
মাসুদ রানা
বেনামী বন্দর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা
প্রকাশনা
ANIK

মাসুদ রানা

বেনামী বন্দর

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

আণবিক অস্ত্র তৈরি করছে ইসরায়েল।
ঠেকাবার সাধ্য নেই কারও।
মিশরীয় সিক্রেট সার্ভিসের চীফ আলী কারামের
মাথা খারাপ হওয়ার দশা। নিউক্লিয়ার বোম হাতে পেলে
অসহ্য হয়ে উঠবে ইসরায়েলের অত্যাচার।
মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর এখন সর্বনাশ ঠেকাবার
একমাত্র উপায় হচ্ছে বোমা তৈরি করা। তবে যদি
রক্ষা করা যায় শক্তির ভারসাম্য। কিন্তু কে দেবে প্রয়োজনীয়
ইউরেনিয়াম? খোলা বাজারে তো বিক্রি হয় না এ-জিনিস।
অবৈধভাবে সংগ্রহ করতে হবে একশো টন ইউরেনিয়াম—
এমন ভাবে, যেন কাকপক্ষীতেও টের না পায়।
ফাঁস হয়ে গেলেই বানচাল হয়ে যাবে সব।
এই অসাধ্য সাধনের ভার পড়ল মাসুদ রানার ওপর।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০


Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
SCANNED & EDITED BY
ANIK
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

মাসুদ রানা

বেনামী বন্দর

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

চুয়ান্ন টাকা

ISBN 984-16-7117-4

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা) ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৩
ষষ্ঠ প্রকাশ: মার্চ ২০০৮

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা) ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা) ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
e-mail: sebaprok@citechco.net
Website: www.Boi-Mela.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা) ঢাকা ১০০০

শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana
BENAMI BANDAR
(Part I & II)
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

মাসুদ রানার ভলিউম

১৪৯-১৫০	শান্তিদূত-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৫১-১৫২	শ্বেত সন্ত্রাস-১,২ (একত্রে)	৬৯/-
১৫৬-১৫৭	মৃত্যু আলিঙ্গন-১,২ (একত্রে)	৫২/-
১৫৮-১৬২	সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া	৫৯/-
১৫৯-১৬০	আবার উ সেন-১,২ (একত্রে)	৪৭/-
১৬২-১৬৫	কে কেন কিভাবে+কুচক্র	৪৭/-
১৬৩-১৬৪	মুক্ত বিহঙ্গ-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
১৬৬-১৬৭	চাই সাম্রাজ্য-১,২ (একত্রে)	৬২/-
১৬৮-১৬৯	অনুপ্রবেশ-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৭০-১৭১	যাত্রা অশুভ-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭২-১৭৩	জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৭৪-১৭৫	কালো টাকা ১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭৬-১৭৭	কোকেন সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৮০-১৮১	সত্যবাবা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১৮২-১৮৩	যাত্রীরা হুঁশিয়ার+অপারেশন চিতা	৪৩/-
১৮৪-১৮৫	আক্রমণ '৮৯-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৮৬-১৮৭	অশান্ত সাগর-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৮৮-১৮৯-১৯০	শ্বাপদ সংকুল-১,২,৩ (একত্রে)	৬৫/-
১৯১-১৯২	দংশন-১,২ (একত্রে)	৪২/-
৯৫-১৯৬	ব্ল্যাক ম্যাজিক-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১৯৭-১৯৮	তিক্ত অবকাশ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৯৯-২০০	ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২০১-২০২	আমি সোহানা-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
২০৩-২০৪	অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
২০৫-২০৬-২০৭	জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে)	৬৯/-
২০৮-২০৯	সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২১০-২১১	গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২১২-২১৩-২১৪	নরপিশাচ-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
২১৭-২১৮	অন্ধশিকারী১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২১৯-২২০	দুই নম্বর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২২১-২২২	কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২২৩-২২৪	কালোছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২২৫-২২৬	নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২২৭-২২৮	বড় ক্ষুধা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২২৯-২৩০	স্বর্ণদ্বীপ-১,২ (একত্রে)	৪০/-
২৩১-২৩২-২৩৩	রক্তপিপাসা-১,২,৩ (একত্রে)	৪৮/-
২৩৪-২৩৫	অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৩৬-২৩৭	ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে)	৩১/-
২৩৮-২৩৯	নীল দংশন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪০-২৪১	সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৪২-২৪৩-২৪৪	কালপুরুষ-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
২৪৫-২৪৬	নীল বজ্র ১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪৯-২৫০-২৫১	কালকূট-১,২,৩ (একত্রে)	৫০/-
২৫৪-২৫৫	সবাই চলে গেছে ১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২৫৬-২৫৭	অনন্ত যাত্রা ১,২ (একত্রে)	৩৯/-

২৬৩-২৬৪	হীরক সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
২৫৮-২৬৫	রক্তচোষা+সাত রাজার ধন	৪৩/-
২৫৯-২৬০-২৬১	কালো ফাইল ১,২,৩ (একত্রে)	৪৮/-
২৬৬-২৬৭-২৬৮	শেষ চাল ১,২,৩ (একত্রে)	৫৬/-
২৬৯-২৮৫	বিগব্যাঙ+মাদকচক্র	৪৩/-
২৭০-২৯১	অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ	৩৮/-
২৭২-২৭৩	মহাপ্রলয়+যুদ্ধবাজ	৩৯/-
২৭৪-২৭৫	প্রিন্সেস হিয়া ১,২ (একত্রে)	৫২/-
২৭৬-২৯১	মৃত্যু ফাঁদ+সীমালঙ্ঘন	৪৫/-
২৭৯-২৮২	মায়ান ট্রেজার+জন্মভূমি	৫১/-
২৮০-২৮৯	ঝড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ	৩৮/-
২৮১-২৭৭	আক্রান্ত দূতাবাস+শয়তানের ঘাঁটি	৪৬/-
২৮৩-২৮৮	দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস	৪৭/-
২৮৪-৩১২	মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট	৪২/-
২৮৬-২৮৭	শকুনের ছায়া ১,২ (একত্রে)	৪১/-
২৯০-২৯৩	গুডবাই, রানা+কান্তার মরু	৪৬/-
২৯২-২৯৮	রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ	৩৭/-
২৯৪-৩০৪	কর্কটের বিষ+সার্বিয়া চক্রান্ত	৪২/-
২৯৫-২৯৭	বোস্টন জ্বলছে+নরকের ঠিকানা	৩৩/-
২৯৬-৩০৬	শয়তানের দোসর+কিলার কোবরা	৪২/-
২৯৯-২৭৮	কুহেলি রাত+ধ্বংসের নকশা	৪৩/-
৩০০-৩০২	বিষাক্ত থাবা+মৃত্যুর হাতছানি	৪০/-
৩০১-৩৪৪	জন্মশত্রু+ক্রাইম বস	৪১/-
৩০৫-৩০৭	দুরভিসন্ধি+মৃত্যুপথের যাত্রী	৪৭/-
৩০৮-৩৪২	পালাও, রানা+অন্ধপ্রেম	৫৪/-
৩০৯-৩১০	দেশপ্রেম+রক্তলালসা	৪১/-
৩১১-৩১৪	বাঘের খাঁচা+মুক্তিপণ	৪৭/-
৩১৫-৩১৬	চীনে সঙ্কট+গোপন শত্রু	৪৯/-
৩১৭-৩১৯	মোসাদ চক্রান্ত+বিপদসীমা	৪০/-
৩১৮-৩৪৭	চরসদ্বীপ+ইশকাপনের টেক্কা	৫০/-
৩২০-৩২১	মৃত্যুবীজ+জাতগোক্ষুর	৪৩/-
৩২২-৩৩৬	আবার ষড়যন্ত্র+অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা	৫৪/-
৩২৩-৩৫২	অন্ধ আক্রোশ+মরুকন্যা	৬২/-
৩২৪-৩২৮	অশুভ প্রহর+অপারেশন ইজরাইল	৫৮/-
৩২৫-৩৫১	কনকতরী+দুর্গে অন্তরীণ	৪৪/-
৩২৬-৩২৭	স্বর্ণখনি ১,২ (একত্রে)	৫৮/-
৩২৯-৩৩০	শয়তানের উপাসক+হারানো মিগ	৪৬/-
৩৩২-৩৩৩	টপ সিক্রেট ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৩৩১-৩৪১	ব্লাইন্ড মিশন+আরেক গডফাদার	৪২/-
৩৩৭-৩৩৮	গহীন অরণ্য+প্রজেক্ট X-15	৫৯/-
৩৪০-৩৪৩	আবার সোহানা+মিশন তেল আবিব	৪৫/-
৩৪৫-৩৪৬	সুমেরুর ডাক-১,২ (একত্রে)	৫৫/-
৩৪৮-৩৪৯	কালো নকশা+কালনাগিনী	৫০/-
৩৫৪-৩৫৯	বিষচক্র+মৃত্যুবাণ	৫০/-
৩৫৫-৩৩১	শয়তানের দ্বীপ+বেদুঈন কন্যা	৫৫/-

বেনামী বন্দর-১

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ১৯৮৩

এক

হিথরো এয়ারপোর্ট।

ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের নিয়মিত কায়রো টু লন্ডন ফ্লাইট। একটা সাতশো সাঁইত্রিশ বোয়িং, বিকেল ঠিক সাড়ে তিনটের সময় পাঁচ নম্বর রানওয়েতে ল্যান্ড করল। সিঁড়ি লাগাবার পর পেটের কাছে দরজা খুলে যেতেই সেখানে ফুটল এক তাজা গোলাপ। একপাশে সরে দাঁড়িয়ে আরোহীদের বেরিয়ে আসার পথ করে দিল সে।

বোয়িঙের দরজা পেরিয়ে সবার আগে বেরিয়ে এলেন দশাসই এক পুরুষ। ইনিই মিশরীয় সিক্রেট সার্ভিসের চীফ, লেফটেন্যান্ট জেনারেল আলি কারাম। পরনে সাদা ঈজিপশিয়ান কটনের থ্রী-পীস স্যুট। চোখে সান-গ্লাস। শজারুর কাঁটার মত গোঁফ, কাঁচা-পাকা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, প্রায় চৌকো আর সমতল প্রকাণ্ড মাথায় কোঁকড়া চুলের নিখুঁত ঢেউ। রিস্টওয়াচে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলেন তিনি।

লন্ডনে জনা বিশেক অ্যাকটিভ এজেন্ট রয়েছে মিশরের, কিন্তু লেফটেন্যান্ট জেনারেল আলি কারামের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্যে তাদের কাউকে ব্যবহার করা হচ্ছে না। সদ্য ট্রেনিং পাওয়া এক দল তরুণকে কাজে লাগানো হয়েছে—এর আগে এরা কখনও কোন এসপিওনাজ তৎপরতায় জড়ায়নি নিজেদের, ট্রেনিং শেষ করে লন্ডনে এসে অবধি অপেক্ষায় ছিল। এদেরকে অনুসরণ করে শত্রুপক্ষের এজেন্টরা চীফের পরিচয় জেনে ফেলবে, সে-ভয় নেই। এই মুহূর্তে কে কোথায় আছে তা বোঝা না গেলেও, লন্ডনে মিশরীয় চীফ যেটুকু সময় আছেন, তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাবে এরা।

বিপজ্জনক ঝুঁকি থাকে বলে কোন ইন্টেলিজেন্স চীফ সাধারণত গোপনে বিদেশের মাটিতে পা দেন না। কিন্তু অ্যাভরাম অ্যামবুসি দেখা করতে চাওয়ায় একান্ত বাধ্য হয়েই লে. জেনারেল আলি কারামকে লন্ডনে আসতে হয়েছে। দেখা করার সময় এবং জায়গা সম্পর্কে কোন রকম আলোচনার অবকাশ মেলেনি, কখন আর কোথায় দেখা করতে হবে একটা মেসেজ পাঠিয়ে সেটাই শুধু জানিয়ে দিয়েছে অ্যামবুসি। আর অ্যামবুসির এ ধরনের অনুরোধে সাড়া না দিয়ে লে. জেনারেলের কোন উপায় নেই। অ্যাভরাম অ্যামবুসি আসলে মিশরীয় সিক্রেট সার্ভিসের একজন টপ এজেন্ট, পনেরো বছরের বেশি হতে চলল ইসরায়েলের শক্তিশালী স্পাই সংস্থা জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইন্টারন্যাশনালের বড়সড় একটা পদ দখল করে আছে। অ্যামবুসি যে ডাবল এজেন্ট, সেটা একা মিশরীয় চীফ ছাড়া আর কেউ জানে না,

কাজেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবার জন্যে দেখা করার প্রয়োজন হলে চীফকেই ছুটে আসতে হয়।

লে. জেনারেল আধা সরকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে ভ্রমণ করছেন, পাসপোর্ট ইত্যাদি সবই নকল, কিন্তু এয়ারপোর্টে কোন ব্যাপারে কোন রকম হাঙ্গামা পোহাতে হলো না। এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙের সামনে মস্ত চাতাল, সেখানে ট্যাক্সি আর প্রাইভেট কারের ভিড়। কোন দিকে বিশেষ দৃক্‌পাত না করে লাল রঙের একটা ডাটসনে গিয়ে উঠলেন আলি কারাম। স্টার্ট দেয়াই ছিল, গাড়ি ছেড়ে দিল শোফার।

কোটের পকেট থেকে টোবাকো পাইপ আর পাউচ বের করলেন জেনারেল। টোবাকো ভরে পাইপে আগুন ধরালেন, ভুরু জোড়া সামান্য একটু কুঁচকে আছে। দেখা করার জন্যে এত থাকতে লন্ডনকেই যে কেন বেছে নিল অ্যামবুসি, তিনি জানেন না। কে জানে, হয়তো জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের কোন মিশন নিয়ে লন্ডনে আসছে সে। ঘটনা যাই হোক, অ্যাভরাম অ্যামবুসির ওপর অগাধ বিশ্বাস আছে তাঁর এই লোকই দুটো যুদ্ধে টিকে থাকতে এবং দুটো যুদ্ধ এড়াতে সাহায্য করেছে মিশরকে।

অ্যামবুসির দেখা করতে চাওয়ার কারণটা জানা না থাকলেও অনুমান করতে পারেন তিনি। প্রফেসর জর্জ ওয়াল-এর ব্যাপারটা নিয়ে তিনি নিজেও দুশ্চিন্তায় ভুগছেন।

নজর রাখার সাধারণ একটা ঘটনা থেকে এর সূচনা। মিশরীয় সিক্রেট সার্ভিস জানতে পারে, উঁচুদরের একজন পদার্থ বিজ্ঞানী, প্রফেসর জর্জ ওয়াল, অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চাকরি করে, ইউরোপে ছুটি কাটাতে এসে হঠাৎ করেই সিদ্ধান্ত নেয়, তেল আবিবে একবার ঢুঁ মেরে যাবে। প্রফেসরের ওপর নজর রাখার দায়িত্ব দেয়া হয় এরহাম মোয়াকিমকে। কায়রো থেকে মাত্র বছর খানেক আগে তেল আবিবে পাঠানো হয়েছে তাকে, এসপিওনাজে এখনও ততটা দক্ষ নয়। কিন্তু কাজটা সহজ আর সাধারণ বলে তাকেই দায়িত্বটা দেয়া হয়। মেসেজ এল, প্রফেসর ওয়ালকে হারিয়ে ফেলেছে মোয়াকিম। এই প্রথম টনক নড়ল লে. জেনারেল আলি কারামের। তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে খোঁজ-খবর শুরু করলেন। মিলানের এক ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক, লোকটা মাঝে মধ্যে জার্মান ইন্টেলিজেন্সের হয়ে ছোট-খাট কাজ করে দেয়, জানাল, রোম থেকে তেল আবিবে যাবার প্লেনের টিকেট নিজের গাঁটের পয়সায় কেনেনি প্রফেসর, সেটা তাকে কিনে দেয় একজন ইসরায়েলী কূটনীতিকের স্ত্রী। গুরুত্বপূর্ণ আরও একটা তথ্য পেয়েছেন তিনি রাশিয়ার কাছ থেকে। মিশরের সাথে রাশিয়ার সম্পর্ক অনেক আগেই খারাপ হয়ে গেছে, তা সত্ত্বেও কোন কোন ব্যাপারে এখনও সহযোগিতার মনোভাব দেখিয়ে থাকে ওরা। কে.জি.বি.-র তরফ থেকে রুটিন মাফিক একসেট স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফ পাঠানো হয়েছিল মিশরীয় সিক্রেট সার্ভিসের হেড অফিসে, সেগুলো বিশ্লেষণ করে জানা গেল, ইসরায়েলের নেগেভ মরুভূমিতে, ডায়মোনার কাছে বড় ধরনের কোন নির্মাণ কাজ চলছে। লে. জেনারেলের সন্দেহ ঘনীভূত হলো। তিনি জানতেন, প্রফেসর ওয়াল এই নেগেভ মরুভূমির দিকেই যাচ্ছিল, এই সময় তাকে হারিয়ে

ফেলে মোয়াকিম।

ইসরায়েলের ভেতর কিছু একটা ঘটছে, কিন্তু কি ঘটছে জানা নেই. সেটাই লে. জেনারেল আলি কারামের দুশ্চিন্তার কারণ। তাছাড়া; ভয় পাবার মত একটা ঘটনাও ঘটে গেছে। নির্দেশ অনুসারে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছিল মোয়াকিম. কিন্তু বেশ কিছুদিন হয়ে গেল তার আর কোন সাড়া নেই।

সন্দেহ আর প্রশ্ন গিজ গিজ করছে তাঁর মনে। আশা করছেন, অন্তত কিছু প্রশ্নের উত্তর জানা যাবে অ্যামবুসির কাছে।

হিলটনের সামনে থামল লাল ডাটসন। দরজা খুলে দিল শোফার. গাড়ি থেকে নামলেন আলি কারাম। রিস্টওয়াচ দেখে নিয়ে সিঁড়ির তিনটে ধাপ টপকে হোটেলের রিসেপশনে ঢুকলেন তিনি। আগেই রিজার্ভ করা হয়েছে স্যুইট, কাজেই রিসেপশন ডেস্কে সময় নষ্ট হলো না। এলিভেটরে চড়ে সাততলায় উঠে এলেন তিনি তিন মিনিটের মধ্যেই।

নিজের স্যুইটে ঢুকে আরেকবার রিস্টওয়াচ দেখলেন আলি কারাম। মনে মনে ইংরেজদের সময় জ্ঞানের প্রশংসা করলেন। ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজের বোয়িং কাঁটায় কাঁটায় নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁচেছে। এখন থেকে পাঁচ মিনিট পর দরজায় নক করবে অ্যামবুসি।

কোটের বোতাম খুলে টাইয়ের নট একটু ঢিল করলেন আলি কারাম। রেফ্রিজারেটর থেকে কোক বের করে গ্লাসে ঢাললেন, সোফায় বসে পা দুটো তুলে দিলেন নিচু টেবিলের ওপর। সময় পার করার জন্যে বাঁ হাত দিয়ে তুলে নিলেন সেদিনের লন্ডন টাইমস।

ঠিক পাঁচ মিনিট পর নক হলো দরজায়।

খবরের কাগজ মুখের সামনে থেকে না সরিয়েই আলি কারাম বললেন, 'কাম ইন।'

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল অ্যাভরাম অ্যামবুসি ওরফে সামী ওয়ালিদ। অ্যাশ কালারের একটা স্যুট পরে আছে সে। বয়স বোঝার উপায় নেই, পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে হবে। সে-ও ছদ্মবেশে আছে—প্রায় কাঁধ ছোঁয়া লম্বা বাবরি, ঘন কালো মোটা লম্বা ভুরু, কানের লতি ছাড়িয়ে ইঞ্চি দেড়েক নেমে এসেছে জুলফি, নাকটা থ্যাবড়া, চোখে স্টীল রিমের চশমা। রেফ্রিজারেটর থেকে কোকের বোতল আর গ্লাস নিয়ে এগিয়ে এল সে, লে. জেনারেলের উল্টো দিকের সিঙ্গেল সোফায় বসল। গ্লাসে কোক ঢালতে শুরু করে বলল, 'এসেছ বলে ধন্যবাদ।' দেখা হলে প্রথমে এই কথাটাই বলে সে।

অ্যামবুসি বয়সে ছোট হলেও, অনেক বছর আগে ওদের পদমর্যাদা ছিল অভিন্ন। কিন্তু অসাধারণ মেধা আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল বলে তখন এক রকম ধরেই নেয়া হয়েছিল, এই অ্যামবুসি একদিন মিশরীয় সিক্রেট সার্ভিসের চীফ হবে। কিন্তু তার জীবনে এমন একটা ঘটনা ঘটে যায়, যার পর থেকে ইসরায়েল আর ইহুদিদের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে সে, বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়ে ইসরায়েলে গিয়ে আস্তানা গাড়ে।

মুখের সামনে থেকে খবরের কাগজ সরিয়ে অ্যামবুসির দিকে তীক্ষ্ণ চোখে

তাকালেন আলি কারাম। দু'জন পরস্পরের নকল চেহারা চেনেন। ধন্যবাদের উত্তরে কি বলতে হয় আজও তাঁর রপ্ত হয়নি। গম্ভীর গলায় বললেন, 'নতুন কি তাই বলো।'

'উপায় ছিল না,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল অ্যামবুসি, 'তোমার এক ছেলেকে অ্যারেস্ট করতে হয়েছিল আমার। তেল আবিবে।'

'উপায় ছিল না মানে?'

গ্লাসে চুমুক দিল অ্যামবুসি, প্রশান্ত চেহারা। 'একজন ভি.আই. পি.-কে পাহারা দিচ্ছিল মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স, ওরা জানতে পারে এক ছোকরা ওদের পিছু নিয়েছে। শহরে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের অপারেশন্যাল এজেন্ট নেই, কাজেই তাকে অ্যারেস্ট করার জন্যে ওরা আমার ডিপার্টমেন্টকে অনুরোধ করে। আন-অফিশিয়ালি।'

ক্ষোভ গোপন করার জন্যে ব্যস্ত হাতে পাইপে টোবাকো ভরতে শুরু করলেন আলি কারাম। 'এখন তার অবস্থা?'

'ইন্টারোগেশনের পর তাকে মেরে ফেলতে হয়েছে। তার নাম আয়েদ সোলায়মান, কাজ করছিল এরহাম মোয়াকিম নামে।'

আরেকটু হলে আলি কারামের হাত থেকে পাইপটা পড়ে যাচ্ছিল। পা দুটো টেবিল থেকে নামিয়ে অ্যামবুসির দিকে ঝুঁকে পড়লেন তিনি। 'সে তার আসল পরিচয় ফাঁস করে দিয়েছে?'

'আমরা মার্কিন ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করছি—ইলেকট্রিক শক আর লাই ডিটেকটর, দুটো এক সাথে। এগুলোর সাথে এঁটে ওঠার ট্রেনিং ওদেরকে তুমি দাও না।'

তিক্ত একটু হাসি ফুটল লে. জেনারেলের ঠোঁটে। 'এইসব ইকুইপমেন্টের কথা বলা হলে আমাদের চাকরি করার জন্যে একজনকেও পাওয়া যাবে না। আর কি ফাঁস করেছে সে?'

'আমাদের অজানা ছিল এমন কিছু নয়। করত, কিন্তু তার আগেই আমি তাকে…'

'তুমি, নিজের হাতে?'

'তোমার এই ছেলে আর কারও হাতে মারা গেলে তুমি খুশি হতে?'

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন আলি কারাম। কার্পেটের ওপর পায়চারি করলেন আধ মিনিট। তারপর অ্যামবুসির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে জানতে চাইলেন, 'প্রফেসর ওয়ালের ব্যাপারে কিছু জানতে পেরেছিল সোলায়মান?'

'বিশেষ কিছু না। প্রফেসর নেগেভ মরুভূমির দিকে গেছে, এইটুকু।' কোটের পকেট থেকে নীল প্লাস্টিকের ছোট একটা বাক্স বের করল অ্যামবুসি।

'লোকটা নেগেভে গিয়েছিল কেন?'

একটু ম্লান দেখাল অ্যামবুসিকে। 'বলতে পারব না। নেগেভে ওরা কি করছে তা আমার জানার সুযোগ হয়নি। তবে বড় ধরনের কিছু একটা যে হচ্ছে ওখানে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। খুব কড়াকড়ি। ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্যে স্পেশাল একটা গ্রুপকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আমার ডিপার্টমেন্ট কিছুই জানে না।' হাতের

বাক্সটা আলি কারামের দিকে বাড়িয়ে দিল সে। 'প্রফেসর ওয়ালের ফ্ল্যাট থেকে এটা উদ্ধার করেছিল সোলায়মান।'

'কোথেকে পেয়েছে তুমি জানলে কিভাবে?' বাক্সটা নিলেন আলি কারাম।

'ওয়ালের ফিঙ্গারপ্রিন্ট ছিল ওতে। জানালা দিয়ে ওয়ালের ফ্ল্যাটে ঢুকেছিল সোলায়মান, বেরিয়ে আসার সময় হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয় তাকে।'

বাক্সটা খুলে লাইট-প্রুফ এনভেলাপে আঙুল বুলালেন আলি কারাম। এনভেল্যাপটা খোলা অবস্থায় রয়েছে। ভেতর থেকে ফটোগ্রাফিক নেগেটিভ বেরল। হঠাৎ হার্টবিট বেড়ে গেল তাঁর।

'এনভেলাপ খুলে ফিল্ম ডেভেলপ করেছি আমরা,' বলল অ্যামবুসি। 'কিছু নেই, ব্ল্যাঙ্ক।'

গভীর উদ্বেগ ও অসন্তোষের অনুভূতি নিয়ে সব গুছিয়ে বাক্সে ভরলেন আলি কারাম, তারপর কোটের পকেটে রেখে দিলেন। সব পরিষ্কার হয়ে গেছে তাঁর কাছে। ইসরায়েলের নেগেভ মরুভূমিতে কি ঘটছে এখন তিনি নিশ্চিত ভাবে জানেন। ফিরে গিয়ে আবার সোফায় বসলেন। 'তোমার বোধহয় যাবার সময় হলো, তাই না?'

ভুরু জোড়া সামান্য একটু কুঁচকে উঠল অ্যামবুসির, মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। ধীর পায়ে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। 'বাক্সটা কি সে-সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই নেই।'

'আমার আছে,' বলে লন্ডন টাইমস তুলে নিজের চেহারা ঢাকলেন আলি কারাম।

দুই

সোনারগাঁও হোটেলের চারতলায় পৌঁছে থামল এলিভেটর, দরজা খুলে গেল, করিডরে পা রাখল বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদ। পরনে সাদা গ্যাবার্ডিনের স্যুট, কোটের বাঁ আস্তিনটা কাঁধ থেকে নিচের দিকে ফাঁপা, হাত নেই। করিডর ধরে হন হন করে এগিয়ে এল সে, থামল একশো দুই নম্বর স্যুইটের সামনে। চোখের সামনে ডান হাত তুলে রিস্টওয়াচ দেখল, চারটে বাজতে আধ মিনিট বাকি।

দরজার সামনে ত্রিশ সেকেন্ড অপেক্ষা করার পর কবাটে নক করল সে। স্যুইটের ভেতর থেকে ভারী গলা ভেসে এল, 'কাম ইন।'

নব ঘুরিয়ে কবাট খুলল সোহেল, পা রাখল স্যুইটের ভেতর। দশ সেকেন্ড পর আবার করিডরে বেরিয়ে এল, পিছনে দশাসই এক পুরুষ। ভদ্রলোকের বয়স হবে ষাট থেকে পঁয়ষট্টি, পরনে ধূসর রঙের ঈজিপশিয়ান কটনের স্যুট। মাথায় চকচকে মস্ত টাক, দাড়ি-গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। সোহেলের পিছু পিছু এলিভেটরে চড়লেন তিনি। গ্রাউন্ড ফ্লোরে নেমে এল এলিভেটর।

রিসেপশন পেরিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল ওরা, সেখান থেকে পার্কিং এরিয়ায়। একটা মার্সিডিজ গাড়ির দরজা খুলে অপেক্ষা করছিল সাদা কাপড় পরা শোফার, ওরা গাড়িতে উঠে বসতে দরজা বন্ধ করল সে, তারপর ড্রাইভিং সীটে উঠে স্টার্ট দিল। দ্রুত একটা ইউ টার্ন নিয়ে হোটেলের গেট দিয়ে স্যাঁৎ করে বেরিয়ে গেল মার্সিডিজ।

কেউ জানল না, হোটেলের তিনতলা থেকে মার্সিডিজের চলে যাওয়াটা অত্যন্ত মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করল একজন বিদেশী লোক। টেকো ভদ্রলোক এবং হাতকাটা যুবক, কাউকেই তার চিনতে কোন অসুবিধে হয়নি। জানালার পর্দা সামান্য একটু সরিয়ে চোখে বিনকিউলার লাগিয়ে ওদের চলে যাওয়াটা দেখার জন্যেই অপেক্ষা করছিল সে। টেকো ভদ্রলোকের সাথে হাতকাটা যুবক থাকায়, ওদের গন্তব্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা করতে পারল সে।

মতিঝিল কমার্শিয়াল এরিয়ার সাততলা একটা বিল্ডিঙের সামনে এসে থামল মার্সিডিজ। গাড়ি থেকে নেমে মার্সিডিজের পিছনের দরজা খুলে দিল শোফার। প্রথমে নামল সোহেল, তারপর বিদেশী ভদ্রলোক। রাশভারি চেহারা নিয়ে মস্ত হলঘরে ঢুকলেন তিনি, এদিক ওদিক কোন দিকে না তাকিয়ে যুবকের পিছু পিছু গিয়ে উঠলেন এলিভেটরে।

টপ ফ্লোর অর্থাৎ সাততলায় চৌকো একটা ঘর আছে, সাদা কাপড় পরা দু'জন সিকিউরিটি গার্ড আছে এই ঘরে। এরা তাকিয়ে আছে দরজার মাথার ওপর ছোট একটা টিভি স্ক্রীনের দিকে। হঠাৎ স্ক্রীনটা আলোকিত হয়ে উঠল, ছোট দুটো শব্দ ফুটে উঠল তাতে—ঠিক আছে।

সাততলায় উঠে এল এলিভেটর, দরজা খুলে গেল। ছোট চৌকো ঘরে পা রাখল সোহেল, পিছনে অতিথি ভদ্রলোক। সিকিউরিটি গার্ডের উপস্থিতি লক্ষ্য করে এক সেকেন্ড ইতস্তত করলেন তিনি, ভাবলেন, এখানে বোধহয় বডি সার্চ করার নিয়ম আছে। তিনি জানেন না, এলিভেটরে পা রাখার পর থেকে কয়েকটা ক্যামেরা কয়েক দিক থেকে তাঁর কয়েকটা ফটো তুলে কম্পিউটরে পাঠিয়ে দিয়েছে, কম্পিউটর তাঁর ফটো আর এক্স-রে ফিল্ম দেখে ডোশিয়ার বেছে বের করেছে, সেটা যাচাই করেছে, তারপর রিপোর্ট করেছে চীফের সেক্রেটারি ইলোরাকে। এদের দু'জনের কাছে অস্ত্র নেই, নকল চেহারা নিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে না। এই সব রিপোর্ট পাবার পর রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে সিকিউরিটি গার্ডদের জানিয়েছে ইলোরা। এই 'ঠিক আছে' না পেলে এদেরকে বাধা দিত সিকিউরিটি গার্ড।

চৌকো ঘর থেকে বেরিয়ে লম্বা করিডর পেরিয়ে এল ওরা। শেষ মাথার একটা কামরার সামনে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে ধরল সোহেল। পর্দা সরিয়ে অফিস কামরায় ঢুকলেন বিদেশী ভদ্রলোক। ডেস্কের পিছনে একটা চেয়ারে বসে আছে আকাশ নীল সালোয়ার-কামিজ পরা ইলোরা, মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের প্রাইভেট সেক্রেটারি। ভদ্রলোককে দেখে উঠে দাঁড়াল সে, মিষ্টি একটু হাসল, তারপর ইন্টারকমের সুইচ অন করে বলল, 'লেফটেন্যান্ট জেনারেল আলি কারাম, স্যার।'

ইন্টারকম থেকে গম্ভীর একটা কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এল, 'পাঠিয়ে দাও।'

ইতোমধ্যে রিসেপশনে ঢুকে আলি কারামকে ছাড়িয়ে চেম্বারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সোহেল; আলি কারাম সেদিকে এগোলেন। দরজা খুলে এক পাশে সরে দাঁড়াল সোহেল। পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকলেন মিশরীয় সিক্রেট সার্ভিসের চীফ। বাইরে থেকে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল সোহেল।

:

একটা খোলা ফাইলে কিছু লেখা শেষ করলেন মেজর জেনারেল রাহাত খান, দরজা খোলার শব্দে মুখ তুলে তাকালেন। পর্দা সরিয়ে মিশরীয় সিক্রেট সার্ভিস চীফ লে. জেনারেল আলি কারামকে ঢুকতে দেখে মৃদু হাসলেন তিনি। কলমটা রেখে দিয়ে ফাইলটা বন্ধ করার জন্যে হাত বাড়ালেন।

লে. জেনারেল আলি কারামের রাশভারি চেহারা থেকে গাম্ভীর্যের ছাপ খসে পড়ল, আন্তরিক হাসি আর সমীহের ভাব ফুটে উঠল সেখানে। বললেন, 'আসসালামু আলায়কুম, স্যার।'

মৃদু হাসিটা ঠোঁটে ধরে রেখে উত্তর দিলেন রাহাত খান, 'ওয়ালাইকুম সালাম। বসো, আলি। এখন তুমি মিশরের দু'নম্বর মানুষ—স্যার বলার অভ্যাসটা দেখছি এখনও তোমার গেল না।'

'কি যে বলেন, স্যার! আপনি আমার সিনিয়র অফিসার ছিলেন...' ডেস্কের সামনের একটা চেয়ার টেনে বসলেন আলি কারাম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মেজর রাহাতের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিলেন তদানীন্তন ক্যাপ্টেন আলি কারাম। 'ধরতে গেলে গুরু বলতে...'

ওয়ালক্লকের দিকে তাকিয়ে সময় দেখলেন রাহাত খান। বললেন, 'বিপদটা কি?'

রাহাত খান সেই রাহাত খানই আছেন, মনে মনে ভাবলেন মিশরীয় ইন্টেলিজেন্স চীফ, একটুও বদলাননি। চোখে এখনও সেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ঝিলিক, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে আছেন মনের গভীরে, সময় যাতে অপচয় না হয় সেদিকে সতর্ক খেয়াল।

'পাঁচ মিনিট, স্যার। তার বেশি আপনার সময় নষ্ট করব না,' বললেন আলি কারাম।

রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিলেন রাহাত খান।

'সিক্স-ডে ওঅরের পর ইসরায়েলী ডিফেন্স মিনিস্ট্রির একজন কর্মকর্তা একটা রিপোর্ট তৈরি করে,' কাজের কথা শুরু করলেন আলি কারাম। 'সেটার নাম ছিল—ইসরায়েলের অবধারিত ধ্বংস। সংক্ষেপে সেই রিপোর্টের বক্তব্য ছিল এই রকম: ভবিষ্যৎ যতদূর দেখতে পাওয়া যায়, তেল থাকায় আরব দেশগুলো ইসরায়েলের চেয়ে ধনীই থাকবে। এরই মধ্যে ইসরায়েলীদের অর্থনীতির ওপর প্রতিরক্ষা বাজেট অসহ্য একটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে, ওদিকে আমাদের শত্রুদের হাতে রয়েছে বিলিয়ন বিলিয়ন পেট্রো-ডলার, যত খুশি অস্ত্র আর গোলা-বারুদ কিনে যেতে পারবে ওরা। ওদের যখন দশ হাজার ট্যাংক থাকবে, আমাদের তো অন্তত ছয় হাজার ট্যাংক দরকার হবে? ওদের যখন থাকবে বিশ হাজার, আমাদের কম

করেও বারো হাজার না হলে চলবে না। ফি বছর স্রেফ প্রতিরক্ষা বাজেট দ্বিগুণ করেই ওরা আমাদের জাতীয় অর্থনীতি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারে, একটা গুলি না চালিয়েও।

'মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, প্রতি দশ বছরে একটা সীমিত যুদ্ধ, এই রকম একটা প্যাটার্ন তৈরি হয়েছে। এই প্যাটার্নও আমাদের অনুকূলে নয়। কিছুদিন পর পর এক-আধটা যুদ্ধে হেরে যাওয়া আরব দেশগুলোর জন্যে তেমন কিছু নয়। ধাক্কা সামলে ওঠার সামর্থ্য ওদের আছে। কিন্তু আমাদের প্রথম পরাজয়টাই হবে আমাদের শেষ যুদ্ধ। উপসংহার—ইসরায়েলের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে শত্রুরা আমাদের জন্যে যে ভিশাস স্পাইরাল তৈরি করেছে তা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এরপর যদি কোন আরব রাষ্ট্র হামলা করে বা করতে চায়, এমন একটা কিছু দিয়ে তাকে শায়েস্তা করতে হবে ভবিষ্যতে যেন সে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। সেই রকম জিনিস একটাই আছে—নিউক্লিয়ার উইপনস।'

'মোশে দায়ানের রিপোর্ট ওটা।'

'জ্বী।'

'কিন্তু আমার জানামতে ইসরায়েলী কেবিনেট পরামর্শটা গ্রহণ করেনি।'

'তখন করেনি,' বললেন আলি কারাম। 'কিন্তু এখন পরামর্শটা শুধু গ্রহণই করেনি, নিউক্লিয়ার বোমা হাতে পাওয়ার জন্যে কাজও শুরু করে দিয়েছে ওরা।'

একটু বিচলিত দেখাল রাহাত খানকে, মাথাটা একপাশে একটু কাত করে তির্যক দৃষ্টিতে তাকালেন আলি কারামের দিকে। 'তাই?'

এরপর আলি কারাম অস্ট্রেলিয়ান পদার্থ বিজ্ঞানী জর্জ ওয়ালের প্রসঙ্গে এলেন। ইসরায়েলের নেগেভ মরুভূমির ডায়মোনায় আটচল্লিশ ঘণ্টা ছিল এই লোক। ফিরে এলে, তার ফ্ল্যাটে একটা বাক্স পাওয়া যায়। পকেট থেকে বের করে বাক্সটা রাহাত খানকে দেখালেন তিনি। এটা একটা পারসনেল ডোসিমিটার, এনভেলাপটা লাইট-প্রুফ, ভেতরে সাধারণ ফটোগ্রাফিক নেগেটিভ ফিল্ম আছে। কোন অ্যাটমিক রিয়্যাক্টরে ঢুকতে হলে প্রত্যেকের কাছে একটা করে এই ডোসিমিটার থাকতে হবে। এটা পকেটে বা ট্রাউজার বেল্টে আটকে নেয়া হয়, এবং এটা যদি রেডিয়েশনের নাগালের মধ্যে আসে, ডেভেলপ করার পর ফিল্মটা ঝাপসা দেখাবে। এরপর কে.জি.বি.-র স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফের কথা জানালেন তিনি, নেগেভ মরুভূমির ওই এলাকায় বড় ধরনের নির্মাণ কাজ চলছে।'

সবশেষে আলি কারাম বললেন, 'ওরা অ্যাটম বোমা বানাচ্ছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সাজ-সরঞ্জাম, ইউরেনিয়াম, টেকনিক্যাল নো-হাউ, সম্ভবত সবই ওদের আছে। কিন্তু একটা বাদে এসব আমাদেরও রয়েছে। কাজেই, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমরাও অ্যাটম বোমা বানাব।'

মোড়ক খুলে একটা চুরুট বের করে ধরালেন রাহাত খান। বললেন, 'তোমাদের ইউরেনিয়াম নেই।'

'জ্বী।'

'আমার কাছ থেকে কি সাহায্য আশা করছ তুমি?'

'ওই জিনিস খোলা বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না ' আলি কারাম বললেন,

'কোথাও থেকে যোগাড় করতে হবে। আমি আপনার সেরা কয়েকজন এজেন্টকে চাইছি, যারা আমাদেরকে ওটা যোগাড় করে এনে দেবে।'

'কেন, তোমার নিজের এজেন্টদের কি হয়েছে?' জানতে চাইলেন রাহাত খান।

'ওরা কে কেমন তা আমার চেয়ে ভাল আর কে জানে। গোটা ব্যাপারটা আমরা গোপন রাখতে চাই। আমার লোক যদি জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সে থাকতে পারে, ওদের লোক আমার ডিপার্টমেন্টে নেই তা বুঝব কিভাবে? অন্তত এই কাজের ব্যাপারে ডিপার্টমেন্টের কাউকে বিশ্বাস করতে রাজি নই আমি।'

'বলছ যোগাড় করতে হবে—আসলে চুরি করতে হবে। কিন্তু ইউরেনিয়াম চুরির ঘটনা, সে তো ফাঁস হবেই—তাহলে গোপনীয়তা থাকল কোথায়?'

'সেজন্যেই তো আপনার সেরা এজেন্টদের চাইছি আমি, স্যার,' সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন আলি কারাম। 'চুরির ঘটনা যাতে ফাঁস না হয় সেটাও তাদের নিশ্চিত করতে হবে।'

'বলো কি? এ যে অসম্ভব আবদারের মত শোনাচ্ছে!'

চেহারা ম্লান হয়ে উঠল লে. জেনারেল আলি কারামের। বললেন, 'আমি স্যার অনেক আশা নিয়ে আপনার কাছে…'

'গরম, না ঠাণ্ডা?' হঠাৎ জানতে চাইলেন রাহাত খান। হাত চলে গেছে ইন্টারকমের বোতামে।

'চা।' আলি কারাম জানেন, তিনি যা বলেছেন তারচেয়ে অনেক বেশি বুঝে নিয়েছেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। এখন বিষয়টা নিয়ে গভীর ভাবে আরও একটু চিন্তা করতে চান তিনি, তারপর সিদ্ধান্ত নেবেন—সেজন্যেই ঠাণ্ডা-গরমের প্রসঙ্গ তুলেছেন।

চা পানের পর দু'একটা প্রশ্ন করলেন রাহাত খান। তারপর বললেন, 'কাজটা সম্ভব কিনা জানি না। ঠিক আছে, তুমি যখন এত করে বলছ, আমার একজন এজেন্টকে পাঠাব তোমার কাছে।'

প্রায় আঁতকে উঠলেন আলি কারাম। 'একজনকে দিয়ে কি করব আমি?'

'আমার ছেলেরা কেউ বসে নেই, আলি। একজনের বেশি দিতে পারব না। তবে, যাকে তোমার কাছে পাঠাব সে একাই একশো।'

বিসিআই-চীফ যখন বলছেন, তখন নিশ্চয়ই তাই; এই ভেবে নিজেকে প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করলেন আলি কারাম।

তাঁর মনের কথা যেন বুঝতে পেরেই রাহাত খান আবার বললেন, 'কিন্তু একটা কথা তোমাকে পরিষ্কার বুঝতে হবে, আলি। সাহায্য করব, এ প্রতিশ্রুতি তোমাকে আমি দিচ্ছি না। সবটাই নির্ভর করবে আমার ওই এজেন্টের ওপর। তাকে সব কথা খুলে বলতে হবে তোমার। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, কাজটা সম্ভব নয়। কিন্তু যদি সম্ভব হয়, ওর পক্ষেই সম্ভব।' কথা শেষ করে মৃদু হাসলেন তিনি। অর্থাৎ, কথা শেষ।

'ঠিক আছে, এতেই আমি খুশি,' বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন আলি কারাম, 'কবে নাগাদ পাঠাবেন ওকে?'

সামনের ফাইলটা টেনে নিয়ে আলি কারামের দিকে তাকালেন রাহাত খান। 'আগামী হপ্তায়।'

'আর একটা কথা,' একটু ইতস্তত করলেন লে. জেনারেল, 'বিনিময়ে বাংলাদেশ যা চাইবে…'

হেসে উঠলেন রাহাত খান। 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল! আগে হোক না তোমার কাজ, তারপর দেখা যাবে।…রাতে আমার সাথে খাচ্ছ,' ভুলে যেয়ো না কিন্তু।'

'আচ্ছা, স্যার। চলি এখন।'

লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেলেন আলি কারাম।

তিন

টুংটুং-টুং-টুংটুং।

জলতরঙ্গের মত মিষ্টি আওয়াজ বেরিয়ে এল কায়রো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম থেকে। তারপর আরবী, ইতালী, ফ্রেঞ্চ আর ইংরেজী ভাষায় জানানো হলো, মিলান থেকে অ্যালিটালিয়া ফ্লাইট এসে পৌঁচেছে।

এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙের সামনে এবং অনেকটা দূরে আড়াআড়ি ভঙ্গিতে থামল কারাভেলি, ঠিক যেন প্রকাণ্ড একটা সাদা বক। একটু পর আরোহীরা বেরিয়ে আসতে শুরু করল। বাদামী রঙের স্যুট, সাদা শার্ট আর লাল রঙের টাই পরে রয়েছে মাসুদ রানা। লাগেজ বলতে হাতে একটা ব্রিফকেস, কাঁধে ঝোলানো ডিউটি-ফ্রী দোকান থেকে কেনা একটা ক্যামেরা। টারম্যাক ধরে এগোবার সময় নাক দিয়ে টেনে উত্তর আফ্রিকার শুকনো, গরম মরু-বাতাসে ভরে নিল ফুসফুস। শেষ বিকেলের রোদ নিস্তেজ হয়ে পড়েছে, অ্যারাইভ্যাল হলে ঢোকার আগেই চোখ থেকে সান-গ্লাস নামাল ও। আর সবার সাথে অবজারভেশন ডেস্কের সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে হলো ওকে, বেশ ভিড় দেখা গেল ওখানে, কিন্তু বিশেষভাবে ওর ওপর নজর রাখছে এমন কেউ আছে বলে মনে হলো না।

প্লেনে ওর কোন লাগেজ নেই, তাই চেকিঙের ঝামেলা সবার আগে সারতে পারল ও, শেড থেকে বেরিয়ে এল একা। এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙে ঢুকে তিন জায়গায় থামল। ডিউটি-ফ্রী শপ থেকে কয়েক প্যাকেট সিগারেট কিনল, বুকস্টল থেকে কিনল সেদিনের কাগজ। দু'জায়গায় চার মিনিট দাঁড়িয়ে নিশ্চিত হওয়া গেল, কেউ ওকে অনুসরণ করছে না। তারপর টয়লেটে ঢুকে ভেতর থেকে বন্ধ করল দরজা, ব্রিফকেস খুলে বের করল হালকা নীল রঙের স্যুট, ডোরা কাটা লাল-নীল টাই, পপলিনের নীলচে শার্ট, কালো জুতো, কালো মোজা, সবশেষে সাদা একটা সুতী ক্যাপ। বাদামী স্যুট, সাদা শার্ট, লাল টাই, সান গ্লাস, ক্যামেরা, সাদা জুতো আর মোজা, এবং সবশেষে হীরে বসানো আঙটি আশ্রয় পেল ব্রিফকেসে। ওপরের আবরণ খুলে ফেলতেই কালো ব্রিফকেস হালকা খয়েরি হয়ে গেল। কালো রঙের

চাল ভেতরে ভরে ব্রিফকেস বন্ধ করল ও। তারপর নতুন সাজ নিয়ে বেরিয়ে এল টয়লেট থেকে।

এয়ারপোর্টের ফটক দিয়ে বেরিয়ে জেব্রা-ক্রসিং ধরে রাস্তা পেরল ও। পার্কিং লটে অনেক গাড়ির ভিড়, কিন্তু গ্রে রঙের মার্সিডিজটা খুঁজে পেতে কোন অসুবিধে হলো না। নব ধরে চাপ দিতেই খুলে গেল দরজা। ড্রাইভিং সীটে বসে গ্লাভ কমপার্টমেন্ট থেকে বের করে আনল গাড়ির চাবি। ভিউ মিররে চোখ রেখে স্টার্ট দিল।

এক মিনিটের মধ্যে মেইন হাইওয়েতে উঠে এল ও। হেলিওপোলিস থেকে কায়রো শহরে পৌঁচেছে এটা। রাস্তাটা কয়েক ভাগে ভাগ করা—দ্রুতগতি, মধ্যম গতি আর মন্থর গতি যানবাহনের জন্যে আলাদা আলাদা লেন। মধ্যম গতি বেছে নিয়ে দু'সারি পাম গাছের মাঝখান দিয়ে ছুটল মার্সিডিজ।

শারি রামসেসের ভেতর দিয়ে কায়রোয় ঢুকল ও। ডানদিকে বাঁক নিল, কর্নিক আল-নিল হয়ে টোয়েনটি সিক্স জুলাই ব্রিজের ওপর দিয়ে নদী পেরোল। গেজিরা দ্বীপের জামালেক জেলায় চলে এল ও।

এলাকাটা সমাজের ধনী লোকদের দখলে। ঝকঝকে তকতকে রাস্তা, দোকানপাটের গ্যাঞ্জাম নেই, সিরামিক ইঁটের উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা সব বাড়িই এক একটা বাগান বাড়ি। অফিসার্স ক্লাব পেরিয়ে এসে বাঁক নিয়ে একটা গলিতে ঢুকল মার্সিডিজ। উরু থেকে তুলে নিয়ে খোলা রোড ম্যাপটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিল ও। ডান পাশে এক সার নারকেল গাছ, সামনের একটা বাঁকের কাছে শেষ হয়েছে, বাঁক ঘুরলেই একটা বাগান বাড়ির প্রাইভেট রোডে পড়বে গাড়ি।

মোড় নিতেই একশো গজ সামনে প্রকাণ্ড গেট দেখা গেল, খোলা। বাড়ির ভেতর, গেটের পাশেই, ছোট্ট একটা গার্ডরুম। চকচকে তামা রঙের চেহারা নিয়ে দু'জন লোক বেরিয়ে এল সেটা থেকে। তাদের পাশে গাড়ি থামাল ও। পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে জানালা দিয়ে বাড়িয়ে দিল। জানালার দিকে ঝুঁকে কার্ডের ওপর নজর বুলাল ওরা, চেহারায় কোন রকম ভাব নেই। দু'জনের একজন ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল একবার।

দু'পাশে বাগান, মাঝখানে কংক্রিটের রাস্তা। শ'খানেক গজ এগিয়ে মোড় নিতে বাঁদিকে পড়ল স্যুইমিং পুল, পানি তো নয় যেন টলটলে স্বচ্ছ কাঁচ। আরও অনেক দূরে দেখা গেল গাড়ি বারান্দা, দুটো মার্সিডিজ, দুটো সিট্রন দাঁড়িয়ে রয়েছে। চট করে একবার রিস্টওয়াচে চোখ বুলিয়ে নিল রানা, সময়ের একচুল এদিক ওদিক হয়নি। একটা মার্সিডিজ আর একটা সিট্রনকে ছাড়িয়ে গাড়ি বারান্দার পাশে সিঁড়ির কিনারায় থামল ও। সিঁড়ির তিনটে ধাপ টপকে দ্রুত নেমে এল একজন যুবক। কয়লার মত কালো চেহারা, ঠাণ্ডা চোখ, টিকাল নাক। গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল সে। সাদা শার্টের ওপর জ্যাকেট পরে আছে যুবক, শোল্ডার হোলস্টারের অস্তিত্ব টের পাওয়া গেল। গাড়ি থেকে নেমে কার্ডটা যুবকের নাকের সামনে ধরল ও। ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকানো ছাড়া আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তিনটে ধাপ টপকে দরজা খুলল ও, দামী আসবাবে সাজানো বিশাল হলঘর, দরজার কাছেই দীর্ঘদেহী কালো দুই মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। ওর মতই বয়স হবে

ওদের। বাইরে থেকে দেখা না গেলেও বোঝা যায়, এরাও সশস্ত্র। ব্রিফকেসের দিকে চোখ রেখে হাতটা বাড়িয়ে দিল একজন। অপরজন অনুসরণ করার ইঙ্গিত দিয়ে লাল কার্পেট মোড়া সিঁড়ির দিকে এগোল।

ব্রিফকেস নিয়ে হলঘরের আরেক দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল লোকটা। দ্বিতীয় লোকটাকে অনুসরণ করে দোতলায়, সেখান থেকে তিনতলায় উঠে এল রানা। পথে কারও সাথে দেখা হলো না। মিশরীয় সিক্রেট সার্ভিসের অফিস নয়, এটা ওদের সেফ হাউস। বিশ্বস্ততার পরীক্ষায় শতকরা একশো ভাগ নম্বর পাওয়া শুধুমাত্র মিশরীয় সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্টরাই এর অস্তিত্ব সম্পর্কে ওয়াকিফ। সে-ই প্রথম একজন বিদেশী এজেন্ট, যাকে এখানে ঢুকতে দেয়া হলো।

একটা দরজার সামনে দাঁড়াল ওরা। নক করতে ভেতর থেকে সাড়া এল, 'কাম ইন।' দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল গাইড। পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল রানা। বাইরে থেকে বন্ধ করে দেয়া হলো দরজা।

ঠাণ্ডা লাগল, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরা। সামনে ছোট একটা ডেস্ক, সামনে পিছনে একটা করে চেয়ার। পিছনের চেয়ারে রাশভারি চেহারা নিয়ে বসে আছেন মিশরীয় সিক্রেট সার্ভিসের চীফ আলি কারাম। এক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি, যেন দেখতে চান এরপর কি করবে সে। সোজা এগিয়ে গিয়ে ডেস্কের সামনে দাঁড়াল ও, ডান হাতটা সটান বাড়িয়ে দিল হ্যান্ডশেকের জন্যে। 'মাসুদ রানা, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স।'

চেয়ার থেকে সামান্য একটু উঠে রানার হাতটা মস্ত থাবার মধ্যে নিয়ে মৃদু চাপ দিলেন ইন্টেলিজেন্স চীফ। 'লেফটেন্যান্ট জেনারেল আলি কারাম।' বাকিটা আর বলার প্রয়োজন বোধ করলেন না তিনি। 'বসো, রানা। পথ চিনতে কোন অসুবিধে হয়নি তো?'

বসল রানা। ছোট্ট করে জবাব দিল, 'না।'

'সিগারেট?' ডেস্ক থেকে তুলে ফিলটার-টিপ সিগারেটের একটা প্যাকেট রানার দিকে বাড়িয়ে দিলেন আলি কারাম।

মৃদু হেসে বলল রানা, 'ধন্যবাদ। আমি খাই না।'

একটা সুইচবোর্ডে অনেক রঙের বোতাম দেখা গেল, কালো একটা বোতামে আঙুল রেখে জিজ্ঞেস করলেন আলি কারাম, 'কফি?' রানা মাথা ঝাঁকাতে বোতামটা টিপে দিলেন তিনি। তারপর কাজের কথা শুরু করলেন।

ভূমিকা সারতেই পাঁচ মিনিট লেগে গেল। তারপর কফি এল। দরজা আবার বন্ধ হলে জানতে চাইল রানা, 'বুঝলাম, মোশে দায়ানের পরামর্শ এতদিনে মেনে নিয়ে আনবিক বোমা বানাতে শুরু করেছে ইসরায়েল। ইরাকের নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশন উড়িয়ে দিয়েছিল ওরা, আপনারাও কি সেই রকম কিছু করে ওদেরকে বাধা দিতে চাইছেন?'

'না,' বললেন আলি কারাম। 'সম্ভাবনাটা বিবেচনা করা হয়েছিল, কিন্তু সামরিক বিশেষজ্ঞরা সেটাকে সম্ভব নয় বলে বাতিল করে দিয়েছেন। তাছাড়া, মিশর এখুনি কাউকে আক্রমণ করতে নীতিগতভাবে রাজি নয়। তাই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, আমরাও ওই বোমা বানাব।'

'কিভাবে?'

রানার প্রশ্নটা ঠিক যেন বুঝতে পারলেন না আলি কারাম, কিন্তু ব্যাখ্যা না চেয়ে বললেন, 'কিছু প্র্যাকটিক্যাল অসুবিধে আছে। বোমা তৈরি করার কারিগরী জ্ঞান, সেটা আমাদের আছে। যে কনভেনশন্যাল বোমা বানাতে পারে সে নিউক্লিয়ার বোমাও বানাতে পারবে। এক্সপ্লোসিভ ম্যাটেরিয়াল প্লুটোনিয়াম যোগাড় করাটাই হলো সমস্যা। শুধু অ্যাটমিক রিয়্যাক্টর থেকেই প্লুটোনিয়াম পাওয়া যেতে পারে। ওটা একটা বাই-প্রোডাক্ট। পশ্চিম মরুর কাতারায় আমাদের একটা রিয়্যাক্টর আছে, তুমি জানো?'

'জানি।'

'ব্যাপারটা আমরা গোপন করে রাখতে পারিনি,' বললেন আলি কারাম। 'ওখানে আমাদের এমন ইকুইপমেন্ট নেই যা দিয়ে স্পেন্ট ফুয়েল থেকে প্লুটোনিয়াম বের করা সম্ভব। আমরা একটা রিপ্রোসেসিং প্ল্যান্ট তৈরি করতে পারি, করছিও, কিন্তু সমস্যা হলো, রিয়্যাক্টরে দেয়ার মত আমাদের কোন ইউরেনিয়াম নেই।'

'নেই মানে?' ভুরু একটু কুঁচকে উঠল রানার। 'ইউরেনিয়াম না থাকলে নরম্যাল ইউজের জন্যে আপনাদের রিয়্যাক্টর ফুয়েল পাচ্ছে কোত্থেকে?'

প্রশ্ন শুনে আলি কারাম বুঝলেন, সমস্যাটাকে হালকা চোখে না দেখে এর ভেতরে ঢুকতে চেষ্টা করছে রানা। মনে মনে খুশি এবং আশাবাদী হয়ে উঠলেন। বললেন, 'সেটা আমরা ফ্রান্সের কাছ থেকে পাই, একটা শর্তে—রিপ্রোসেসিঙের জন্যে স্পেন্ট ফুয়েল ওদেরকে ফিরিয়ে দিতে হবে, যাতে প্লুটোনিয়ামটুকু ওরা নিজেরা পেতে পারে।'

'ফ্রান্স ছাড়া আর কোন সাপ্লায়ার নেই?'

'তারাও এই একই শর্ত দেবে—এই শর্ত সমস্ত নিউক্লিয়ার নন-প্রলিফারেশন চুক্তির অংশ।'

এক সেকেন্ড চিন্তা করে জিজ্ঞেস করল রানা, 'কাতারার বিজ্ঞানীরা কাউকে না জানিয়ে স্পেন্ট ফুয়েল কিছু কিছু করে সরিয়ে ফেলতে পারে না?'

'না। কতটুকু ইউরেনিয়াম থেকে কি পরিমাণ প্লুটোনিয়াম বের হবে হিসেব করে তা বলে দেয়া যায়। ফেরত নেয়ার সময় স্পেন্ট ফুয়েল খুব সাবধানে মেপে নেয় ওরা—দামী জিনিস কিনা।'

'তারমানে কিছু ইউরেনিয়াম দরকার আপনাদের।'

'রাইট।'

'সমাধান?' জানতে চাইল রানা।

'সমাধান হলো, তুমি আমাদেরকে ওটা চুরি করে নিয়ে এসে দিচ্ছ।'

কি বলবে ভেবে পেল না রানা। কয়েক সেকেন্ড কেটে যাবার পর মৃদু কণ্ঠে বলল ও, 'চুরিই যখন করতে চাইছেন, এক কাজ করলেই তো পারেন—শর্ত যাই দিক, ইউরেনিয়াম কিনুন, তারপর রিপ্রোসেসিঙের জন্যে ফেরত দেবেন না বলে জানিয়ে দিন।'

'কিন্তু তাতে আমাদের উদ্দেশ্য জেনে ফেলবে সবাই।'

'না হয় জানলই।'

'রিপ্রোসেসিঙে সময় লাগে—মাসের পর মাস। এই সময়ের মধ্যে সম্ভাব্য দুটো জিনিস ঘটতে পারে—এক. ইসরায়েলীরা তাদের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্যে উঠেপড়ে লাগবে। দুই. যুক্তরাষ্ট্র আর রাশিয়া বোমা না বানাবার জন্যে চাপ দেবে আমাদের ওপর।'

'আপনারা চোর, এটা কাউকে জানতে দেয়া চলবে না?'

'শুধু তাই নয়,' গম্ভীর সুরে বললেন আলি কারাম। 'ওটা যে চুরি হয়েছে তাও গোপন রাখতে হবে। এমনভাবে সারতে হবে কাজ, দেখেশুনে যেন মনে হয়, জিনিসটা হারিয়ে গেছে। ইউরেনিয়ামের মালিক এবং ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সীগুলোকে এমন বেকায়দায় ফেলতে হবে, ওরা যেন নিজেরাই ব্যাপারটা চেপে যায়।'

'কিন্তু আমার মনে হয় শেষ পর্যন্ত ঘটনাটা ফাঁস হবেই।'

'আমরা বোমা হাতে পাবার আগে না হলেই হলো।' পাইপে টোবাকো ভরলেন আলি কারাম।

মাথা চুলকে জানতে চাইল রানা, 'কতটা ইউরেনিয়াম দরকার আপনাদের?'

'বারোটা বোমা চাই আমরা। ইয়েলোকেক-ফর্মে, এই ধরো, প্রায় একশো টন।'

'তারমানে পকেটে ভরে আনতে পারব না,' তিক্ত হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। তারপর জানতে চাইল, 'কিনতে গেলে কত দাম পড়বে?'

'তিন মিলিয়ন ইউ.এস. ডলারের কিছু বেশি।'

'অথচ আপনি ভাবছেন, যার যাবে সে একদম মুখ বুজে থাকবে?'

পাইপে আগুন ধরাতে গিয়েও ক্ষান্ত হলেন আলি কারাম, মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে জোর দিয়ে বললেন, 'কাজটা যদি ঠিক মত করা হয়।'

'কিভাবে?'

রানার দিকে ঝাড়া পাঁচ সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর লে. জেনারেল আলি কারাম বললেন, 'সেটা তোমার ওপর নির্ভর করে।'

'কাজটা সম্ভব বলে মনে হয় না,' মৃদু সুরে বলল রানা।

আরও কয়েক সেকেন্ড রানার দিকে নির্বিকার তাকিয়ে থেকে রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিলেন মিশরীয় সিক্রেট সার্ভিস চীফ। তারপর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ধীরেসুস্থে পাইপে আগুন ধরালেন। শান্ত ভঙ্গিতে বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম মেজর জেনারেল রাহাত খান তাঁর সেরা এজেন্টকে পাঠাবেন।'

উত্তরে কড়া একটা কিছু বলতে গিয়েও বলল না রানা। পরমুহূর্তে ইচ্ছে হলো, উঠে দাঁড়িয়ে সোজা বেরিয়ে যায় কামরা থেকে। কিন্তু অনুভব করল, এর মধ্যে একটা চ্যালেঞ্জ আছে। জীবনে অনেক কঠিন অ্যাসাইনমেন্ট পেয়েছে সে, কিন্তু সেগুলোর সাথে এটার যেন কোন মিলই নেই। এটার মধ্যে আশ্চর্য ধরনের নতুনত্ব আছে। উপলব্ধি করল, মিশরীয় চীফের সাথে ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ লেগে গেছে তার, যেটা সে ভাবতেও পারেনি। উনি বলছেন, যোগ্য লোকের পক্ষে কাজটা করা সম্ভব। সে অসম্ভব বলায় তাকে উনি অযোগ্য বলে রায় দিতে চাইছেন। সাধারণ কেউ এই রকম একটা খোঁচা দিলে সেটা গায়ে না মাখলেও চলত, কিন্তু ইনি মিশরীয় সিক্রেট সার্ভিসের চীফ! এই অপমানের সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তর হতে

পারে—কাজটাকে সম্ভব করে দেখানো।

না তাকিয়েও বুঝল রানা, আলি কারাম ওর দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করে আছেন। আরও কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করল ও, তারপর বলল, 'আপনার অফার করা সিগারেটটা এবার আমাকে দিতে পারেন, মিস্টার কারাম।'

ঝট্ করে চেয়ারের ওপর সিধে হয়ে বসলেন আলি কারাম। 'আমি কি ধরে নেব কাজটা তুমি করে দেবে?'

'না,' বলল রানা। লে. জেনারেল আলি কারামের হাত থেকে প্যাকেট নিয়ে একটা সিগারেট বের করল ও; ধরিয়েই কাশল খুক খুক করে, বেশ অনেকদিন অভ্যেস নেই। 'করে দেয়ার চেষ্টা করব!'

'কি বলেছি না বলেছি সে-সব তুমি মনে রেখো না, রানা!' আন্তরিক সুরে বললেন মিশরীয় ইন্টেলিজেন্স চীফ। 'তুমি যে চেষ্টার ত্রুটি করবে না, সে আমি ভালই জানি।' বন্ধ একটা ফাইলের গায়ে টোকা দিলেন তিনি। 'অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তোমার ডোশিয়ার যোগাড় করেছি আমি। বলছ, চেষ্টা করবে—তাতেই আমি খুশি। এই কথাটুকু আদায় করার জন্যেই খোঁচাটা দিতে হয়েছে আমাকে। খোঁচার জবাব কিভাবে তুমি দিয়ে থাকো, সেটা এই ডোশিয়ার থেকে জেনেছি আমি। যাক, এখন আমি নিশ্চিত হলাম···ভাল কথা, কাদের নিয়ে দল তৈরি করবে ভেবেছ কিছু?'

'দল?' ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। এদিক ওদিক মাথা নাড়ল ও। 'হয় কাজটা আমি একা করব, নাহয় করব না।'

'একা?'

'হ্যাঁ।'

আলি কারাম জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন, পারবে? কিন্তু দ্বিতীয়বার খোঁচা দেয়া হয়ে যাবে মনে করে বিরত থাকলেন তিনি। মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'বেশ, তুমি যা ভাল মনে করো।'

জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইন্টারন্যাশনাল দু'ভাগ হয়ে কাজ করছে। মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স আর জেনারেল ইনভেস্টিগেশন। দুই ডিরেক্টরেটের শীর্ষে একজনই রয়েছে, তাকে বলা হয় ডিরেক্টর অভ জেনারেল ইন্টেলিজেন্স। নিয়ম হলো, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট করবে সে, কিন্তু বেশির ভাগ সময় দেখা যায়, খোদ প্রধানমন্ত্রী নাক গলাচ্ছেন। সাধারণত দুটো কারণে এই রকমটি ঘটে থাকে। এক, হত্যাকাণ্ড, ব্ল্যাকমেইল আর অনুপ্রবেশের উদ্ভট উন্মাদ সব প্ল্যান একের পর এক তৈরি করে চলেছে জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের লোকেরা, সবগুলো যদি সত্যি কাজে রূপ দেয়া হয়, সরকারকে বিপজ্জনক অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়তে হতে পারে, সেজন্যেই এই সব ডিপার্টমেন্টের ওপর প্রধানমন্ত্রী নিজের একটা চোখ রাখতে চান। দুই, ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস হলো ক্ষমতার একটা উৎস, বিশেষ করে অস্থির একটা দেশে, তাই দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাবান ভদ্রলোক এই ক্ষমতা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে চান না। আর তাই জেনারেল ইন্টেলিজেন্সের ডিরেক্টর তাঁর রিপোর্ট দাখিল করেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে।

ডাবল এজেন্ট অ্যাভরাম অ্যামবুসি কাজ করে জেনারেল ইনভেস্টিগেশনে। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এই বিপজ্জনক কাজ করার পিছনে একটা কারণ আছে তার। যোলো বছর আগে জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের একদল খুনেকে কায়রোয় পাঠানো হয় সামী ওয়ালিদকে হত্যা করার জন্যে। সামী ওয়ালিদ তখন মিশরীয় সিক্রেট সার্ভিসের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তার বুদ্ধি, মেধা আর কর্মতৎপরতার কাছে মার খেয়ে নাস্তানাবুদ হচ্ছে জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স। এই লোক যে একদিন মিশরীয় সিক্রেট সার্ভিসের মাথা হয়ে বসবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তখন ইসরায়েলের জন্যে আরও বড় হুমকি হয়ে দেখা দেবে সে। তাই জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স সিদ্ধান্ত নেয়, এই লোককে সময় থাকতে সরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু ইসরায়েলী এজেন্টরা কায়রোয় পৌঁছে দেখল, সামী ওয়ালিদ দেশে নেই, কাজ নিয়ে বাইরে গেছে। অপারেশন ব্যর্থ হতে যাচ্ছে দেখে তারা এক নিষ্ঠুর প্ল্যান করল। গভীর রাতে সামী ওয়ালিদের বাড়িতে ঢুকল তারা। সামী ওয়ালিদের পরমাসুন্দরী স্ত্রী আর দুই যুবক ভাই ছিল বাড়িতে। দুই ভাইকে প্রথমেই ছুরি মারল, তারপর একের পর এক ছয়জন রেপ করে খুন করল মিসেস ওয়ালিদকে। ভদ্রমহিলা তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিল।

কাজ সেরে দেশে ফিরল সামী ওয়ালিদ। খবরটা শোনার পর উন্মাদের মত হয়ে গেল সে। কিন্তু মাস দুয়েকের মধ্যে সবাইকে আশ্চর্য করে দিয়ে আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠল সে। আবার মন দিল কাজে, কিন্তু সেইসাথে সুযোগের সন্ধানে থাকল। খুঁজতে খুঁজতে একসময় সত্যিই পেয়ে গেল সে মোক্ষম সুযোগ।

আত্মীয়-পরিজন নেই এই রকম একজন জার্মান ইহুদীর কথা জানা ছিল মিশরীয় ইন্টেলিজেন্সের, নাম ছিল অ্যাভরাম অ্যামবুসি। লোকটা ব্রিটেনে বসবাস করছিল। তার চেহারার সাথে বেশ কিছু মিল ছিল সামী ওয়ালিদের। প্রথমে নিজের আত্মহত্যার মিথ্যে খবর ছড়াবার ব্যবস্থা করল সামী ওয়ালিদ, তারপর অ্যাভরাম অ্যামবুসিকে খুন করে এবং খুনটা চাপা দিয়ে নিজেই অ্যাভরাম অ্যামবুসি সেজে বসল। এরপর ইসরায়েলে গিয়ে নাগরিকত্ব নেয়া, একটা ইসরায়েলী মেয়েকে বিয়ে করা, স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনদের চেষ্টায় জেনারেল ইনভেস্টিগেশনে চাকরি পাওয়া—কোন ব্যাপারেই কোন অসুবিধে হয়নি। চাকরিতে উন্নতি করে এতদূর আসার পিছনে তার মেধা আর যোগ্যতা তাকে সাহায্য করেছে।

সৈনিকদের মত ছোট করে ছাঁটা চুল, না থাকার মত জুলফি। ভুরুতে রোম খুব কম। নাকটা ছোট আর চ্যাপ্টা। সাধারণত চশমা ব্যবহার করে না। চেহারায় সব সময় একটা হাসি হাসি ভাব লেগে আছে, যেন তার চেয়ে সুখী মানুষ গোটা ইসরায়েলে আর দ্বিতীয়টি নেই। সে যে ডাবল এজেন্ট এটা আজও ধরা না পড়ার কারণ সম্ভবত এই, যে শ্বশুরকুলের আত্মীয়-স্বজন ছাড়া বিশেষ কারও সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে না সে।

প্রফেসর জর্জ ওয়ালের ব্যাপারটা নিয়ে বেশ একটু চিন্তাতেই আছে অ্যামবুসি। মুশকিল হলো, নেগেভ মরুভূমির ডায়মোনায় কি হচ্ছে না হচ্ছে তার কিছুই জেনারেল ইনভেস্টিগেশন জানে না, ওটার ব্যাপারে খবরদারী করছে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স। মনে মনে একটা পরিকল্পনা এঁটেছে সে, সেটা সফল হলে ডায়মোনা প্রজেক্টের সব খবরই তার হাতে আসবে। পরিকল্পনা সফল হবে কিনা তাই নিয়েই

এখন দুশ্চিন্তা।

ডিরেক্টরেট অভ জেনারেল ইন্টেলিজেন্সে চাকরি করে অ্যামবুসির ভায়রা, নাম অ্যাজাসি। ওদের বিভাগটি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স আর জেনারেলের ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করছে। অ্যাজাসি অ্যামবুসির চেয়ে সিনিয়র, কিন্তু অ্যামবুসি চালু বেশি।

একদিন অফিস ছুটির পর ভায়রাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে একটা রেস্তোরাঁয় এসে বসল অ্যামবুসি। কেক আর কোকের অর্ডার দিয়ে প্রসঙ্গটা সরাসরি পাড়ল সে। 'আচ্ছা, নেগেভের ডায়মোনায় কি ঘটছে, জানো কিছু?'

ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর অ্যাজাসি বলল, 'তুমি যদি না জানো, আমার মুখ খোলা উচিত হবে না।'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল অ্যামবুসি, যেন অ্যাজাসি তাকে ভুল বুঝেছে। 'ধ্যেৎ! তোমাকে আমি গোপন তথ্য ফাঁস করতে বলছি না। তাছাড়া, প্রজেক্টটা কি নিয়ে তা আমি আন্দাজ করতে পারি।' কথাটা আসলে মিথ্যে। 'আমার খারাপ লাগছে যেটা, ওখানে যারা কাজ করছে তাদের একটা গ্রুপকে কন্ট্রোল করছে বুরাম।'

'কেন?'

'আমি তোমার ক্যারিয়ারের কথা ভাবছি, অ্যাজাসি। বুরাম তোমাকে পছন্দ করে না।'

'সেজন্যে আমি ঘাবড়াই না...'

'কিন্তু উচিত। বুরাম তোমার পদটা চায়, এটা মানো তো?'

কেবিনে ঢুকল বেয়ারা। সে আবার বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত চুপ করে থাকল ওরা। যা আশা করেছিল অ্যামবুসি, বিষণ্ণ আর মনমরা হয়ে উঠেছে অ্যাজাসি। তাকে আরেকটু কাহিল করার জন্যে আবার বলল সে, 'শুনলাম, বুরাম নাকি সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট করছে।'

'তবে সমস্ত ডকুমেন্ট আমার টেবিলেও আসে।'

'কিন্তু আড়ালে সে তোমার নামে প্রধানমন্ত্রীর কাছে কি বলছে না বলছে তার কিছুই তুমি জানতে পারছ না। আমার ধারণা, তার পজিশন এখন তোমার চেয়ে ভাল।'

ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল অ্যাজাসি, 'ডায়মোনা প্রজেক্টের কথা তুমি জানলে কোত্থেকে বলো তো?'

কংক্রিটের ঠাণ্ডা দেয়ালে হেলান দিয়ে গড়গড় করে বলে গেল অ্যামবুসি, 'বুরামের এক লোক একজন বিদেশী মেহমানের দেহরক্ষী হিসেবে কাজ করছিল শহরে। দেহরক্ষী বুঝতে পারে, তাকে একজন অনুসরণ করছে। যে অনুসরণ করছিল সে মিশরের একজন স্পাই, নাম এরহাম মোয়াকিম। শহরে বুরামের ফিল্ড ম্যান নেই। তাই মোয়াকিমকে অ্যারেস্ট করার অনুরোধ জানানো হয় আমাকে।'

আঁতকে উঠল অ্যাজাসি। 'বলো কি! অন্য ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে এভাবে সাহায্য চাওয়া, এ তো সাংঘাতিক অন্যায়!'

'তুমি যদি চাও, এই সুযোগে বুরামের ওপর একহাত নেয়া যায়।'

'কি রকম?'

'ডিরেক্টরকে মোয়াকিমের ব্যাপারটা বলো। বলো, বুরাম আসলে অযোগ্য, যে-কোন কাজ লেজে-গোবরে করাই তার স্বভাব। টপ-সিকিউরিটি ব্যাপারে ওর ঢিলেমি দেখাতে পারলে ডিরেক্টর তোমার ওপর খুশি হবে। তুমি তাকে বলবে, এ-ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বুরামের ওপর একা দায়িত্ব দেয়া ঠিক হচ্ছে না। তাতেই কাজ হবে বলে মনে হয়—হয় এই দায়িত্ব থেকে বুরামকে সরিয়ে তোমাকে ভার নিতে বলা হবে, নয়তো তোমার নির্বাচিত একজন লোক চাওয়া হবে। দুটোই আমাদের জন্যে ভাল—লোক চাওয়া হলে, আমাদের ছোট শ্যালক তো রয়েছেই।'

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ রইল অ্যাজাসি। বুঝে দেখছে ব্যাপারটা।

'শালাকে তাহলে দিই এক ঠেলা, কি বলো?' ষড়যন্ত্রের হাসি দেখা গেল অ্যাজাসির মুখে।

প্রথমটায় বুঝতে পারল না অ্যামবুসি, তারপর ধরতে পারল শালা বলতে বুরামকে বোঝাচ্ছে অ্যাজাসি।

•

দুটো দিন সেফ হাউসেই কাটাতে হলো রানাকে। মিশরীয় ইন্টেলিজেন্সের এজেন্টরা নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে রাত-দিন চব্বিশ ঘণ্টা হোলস্টারে রিভলভার আর ট্রেনিং পাওয়া কুকুর নিয়ে টহল দিল সারা বাড়ি। কায়রো ইউনিভার্সিটির একজন পদার্থ বিজ্ঞানী দেখা করল রানার সাথে। মেয়েদের মত লম্বা চুল তার, টাইয়ে বসরাই গোলাপ ফুটে আছে। সে রানাকে ইউরেনিয়ামের কেমিস্ট্রি আর রেডিয়ো অ্যাকটিভিটির প্রকৃতি বোঝাতে শুরু করল। অসাধারণ ধৈর্য লোকটার, অন্য কেউ হলে রানার হাজার হাজার প্রশ্নের মুখে পাগল হয়ে যেত। লাঞ্চের পর কাতারা থেকে আসা একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের সাথে কথা বলল রানা। ইউরেনিয়াম মাইন, এনরিচমেন্ট প্ল্যান্ট, ফুয়েল ফ্যাব্রিকেশন ওয়র্ক, স্টোরেজ অ্যান্ড ট্র্যান্সপোর্ট, সেফটি রুলস অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল রেগুলেশনস, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এজেন্সী, মার্কিন অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন, ইউনাইটেড কিংডম অ্যাটমিক এনার্জি অথরিটি, ইউরাটম ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক সমস্ত ব্যাপারে আলোচনা হলো।

সন্ধেবেলা মিশরীয় ইন্টেলিজেন্স চীফের সাথে ডিনারে বসল রানা। ডিনারের পর রানাকে তিনটে চাবি দিলেন তিনি। বললেন, 'লন্ডন, ব্রাসেলস আর জুরিখের সেফটি ডিপোজিট বক্সে তোমার জন্যে কাগজপত্র আছে। প্রতিটি বাক্সে পাবে নতুন পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, নগদ টাকা আর একটা করে অস্ত্র। তোমার যদি পরিচয় বদলাতে হয়, বাতিল ডকুমেন্টগুলো বাক্সে ফেলে দিয়ো।'

'কোথায় রিপোর্ট করব আমি?'

কাজ শেষ না করে রিপোর্ট করার অভ্যেস নেই তোমার, মনে মনে বললেন মিশরীয় ইন্টেলিজেন্স চীফ। মুখে বললেন, 'কায়রোয়, আমার কাছে, প্লীজ। কোড সিগন্যাল তো বলাই হয়েছে তোমাকে। যখনি সম্ভব হবে সরাসরি আমাকে চাইবে। যদি আমার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব না হয়, যে কোন দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করে কোড সিগন্যাল ব্যবহার কোরো, তোমার সাথে যোগাযোগ

করবার চেষ্টা করব আমি, যেখানেই তুমি থাকো না কেন। শেষ উপায় হিসেবে—ভায়া ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ, কোডেড চিঠি পাঠিয়ো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল রানা, এসবই রুটিন মাত্র। মিশরীয় ইন্টেলিজেন্স চীফ ওর দিকে তাকিয়ে ওর মনের কথা পড়ার চেষ্টা করছেন। কি রকম বোধ করছে ও? নিজের ওপর কতটুকু বিশ্বাস ওর, কাজটা পারবে বলে মনে করছে তো? কিভাবে কি করবে, কোন ধারণা করতে পেরেছে? নাকি বুদ্ধি এঁটেছে, চেষ্টা করার ভাব দেখিয়ে তারপর এক সময় ফিরে এসে বলবে, না, এ কাজ সম্ভব নয়? নিউক্লিয়ার বোমা মিশরের একান্ত দরকার, এই বন্ধুরাষ্ট্রের ছেলেটা কি তা বিশ্বাস করে?

'সময়ের একটা সীমা আছে, সম্ভবত?' জানতে চাইল রানা।

'আছে, কিন্তু সেটা কতটুকু জানা নেই আমাদের। ইসরায়েলীরা ওদেরকে তৈরি করে ফেলার আগেই বোমা পেতে হবে আমাদের। এর মানে হলো, ইসরায়েলীদের রিয়্যাক্টর কাজ শুরু করে দেয়ার আগেই তোমার ইউরেনিয়াম আমাদের রিয়্যাক্টরে পৌঁছতে হবে। এই পর্যায়ের পর থেকে গোটা ব্যাপারটা কেমিস্ট্রি—তাড়াহুড়ো করে কোন পক্ষই কিছু লাভ করতে পারবে না। আগে যারা শুরু করবে তারাই শেষ করবে আগে।'

'নেগেভের ডায়মোনায় নিজেদের একজন এজেন্ট দরকার হবে আমাদের,' বলল রানা।

'সে-চেষ্টা আমি করছি।'

সন্তুষ্ট দেখাল রানাকে। 'তেল আবিবেও খুব ভাল একজন লোক আমাদের না থাকলেই নয়।'

এই একটি বিষয়ে মুখ খুলতে রাজি নন আলি কারাম। রসিকতার ছলে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেলেন তিনি। একগাল হেসে জানতে চাইলেন, 'ব্যাপার কি, রানা? তুমি কি ইনফরমেশনের জন্যে পাম্প করছ আমাকে?'

'থিঙ্কিং অ্যালাউড।'

কয়েক মুহূর্ত আর কোন কথা হলো না। তারপর আলি কারামই নিস্তব্ধতা ভাঙলেন: 'আমি কি চাই তা তোমাকে জানিয়েছি, জিনিসটা যোগাড় করার দায়িত্ব তোমার—সেই সাথে সব রকম স্বাধীনতাও তোমার থাকল।'

'হ্যাঁ, এর আগেও কথাটা বলেছেন আপনি।' উঠে দাঁড়াল রানা। 'আপনি বললে এবার আমি ঘুমাতে যেতে পারি।'

'কোত্থেকে শুরু করবে, কিছু ভেবেছ?'

রানা বলল, 'হ্যাঁ, ভেবে রেখেছি। গুডনাইট।'

চার

লুক্সেমবার্গ।

পাহাড়ের মাথার ওপর জেঁকে বসা শহর থেকে নেমে এসেছে নদীটা, পাশেই

সরু একটা উপত্যকা, তার ওপর আড়াআড়ি উঁচু হয়ে আছে কির্চবার্গ মালভূমি। জাঁ-মোনেট বিল্ডিংটা এখানেই। ইউরাটম সেফগার্ডস ডিরেক্টরেটের রিসেপশনে বসে আছে রানা। ঠিক কি জানতে এসেছে নিজেও জানে না ভালমত। কর্মচারীরা কাজে আসছে, তাদের চেহারাগুলো মনের পর্দায় এঁকে নিচ্ছে ও। রেফার নামে একজন প্রেস অফিসারের সাথে দেখা করতে চায়, কিন্তু ইচ্ছে করেই খানিক আগে এসে পৌঁচেছে। দুর্বলতার সন্ধানে আছে ও। এর একটা অসুবিধে হলো, কর্মচারীরাও ওর চেহারা দেখার সুযোগ পাচ্ছে। কি আর করা।

চেহারা দেখে মনে হলো রেফার অস্থিরমতি, সাজ-পোশাকেও পরিপাটি নয়। কিছুই তার মনঃপূত হচ্ছে না, চেহারায় এই রকম ভাব। হাতের ব্রিফকেসটা তোবড়ানো, রঙচটা। তার পিছু পিছু অগোছাল একটা অফিস কামরায় ঢুকল রানা, অনুরোধ করায় কফি খেতে রাজি হলো। ফ্রেঞ্চ ভাষায় আলাপ শুরু করল ওরা। প্যারিসের সায়েন্স ইন্টারন্যাশনাল পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার সে। কথার পিঠে কথা তুলে রেফারকে জানাল, সায়েন্টিফিক আমেরিকানে কাজ পাওয়া ওর অ্যামবিশন।

রেফার জানতে চাইল, 'এই মুহূর্তে ঠিক কোন্ সাবজেক্টের ওপর লিখছেন আপনি?'

'আর্টিকেলের নাম এম.ইউ.এফ। ইংরেজীতে বলে মেটিরিয়াল আন অ্যাকাউন্টেড ফর। যুক্তরাষ্ট্রে তো রেডিও অ্যাকটিভ ফুয়েল একনাগাড়ে হারিয়ে যাচ্ছে। এখানে, ইউরোপে, ওই ধরনের সমস্ত মেটিরিয়ালের খোঁজ-খবর রাখার একটা ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম আছে বলে শুনেছি।'

'কারেক্ট,' বলল রেফার। 'সদস্য রাষ্ট্রগুলো তাদের ফিসাইল পদার্থের নিয়ন্ত্রণ ভার ইউরাটমের ওপর ছেড়ে দেয়। যে-সব সিভিলিয়ান এসট্যাবলিশমেন্টে এই জিনিস মজুদ থাকে, তার কমপ্লিট একটা তালিকা আছে আমাদের কাছে—খনি থেকে শুরু করে প্রিপারেশন অ্যান্ড ফ্যাব্রিকেশন প্ল্যান্টস, স্টোরস, রিয়্যাক্টর কাভার করে রিপ্রোসেসিং প্ল্যান্ট পর্যন্ত।'

'আপনি বললেন, সিভিলিয়ান এসট্যাবলিশমেন্ট।'

'হ্যাঁ, মিলিটারি আমাদের নাগালের বাইরে।'

'বলে যান।' এইসব বিষয়ের ওপর ওর জ্ঞান কত যে কম তা বুঝতে পারার আগেই রেফার গড় গড় করে সব বলতে শুরু করায় স্বস্তি বোধ করল রানা।

'একটা উদারণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে,' রানার কাছ থেকে সিগ্যারেট আর লাইটারের আগুন নিল রেফার। 'সাধারণ ইয়েলোকেক থেকে ফুয়েল এলিমেন্ট তৈরি করছে এমন একটা ফ্যাক্টরীর কথা ধরুন। ফ্যাক্টরীতে যে র' মেটিরিয়াল আসছে, সেটার মাপ নেয় আর অ্যানালাইজ করে ইউরাটম ইন্সপেক্টর। তাদের পাওয়া তথ্যগুলো ইউরাটমের কম্পিউটরে ভরে দেয়া হয়, এবং ডিসপ্যাচিং ইন্স্টলেশন থেকে ইন্সপেক্টরদের যোগান দেয়া তথ্যের সাথে মিলিয়ে দেখা হয়—এক্ষেত্রে, ডিসপ্যাচিং ইন্স্টলেশন বলতে একটা ইউরেনিয়াম খনিকে ধরে নিন। ডিসপ্যাচিং ইন্স্টলেশন থেকে যতটুকু বেরল আর ফ্যাক্টরীতে যতটুকু পৌঁছল তার মধ্যে যদি কোন রকম হেরফের থাকে, কম্পিউটার সেটা বলে দেবে। জিনিসটা যখন ফ্যাক্টরী থেকে বেরোয়, তখনও এই রকম নজর রাখা হয়—গুণগত

মান এবং মাপ ঠিক আছে কিনা দেখার জন্যে। চেকিং-রিচেকিঙের পর যে-সব তথ্য পাওয়া গেল সেগুলো মেলানো হবে ফুয়েল ব্যবহারের জায়গায় ডিউটিরত ইন্সপেক্টরদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের সাথে—ধরুন, সেটা হবে একটা নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশন। আরেকটা কথা, ফ্যাক্টরীতে যেটুকু নষ্ট হয় তারও মাপ নেয়ার এবং অ্যানালাইজ করার নিয়ম আছে। ইন্সপেকশন আর ডাবল-চেকিঙের এই সিস্টেম রেডিওঅ্যাকটিভ আবর্জনার শেষ গন্তব্যের পর্যায় পর্যন্ত চালু থাকে। সবশেষে, বছরে অন্তত দু'বার ফ্যাক্টরীতে স্টকের হিসেব নেয়া হয়।'

'আচ্ছা!' ভাব দেখাল মুগ্ধ হয়েছে, কিন্তু মনে মনে সাংঘাতিক নিরাশ হলো রানা। সন্দেহ নেই, সিস্টেমটা সম্পর্কে বাড়িয়ে বলছে রেফার, কিন্তু যতটুকু বলছে তার অর্ধেক চেকিংও যদি করা হয়, ওদের কম্পিউটরকে ফাঁকি দিয়ে কিভাবেই বা একজনের পক্ষে একশো টন ইয়েলোকেক গায়েব করে দেয়া সম্ভব? রেফারের কাছ থেকে আরও কথা আদায়ের জন্যে বলল ও, 'তাহলে, যে কোন সময় চাওয়া হলে, ইউরোপের কোথায় কতটুকু ইউরেনিয়াম আছে তার নিখুঁত হিসেব বলে দিতে পারবে আপনাদের কম্পিউটর?'

'শুধু সদস্য রাষ্ট্রগুলোর বেলায়—ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস এবং লুক্সেমবার্গ। আর, শুধু ইউরেনিয়ামই নয়, সমস্ত রেডিও অ্যাকটিভ মেটিরিয়াল।'

'পরিবহনের ব্যাপারটা কি রকম?'

'ওই সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে আগে থাকতে আমাদের অনুমতি নিতে হবে।'

নোট বই বন্ধ করল রানা। 'অত্যন্ত চমৎকার সিস্টেম। কিন্তু সেটা কি রকম কাজ করছে তা দেখার উপায় কি? ধরুন, আমি যদি দেখতে চাই?'

'এ-ব্যাপারে আপনাকে আমরা সাহায্য করতে পারব না। কোন ইনস্টলেশন ভিজিট করতে হলে অনুমতির জন্যে সদস্য রাষ্ট্রের অ্যাটমিক এনার্জি অথরিটির সাথে যোগাযোগ করতে হবে আপনার। কোন কোন দেশে গাইডেড ট্যুরের ব্যবস্থা আছে।'

'ফোন নাম্বারের একটা তালিকা দিতে পারেন?'

'অবশ্যই।' চেয়ার ছেড়ে একটা ফাইলিং কেবিনেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রেফার।

একটা সমস্যার সমাধান পেয়ে গেছে রানা, কিন্তু সেই সাথে নতুন আরেকটা সমস্যার মুখোমুখি পড়তে হলো ওকে। ও জানতে চেয়েছিল, রেডিও অ্যাকটিভ মেটিরিয়াল কোথায় কতটুকু আছে। উত্তর রয়েছে ইউরাটম কম্পিউটরে। কিন্তু কম্পিউটরের আওতার মধ্যে যত ইউরেনিয়াম রয়েছে সেগুলোর ওপর এমন কড়া নজর রাখা হয়েছে যে ধরা না পড়ে চুরি করা অসম্ভব। রেফারের পিঠের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হাসি পেল ওর। ওর মনের কথা যদি টের পেত লোকটা!

সাইক্লোস্টাইল করা একটা লিফলেট দিল রেফার। ভাঁজ করে সেটা পকেটে ভরল রানা। চেয়ার ছেড়ে বলল, 'ধন্যবাদ।'

'কোথায় উঠেছেন আপনি?'

'আলফায়, রেলওয়ে স্টেশনের উল্টোদিকে।'

সাথে সাথে দরজা পর্যন্ত এল রেফার। 'এনজয় লুক্সেমবার্গ।'

'সাধ্যমত চেষ্টা করব,' বলল রানা, তারপর হ্যান্ডশেক করে বিদায় নিল।

ইংরেজী ছাড়া অন্যান্য বিদেশী ভাষা শিখতে গিয়ে একটা কৌশল রপ্ত করেছিল রানা, অনেক কাল পর আজ সেটা আবার কাজে লেগে গেল। অচেনা অক্ষর চেনার কৌশল হলো, সবগুলোকে একসাথে মনে গেঁথে নিতে চাওয়াটা ভুল, একটাকে বেছে নিতে হয়, বাকি সবগুলোর কথা একদম ভুলে গিয়ে শুধু সেটাকে মনে রাখার চেষ্টা করতে হয়। ইউরাটম কর্মচারীদের মুখ চেনার ব্যাপারে সেই পুরানো কৌশলটা কাজে লাগাল ও।

পিঠে শেষ বিকেলের রোদ নিয়ে কংক্রিটের একটা বেঞ্চের ওপর বসে আছে ও, মাথার ওপর গাছের ডালপালা। ওর সামনে, রাস্তার ওপারেই জাঁ-মোনেট। ইউরাটম কর্মচারীরা কাজ সেরে বাড়ি ফিরছে। এদের সবার ওপর সমান আগ্রহ নেই ওর। সেক্রেটারি, মেসেঞ্জার, কফি মেকার—এরা ওর কোন কাজেই আসবে না। সিনিয়র অ্যাডমিনিস্ট্রেটরও বাদ। এই দুই দলের মাঝখানে যারা রয়েছে তাদেরকে দরকার ওর—কম্পিউটর প্রোগ্রামার, অফিস ম্যানেজার, ছোটখাট ডিপার্টমেন্টের হেড, পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট চীফ। এদের কারও কারও নামকরণও করল ও। ব্যক্তির বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা চোখে পড়ার মত ত্রুটি অনুসারে নামগুলো রাখল, পরে যাতে চিনতে সুবিধে হয়। অবলা, বগা, হিটলার, চীনা, দেড় ব্যাটারি, বোয়াল, মহারাজা, এই রকম আরও অনেক। বিশ বাইশ বছরের একটা মেয়েকে দেখে আগেই মাথা ঘুরে গিয়েছিল ওর, প্রথমবার ইউরাটমে গিয়েই মেয়েটার পরিচয় জানতে পেরেছিল। উঁচু পদের একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের স্ত্রী। মেয়ে তো নয়, পরী। একে দিয়ে কাজ বাগাবার কোন ইচ্ছেই জাগেনি মনে, তবু কয়েকটা ব্যাপার লক্ষ্য না করেও পারেনি। স্বামীটির বয়স হবে পঞ্চাশ, কিন্তু দেখে মনে হয় ষাট, এই রকম একটা সুন্দরী মেয়ের সাথে একেবারেই বেমানান। আজ বিকেলে স্বামীর সাথে আবার ওকে দেখতে পেয়ে, অনেকটা শখ করেই ওরও একটা নাম রেখে দিল—পদ্মিনী।

বয়স কম হলে কি হবে, এই বয়সে যা চেহারা হওয়া দরকার তার ঠিক আড়াই গুণ মোটা হয়ে গেছে অবলা। বেঢপ একটা বেলুন বললেই হয়, অথচ কাপড়-চোপড় আর মেকআপে সাংঘাতিক উগ্র। তাকে অনুসরণ করে কার পার্ক পর্যন্ত এল রানা। সাদা একটা ফিয়াট ফাইভ হানড্রেডে অনেক কষ্টে ঢুকল অবলা জীব। ভাড়া করা রেনোয়া চড়ে তার পিছু নিল রানা।

পন্ট-অ্যাডোলফ পেরিয়ে এসে দক্ষিণ-পুবে পনেরো কিলোমিটার এগোল অবলা। গাড়ি চালায় খুব আস্তে-ধীরে। মনডর্ফ-লেসবেইন্স নামে একটা অঞ্চলে এসে থামল ফিয়াট। কাঁকর বিছানো উঠান পেরিয়ে একতলা একটা বাড়ির তালা খুলে ভেতরে ঢুকল অবলা। এই অঞ্চলে ট্যুরিস্টদের আনাগোনা আছে, কাজেই কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে বাড়িটার সামনে দিয়ে বার কয়েক যাওয়া-আসা করায় কেউ সন্দেহ করল না। একবার জানালা পথে দেখল, অথর্ব এক বুড়িকে খাওয়াতে বসেছে অবলা। মাঝরাতের আরও কিছু পর পর্যন্ত বেবি ফিয়াটকে বাড়ির সামনে

দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। এরপর আর ওখানে সময় নষ্ট করল না সে।

নির্বাচনে ভুল হয়ে গেছে ওর। বুড়ি মায়ের সাথে বাস করছে অবলা। ধনীও নয় গরীবও নয়। বাড়িটা সম্ভবত মায়েরই। আর যাই হোক, অপরাধের সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই। রানার যদি রুচির কোন বালাই না থাকত, প্রেমের অভিনয় করে মেয়েটার দ্বারা স্বার্থ উদ্ধার হয়তো তেমন কোন সমস্যাই হত না। আর কোন উপায়ে অবলার কাছে ঘেঁষা সম্ভব নয়।

আরও তিনটি দিন নিষ্ফল গেল। হিটলার, বোয়াল আর মহারাজা, এদের কোন দুর্বলতা পাওয়া গেল না। কিন্তু সবদিক থেকে আদর্শ মনে হলো বগাকে।

লোকটা যে শুধু পাটখড়ির মত রোগা তাই নয়, তার গলাটা ঠিক বগের মতই সরু আর লম্বা। অফিস ছুটির পর বাড়ি না ফিরে শহরের প্রায় শেষ মাথায় পৌঁছে একটা নাইট ক্লাবে ঢুকল সে। এলাকাটার তেমন সুনাম নেই। কারণ, হোমোসেক্সুয়ালদের কয়েকটা ক্লাব রয়েছে এদিকে। নাইট ক্লাবে ঢুকে একটা কেবিন রিজার্ভ করল বগা। খোলা জায়গায় একটা টেবিল দখল করে বসল রানা, যাতে বগার কেবিনের ওপর নজর রাখা যায়। বগা অর্ডার দিল না, অথচ ওয়েটার শ্যাম্পেনের বোতল আর দুটো গ্লাস দিয়ে এল টেবিলে। তারমানে, কারও জন্যে অপেক্ষা করছে বগা। রোজ যদি নাও হয়, প্রায়ই এখানে আসে সে।

দু'ঘণ্টা পেরিয়ে গেল কারও আসার নাম নেই। বিরক্তি বোধ করল রানা, কিন্তু সেই সাথে জেদও চাপল। এর শেষ না দেখে ছাড়বে না ও। বগার সামনে শ্যাম্পেনের বোতল আর গ্লাস যেমন দিয়ে গেছে ওয়েটার তেমনি আছে, ছোঁয়ওনি সে। শুধু একের পর এক সিগারেট টেনে চলেছে।

ঠাণ্ডা কিছু নেই, কাজেই বাধ্য হয়ে শ্যাম্পেনের অর্ডার দিতে হলো রানাকে। আরও দু'ঘণ্টা পর সবুরের মেওয়া ফলল। প্রথমে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো ওর। যখন বুঝল, না, মেয়েটা আর কেউ নয়, সত্যিই পদ্মিনী, তখন সেই প্রচলিত আপ্ত-বাক্যটা আওড়াল মনে মনে—এই দুনিয়ায় আশ্চর্য বলে কিছু নেই।

ইতোমধ্যে স্টেজে দল বদল হয়েছে। একটা লোক গিটার বাজাচ্ছিল, তার জায়গায় এল একটা মেয়ে আর একটা ছেলে, নেচে-কুঁদে অশ্লীল জার্মান লোকগীতি গাইতে শুরু করল তারা। রস আহরণে খুব একটা সুবিধে করতে পারল না রানা, কিন্তু আর সব খদ্দেররা গান শুনে এমন হাসিই হাসল যে বাকি থাকল শুধু মূর্ছা যেতে। এরপর শুরু হলো নাচ। নাচের নামে এমনই বিচ্ছিরি ব্যাপার চলল, এর কথা রানা মনে রাখতেও রাজি নয়।

পদ্মিনী কেবিনে ঢোকার পর থেকে সেই যে তার কানের কাছে ঠোঁট নিয়ে গিয়ে ফিসফিস শুরু করেছে বগা, মাথা তোলার আর নামটি নেই। চেয়ার ছেড়ে সোজা তাদের কেবিনে গিয়ে ঢুকল রানা। বলল, 'হ্যালো, সেদিন তোমাকেই না আমি ইউরাটম অফিসে দেখলাম?'

বগা যেন আগুনের ছ্যাঁকা খেয়ে লাফিয়ে উঠল। 'কে?' রানা পরিচিত কেউ নয় দেখে খানিকটা যেন ধাতস্থ হলো সে। 'কই কি জানি…'

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে পদ্মিনী, যেন চোখেও দেখে না, কানেও শোনে না।

হাসিমুখে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল রানা। 'ক্লড রেলিক,' রেফারকে এই নামটাই বলেছিল ও। 'আমি একজন সাংবাদিক।'

'হাউ ডু ইউ ডু,' বিড়বিড় করে উঠল বগা। বেচারার অন্তরাত্মা পর্যন্ত কেঁপে গেছে, কিন্তু নিজের নাম প্রকাশ না করার উপস্থিত বুদ্ধিটুকু হারায়নি। হাউ ডু ইউ ডু-এর পর মুখটা বন্ধ করে ফেলল।

'তাড়া আছে,' বলল রানা। 'চলি। আবার দেখা হওয়ায় ভাল লাগল।'

'ঠিক আছে, গুডবাই।'

ক্লাব থেকে বেরিয়ে এল রানা। এখনকার মত যতটা দরকার তার সবটুকু করেছে ও। বগা জানে, তার গোপন ব্যাপার ফাঁস হয়ে গেছে। এবং ভয় পেয়েছে সে।

হোটেলের দিকে হাঁটা ধরল রানা। অপরাধী-অপরাধী লাগছে নিজেকে। কিন্তু কি করবে সে! কোন দিক থেকেই তো কোন ওপেনিং পাওয়া যাচ্ছে না। অগ্রগতি নিল্।

হোমোদের ক্লাবগুলো ছাড়িয়ে খানিকদূর এসেছে, এই সময় ফেউ লাগল পিছনে। প্রফেশন্যাল নয়, হলে নিজেকে গোপন রাখার চেষ্টা করত। পনেরো থেকে বিশ কদম পিছনে থাকল, চামড়ার শক্ত জুতো পেভমেন্টের ওপর খট খট আওয়াজ করছে। রানা ভান করল, ব্যাপারটা যেন টেরই পায়নি ও। রাস্তা পেরোবার সময় সুযোগ করে দেখে নিল ফেউটাকে—লম্বা-চওড়া এক যুবক, লম্বা চুল, বাদামী রঙের লেদার জ্যাকেট পরে আছে।

এক মিনিট পর ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়াল আরেকজন। দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, ভাবল, ব্যাপারটা কি হতে পারে? এরই মধ্যে বৈরী এজেন্টদের চোখে পড়ে গেছে সে, এ ভাবাই যায় না। কেউ অনুসরণ করতে পাঠিয়ে থাকলে এদের মত অ্যামেচারদের পাঠাবে না।

রাস্তার আলো লেগে ঝিক্ করে উঠল ছুরির ফলা। পিছন থেকে এগিয়ে আসছে প্রথম যুবক। সামনেরটা বলল, 'কোন রকম ট্যাঁ-ফোঁ নয়। মনে করো, আমরা তোমার প্রেমিক। মানিব্যাগটা বের করো।'

গভীর স্বস্তি বোধ করল রানা। এরা ছিনতাই করতে চায়।

'মারধর কোরো না,' বলল রানা। 'টাকা-পয়সা যা আছে সব নিয়ে যাও।' পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল ও।

'খুলতে হবে না, এদিকে দাও!'

এদের সাথে এমন কিছু করতে চায় না রানা যাতে কোন খবর তৈরি হয়। টাকা কোন সমস্যা নয়, কিন্তু কাগজপত্র আর ক্রেডিট কার্ড হাতছাড়া করতে রাজি নয় ও। কড়কড়ে নোটগুলো বের করে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'কাগজপত্রগুলো আমার দরকার। টাকা নিয়ে যাও, ব্যাপারটা আমি রিপোর্ট করব না।'

সামনের ছেলেটা ছোঁ দিয়ে নিয়ে গেল টাকা। পিছন থেকে তার সঙ্গী বলল, 'ক্রেডিট কার্ডও চাই আমাদের—জলদি!'

দু'জনের মধ্যে সামনের ছেলেটা দুর্বল। 'আমাকে যেতে দাও,' বলে তাকে

পাশ কাটিয়ে, পেভমেন্টের কিনারা ধরে এগোল রানা

জুতোর খটাখট আওয়াজ হলো পিছনে, রানার ঘাড়ের কাছে চলে এল লম্বা-চওড়া। আর কোন উপায় নেই দেখে ঝট্ করে ঘুরল রানা। লাথি মারার জন্যে পা তুলেছে যুবক, সেটা দু'হাতে ধরে একই সাথে মোচড় আর টান দিয়ে তার ভারসাম্য নষ্ট করে দিল। অসহ্য ব্যথায় চিৎকার করে পড়ে গেল যুবক।

ছুরি বাগিয়ে ধরে অপেক্ষা করছিল সঙ্গী, রানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। নাচের ভঙ্গিতে পিছিয়ে এসে ছেলেটার হাঁটুর নিচে লম্বা হাড়ের ওপর একটা লাথি মারল রানা। কোন বিরতি না দিয়ে চট্ করে পাটা নামিয়ে অপর পায়ে সেই একই জায়গায় লাথি কষাল আরও জোরে। হাঁটু ভেঙে হুড়মুড়িয়ে পড়ল ছেলেটা বন্ধুর গায়ের ওপর, হাত থেকে ছিটকে দশহাত দূরে চলে গেল ছুরিটা।

টাকাগুলো উদ্ধার করে আলোছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে ছেলেদুটোর দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল রানা। ভাবল, কেন আমাকে দিয়ে করালে কাজটা? একেবারে কম বয়স, টেনেটুনে ষোলো কি সতেরো হবে, অনুমান করল ও। মনটা খারাপ হয়ে গেল। হিংস্র, তাতে কোন সন্দেহ নেই, লোকের দুর্বলতাকে পুঁজি করে কিছু কামাই করতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই সাথে মনে পড়ল রানার, সে-ও তো ওই একই কাজ করবে বলে ভাবছে।

নির্জন রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করল রানা। এই রাতের কথা ভুলে থাকতে পারলে ভাল হয়। ঠিক করল, কাল সকালে শহর ছেড়ে যাবে ও। আসলে মিছেই সময় নষ্ট করছে, এখানে বিশেষ সুবিধে হবে না।

পরিচিত কারও সাথে দেখা হয়ে যাবার ভয়ে কাজ ছাড়া হোটেলের কামরা থেকে বেরোয়নি রানা এ-কয়দিন। জানালার সামনে বসে অথবা টিভি দেখে প্রচুর সময় কাটিয়েছে ও। ইচ্ছে হলেও রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়ায়নি, হোটেলের বারে বসেনি, এমনকি হোটেলের রেস্তোরাঁয় খেতেও যায়নি—সব সময় রুম সার্ভিস ব্যবহার করেছে। কিন্তু সাবধান হবারও একটা সীমা আছে, চাইলেই তো আর সে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে না। দুর্ভাগ্য বা দুর্ঘটনাই বলতে হবে, লুক্সেমবার্গ রেলওয়ে স্টেশনের উল্টোদিকে আলফা হোটেলের লবিতে, পরিচিত একজনের সাথে দেখা হয়ে গেল ওর

হোটেল ছেড়ে চলে যাবে, ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে বিল দিচ্ছে। কত টাকা হয়েছে দেখে নিয়ে ক্লড রেলিকের নামে ইস্যু করা ক্রেডিট কার্ড দিল ও। আমেরিকান এক্সপ্রেসের স্লিপে সই করার জন্যে অপেক্ষা করছে, এই সময় পিছন থেকে একটা বিস্মিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল 'আরে, রানা না?' প্রশ্নটা ইংরেজীতে।

এই রকম বিপজ্জনক মুহূর্তে কি করতে হয় সে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে রানাকে। নিয়মটা খুব সাধারণ, লোকটা যে-ই হোক, তাকে তুমি চেনো না। তার চোখে চোখ রেখে তোমাকে বলতে হবে, আপনি ভুল করেছেন, আপনাকে আমি চিনি না।

সেই ট্রেনিং কাজে লাগাবার সময় এসেছে। প্রথমে ডেস্ক ক্লার্কের দিকে তাকাল ও। খাতায় ক্লড রেলিক নামের পাশে পেইড লিখে নামটা কাটতে ব্যস্ত সে, তার মধ্যে কোন রকম প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল না। হয় সে বোঝেনি, কিংবা

শুনতে পায়নি, অথবা গ্রাহ্য করছে না।

পিছন থেকে একটা হাত পড়ল রানার কাঁধে। মুখে ক্ষমা-প্রার্থনার হাসি ফোটাতে শুরু করে ঘুরল ও, ফ্রেঞ্চ ভাষায় শুরু করল, 'আপনি বোধহয় ভুল করছেন, মঁশিয়ে...' কিন্তু শেষ করতে পারল না।

চোখের সামনে বহু বছর আগের একটা দৃশ্য ভেসে উঠল আচমকা। সোফার ওপর আধশোয়া অবস্থায় ছটফট করছেন রাজিয়া ফিলমনটন, দু'হাত দিয়ে নিজের খোলা বুক ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন, আর তার ওপর ঝুঁকে পড়ে ঠোঁটে চুমো দেয়ার জন্যে উন্মাদের মত ধস্তাধস্তি করছে ন্যাট কোহেন।

'কি হে, আমাকে তুমি চিনতে পারছ না?'

ঘটনাটা মনে পড়ে যাওয়ায় এমনই হতচকিত, বিব্রত বোধ করল রানা, ট্রেনিঙের কথা ভুলে গেল সে, এবং ওর ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় ভুলটা করে বসল। নিজের অজান্তেই মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, ফিসফিস করে বলল, 'মাই গড! কোহেন!' এখন মাথার সবকটা চুল ছিঁড়ে উপড়ে ফেললেও শুধরানো যাবে না ভুলটা। মাস্টার স্পাই হার মানাল নোভিসকেও।

বিস্ময়ের ভাব কেটে গিয়ে কোহেনের চেহারায় উজ্জ্বল হাসি ফুটল। হাত বাড়িয়ে রানার একটা কব্জি ধরল সে। 'মনে হয় গত জন্মের কথা...অ্যাদ্দিন কোথায় ছিলে তুমি, রানা?'

নিজের অজান্তেই হাতটা ছাড়িয়ে নিল রানা, বুঝতে পারছে কি মারাত্মক ভুল করে বসেছে সে। মৃদু গলায় বলল, 'হ্যাঁ, অনেকদিন হলো। তুমি এখানে কি করছ?'

'আমি তো এখানেই থাকি। তুমি?'

'চলে যাচ্ছি ' আর কোন ক্ষতি হবার আগেই পালাতে হবে, ঠিক করল রানা। ক্লার্কের বাড়ানো হাত থেকে ক্রেডিট কার্ড ফর্ম নিয়ে তাতে খসখস করে লিখল, ক্লড রেলিক। রিস্টওয়াচ দেখল। 'সর্বনাশ, একটু পরই প্লেন ছেড়ে যাবে।'

'সাথে গাড়ি আছে,' বলল কোহেন। 'চলো, তোমাকে আমি এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিই। অনেক কথা জানার আছে আমার।'

'ট্যাক্সি ডাকতে পাঠিয়েছি...'

ডেস্ক ক্লার্কের সাথে কথা বলল কোহেন, 'ট্যাক্সি ফেরত যাবে। ড্রাইভারকে খুশি করার জন্যে এটা রাখুন।' পকেট থেকে একটা নোট বের করে কাউন্টারে রাখল সে।

'ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো। আমার সত্যিই খুব তাড়া আছে।'

'তাহলে দেরি করছ কেন?' বলে রানার হাত ধরে টান দিল কোহেন। আরেক হাতে তুলে নিল রানার ব্রিফকেস।

কোহেনকে অনুসরণ করার সময় নিজেকে অসহায়, বোকা আর অযোগ্য লাগল রানার। টু-সীটার একটা ইংলিশ স্পোর্টস কারে চড়ল ওরা। পার্কিং এরিয়া থেকে গাড়িটাকে রাস্তায় নিয়ে এল কোহেন, এই ফাঁকে তাকে ভাল করে দেখে নিল রানা। শরীর থেকে মেদ ঝরে গেছে, আগের সেই সরু গোঁফটা নেই, কাপড়-চোপড়ের ব্যাপারে এখনও সৌখিন। কোহেনের সাথে দেখা হয়ে যাওয়ায় কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে জানার চেষ্টা করল ও। 'এখানে থাকো কেন? ইসরায়েল কি

...োষ করল?'

'ইসরায়েল কোন দোষ করেনি,' হেসে উঠে জবাব দিল কোহেন। 'আমার ব্যাংকের ইউরোপিয়ান হেডকোয়ার্টার এখানে।'

'কোন্ ব্যাংক?'

'ফেদার ব্যাংক অভ ইসরায়েল।'

'লুক্সেমবার্গে কেন?'

'ফাইন্যানশিয়াল সেন্টার হিসেবে এই জায়গার গুরুত্ব আছে,' বলল কোহেন 'ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকটা তো এখানেই, এখানে ওদের একটা ইন্টারন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ আছে। এবার তোমার খবর কি তাই বলো?'

'দেশের ছেলে দেশেই আছি। জানোই তো, আমরা সোনালি আঁশ ফলাই—গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছি, কোথাও আরও ভাল দাম পাবার সম্ভাবনা আছে কিনা।'

'আবার যদি ফিরে আসো, আমি হয়তো তোমাকে সাহায্য করতে পারব। এখানে সবার সাথে যোগাযোগ আছে আমার, কিছু ভাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে দিতে পারব।'

'ধন্যবাদ, তোমার প্রস্তাব আমার মনে থাকবে,' বলল রানা। ভাবল, মন্দ কি, সুযোগ মত একবার এসে নাহয় কিছু পাট বিক্রি করা যাবে। 'ব্যাংক ব্যবসা কেমন চলছে?' জানতে চাইল ও। আমার ব্যাংক বলতে আমি যে ব্যাংক চালাই নাকি আমি যে ব্যাংকের মালিক অথবা আমি যে ব্যাংকে চাকরি করি—কোনটা বোঝাতে চাইল কোহেন?

'ভাল, খুব ভাল।'

দু'জনের কথাই যেন ফুরিয়ে গেছে।

খানিক পর কোহেন জিজ্ঞেস করল, 'বিয়ে থা?'

'না। তুমি?'

'না।'

'কি আশ্চর্য!' বলল রানা।

একটু হাসল কোহেন। 'তুমি বা আমি, আমরা যে টাইপের মানুষ, আমাদের দায়িত্ব নেয়া সাজে না।'

'আমার ঘাড়ে কিন্তু অনেক দায়িত্ব, সেগুলো আমি সাধ্যমত পালন করারও চেষ্টা করি।' কয়েকটি এতিম আর দুঃস্থ ছেলেমেয়ের চেহারা ভেসে উঠল রানার চোখের সামনে। নিয়মিত সাহায্য না করলে ওদের বেঁচে থাকাই কঠিন হয়ে উঠবে।

'সে যাই হোক, তোমার লেডিকিলার চেহারা দেখে জানতে কৌতূহল হয়, মেয়েরা তোমাকে শান্তিতে থাকতে দেয় তো?' প্রশ্ন শেষ করে একটা চোখ টিপল কোহেন।

'যতদূর মনে করতে পারি, মেয়েদের প্রতি তোমারই দুর্বলতা ছিল বেশি!' চাইছিল না, অনেকটা মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল কথাটা।

'সে একসময় ছিল বটে!' নির্লজ্জের মত বলল কোহেন।

সেই পুরানো, বিশ্রী দৃশ্যটা আবার ফিরে আসতে চাইল মনের পর্দায়, জোর করে ভুলে থাকতে চেষ্টা করল রানা। এয়ারপোর্টে পৌঁছে গাড়ি দাঁড় করাল কোহেন।

'ধন্যবাদ, কোহেন।' গাড়ি থেকে নেমে পড়ল রানা।

জানালা দিয়ে মুখ বের করে রানার দিকে তাকাল কোহেন। 'তুমি কিন্তু আগের মতই আছ, একটুও বদলাওনি।'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা। 'দুঃখিত, তাড়া আছে।' ঘুরে দাঁড়াল ও।

'ভুলো না, ফের যদি এদিকে আসো আমার সাথে অবশ্যই দেখা করবে।'

এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙের দিকে দ্রুত হাঁটা শুরু করে মাথার ওপর হাত তুলে নাড়ল রানা। 'গুডবাই।'

এতক্ষণে সব কথা মনে আসতে দিল ও।

লন্ডনে লেখাপড়া করার সময় প্রফেসর ফিলমনটনের বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হিসেবে ছিল ওরা তিনজন—মাসুদ রানা, ন্যাট কোহেন আর জ্যাক রিচি। প্রফেসর ফিলমনটন একটু অদ্ভুত মানুষ ছিলেন। তখনই তাঁর বয়স হয়েছিল ষাটের মত। তাঁর লেবানীজ স্ত্রী রাজিয়া ফিলমনটন, বয়সে প্রফেসরের চেয়ে ত্রিশ বছরের ছোট। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ইতিহাস পড়াতেন প্রফেসর, কিন্তু যুদ্ধ, রাজনীতি, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর আগ্রহ এবং পড়াশোনা ছিল বিস্তর। নীতিগতভাবে ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল আগাগোড়া। বোধহয় সেজন্যেই ইহুদী কোহেনকে তিনি একটু বেশি সুনজরে দেখতেন। কিন্তু রানার তাতে ঈর্ষান্বিত হবার কোন কারণ ঘটেনি। সম্ভবত মুসলমান বলেই রাজিয়া ফিলমনটনের কাছ থেকে অগাধ স্নেহ-ভালবাসা এবং প্রশ্রয় পেত রানা। এখানে কোহেন বা রিচি একদম পাত্তাই পেত না। ভদ্রমহিলার কোন সন্তান ছিল না, সম্ভবত সেই অভাবের কিছুটা তিনি রানাকে দিয়ে পূরণ করার চেষ্টা করতেন। রানাও তাঁকে শ্রদ্ধা করত।

রিচি এবং কোহেন বয়সে রানার চেয়ে বছর পাঁচ-সাত বড় ছিল, তাছাড়া নিজেদের বয়সের তুলনায়ও ইঁচড়ে পেকে গিয়েছিল ওরা। রাজিয়া ফিলমনটন ওদেরকে তো পাত্তা দিতেনই না, তিনি চাইতেন রানা যেন ওদের সাথে বেশি মেলামেশা না করে। পাশাপাশি দুটো কামরায় থাকত ওরা—একটায় রানা একা, আরেকটায় ওরা দু'জন। কোহেনের কামরাটা খালিই পড়ে থাকত, সারাটা বছর রিচির কামরাতেই থাকত সে। রানাকে কালা-আদমী বলে প্রায়ই খোঁচা দিত রিচি। আর ওই বয়সেই রাজনীতি সম্পর্কে সাংঘাতিক সচেতন ছিল কোহেন, যে-সব দেশ জাতিসংঘে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ভোট দিত তাদের ওপর ভীষণ চটা ছিল সে—সেই সূত্রে পাকিস্তানী রানাও ছিল তার চোখের বালি।

বাড়িটা দুটো স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাগে ভাগ করা ছিল, তারই একটায় থাকত পেয়িং গেস্টরা। প্রফেসর ফিলমনটন ছেলেদের সাথে সময় কাটাতে পছন্দ করতেন বলে তাঁর বৈঠকখানায় শেষ বিকেলের দিকে একটা আড্ডামত জমত, তা না হলে বাড়ির ওই অংশে বড় একটা যাওয়া পড়ত না। কোহেন আর রিচির দৌড় ছিল ফিলমনটনদের বৈঠকখানা পর্যন্ত, কিন্তু রাজিয়া ফিলমনটনের অনুমতি থাকায়

অন্দরমহলেও অবাধ যাতায়াত ছিল রানার।

একদিন সন্ধে রাতে কোন কারণ নেই তবু কেন যেন মন খুব বিষণ্ণ হয়ে উঠল রানার। বারবার মনে হতে লাগল, মিসেস ফিলমনটনের কাছে একবার গেলে হয়। মনে পড়ল প্রফেসর বাড়ি নেই, রিচিকে নিয়ে কি সব কেনাকাটা করতে বেরিয়েছেন তিনি। ঘর থেকে বেরিয়ে এল রানা। দেখল, কোহেন আর রিচির ঘরে তালা ঝুলছে। বাড়ির পিছন দিকের উঠান পেরিয়ে ফিলমনটনদের বৈঠকখানার সামনে চলে এল ও। সিঁড়ির ধাপ ক'টা টপকে বারান্দায় উঠেছে, এই সময় চাপা একটা নারী-চিৎকার শুনে থমকে গেল রানা। পরমুহূর্তে ঝড়ের বেগে বৈঠকখানায় ঢুকল ও। দেখল, সোফার ওপর আধশোয়া অবস্থায় ছটফট করছেন মিসেস ফিলমনটন, কাপড়চোপড় ছিঁড়ে গিয়ে এখানে সেখানে গা বেরিয়ে পড়েছে, আর হিংস্র একটা দানবের মত তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ন্যাট কোহেন।

দু'সেকেন্ড নিথর পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল রানা। পরিচিত দুনিয়া সম্পর্কে ওর ধারণা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল ওই দু'সেকেন্ডে। তারপর প্রচণ্ড রাগে, কিন্তু সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা মাথায়, দু'হাত দিয়ে কোহেনের কাঁধ ধরে টেনে সরিয়ে এনেছিল তাকে। বাধা পেয়ে নিজেই ঘুরল কোহেন। ঘামে ভেজা চেহারা, ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে, ঠিক চোরের মত দেখতে লাগল তাকে। এরপর কি যে হলো—বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেল রানা। মিসেস ফিলমনটন সোফা থেকে নেমে এক ছুটে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন, অমনি বাঘের মত কোহেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ও। হিতাহিত জ্ঞান ছিল না ওর, কিল ঘুসি-লাথি যখন যেটা সুবিধে একনাগাড়ে চালিয়ে গেল ও ঝাড়া তিনমিনিট।

বয়সে তো বটেই, আকারেও রানার চেয়ে অনেক বড় কোহেন। স্বাভাবিক অবস্থায় মারামারি বাধলে রানার হাড় গুঁড়িয়ে দিতে পারে সে। কিন্তু রানার এই নিষ্ঠুর উন্মত্ততা এমনই হতভম্ব করে দিল তাকে, বেশ কিছুক্ষণ আত্মরক্ষার কথা তার মনেই থাকল না। তারপর যখন বাধা দিতে শুরু করল সে, বুঝল কোন লাভ নেই—রানাকে এতদিন ভুল বুঝে এসেছে সে, গায়ের জোরে ওর সাথে চারটে কোহেনও পারবে না।

চোখ মুখ ফুলে বিশ্রী চেহারা হলো কোহেনের। ঠোঁট, নাক থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। এইভাবে চলতে থাকলে মারাই যেত সে। কিন্তু যেমন হঠাৎ করে শুরু করেছিল রানা, তেমনি হঠাৎই থামল সে, যেন এতক্ষণে হুঁশ ফিরেছে ওর। কোহেনকে ছেড়ে দিয়ে এক পা পিছিয়ে এল ও, দরজাটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে বলল, 'যাও।'

আধ মিনিট চেষ্টা করে উঠে দাঁড়াতে পারল কোহেন। চোখে ঘৃণা নিয়ে রানার দিকে তাকাল সে, হিংস্র দৃষ্টি দেখে বোঝা গেল, সুযোগ পেলে রানাকে সে ছাড়বে না। তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

সেই একই জায়গায় ঝাড়া পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে ছিল রানা। নড়ার শক্তি ফিরে পেয়ে দরজার দিকে এগোচ্ছে, পিছন থেকে রাজিয়া ফিলমনটনের মৃদু কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ও। 'প্রফেসর না ফেরা পর্যন্ত একটু বসবে, রানা?'

দরজার কাছ থেকে ফিরে এসে সোফায় বসল রানা। মুখ তুলে রাজিয়া

ফিলমনটনের দিকে তাকাতেই পারল না ও। কিছুক্ষণ বেডরূমের চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি, তারপর এগিয়ে এসে রানার সামনের একটা সোফায় বসলেন। কারও মুখেই কোন কথা যোগাল না। এইভাবে বোধহয় আধঘণ্টার মত কেটেছে, তারপর বাইরে গাড়ির আওয়াজ হলো। রিচিকে নিয়ে প্রফেসর ফিরলেন।

'রানা,' মৃদু গলায় বললেন রাজিয়া ফিলমনটন, 'প্রফেসরকে ব্যাপারটা না শোনানোই ভাল। তোমাদের সবাইকে তিনি অবিশ্বাস করতে শুরু করবেন।' কথাটা বলে আর বসলেন না, সোফা ছেড়ে বেডরূমে ফিরে গেলেন। প্রফেসর বৈঠকখানায় ঢোকার আগে রানাও আরেক দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

এরপর প্রায় মাস খানেক ফিলমনটনদের বৈঠকখানায় পা দেয়নি রানা। দু'চার দিন খুব গম্ভীর হয়ে ছিল কোহেন, কিন্তু তারপর আবার সে আগের মতই স্বাভাবিক হয়ে উঠল। ইতোমধ্যে রানার কাছে মাফ চেয়ে নিয়েছে সে। অনুরোধ করে বলেছে, রানা যেন ঘটনাটা কাউকে না জানায়। রাজিয়া ফিলমনটন প্রফেসরের কাছে ব্যাপারটা চেপে রাখলেন কেন, এই রহস্য কোনদিনই উদ্‌ঘাটন করতে পারেনি রানা। তাঁর কি কোন দুর্বলতা ছিল, যেজন্যে কোহেনকে তিনি ভয় পেতেন? নাকি প্রফেসর কোহেনকে অত্যধিক ভালবাসতেন বলে কথাটা তাঁকে জানাতে সাহস পাননি? কারণটা যা-ই হোক, বিষয়টা নিয়ে আর কখনও কারও সাথে আলাপ করেনি রানা।

রানার উপস্থিতি ছাড়াই ফিলমনটনদের বৈঠকখানায় আবার আড্ডা জমে উঠল। পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়েছে ও, সেটা পুষিয়ে নেবার জন্যে একটু বেশি খাটছে, এই রকম অজুহাত দেখিয়ে ওদেরকে এড়িয়ে যেত রানা। কিন্তু রাজিয়া ফিলমনটনের সঙ্গ পাবার জন্যে মনে মনে কাঙাল হয়ে উঠেছিল। বিদেশ-বিভূঁইয়ে আপনজনের মত কেউ যদি ভালবাসে, তাকে এড়িয়ে চলা কি যে কঠিন সেটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারত রানা। কিন্তু রাজিয়া ফিলমনটন ডেকে না পাঠালে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াবার কথা ভাবতেও পারছিল না ও। তারপর একদিন ওর মনের আশা পূরণ হলো। তিনি একদিন ওকে ডেকে পাঠালেন। সেই থেকে আবার নিয়মিত আসা-যাওয়া শুরু হলো। কিন্তু বৈঠকখানায় নয়, রাজিয়া ফিলমনটন ওকে একেবারে অন্দরমহলে নিয়ে গিয়ে বসাতেন।

তারপর লন্ডনের লেখাপড়া মাঝপথে থামিয়ে দেশে ফিরতে হলো রানাকে। সেই থেকে ফিলমনটনদের সাথে ওর যোগাযোগও কেটে গেল। পরবর্তী জীবনে অনেকবারই লন্ডন বা অক্সফোর্ডে গেছে রানা, কিন্তু তাঁদের সাথে দেখা বা তাঁদের খোঁজখবর করেনি ও। এর কারণ হিসেবে মাঝে মধ্যে মনে হয়, হয়তো রাজিয়া ফিলমনটনের ওপর নিজের অজ্ঞাতেই একটা অভিমান জমে উঠেছিল ওর মনে। কোহেনের অপরাধ কেন তিনি চাপা দিলেন? কিন্তু এটাকেও একমাত্র কারণ বলে মেনে নিতে পারেনি ও। কী যেন একটা অন্য কারণ আছে।

গাড়ি নিয়ে ব্যাংকে ফেরার সময় অনেক কথাই ভাবতে লাগল ন্যাট কোহেন। বাংলাদেশী মাসুদ রানা ক্লড রেলিক নামে লুক্সেমবার্গের একটা হোটেলে উঠেছিল কেন? ওকে দেখে রানার যে প্রতিক্রিয়া হলো, সেটাকে ঠিক স্বাভাবিক বলে মেনে

যোগা যায় না। ব্যাপারটা কি? এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল, মিশরীয় সিক্রেট সার্ভিসের চীফ লে. জেনারেল আলি কারাম এই কিছুদিন আগে গোপনে ঢাকা সফর করে এসেছেন।

জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট হলেও, কখনও একজন গুরুত্বপূর্ণ স্পাই হিসেবে স্বীকৃতি আদায় করতে পারেনি কোহেন। ব্যাংকে সে নামমাত্র চাকরি করে, তার আসল কাজ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অফিসারদের সাথে আড্ডা দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যোগাড় করা। সময় মত অফিস পৌঁছবার কোন তাগিদ নেই, গাড়ি নিয়ে সোজা আলফা হোটেলে চলে এল। কাল রাতে শহরে একটা ঘটনা ঘটেছে, সেটার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় রানার ব্যাপারে আরও খবর নেয়ার গরজ অনুভব করছে সে।

পুলিসের কাছে ছিঁচকে চোর আর ছিনতাইকারী হিসেবে পরিচিত দুই যুবককে হাড়-গোড় ভাঙা, অচেতন অবস্থায় পেভমন্টের ওপর পাওয়া গেছে। সিটি পুলিস ফোর্সে লোক আছে কোহেনের, তার কাছ থেকেই বিশদ জানতে পেরেছে সে। সন্দেহ নেই, ছিনতাইয়ের জন্যে ভুল লোককে বেছে নিয়েছিল ওরা। জখমের নমুনা দেখেই বোঝা যায়, কাজটা একজন প্রফেশনালের। একজন সৈনিক, পুলিস, দেহরক্ষী…অথবা একজন এসপিওনাজ এজেন্টের কাজ। এই রকম একটা ঘটনার পর কেউ যদি পরদিন সকালেই তাড়াহুড়ো করে শহর ছেড়ে চলে যায়, তার ব্যাপারে খবর নেয়া সত্যিই দরকার।

আলফা হোটেলের ডেস্ক ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করল সে, 'ঘণ্টাখানেক আগে আপনার একজন গেস্ট বিদায় নিয়ে চলে গেল, আমি তখন ছিলাম এখানে, মনে পড়ে?'

'পড়ে। কেন বলুন তো?'

ক্লার্কের হাতে দুশো লুক্সেমবার্গ ফ্রাঙ্ক গুঁজে দিল কোহেন। 'হোটেলের খাতায় কি নাম লিখিয়েছিল বলতে পারেন?'

ফাইল দেখে ক্লার্ক জানাল, 'সায়েন্স ইন্টারন্যাশনাল ম্যাগাজিনের ক্লড রেলিক।'

'মাসুদ রানা নয়?'

মাথা নাড়ল ক্লার্ক।

'বাংলাদেশী কোন মাসুদ রানা আপনার গেস্ট হিসেবে ছিল কিনা একটু দেখবেন?'

খাতা-পত্র ঘাঁটতে শুরু করল ক্লার্ক। কোহেন ভাবল, রানা যদি নাম বদলে হোটেলে উঠে থাকে, তাহলে সে হয়তো পেশার কথাটাও মিথ্যে বলেছে। সম্ভবত পাটের বাজার দেখতেও আসেনি, কোন পত্রিকার রিপোর্টারও নয় সে। আচ্ছা, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের স্পাই নয় তো? মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠলেও সম্ভাবনাটাকে বাতিল করে দিল সে। নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল, এই ধরনের কাকতালীয় ঘটনা আজকাল আর ঘটে না। খাতা বন্ধ করে ক্লার্ক জানাল, 'না, স্যার। মাসুদ রানা নামে কোন গেস্ট আমরা পাইনি।'

নিজের অফিসে ফিরে এসে ডেস্কে বসেই একটা মেসেজ তৈরি করল

কোহেন।

মেসেজটা এই রকম—সন্দেহজনক একজন বাংলাদেশীকে দেখা গেছে এখানে। মাসুদ রানা, ওরফে ক্রুড রেলিক। প্রায় ছ'ফিট লম্বা, ক্লিনশেভন, শক্ত-সমর্থ একহারা গড়ন, ব্যাকব্রাশ করা কালো চুল, কালো চোখ।

মেসেজটা কোড করল কোহেন, এর মাথায় অতিরিক্ত কিছু কোড শব্দ যোগ করে টেলেক্স যোগে পাঠিয়ে দিল ব্যাংকের ইসরায়েলী হেডকোয়ার্টারে। ওখানে সেটা কখনোই পৌঁছবে না। অতিরিক্ত কোড শব্দগুলো দেখেই ওটাকে সরাসরি ডিরেক্টরেট অভ জেনারেল ইনভেস্টিগেশনে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

মনে মনে কোহেন জানে, মেসেজটা কোন আলোড়নের সৃষ্টি করবে না। তেল আবিব থেকে একটা সামান্য ধন্যবাদ পর্যন্ত পাবে না সে। আবার সেই একঘেয়ে ব্যাংকের কাজে নাক ডুবিয়ে থাকতে হবে ওর।

কিন্তু না, তেল আবিব থেকে ফোন করা হলো তাকে।

এর আগে এ-ধরনের ঘটনা ঘটেনি। মাঝে মধ্যে ওখান থেকে টেলিগ্রাম, চিঠি, টেলেক্স মেসেজ আসে, সবই কোড করা। এক কি দু'বার ইসরায়েলী দূতাবাসের লোকেরা ওর সাথে দেখা করে মৌখিক নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু ফোন করেনি কখনোই। যতটুকু আশা করেছিল সে, ওর মেসেজ নিশ্চয়ই তারচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

ফোনে ওরা মাসুদ রানা সম্পর্কে আরও কিছু জানতে চাইল। চেহারা আর কাপড়চোপড়ের বিশদ বর্ণনা, সাথে কেউ ছিল কিনা, তাকে সে চিনল কিভাবে, ইত্যাদি। তারপর জানানো হলো, 'মন দিয়ে শোনো। এই লোক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ…মক্কেল। আমরা চাই দিনের চব্বিশ ঘণ্টা ওর পিছনে ছায়ার মত লেগে থাকো তুমি।'

'তা সম্ভব নয়,' মন খারাপ করে বলল কোহেন। 'শহর ছেড়ে চলে গেছে সে।'

'চলে গেছে? কোথায়?'

'আমি তাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিই। কোথায় গেছে তা তো বলতে পারব না।'

'জানো। এয়ারলাইন্স অফিসগুলোয় ফোন করো। কোন্ ফ্লাইট ধরে কোথায় গেছে জেনে নিয়ে পনেরো মিনিটের মধ্যে যোগাযোগ করো আমার সাথে।'

'সাধ্যমত চেষ্টা করব…'

'তোমার সাধ্যের ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ নেই,' তেলআবিব থেকে বলা হলো। 'ওর গন্তব্য জানতে চাই আমি। সেখানে ও পৌঁছবার আগেই জানতে চাই। পনেরো মিনিটের মধ্যে, মনে থাকে যেন। একবার যখন তাকে আমরা পেয়েছি, কোনভাবেই হারানো চলবে না।'

রানার এত গুরুত্ব কিসের জিজ্ঞেস করতে যাবে কোহেন, কিন্তু তার আগেই ফোনের যোগাযোগ কেটে দেয়া হলো অপরপ্রান্ত থেকে। রিসিভার নামিয়ে রেখে ক্রাডলে হাত বুলাতে শুরু করল কোহেন। সত্যি বটে তেল আবিব থেকে সামান্য ধন্যবাদটুকু পর্যন্ত জানানো হয়নি তাকে, কিন্তু এ-ও মন্দ নয়। হঠাৎ করে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে সে। তার এই কাজ অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করা হচ্ছে। তেলআবিব

নির্ভর করছে তার ওপর। সেই মারধরের কথা মনে পড়ে গেল কোহেনের। হাত তুলে চোখের নিচেটায় আঙুল বুলাল সে, যেন এতকাল পর ব্যথাটা অনুভব করার চেষ্টা করছে। আত্মবিশ্বাস আর জেদের একটা ভাব দেখা গেল তার চেহারায়। এতদিনে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ বোধহয় পাওয়া গেল।

রিসিভার তুলে নিয়ে এয়ারলাইন্স অফিসে ফোন করতে শুরু করল সে।

পাঁচ

একটা নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশন ভিজিট করবে রানা। ইউরোপিয়ান ভাষাগুলোর মধ্যে ইংরেজীর পরই ফ্রেঞ্চ সবচেয়ে ভাল বোঝে বলে ফ্রান্সে গেল ও—ইংল্যান্ড ইউরাটমের সদস্য নয়।

ছাত্র এবং ট্যুরিস্টদের বাছাই করা একটা দলের সাথে বাসে চেপে রওনা হলো ও। জানালার বাইরে ধুলোমাখা সবুজ বন-জঙ্গল, ক্ষীণকায় নদী-নালা, প্রায় নির্জন গ্রাম—রানার মন কাড়তে পারল না। ছোট একটা শহর পেরিয়ে এল বাস, তারপর থেকে দু'পাশে ধু-ধু মাঠ। দূর থেকেই দেখা গেল পাওয়ার স্টেশনটাকে। দূরত্ব কমে আসার সাথে সাথে উপলব্ধি করল ও, ওর কল্পনার চেয়ে নিশ্চয়ই অনেক বড় হবে রিয়্যাক্টর। তা না হলে শুধু শুধু তাকে একটা দশতলা বিল্ডিঙের ভেতর বসানো হয়নি।

আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা মিলিটারি নয়, ইন্ডাসট্রিয়াল ধরনের। গোটা এলাকাটা উঁচু একটা পাঁচিল, তার ওপর কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা, কিন্তু ইলেকট্রিফায়েড নয়। ট্যুর গাইড ফরমালিটি সারছে, এই সুযোগে গেট-হাউসের ভেতরটা দেখে নিল রানা। মাত্র দুটো ক্লোজ-সার্কিট টেলিভিশন স্ক্রীন রয়েছে গার্ডদের জন্যে। ভাবল, গার্ডদের ভাল-মন্দ কিছু বুঝতে না দিয়ে দিন দুপুরে পঞ্চাশজন লোককে উঠানের ভেতর আনতে পারি আমি। লক্ষণটা ভাল নয়—এর মানে হলো, অন্যান্য আরও ব্যবস্থা আছে বলে গেটের কাছে তেমন কড়াকড়ি নেই।

আর সবার সাথে বাস থেকে নেমে কংক্রিটের মস্ত চাতাল পেরিয়ে রিসেপশন বিল্ডিঙের দিকে এগোল রানা। লন আর ফুলের বাগানগুলো ছবির মত সুন্দর, এক কণা ময়লা বা অযত্নের ছাপ নেই কোথাও। দেয়ালের দিকে তাকালে মনে হয় এইমাত্র চুনকাম করা হয়েছে। কোথাও ধোঁয়া বা ধুলোর লেশমাত্র নেই, সব ঝকঝক তকতক করছে। কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে, গেট-হাউসে তাকাল রানা, সেখান থেকে দৃষ্টি গিয়ে পড়ল গেটের বাইরে। রাস্তার ওপর একটা ধূসর রঙের ওপেল দাঁড়িয়ে রয়েছে। দু'জন আরোহী, একজন নেমে এসে কথা বলল সিকিউরিটি গার্ডের সাথে। গার্ডের ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হলো, লোকটাকে সে পথ-নির্দেশ দিচ্ছে। রোদ লেগে কি যেন ঝিক্ করে উঠল গাড়ির ভেতর।

দলবলের সাথে লাউঞ্জে ঢুকল রানা। কাঁচের একটা শো-কেসে ফুটবল ট্রফি

সাজানো রয়েছে, স্টেশনের টীম পুরস্কার হিসেবে পেয়েছে সেটা। দেয়ালে ঝুলছে প্রতিষ্ঠানের এরিয়াল ফটোগ্রাফ। সেটার সামনে দাঁড়িয়ে সমস্ত বিবরণ মনে গেঁথে নিতে শুরু করল রানা, সেই সাথে বুদ্ধি আঁটতে লাগল কিভাবে হানা দেয়া যায় স্টেশনে। কিন্তু ধূসর রঙের ওপেলের কথা কোনমতেই ভুলে থাকতে পারছে না ও।

আঁটসাট ইউনিফর্ম পরা চারটে মেয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সবকিছু দেখাল ওদেরকে। বিশাল আকারের টারবাইনগুলোর ব্যাপারে রানার কোন আগ্রহ দেখা গেল না। রকেট-যুগের কন্ট্রোল রুম, থরে বিথরে সাজানো ডায়াল আর সুইচের প্রদর্শনীর মত লাগল। ওয়াটার-ইনটেক সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য হলো, মাছগুলোকে বাঁচিয়ে রেখে আবার নদীতে ফেরত পাঠানো হয়। এগুলোতেও রানার কোন আগ্রহ নেই। ওপেলের লোকগুলো কি ওকে অনুসরণ করছে? তাই যদি হয়—কেন?

ডেলিভারি বে সম্পর্কে দারুণ আগ্রহ দেখা গেল ওর মধ্যে। ইউনিফর্ম পরা একটা মেয়েকে জিজ্ঞেস করল ও, 'ফুয়েল পৌছায় কিভাবে?'

'ট্রাকে করে,' শান্ত সুরে বলল মেয়েটা। ছাত্র আর ট্যুরিস্টদের কেউ কেউ নার্ভাস ভঙ্গিতে হেসে উঠল। ইউরেনিয়ামের মত জিনিস এই রকম সাধারণভাবে নিয়ে যাওয়া হয়, আশ্চর্য লাগারই কথা। 'বিপজ্জনক মনে করার কোন কারণ নেই,' সবাই যে হেসে উঠবে এটা যেন সে জানত, হাসি থামার আগেই ঠোঁটে যুগিয়ে রাখা জবাবটা আওড়ে গেল সে। 'অ্যাটমিক পাইলে না ঢোকানো পর্যন্ত এ-জিনিস এমন কি রেডিওঅ্যাকটিভও নয়। ট্রাক থেকে নামিয়ে সোজা এলিভেটরে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখান থেকে সাততলার ফুয়েল স্টোরে। ওখান থেকে বাকি সব কিছুই অটোমেটিক।'

'কনসাইনমেন্টের মান বা পরিমাণ চেক করার কি ব্যবস্থা?'

'সে-সব ফুয়েল ফ্যাব্রিকেশন প্ল্যান্টে সারা হয়। কনসাইনমেন্ট ওখানেই সীল করে দেয়া হয়, শুধু সীল চেক করা হয় এখানে।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। মনটা খুশি হয়ে উঠল। ইউরাটমের রেফার যতটা বোঝাতে চেয়েছে, চেকিং সিস্টেম ততটা কড়া নয়। রানার মাথার ভেতর একটা অস্পষ্ট ধারণা এরই মধ্যে গজিয়ে উঠতে শুরু করেছে।

রিয়্যাক্টরের লোডিং মেশিন কিভাবে কাজ করছে দেখল ওরা। সবটাই রিমোট কন্ট্রোলে চলে, মেশিনটা স্টোর থেকে রিয়্যাক্টরে নিয়ে যায় ফুয়েল এলিমেন্ট, একটা ফুয়েল চ্যানেলের কংক্রিটের তৈরি ঢাকনি তোলে, স্পেন্ট এলিমেন্ট নামায়, ভেতরে ঢোকায় নতুন এলিমেন্ট, তারপর ঢাকনি আবার বন্ধ করে ব্যবহার করা এলিমেন্ট নিয়ে গিয়ে ফেলে একটা পানিভরা শ্যাফটে, সেখান থেকে ওটা কুলিং পন্ডে চলে যায়।

দুই কোমরে হাত রেখে জ্ঞান দান করার ভঙ্গিতে কথা বলতে শুরু করল একটা মেয়ে, কণ্ঠস্বর মিষ্টি বলে ভঙ্গিটা তাকে মানিয়ে গেল। 'রিয়্যাক্টরের ফুয়েল চ্যানেল রয়েছে তিন হাজার, প্রত্যেকটা চ্যানেলে রয়েছে আটটা করে ফুয়েল রড। চার থেকে সাত বছর পর্যন্ত টেকে রডগুলো। প্রতিটি অপারেশনে পাঁচটা চ্যানেল রিনিউ করে লোডিং মেশিন।'

কুলিং পন্ড দেখতে এল ওরা। বিশ ফিট পানির নিচে স্পেন্ট ফুয়েল এলিমেন্ট প্যানেটে লোড করা হয়। ইতোমধ্যে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে সেটা, কিন্তু ভীষণভাবে রেডিওঅ্যাকটিভ—এই অবস্থায় পঞ্চাশ টনী লীড ফ্লাস্কে ভরা হয়, একটা ফ্লাস্কে দুশো করে এলিমেন্ট। ব্যস, ইউরেনিয়ামের আবর্জনা রোড আর রেল যোগে একটা রিপ্রোসেসিং প্ল্যান্টে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে গেল।

লাউঞ্জে বসিয়ে মেয়েরা ওদেরকে পেস্ট্রি আর কফি দিয়ে অ্যাপায়ন করল। কি শিখেছে তার একটা হিসেব করতে বসল রানা। মাঝখানে মাথায় একটা বুদ্ধি উঁকি দিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত আসলে যখন প্লুটোনিয়ামই দরকার, স্পেন্ট ফুয়েল চুরি করলেই পারে সে। কিন্তু এ-ধরনের পরামর্শ কেন তাকে দেয়া হয়নি, এখন সেটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। একটা ট্রাক হাইজ্যাক করা কোন সমস্যাই নয়, সে একাই পারে, কিন্তু পঞ্চাশ টনী একটা লীড ফ্লাস্ক কিভাবে ফ্রান্স থেকে বের করে নিয়ে গিয়ে মিশরে পৌঁছে দেবে—কারও চোখে ধরা না পড়ে? নাহ্, সেটা সম্ভব নয়।

পাওয়ার স্টেশনের ভেতর থেকে ইউরেনিয়াম চুরি, এটাও তেমন সুবিধে হবে না। সিকিউরিটি সিস্টেম এখানে তেমন কড়া নয়, তা ঠিক। বাইরের লোকজনকে এখানে ঢুকতে দেয়া হয়েছে, এ-থেকেই সেটা প্রমাণ হয়। কিন্তু স্টেশনে ফুয়েল একটা অটোমেটিক, রিমোট-কন্ট্রোল সিস্টেমের সাহায্যে তালা দেয়া অবস্থায় থাকে। তারপর একমাত্র নিউক্লিয়ার প্রোসেসের ভেতর দিয়ে কুলিং পন্ডে বেরিয়ে আসে। সেই আগের সমস্যা ফিরে এল—সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে রেডিওঅ্যাকটিভ মেটিরিয়াল ভরা প্রকাণ্ড ফ্লাস্ক কোন ইউরোপিয়ান বন্দরে নিয়ে যেতে হবে।

সিঁদ কেটে বা অন্য কোনভাবে ফুয়েল স্টোরে ঢুকতে হবে ওকে, ভাবল রানা। তারপর হাত দিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করে এলিভেটরে তুলতে হবে জিনিসটাকে। এলিভেটর নিচে নেমে এলে আবার সেটা বয়ে নিয়ে যেতে হবে ট্রাকের ওপর। তারপর নও দোগিয়ারা। কিন্তু এর মানে হলো, স্টেশনের প্রায় সব লোককে অস্ত্রের মুখে আটকে রাখতে হবে—অপারেশন শেষ হবার পর আরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত। দুনিয়ার কারও আর জানতে বাকি থাকবে না। অথচ কাউকে না জানিয়ে কাজটা সারতে বলা হয়েছে ওকে।—কিভাবে?

একটা মেয়ে ওর কাপটা আবার ভরে দিতে চাইলে রাজি হলো রানা, ভাল কফি দেবে এই বিশ্বাস ফ্রেঞ্চদের ওপর রাখা যায়। ইউনিফর্ম পরা মেয়েদের সাথে অল্প-বয়সী একজন এঞ্জিনিয়র যোগ দিল, নিউক্লিয়ার সেফটি সম্পর্কে কথা বলল সে। ইস্ত্রি না করা একটা ট্রাউজার আর ঢোলা সোয়েটার পরে আছে। বিজ্ঞানী আর টেকনিশিয়ানরা সবাই প্রায় একই রকম, দেখলেই চেনা যায়। এদের কাপড়চোপড় পুরানো, বেঢপ আর আরামদায়ক হয়, এবং এদের কারও যদি দাড়ি থাকে, সাধারণত সেটা অহমিকার নয়, বরং নির্লিপ্তির পরিচয় বহন করে। রানার ধারণা, এটা ঘটে কারণ এদের কাজের মধ্যে বানোয়াট ব্যক্তিত্বের কোন মূল্য নেই, ধরা হয় শুধু মেধাটুকু, কাজেই কারও চোখে সুন্দর হবার চেষ্টা করে লাভ নেই কোন। কিন্তু সেই সাথে এটা আবার বিজ্ঞানের একটা রোমান্টিক ভঙ্গিও হতে পারে।

লেকচারে কান দিল না রানা। এরপর একজন পদার্থ বিজ্ঞানী এসে কম কথায়

অনেক কিছু বুঝিয়ে দিল ওদেরকে। 'রেডিয়েশনের সেফ লেভেল বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই,' বলল সে। 'এধরনের কথাবার্তা থেকে আপনাদের ধারণা হতে পারে রেডিয়েশন হলো পুকুরে পানির মত—পানি যদি চার ফিট গভীর হয় তাহলে আপনি নিরাপদ, কিন্তু আট ফিট হলে আপনি ডুবে যাবেন। কিন্তু বাস্তবে রেডিয়েশন লেভেলের সাথে হাইওয়ের স্পীড লিমিটের অনেক বেশি মিল আছে—ঘণ্টায় আশি মাইলের চেয়ে ত্রিশ মাইল নিরাপদ, কিন্তু বিশ মাইলের মত নিরাপদ নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাপদ গাড়িতে না চড়া।'

কিভাবে ইউরেনিয়াম চুরি করা যায় আবার সেই বুদ্ধি আঁটতে শুরু করল রানা। ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে, এই শর্তই সবগুলো প্ল্যানকে গোড়াতেই ধ্বংস করে দিচ্ছে। কে জানে, এই ব্যাপারটার ভাগ্যে হয়তো ব্যর্থতাই ঝুলছে। অসম্ভব অসম্ভবই, ভাবল ও। না, এত তাড়াতাড়ি এ-কথা বলার সময় আসেনি। আবার প্রথম আইডিয়াটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করল ও।

এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছে, এই সময় দখল করতে হবে কনসাইনমেন্ট। আজ যা দেখল তা থেকে এইটুকু অন্তত পরিষ্কার হয়ে গেছে। দেখা যাচ্ছে, এখানে পৌছবার পর ফুয়েল এলিমেন্ট চেক করা হয় না, সরাসরি সিস্টেমের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। পথের মাঝখানে কোথাও একটা ট্রাক হাইজ্যাক করতে পারে ও, ফুয়েল এলিমেন্ট থেকে বের করে নিতে পারে ইউরেনিয়াম, আবার ওগুলো বন্ধ করে নতুন করে সীল করতে পারে কনসাইনমেন্ট, তারপর ঘুষ দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে খালি শেল ডেলিভারি দিতে বাধ্য করতে পারে ড্রাইভারকে। ফাঁপা শেলগুলো নিজেদের সময় এবং পথ ধরে রিয়্যাক্টরে পৌছবে, একসাথে পাঁচটা করে, সবগুলোর পৌছতে সময় লেগে যাবে কয়েক মাস। একসময় দেখা যাবে, রিয়্যাক্টরে আউটপুট নেমে গেছে। ফলে তদন্ত হবে। টেস্ট হবে। সম্ভবত খালি এলিমেন্ট শেষ হয়ে গিয়ে নতুন ফুয়েল এলিমেন্ট ভেতরে না ঢোকা পর্যন্ত কোন উপসংহারে পৌছনো সম্ভব হবে না। কিন্তু ইতোমধ্যে আবার স্বাভাবিক পর্যায়ে উঠে আসবে আউটপুট। কি ঘটেছিল তা বোধহয় কেউ টের পাবে না, অন্তত যতক্ষণ না খালি শেলগুলো রিপ্রোসেস করা হয় এবং উদ্ধার করা প্লুটোনিয়ামের পরিমাণ কম ঠেকে। কিন্তু ততদিনে, চার থেকে সাত বছর পরে, অনুসরণ করে মিশরকে ধরা কঠিন, প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে।

তবে, আরও আগে জেনে ফেলতে পারে ওরা। তাছাড়া, সেই সমস্যাটা এখনও রয়েছে—জিনিসটা এই দেশ থেকে বের করে নিয়ে যাবে কিভাবে? তবু, সম্ভাব্য একটা স্কিমের আউটলাইন দেখতে পাচ্ছে ও। তাই একটু খুশি হয়ে উঠল মন।

বিজ্ঞানীর কথা শেষ। ভিজিটরদের তরফ থেকে দু'একটা প্রশ্ন করা হলো, উত্তরও পাওয়া গেল। সবাইকে নিয়ে আবার বাসে উঠল ট্যুর গাইড। একেবারে পিছনের সীটে বসল রানা। মধ্য-বয়স্ক এক মহিলা ওকে বলল, 'ওটা তো আমার সীট ছিল!' রানা কঠিন দৃষ্টিতে তাকাতে মানে মানে কেটে পড়ল সে।

ফেরার পথে পিছনের জানালা দিয়ে ফেলে আসা পথের ওপর চোখ রাখল রানা। মাইলখানেক চলে এসেছে, এই সময় সাইড রোড থেকে বেরিয়ে এসে

বাসের পিছু নিল একটা ধূসর ওপেল।

খুশি খুশি ভাবটুকু উধাও হয়ে গেল রানার মন থেকে।

শত্রুর চোখে ধরা পড়ে গেছে ও। ব্যাপারটা হয় এখানে, নয়তো লুক্সেমবার্গে ঘটেছে—সম্ভবত লুক্সেমবার্গে। হয়তো ন্যাট কোহেনই এর জন্যে দায়ী, জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের একজন এজেন্টও হতে পারে সে। নিশ্চয়ই সাধারণ কৌতূহল থেকে ওকে অনুসরণ করছে ওরা, ওর উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখুনি জানবে কিভাবে? এখন ওদেরকে খসাতে পারলেই ল্যাঠা চুকে যায়।

শহরের মধ্যে এবং চারপাশে পুরো একটা দিন অকারণ ঘুরে বেড়াল রানা। বাস, ট্যাক্সি, ভাড়া করা কার ব্যবহার করল ও। দিন শেষে তিনটে গাড়ি চিনল—ধূসর ওপেল, পুরানো একটা ফ্ল্যাটবেড ট্রাক, একটা জার্মান ফোর্ড। সব মিলিয়ে দলে ওরা পাঁচজন। এরা ইসরায়েলী নাও হতে পারে। ফ্রান্সের এই এলাকায় অনেক ক্রিমিন্যাল আছে যারা স্থানীয়, কিন্তু ইহুদী। ওরা হয়তো স্থানীয় লোকদের সাহায্য নিয়েছে। আরও আগে কেন ওদের অস্তিত্ব টের পায়নি রানা, সেটা দলের আকার দেখে বোঝা গেল। ঘন ঘন লোক আর গাড়ি বদল করার সুযোগ পেয়েছে ওরা।

পরদিন একটা অটোরুট ধরে শহর থেকে বেরিয়ে এল রানা। কয়েক মাইল ওর গাড়ির পিছু পিছু এল ফোর্ড, তারপর ওপেলটাকে দেখা গেল। প্রতিটি গাড়িতে দু'জন করে লোক। তারমানে সংখ্যায় ওরা পাঁচজন নয়, আরও বেশি। ট্রাকে তো আছেই, ওর হোটেলেও দু'একজন না থেকে পারে না।

ওপেল তখনও পিছু লেগে রয়েছে এই সময় রাস্তার ওপর আড়াআড়ি ঝুলে থাকা একটা ওভারব্রিজ দেখল রানা—হাইওয়ের এমন এক জায়গায়, এদিক ওদিক দু'দিকেই পাঁচ মাইলের মধ্যে বাঁক নেয়ার কোন উপায় নেই। ব্রিজের একপাশে গাড়ি দাঁড় করাল রানা, নিচে নেমে হুড খুলল। ভাবখানা এই, গোলমালটা কোথায় দেখছে। পাশ কাটিয়ে চলে গেল ওপেল, এক মিনিট পর ফোর্ডও তাকে অনুসরণ করল। পরবর্তী বাঁকের কাছে পৌঁছে অপেক্ষা করবে ফোর্ড, আর রানা কি করছে দেখার জন্যে পাশের রাস্তা ধরে ফিরে আসবে ওপেল।

এই পরিস্থিতিতে সেটা করাই নিয়ম। নিয়মটা ওরা মেনে চলবে বলে আশা করল রানা, তা না হলে ওর কৌশল কাজে লাগবে না।

গাড়ির পিছন থেকে একটা কোলাপসিবল ওয়ার্নিং ট্রায়াঙ্গল বের করে অফসাইড রিয়্যার হুইলের পিছনে দাঁড় করল রানা। হাইওয়ের উল্টোদিক দিয়ে ছুটে গেল ওপেল। হাসি চাপল রানা, ওরা নিয়ম ধরেই কাজ করছে। শান্তভাবে হাঁটতে শুরু করল ও।

হাইওয়ে থেকে নেমে এসে প্রথম যে বাসটা পেল তাতে চড়ে একটা শহরে পৌঁছল রানা। পথে এক এক করে তিনটে গাড়িকেই দেখতে পেল।

শহর থেকে ট্যাক্সি নিল রানা, নিজের গাড়ির কাছাকাছি কিন্তু হাইওয়ের উল্টোদিকে নামল ও। ওকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল ওপেল, কিন্তু ফোর্ড ওর দু'শো গজ পিছনে রাস্তার এক ধারে দাঁড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ ছুটতে শুরু করল রানা।

সিঁড়ি বেয়ে ওভারব্রিজে উঠে এল ও। আরেক প্রস্থ সিঁড়ি ভেঙে হাইওয়ের আরেকদিকে, নিজের গাড়ির কাছে নামল। একটু হাঁপিয়ে গেছে ও, কপালে ঘাম। ছুটতে শুরু করার পর দু'মিনিট হয়েছে, গাড়িতে চড়েই স্টার্ট দিল।

ফোর্ড থেকে নেমে একজন লোক ওর পিছু নিয়েছিল, কিন্তু ওকে ধরা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে বোকার মত মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ফোর্ড ছুটতে শুরু করল। চলন্ত গাড়িতে উঠে পড়ল লোকটা। স্পীড বাড়িয়ে দিল ড্রাইভার।

মুচকি একটু হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। সব ক'টা গাড়ি এখন হাইওয়ের উল্টোদিকে, ওর পিছু নিতে হলে পাঁচ মাইল এগিয়ে পরবর্তী বাঁকে পৌঁছে গাড়ি ঘোরাতে হবে ওদেরকে। ঘণ্টায় যাট মাইল গতিতে গাড়ি চালালেও দশ মিনিট লেগে যাবে ওদের। তারমানে, ওদের চেয়ে বেশ অনেকটা এগিয়ে থাকল রানা। আর কোন উপায় নেই ওকে ধরার।

প্যারিসের দিকে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে গুন গুন করে উঠল রানা। লন্ডনের ফুটবল স্টেডিয়ামে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটা গানের সুর ভাঁজতে লাগল ও—'ইজি, ইজি, ইইইই-জিইইই।'

ছয়

ইসরায়েল অ্যাটম বোমা বানাতে যাচ্ছে শুনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল ওয়াশিংটনে। ফরেন মিনিস্ট্রির আতঙ্ক, খবরটা আরও আগে কেন তারা পায়নি। সি. আই. এ-র আতঙ্ক, তারা সবার আগে কেন শুনল না। কংগ্রেসের আতঙ্ক, কে দায়ী এই নিয়ে ফরেন মিনিস্ট্রি আর সি.আই.এ.-র মধ্যে যে ঝগড়াটা লাগবে সেটা মেটাবার ঝামেলা তাকেই ভোগ করতে হবে।

নিজেদের ভেতর ফাঁক আর ফাঁকি যাই থাক, খবরটা পরিবেশনের সময় অত্যন্ত চাতুর্যের পরিচয় দিল ইসরায়েল। জানাল, বন্ধু যুক্তরাষ্ট্রকে এই গোপন প্রজেক্টের কথা জানাবার ব্যাপারে ইসরায়েলের কোন বাধ্যবাধকতা নেই, এবং যে টেকনিক্যাল সাহায্য তারা চাইছে সেটা পাওয়ার ওপরই যে তাদের সফলতা নির্ভর করছে তা মনে করারও কোন কারণ নেই। তাদের বলার ধরনটা ছিল অনেকটা এই রকম—'ও, হ্যাঁ, ভাল কথা, আমরা এই রিয়্যাক্টর তৈরি করছি কিছু প্লুটোনিয়াম পাবার জন্যে, যা দিয়ে অ্যাটম বোমা বানিয়ে আরব রাষ্ট্রগুলোকে শায়েস্তা করা যাবে। এখন তোমরা আমাদেরকে সাহায্য করবে, না করবে না?' খবরটা অত্যন্ত হালকা ভঙ্গিতে পরিবেশন করা হলো একটা রুটিন মীটিঙের সময়। মার্কিন মিডল ঈস্ট ডেস্কের ডেপুটি চীফ আর ইসরায়েলী অ্যামব্যাসাডরের মধ্যে প্রতি মাসেই এই মীটিং বসে।

ওই একই দিন আরও একটা খবর এসে পৌঁছল সি.আই.এ. হেডকোয়ার্টারে। জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স আর সি.আই.এ.-র মধ্যে নিয়মিত তথ্যাদি বিনিময় হয়ে থাকে, সেই সূত্র ধরে জানানো হলো, মাসুদ রানা নামে একজন বাংলাদেশী

এজেন্টকে লুক্সেমবার্গে দেখা গেছে। ইসরায়েলের অ্যাটমবোমা বানাবার খবরটা এখনও গরম, কাজেই এই নতুন খবরটা তেমন কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করল না। কিন্তু একজন লোক দুটো খবরের মধ্যে একটা সম্পর্ক থাকতে পারে বলে সন্দেহ করে বসল।

তার নাম জ্যাক রিচি।

ছাত্র জীবনের বন্ধু বলে নয়, নিজে একজন স্পাই বলেও নয়, রানা অত্যন্ত বিপজ্জনক এজেন্ট বলেই তার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে আসছে জ্যাক রিচি। রানার ওপর কিছু ব্যক্তিগত আক্রোশ তার আছে বটে, কিন্তু প্রতিশোধ নেবার সুযোগ একদিন এসে যাবে এটা সে ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি। আজ হঠাৎ করে একটা সুযোগ উঁকি দিচ্ছে উপলব্ধি করে ধৈর্য ধরার সিদ্ধান্ত নিল সে। ইসরায়েলী বোমার ব্যাপারে মিডল ঈস্ট পলিটিক্যাল কমিটি মীটিঙে বসেছে, তার ফলাফল কি হয় দেখা যাক আগে।

কম্পিউটর থেকে রানার ডোশিয়ার নিয়ে নতুন করে তাতে মন দিল রিচি।

মিডল ঈস্ট পলিটিক্যাল কমিটির বৈঠক সেদিনই শুরু হলো। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের লোকজন তো থাকলই, বৈঠকে আরও থাকল সি.আই.এ. এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা। দু'বার বিরতি নিয়ে প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে চলল গোপন বৈঠক।

সি.আই.এ.-র ভূমিকা হলো ইসরায়েলী বোমার বিরুদ্ধে, কারণ তাতে করে কাজের মাত্রা তাদের অনেক বেড়ে যাবে। আর সেই একই কারণে ইসরায়েলী বোমার পক্ষে কথা বলল ফরেন মিনিস্ট্রি, এতে করে তাদের কাজ আর প্রভাব দেখাবার সুযোগ সৃষ্টি হবে। কংগ্রেসের ভেতর ইসরায়েলী লবি সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী, কাজেই তাদের সমর্থনটা খুব জোরাল হলো। শেষ বিরতির একটু আগে কে.জি.বি. আর সোভিয়েত সরকারের প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে সে-বিষয়েও আলোচনা হলো। ইসরায়েলের দেখাদেখি মিশর যদি অ্যাটম বোমা তৈরি করতে চায়, সোভিয়েত সরকার তাকে সাহায্য করবে না ধরে নিয়ে প্রতিনিধিরা প্রচুর আত্ম-প্রসাদ লাভ করল। এই সময় সাদা অ্যাপ্রন পরা একটা মেয়ে ঢুকল কামরায়, একটা ট্রলি ঠেলে নিয়ে এল সে। চা খাবার ফাঁকে একজন কংগ্রেস সদস্য একটু রসিকতা করলেন। কে.জি.বি. প্রসঙ্গে আলাপ হচ্ছিল, কৌতুকটা তাদের নিয়েই। কে. জি. বি.-র একজন ক্যাপ্টেন, তার নাবালক ছেলেটি বোকার একেবারে হদ্দ। পার্টি, মাতৃভূমি, ইউনিয়ন আর জনতা—এগুলো বলতে কি বোঝায়, শত চেষ্টা করেও তার মাথায় ঢোকানো যায় না। ক্যাপ্টেন একদিন তার ছেলেটিকে বলল, বাবাকে পার্টি হিসেবে, মাকে মাতৃভূমি হিসেবে, পিতামহকে ইউনিয়ন হিসেবে আর নিজেকে জনতা হিসেবে কল্পনা করো। কিন্তু তাতেও ছেলেটি বুঝল না। রেগে গিয়ে ক্যাপ্টেন করল কি, শোবার ঘরের ওয়ার্ডরোবে বন্দী করে রাখল তাকে। সেই রাতে ছেলেটি তখনও ওয়ার্ডরোবে আটকা রয়েছে, ক্যাপ্টেন তার স্ত্রীর সাথে প্রেমে মত্ত হলো। কী-হোল দিয়ে দৃশ্যটা দেখতে পেয়ে ছেলেটি বলে উঠল, 'এবার আমি বুঝতে পেরেছি! পার্টি মাতৃভূমিকে রেপ করে, ওদিকে ইউনিয়ন নাক ডেকে ঘুমায়, আর দাঁড়িয়ে থেকে ভুগতে হয় জনতাকে।'

প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ল সবাই। সাদা অ্যাপ্রন পরা মেয়েটি কৃত্রিম অসন্তোষের সাথে মাথা নাড়তে লাগল।

আবার আলোচনা শুরু হতে প্রশ্ন উঠল, যুক্তরাষ্ট্র যদি ইসরায়েলকে টেকনিক্যাল সাহায্য দিতে অস্বীকার করে, ওরা কি আদৌ বোমা বানাতে পারবে? কংগ্রেস প্রতিনিধি জানাল, সঠিক উত্তর দেয়ার মত যথেষ্ট তথ্য আমাদের জানা নেই। তবে, প্রচলিত ধারণা হলো, টেকনিক্যালি, কনভেনশনাল বোমা বানানো যতটা কঠিন অ্যাটম বোমা বানানো তারচেয়ে বেশি কঠিন নয়। ধরে নেয়া যেতে পারে, অ্যাটম বোমা বানাবার মত টেকনিক্যাল নো-হাউ ইসরায়েলের জানা আছে। ফরেন মিনিস্ট্রির তরফ থেকে বলা হলো, কাজটা ওরা আমাদের সাহায্য ছাড়াই করতে পারবে এটা ধরে নেয়াই ভাল। তবে আমরা সাহায্য না করলে ওদের হয়তো শেষ করতে কিছু বেশি সময় লাগবে। এরপর সি.আই.এ. প্রতিনিধিকে জিজ্ঞেস করা হলো, অ্যাটম বোমা বানাতে হলে ইসরায়েলের প্লুটোনিয়াম দরকার, সেটা কি তাদের আছে? উত্তর হলো, জানা নেই।

শেষ পর্যন্ত একঘেয়ে হয়ে উঠল আলোচনাটা। সভাপতি বললেন, 'এতক্ষণ যা আলোচনা হলো তা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি, ইসরায়েল আমাদের সাহায্য ছাড়াই অ্যাটম বোমা বানাতে পারবে। তাদেরকে সাহায্য করাটাই বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে। বিশেষ করে, তার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের যা সম্পর্ক, তার কোন কাজে বাধা দেয়ার রীতি আমরা চালু করতে পারি না। তবে,' এইটুকু বলে নাটকীয় ভঙ্গিতে বেশ লম্বা একটা বিরতি নিলেন তিনি, তারপর বললেন, 'ওরা যদি বোমা তৈরি করেই, সেই বোমার ট্রিগারে যুক্তরাষ্ট্রের আঙুল থাকাই সবদিক থেকে কল্যাণকর হবে।'

এ ব্যাপারে একমত হলো সবাই।

মীটিং শেষ হবার ঠিক আগের মুহূর্তে সি.আই.এ. প্রতিনিধি এবং জ্যাক রিচির বস্ জানাল, ইসরায়েলের দেখাদেখি মিশরও অ্যাটম বোমা তৈরি করতে পারে, এটা শুধু একটা কথার কথা নয়—কিছু ঘটনা দেখে মনে করার কারণ ঘটেছে, ইতোমধ্যে তারা কাজও শুরু করে দিয়েছে। মিশরীয় সিক্রেট সার্ভিস চীফের ঢাকা সফর এবং মাসুদ রানা নামে একজন বাংলাদেশী এসপিওনাজ এজেন্টের লুক্সেমবার্গ উপস্থিতি, এই ঘটনা দুটো উল্লেখ করল সে। কিন্তু এই ব্যাপারটা নিয়ে বিশেষ একটা মাথা ঘামাল না সভা। মিশর এতটা অ্যাডভান্স হয়নি যে চাইলেই অ্যাটম বোমা বানাতে পারবে, সবারই প্রায় এই রকম ধারণা। তবু, সন্দেহ যখন হয়েছে, খবর নিয়ে দেখা যেতে পারে। দায়িত্বটা সি.আই.এ-র ওপরই চাপানো হলো। সি.আই.এ. প্রতিনিধি সিদ্ধান্ত নিল, রিচির যখন এত আগ্রহ, তদন্ত করার জন্যে তাকেই পাঠানো হবে।

এর খানিক পর মীটিঙের সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো।

মেজাজ বিগড়ে আছে মিশরীয় সিক্রেট সার্ভিস চীফের। রানার ওপর রেগে আছেন তিনি। রেগে আছেন অ্যামবুসির ওপরও। কি ঘটছে জানতে না পারলে একটুতেই রেগে উঠেন তিনি। কিন্তু রাগ তাঁর বুদ্ধি আর বিবেচনা বোধকে ঘোলা করে দেয়

না।

রোমে কেন দেখা করতে বলেছে অ্যামবুসি সেটা তিনি বুঝতে পারেন—জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের বিরাট একটা টীম আছে এখানে, তাই নিজের আসার ব্যাপারে সহজেই একটা অজুহাত তৈরি করা সম্ভব—কিন্তু তাই বলে একটা বাথহাউসে কেন দেখা করতে হবে, সেটা তিনি বুঝতে পারেন না।

লোকজনের সামনে খালি গা হতে পছন্দ করেন না তিনি। অথচ রোমে এসে এখন তাকে ঠিক তাই করতে হচ্ছে। কোমরে বিশাল একটা তোয়ালে জড়িয়ে স্টীমরুমে দাঁড়িয়ে আছেন, আয়নায় নিজেকে একটা কিম্ভূতকিমাকার ভাঁড় ছাড়া কিছুই মনে হচ্ছে না। যতটা সম্ভব ছদ্মবেশ নিয়ে আছেন বটে, কিন্তু কাঁচাপাকা বুকের লোম ঢাকতে না পারায় দারুণ অস্বস্তি বোধ করছেন। অ্যামবুসিকে প্রথম তিনি আয়নাতেই দেখতে পেলেন। সে-ও কোমরে শুধু একটা তোয়ালে জড়িয়ে আছে। স্টীল রিমের চশমাটা খোলেনি। আলি কারাম লক্ষ্য করলেন, অ্যামবুসির বুকে লোমের কোন বালাই নেই। তার কাছ থেকে নিঃশব্দ ইঙ্গিত পেয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, দু'জন পাশাপাশি হেঁটে একটা প্রাইভেটরুমে ঢুকলেন, পরিপাটি একটা বিছানা দেখা গেল এক ধারে। অচেনা লোকদের দৃষ্টি এড়াতে পেরে খানিকটা স্বস্তি বোধ করলেন তিনি, কিন্তু সেই সাথে খবর কি জানার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলেন। বোতাম টিপে একটা মেশিন চালু করল অ্যামবুসি, তাতে থরথর করে কাঁপতে শুরু করল বিছানা। মেশিনটা গোঁ গোঁ আওয়াজ করতে লাগল, এই আওয়াজটাই ওদের দরকার—এখানে আড়িপাতা যন্ত্র থাকলেও ওদের কথাবার্তা কিছুই রেকর্ড হবে না। আলি কারাম বসলেন না, অ্যামবুসিও দাঁড়িয়ে থাকল। শরীরটা ঘুরিয়ে নিলেন আলি কারাম, যাতে করে অ্যামবুসির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেন।

'নেগেভের ডায়মোনায় একজন লোককে ঢুকিয়েছি আমি,' বলল অ্যামবুসি।

'গুড,' গম্ভীর সুরে বললেন আলি কারাম। পরম স্বস্তির সাথে অনুভব করলেন, বিরাট একটা দুশ্চিন্তার বোঝা তাঁর কাঁধ থেকে নেমে গেল। 'কিন্তু সম্ভব হলো কিভাবে? তোমার ডিপার্টমেন্ট তো এই প্রজেক্টের সাথে জড়িত নয়।'

'মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে আমার এক শ্যালক আছে।'

'নাম?'

'চাইম মেয়ারসন।'

'কিছু জানতে পেরেছে সে?' জিজ্ঞেস করলেন আলি কারাম।

'নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে গেছে। রিয়্যাক্টর যে ঘরে বসানো হবে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ব্লক, স্টাফ কোয়ার্টার আর একটা এয়ারস্ট্রিপ। তুমি যতটা ভেবেছিলে তারচেয়ে অনেক এগিয়ে আছে ওরা।'

'রিয়্যাক্টর কতদূর? সেটাই আসল কথা।'

'এখনও কাজ চলছে। ঠিক কতদিন লাগবে বলা কঠিন।'

'আসলে কি ওরা ম্যানেজ করতে পারবে?' অনেকটা আপনমনে বললেন আলি কারাম। 'আমি বলতে চাইছি, ওই সব জটিল কন্ট্রোল সিস্টেম...'

'ঘটনা আরেকটু গড়িয়েছে।' বরাবরের মত শান্ত এবং নিরুদ্বিগ্ন দেখাল

অ্যামবুসিকে। 'চাইম মেয়ারসন দেখেছে, মার্কিনীরা গিজ গিজ করছে ওখানে।'

'সর্বনাশ!'

'এর মানে হলো, সমস্ত সফিসটিকেটেড ইলেকট্রোনিক যন্ত্রপাতি পেয়ে গেছে ওরা।'

ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন আলি কারাম। 'খারাপ খবর, অত্যন্ত খারাপ খবর,' বিড়বিড় করে বললেন তিনি।

'এরচেয়েও খারাপ খবর—তোমার মাসুদ রানা ফাঁস হয়ে গেছে।'

বজ্রাহতের মত অ্যামবুসির দিকে তাকিয়ে থাকলেন আলি কারাম। 'ফাঁস হয়ে গেছে? কি বললে? রানা ফাঁস হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'মাই গড! কিভাবে?'

'লুক্সেমবার্গে আমাদের একজন এজেন্টের চোখে পড়ে গেছে সে।'

'ওখানে কি করছিল সে?' অযথা চটে উঠলেন আলি কারাম।

'তুমিই ভাল জানো।'

'ব্যাপারটা একটু খুলে বলো, অ্যামবুসি।'

'আমাদের এজেন্টের সাথে হঠাৎ করে দেখা হয়ে গেছে মাসুদ রানার। আমাদের লোকটা কেউকেটা গোছের কেউ নয়, কিন্তু তার কাছ থেকে রানা নামটা শুনে আমরা...'

'রানা কি স্বনামে...?'

'মনে হয় না,' বলল অ্যামবুসি। 'এই ন্যাট কোহেন রানার ছাত্র-জীবনের পরিচিত ছিল।'

'হুঁ।'

'রানাকে চোখে চোখে রাখার ব্যবস্থা করে সি.আই.এ.-কে খবর দিই আমরা। আমাদের লোককে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে গেছে সে, কিন্তু আমাদের সাথে তাল মিলিয়ে আবার তাকে খুঁজে বের করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে সি.আই.এ.।'

সাদা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে থাকলেন আলি কারাম। ইচ্ছে হলো, ভোঁতা একটা কিছু দিয়ে অ্যামবুসির মাথায় প্রচণ্ড এক ঘা বসিয়ে দেন। ইচ্ছে হলো, রানাকেও একহাত নেন। হাত দিয়ে কিছু একটা ছুঁড়ে মারার ভঙ্গি করলেন তিনি। 'চমৎকার! রিয়্যাক্টর তৈরির কাজে ইসরায়েল এগিয়ে গেছে, যুক্তরাষ্ট্র তাদেরকে সাহায্য করছে, রানা আর গোপন নেই, সি.আই.এ. তার পিছু লেগেছে! এর পরের বার দেখা হলে তুমি বলবে, ওরা অ্যাটম বোমা বানিয়ে ফেলেছে। অথচ আমাদের হাত থাকবে খালি।' চেয়ার ছেড়ে নিজের অজান্তেই উঠে দাঁড়ালেন আলি কারাম। দু'হাত দিয়ে চেপে ধরলেন অ্যামবুসির দুই কাঁধ। 'ওদেরকে তুমি কাছ থেকে দেখছ—বলো, ওই বোমা ওরা কি আমাদের ওপর ফেলবে? আমি বলি, ফেলবে। কি, বাজি ধরতে চাও?'

'গলা নামাও,' শান্ত সুরে বলল অ্যামবুসি। কাঁধ থেকে আলি কারামের হাত দুটো আস্তে করে নামিয়ে দিল সে। 'কে জিতবে সেটা এখুনি বলা যায় না। দু'পক্ষকেই আরও অনেক লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে।'

মুখ.ফিরিয়ে নিয়ে লে. জেনারেল আলি কারাম বললেন, 'তা বটে।' মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়েছেন তিনি।

'রানার সাথে যোগাযোগ করে তাকে সাবধান করে দিতে হবে,' বলল আমবুসি। 'কোথায় সে?'

'জানলে তো!'

ভাড়া করা গাড়ির নম্বর জানা আছে ওদের, কাজেই প্যারিসে পৌঁছে সেটা বদল করতে হলো রানাকে। ইতোমধ্যে নিশ্চয়ই গরু-খোঁজা শুরু করে দিয়েছে ইসরায়েলী এজেন্টরা, ইউরোপের প্রায় সবগুলো বড় এয়ারপোর্টে লোক থাকবে ওদের। কোন ঘটনা ছাড়াই বাই রোড লুক্সেমবার্গে ফিরে এল রানা।

বিকেল থাকতে থাকতেই সেই নাইটক্লাবে পৌঁছল ও। একা একটা টেবিলে বসে বিয়ারের অর্ডার দিল। বগা নয়, প্রথমে এল পদ্মিনী। হাঁটু ঢাকা কালো ঢোলা গাউন আর সাদা ব্লাউজ পরেছে, মাথা আর কাঁধ নীল স্কার্ফ দিয়ে আড়াল করা। কিন্তু কাপড় দিয়ে নিজেকে যতই বদলাবার চেষ্টা করুক, সে যে অপরূপ সুন্দরী সেটা এক নজর তাকালেই বোঝা যায়। মনে মনে স্বীকার করল রানা, এই রকম একটা মেয়ের সঙ্গ পাওয়া ভাগ্যের কথা। কিন্তু যেই বগার চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠল অমনি মেয়েটার ওপর বিরূপ হয়ে উঠল মন। এমন আগুন জ্বালানো যৌবন আর ভুবন ভোলানো রূপ তোর, শেষ পর্যন্ত মজলি কিনা বাঁকাচোরা বেঢপ এক তালপাতার সেপাইয়ের সাথে!

কেবিনে ঢুকে দরজার দিকে পিছন ফিরে বসল পদ্মিনী। প্রেমটা যে দু'তরফ থেকেই গভীর সেটা একটু পরেই বোঝা গেল। পদ্মিনী কোন অর্ডার দিল না, অথচ কেবিনে শ্যাম্পেনের বোতল আর দুটো গ্লাস রেখে এল ওয়েটার। একটা সিগারেট ধরাল পদ্মিনী, কিন্তু শ্যাম্পেন ছুঁলো না। বগার জন্যে অপেক্ষা করছে সে। রানার মনে পড়ল, বগাও ঠিক তাই করেছিল।

পনেরো মিনিট পর বগা এল। খুব তাড়াহুড়ো করে ঢুকল সে, কোন দিকে তাকাল না। দরজার দিকে মুখ করে মেয়েটার সামনে বসল। চেয়ারে পিঠ দিয়ে ছিল পদ্মিনী, টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ল সে। দুই কপাল ছুঁই ছুঁই অবস্থা। রানার টেবিল খুব একটা দূরে নয়, ওদের হাসির শব্দ বেশ ভালই শুনতে পেল ও। লুকিয়ে প্রেম করছে ওরা, জানলে কে কি বলবে সেটা পরের কথা, কিন্তু এই মুহূর্তে ওরা দু'জন সুখী। ওদের সুখ কেড়ে নেবার জন্যে তৈরি হলো রানা।

একজন ওয়েটারকে ডেকে বলল ও, 'ওই কেবিনের সাদা সোয়েটার পরা ভদ্রলোককে এক বোতল শ্যাম্পেন আর এখানে আমাকে আরেকটা বিয়ার দাও।'

রানাকে বিয়ার দিয়ে তারপর শ্যাম্পেন নিয়ে কেবিনে ঢুকল ওয়েটার। ওয়েটারের কথা শুনে বগা আর পদ্মিনী দু'জনেই তাকাল রানার দিকে। বিয়ারের গ্লাসটা তুলে ওদের উদ্দেশে নাড়ল রানা, হাসল। রানাকে দেখে চিনতে পেরেই কালো হয়ে গেল বগার চেহারা।

টেবিল ছেড়ে উঠতে যাবে রানা, এই সময় দেখল কেবিন থেকে বেরিয়ে আসছে বগা। এদিকে আসতে পারে ভেবে টেবিল ছাড়ল না রানা, কিন্তু সোজা

গিয়ে টেলিফোন বুদে ঢুকল বগা। চিন্তায় পড়ে গেল রানা। পুলিস ডাকছে নাকি? কথাটা মনে হতেই হাসি পেল ওর। বোকার মত এমন কিছু করবে না বগা যাতে ওদের গোপন প্রেম ফাঁস হয়ে যায়। তাহলে?

বুদ থেকে বেরিয়ে কেবিনে ফিরল বগা। ইতোমধ্যে ভুলেও সে রানার দিকে তাকায়নি। অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল রানা, দেখা যাক কি হয়।

পনেরো মিনিট পর কালো ট্রাউজার আর লাল জ্যাকেট পরা একজন বক্সার ঢুকল নাইটক্লাবে। শরীরের গঠন আর হাঁটার ভঙ্গি দেখেই লোকটার পেশা কি বুঝে ফেলল রানা, সেই সাথে আন্দাজ করল, টেলিফোনে একেই ডেকেছে বগা। বন্ধু-বান্ধব কেউ হবে আর কি।

ধারণা মিথ্যে নয়। সোজা বগাদের কেবিনে গিয়ে ঢুকল বক্সার। খালি চেয়ারে না বসে বসল সেটার হাতলে। রানা দেখল, বগার মুখ নড়ছে, কিন্তু কান বগার দিকে থাকলেও কেবিনের বাইরেটা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে নিচ্ছে বক্সার। শেষ পর্যন্ত চোখাচোখি হলো রানার সাথে, দুইজনের দৃষ্টি পরস্পরের সাথে আটকে গেল।

একটু দুর্বলতা দেখানো দরকার, মনে হতেই চোখ নামিয়ে নিল রানা, তারপর টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। চেহারায় একটু উদ্বেগের ভাব ফুটিয়ে ক্লোক-রুমে গিয়ে ঢুকল ও। সময় পার করার জন্যে হাত-মুখ ধুতে শুরু করল। দু'মিনিট পর বগার বন্ধু ঢুকল ক্লোক-রুমে। আরও একজন লোক রয়েছে, সে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আয়নায় দেখল সে। তারপর রানার সামনে এসে দু'কোমরে হাত রেখে দাঁড়াল। বাঁকা ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের ক্ষীণ হাসি নিয়ে বলল সে, 'আমার বন্ধু চায় ওকে যেন তুমি আর বিরক্ত না করো।'

ওদের একজনকে ক্লোক-রুমে নিয়ে আসা গেছে, কাজেই অভিনয় করার আর দরকার নেই, শরীরটা সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়ে কঠিন সুরে বলল রানা, 'যাও। বগলাটাকে পাঠিয়ে দাও। কিছু যদি বলার থাকে, সরাসরি আমাকে এসে বলুক।'

একটু আগে রানা যা করেছে, বক্সারও ঠিক তাই শুরু করল—অভিনয়। মুহূর্তের জন্যে একটু কৌতুকের ভাব ফুটে উঠল তার চেহারায়, যেন রানার স্পর্ধা তার মজার খোরাক যুগিয়েছে। তারপর কৃত্রিম গোবেচারা ভঙ্গিতে বলল সে, 'বলছিলাম কি, তুমি তো একজন জার্নালিস্ট, তাই না? তোমার এডিটর যদি এসব শোনে, সেটা কি তোমার জন্যে ভাল হবে?'

'আমার নয়, বন্ধুর কিসে ভাল হয় সেটা চিন্তা করো।'

রানার দিকে আরও এক পা এগিয়ে এল বক্সার। লম্বায় ছ'ফিটের বেশি হবে তো কম নয়, চওড়ায় রানার দেড় গুণ। 'ঝগড়া-ঝাঁটি পছন্দ করি না আমরা, আমাদের না ঘাঁটালে ক্ষতি কি?' গলায় আপসের সুর। 'কি চাই তোমার, বলো।'

'তোমাকে বলব না। বগলাকে পাঠিয়ে দাও।'

'তুমি আমার বন্ধুর ক্ষতি করতে চাও?'

নিষ্ঠুর হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে। 'এতক্ষণে বুঝলে?'

'ওরে শালা!' পরমুহূর্তে বিদ্যুৎ খেলে গেল বক্সারের শরীরে। প্রথমে হাঁটু চালাল সে। ইচ্ছে, তলপেটে হাঁটুর প্রচণ্ড গুঁতো খেয়ে যেই বাঁকা হয়ে যাবে রানা অমনি

তার নাকে একটা পাঞ্চ কষাবে।

অনায়াস ভঙ্গিতে শরীর ঘুরিয়ে হাঁটুর গুঁতোটা নিতম্বে নিল রানা। বক্সারের চেহারায় তাজ্জব একটা ভাব ফুটে উঠতে শুরু করেছে, এই সময় ধনুকের মত বাঁকা একটা পথ ধরে ছুটে এল রানার পাঞ্চ। ঝট করে মুখ সরিয়ে নিল বক্সার, কিন্তু হিতে বিপরীত হলো তাতে। পাঞ্চটা লাগত কানের পাশে, লাগল দুই চোখের মাঝখানে নাকের ওপর। চোখে অন্ধকার দেখল বক্সার, তাকে সামলে ওঠার সময় না দিয়ে আরও দুটো ঘুসি মারল রানা, দুটোই তলপেটে। দু'হাত দিয়ে নাক চেপে ধরা অবস্থায় মেঝেতে পড়ে গেল সে, আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে।

এর বেশি আর দরকার নেই। টাই আর চুল ঠিক করে নিতে শুরু করে তাড়াতাড়ি ক্লোক-রূম থেকে বেরিয়ে এল রানা। ইতোমধ্যে ক্যাবারে ড্যান্স শুরু হয়েছে। এক নারী-দেহ লোলুপ অথর্ব বুড়োর হাস্যকর আচরণকে বিষয় করে লেখা একটা গানের সুর বাজাচ্ছে জার্মান গিটারিস্ট। বিল মিটিয়ে দিয়ে নাইট ক্লাব থেকে বেরিয়ে এল রানা। বেরোবার আগে লক্ষ্য করল, চেহারায় রাজ্যের উদ্বেগ নিয়ে হন হন করে ক্লোক-রূমের দিকে এগোচ্ছে বগা। কেবিনে পদ্মিনী নেই।

ওখান থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করল রানা। বগা বা তার বক্সার বন্ধু ক্লোক-রূমের ঘটনাটা পুলিসকে জানাবে না বলে আশা করল ও। ক্লাব ম্যানেজমেন্ট পুলিসী হাঙ্গামায় জড়াতে চাইবে না, কাজেই বগাদের অনুরোধ তারা রাখবে। বগা তার বন্ধুকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে, বলবে, দরজার সাথে ধাক্কা খেয়ে এই অবস্থা হয়েছে।

ইচ্ছে হলো একটা সিগারেট কিনে ধরায়, কিন্তু নিজের নিষেধ অমান্য করলে নিজের কাছে ছোট হয়ে যাবে বলে ইচ্ছেটাকে গলা টিপে মারল রানা। আসলে, ভাবল ও, এ-ধরনের বাজে কাজ না করে স্পাই হবার কোন উপায় নেই। সেই সাথে এ-ও সত্যি, আজকালের দুনিয়ায় স্পাইং ছাড়া কোন দেশের টিকে থাকার কোন উপায়ও নেই।

দেখেশুনে মনে হয় মর্যাদা আর সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকবে তুমি সেটি সম্ভব নয়। আজ যদি সে এই পেশা ছেড়ে দেয়, তার জায়গায় অন্যেরা এসে এই একই বাজে কাজ করবে, সেটা হবে প্রায় এখনকার মতই খারাপ। বেঁচে থাকতে হলে সময়ে তোমাকে খারাপ হতেই হবে।

অনেক আগেই উপলব্ধি করেছে রানা, তুমি ভাল কি মন্দ সেটা কোন ব্যাপার নয়। হার অথবা জিত, হিসেবের মধ্যে এই দুটোকেই ধরা হয়। তবু, এমন এক একটা সময় আসে যখন এই সব দর্শন ওকে কোন রকম সান্ত্বনা দিতে পারে না।

এ-রাস্তা সে-রাস্তা ঘুরে খানিকটা সময় কাটাল রানা। তারপর রাস্তা বদলে রওনা হলো বগার বাড়ির দিকে। মনে আতঙ্ক থাকতে থাকতেই সুবিধেটুকু আদায় করতে হবে। কাঁকর ছড়ানো চওড়া রাস্তায় পৌঁছে দেখল, বগার তিন তলার ফ্ল্যাটে আলো জ্বলছে না।

রাস্তার এপারে পরিবহন সংস্থার নির্জন যাত্রী-ছাউনি, তার এক কোণে দাঁড়াল রানা। শীত শীত লাগছে অনুভব করে পায়চারি শুরু করল ও। অবশেষে বগা আর তার বন্ধুকে আসতে দেখা গেল। বক্সারের কপালে ব্যান্ডেজ, চোখেও বোধহয় ভাল

দেখতে পাচ্ছে না। অন্ধ লোকের মত পিছন থেকে বগার একটা কাঁধে হাত রেখে হাঁটছে সে। বাড়ির সামনে দাঁড়াল ওরা। পকেটে হাত ভরে চাবি বের করছে বগা। রাস্তা পেরিয়ে ওদের দিকে এগোল রানা। ওর দিকে পিছন ফিরে রয়েছে ওরা, রানার জুতো কোন আওয়াজ তুলল না।

দরজা খুলে বন্ধুকে সাহায্য করার জন্যে পিছন ফিরল বগা, সেই সাথে রানাকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠল। 'ওই দেখো, এখানেও চলে এসেছে!'

বক্সার অস্থির হয়ে উঠল। 'কি বলছ?'

'সেই লোকটা!'

'তোমার সাথে আমার কথা আছে,' বলল রানা।

'পুলিস ডাকো,' ফিসফিস করে বলল বক্সার।

বন্ধুর হাত ধরে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করল বগা। তার ঘাড়ে হাত দিয়ে তাকে থামাল রানা। 'আমাকেও ভেতরে নিয়ে চলো, তা না হলে দু'জনকেই মেরে তক্তা বানিয়ে ছাড়ব।'

রানার দিকে ফিরল না বক্সার, কিন্তু কথাগুলো ওকেই বলল, 'আমাদের অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে, তারা খবর পেলে তোমার আর রেহাই নেই, জার্নালিস্ট!'

বগার পাঁজরে কনুই দিয়ে হালকা গুঁতো দিল রানা, 'আমি শুধু তোমার কথা শুনতে চাই।'

'এর সাথে গোলমাল করে লাভ নেই,' বন্ধুকে বলল বগা। 'বোঝাই যাচ্ছে, ব্ল্যাকমেইল করতে চায়। জিজ্ঞেস করো, কত টাকা?'

'টাকা নয়, ব্ল্যাকমেইলও নয়,' বলল রানা। 'কি, সেটা একটু পর বলছি।' ওদেরকে পাশ কাটিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল ও, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল।

কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করে রানাকে অনুসরণ করল ওরা।

তিনতলায় উঠে নিজের ফ্ল্যাটের দরজা খুলল বগা। ব্যাচেলারদের কামরা সাধারণত সাজানো-গোছানো হয় না, এটা ঠিক তার উল্টো। ফার্নিচারগুলোও বেশ দামী। বলতে হলো না, বগা নিজেই দরজা বন্ধ করল। বন্ধুকে একটা চেয়ারে বসিয়ে পাশের চেয়ারটায় নিজে বসল। দু'জনেই তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'আমি একজন জার্নালিস্ট,' বলল রানা।

বাধা দিয়ে বগা বলল, 'জার্নালিস্টরা খবর সংগ্রহ করে, লোকজনকে মারধর করে না।'

'দু'একটা ঘুসি দেয়াকে মারধর করা বলে না।'

'ঘুসিই বা কেন মারবে তুমি?'

আশ্চর্য হয়ে বলল রানা, 'তোমাকে বলেনি? ও-ই তো প্রথম আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল!'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে...আমার পিছনে কেন লেগেছ সেটা শুনতে চাই।'

'তোমার একার নয়, তোমার আর তোমার সুন্দরী প্রেমিকার পেছনে লেগেছি আমি,' ভুল শুধরে দিয়ে বলল রানা।

'কারণ?'

'ইউরাটম সম্পর্কে আমি একটা রিপোর্ট তৈরি করতে চাই। ভাল একটা গল্প

যোগাড় করতে না পারলে আমার ক্যারিয়ার নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু. এর চেয়ে ভাল কোন সাবজেক্ট পেলেও আমার চলবে। সিনিয়র একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের স্ত্রীর সাথে সহকারী হেড ক্লার্কের গভীর প্রেম. সাবজেক্ট হিসেবে এটাও মন্দ নয়।'

দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল বক্সার। বগাকে বলল. 'আমি বলছি. পুলিসে খবর দেয়াই ভাল।'

'তুমি চুপ করো!' বলে মাথার চুলে আঙুল চালাতে শুরু করল বগা। 'ও কি চায় বুঝতে পারছি আমি।'

'কি?'

'ইনফরমেশন।'

'ঠিক ধরেছ,' বলল রানা। লক্ষ্য করল, বগার চেহারায় স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ রানাকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করল বগা, 'ঠিক কি চাও তুমি?'

'সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রের ফিশনেবল মেটিরিয়াল কোথায় কি অবস্থায় আছে, কোত্থেকে কোথায় যাচ্ছে ইত্যাদি বিষয়ে রেকর্ড রাখে ইউরাটম, ঠিক?'

'রাখে।'

'ক থেকে খ-য়ে যদি এক আউন্স ইউরেনিয়ামও সরাতে হয়, তোমাদের অনুমতি লাগবে, ঠিক?'

'হ্যাঁ।'

'এ পর্যন্ত যত অনুমতি দেয়া হয়েছে তার একটা কমপ্লিট তালিকা আছে তোমাদের কাছে।'

'আমাদের সমস্ত রেকর্ড কম্পিউটরে থাকে।'

'জানি,' বলল রানা। 'অনুমতি পেয়েছে অথচ এখনও ইউরেনিয়াম শিপমেন্ট হয়নি, এই রকম ঘটনার তালিকাও আছে তোমাদের কাছে, চাওয়া হলে এই তালিকার প্রিন্ট-আউট কম্পিউটর দেবে।'

'তা দেবে,' বলল বগা। 'নিয়মিত চাই-ও আমরা। এই ধরনের তালিকা মাসে একবার বিলি করা হয় অফিসে।'

'চমৎকার! আমার শুধু ওই তালিকাটা দরকার।'

রানার দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল বগা। ইশারায় তার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করল বক্সার, কিন্তু তার দিকে ভুলেও তাকাল না সে। খানিক পর একটা সাইড টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। টেবিলের ওপর হুইস্কির একটা বোতল আর গ্লাস রয়েছে। দু'ঢোক হুইস্কি গিলে আবার নিজের চেয়ারে ফিরে এল সে। কিন্তু সে কোন কথা বলার আগে বক্সার জানতে চাইল, 'তালিকাটা কি জন্যে দরকার তোমার?'

'নির্দিষ্ট একটা মাসের সমস্ত শিপমেন্ট চেক করতে চাই আমি। আশা করি প্রমাণ করতে পারব, সদস্য রাষ্ট্রগুলো ইউরাটমকে মুখে যা বলে আর কাজে যা করে তার সাথে খুব সামান্যই মিল আছে বা একেবারেই নেই।'

'তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না,' বলল বগা।

আর যাই হোক, এ লোক বোকা নয়। কাঁধ ঝাঁকাল রানা, জানতে চাইল,

'তাহলে তুমিই বলো, তালিকাটা আমার কি কাজে লাগবে?'
'তা আমি জানি না। তুমি জার্নালিস্ট নও। তোমার একটা কথাও সত্যি নয়।'
'এসবে কিছু এসে যায় না,' বলল রানা। 'তালিকাটা আমার হাতে তুলে দেয়া ছাড়া তোমার কোন উপায় নেই।'
'আছে,' বলল বগা। 'আমি চাকরি থেকে ইস্তফা দেব।'
নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে হেসে উঠল রানা। 'তোমার চাকরির সাথে এর তেমন কোন সম্পর্ক নেই। অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের স্ত্রীর সাথে লুকিয়ে প্রেম করছ, সেটাই তোমার জন্যে কাল হয়ে দেখা দেবে। এখন বুঝে দেখো।'
'আমরা পুলিসকে সব জানিয়ে দেব।'
'পুলিসে আমার লোক আছে,' বলল রানা। 'গ্রেফতার এড়ানো পানির মত সহজ। আমি লিখলেই তোমাদের গোপন প্রেমের কথা ফলাও করে দৈনিক পত্রিকাগুলোয় ছাপা হবে। তখনকার অবস্থা একটু কল্পনা করো।'
একদৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে ছিল বগা, হঠাৎ জানতে চাইল, 'কে তুমি?'
'ভালর ভাল, মন্দের মন্দ। এর চেয়ে বেশি কিছু জানার দরকার নেই। শুধু মুখে ভয় দেখাচ্ছি না, এটুকু বিশ্বাস করো তো?'
'করি,' বিড়বিড় করে বলল বগা। দু'হাতে নিজের মুখ ঢাকল সে।
নিস্তব্ধতা আরও জমাট বাঁধতে দিল রানা। কোণঠাসা, অসহায় বোধ করছে বগা। এই মুসিবত থেকে বাঁচার একটাই মাত্র পথ আছে, এটুকু বুঝতে শুরু করেছে সে।
প্রায় দু'মিনিট পর নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা, 'প্রিন্ট আউটটা বেশ মোটা আর ভারী হবে।'
মুখ থেকে হাত না নামিয়েই মাথা দোলাল বগা। 'হ্যাঁ।'
'অফিস থেকে বেরোবার সময় তোমার ব্রিফকেস চেক করা হয়?'
মাথা নাড়ল বগা।
'প্রিন্ট আউটগুলো কি তালা-চাবির ভেতর রাখতে হয়?'
'না,' মুখ থেকে হাত নামিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বগা। 'এই তথ্য ক্লাসিফায়েড নয়, খুব বেশি হলে কনফিডেনশিয়াল। বাইরের কাউকে দেয়া নিষেধ।'
'আমাকে দিলে কেউ জানবে না,' বলল রানা। 'প্ল্যান যা করার কালকের মধ্যেই করে ফেল তুমি। প্রিন্ট আউটের কোন্ কপিটা নিতে হবে, তোমার বসকে ঠিক কি বলবে, এই সব আগে থেকে ভেবে রাখা দরকার। পরশু বাড়িতে নিয়ে আসবে প্রিন্ট আউট। ফিরে দেখবে, আমার একটা নোট অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে। ডকুমেন্টটা কিভাবে আমার হাতে ডেলিভারী দিতে হবে, সব লেখা থাকবে তাতে।' অভয় দিয়ে হাসল ও। 'কথামত কাজ করলে জীবনে আর কখনও আমাকে দেখবে না তুমি।'
মাথার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে বগা বলল, 'ঠিক আছে।'
ফোনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। কর্ড ধরে হ্যাঁচকা একটা টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল সেটা। 'কোথাও যাতে ফোন করতে না পারো।'

ছেঁড়া কর্ডের দিকে চোখ রেখে বক্সার বলল, 'ও, তুমি ভয় পাচ্ছ!'

'হ্যাঁ,' বলে দরজার কাছে চলে এল রানা। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসার সময় ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বক্সারের দিকে। 'কিন্তু আমার জন্যে নয়, তোমার বন্ধু আর তার প্রেমিকার জন্যে।'

সাত

মার্কিন মিডল ঈস্ট পলিটিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্যে পাঠানো হলো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং কংগ্রেসের বিশেষ একটা কমিটিতে। তিন জায়গাতেই ইসরায়েলী লবির প্রভাব রয়েছে, কাজেই অনুমোদনের জন্যে বেগ পেতে হলো না। কিন্তু প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় লিখিত সিদ্ধান্তের ওপর একটা মন্তব্য রাখল—ইসরায়েলের দেখাদেখি মিশর বা আর কেউ যাতে বোমা বানাবার কাজে হাত না দেয় সেদিকটায় লক্ষ্য রাখা একান্ত দরকার। এ-ব্যাপারে জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে সি.আই.এ.-কে। এই মন্তব্যের নিচে কংগ্রেসের বিশেষ কমিটি লিখল, আমরাও তাই মনে করি।

ইসরায়েলীদের সাথে কাজ করতে হবে শুনে মেজাজ বিগড়ে গেল জ্যাক রিচির। তাও আবার সেই ইডিয়েট, ন্যাট কোহেনের সাথে। আরও দু'জনকে নিয়ে রিচির নিজস্ব একটা দল আছে, নিক কুয়েল আর অ্যালান হিলারী, এরা শুধু যে বিশ্বস্ত তাই নয়, রিচির কথা তারা বেদবাক্যের মত মেনে চলে। জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের সাথে কাজ করার অসুবিধে হলো, ওদের সাথে সি.আই.এ-র যা কিছু আদান-প্রদান হয় তার বেশিরভাগই কিভাবে যেন পাচার হয়ে যায় মিশরে।

ন্যাট কোহেনকে পরিষ্কার মনে রেখেছে রিচি। ধনী লোকের ভাইপো ছিল, মেয়েদের মত সাজ-গোজ করতে খুব পছন্দ করত। বেঁচে থাকার ধরন সম্পর্কে তার না ছিল কোন নীতির বালাই, না ছিল গঠনমূলক কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এই লোক একটা ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের এজেন্ট হয় কি করে, ভেবে পায় না সে।

কিন্তু আদেশ যখন হয়েছে, ন্যাট কোহেনের সাথে কাজ করতে হবে বলে মন খারাপ করে কোন লাভ নেই, নিজেকে বোঝাল রিচি। ওয়াশিংটন থেকে রওনা হবার আগেই মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল সে, কোহেনকে সব কথা জানানো চলবে না। তাকে যে উভয় সঙ্কটে পড়তে হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কোহেনকে খুব কম জানালে ইসরায়েল চটেমটে লাল হবে, আর বেশি জানালে মিশর তার কাজে বাধা দেবার সুযোগ পেয়ে যাবে।

ওয়াশিংটন থেকে রওনা হয়ে তিন বার প্লেন আর দু'বার পরিচয় বদলে লুক্সেমবার্গে পৌঁছল রিচি। আগেই ঠিক হয়েছে, এয়ারপোর্টে কেউ থাকবে না। ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলের দিকে রওনা হলো সে। জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সকে জানানো হয়েছে, ডেভিড রবার্টস নামটা ব্যবহার করবে সে। ওই নামে হোটেলের রুম বুক করার সময় ডেস্ক ক্লার্ক তাকে একটা মেসেজ দিল। পোর্টারের সাথে এলিভেটরে

উঠে এনভেলাপটা খুলল সে। ছোট্ট একটা কাগজে দুটো শব্দ লেখা রয়েছে—রুম ১৭৯।

পোর্টারকে বকশিশ দিয়ে বিদায় করল রিচি. কামরার ফোন তুলে অপারেটরকে বলল. 'একশো উনআশি নম্বর কামরা চাই।'

কয়েক সেকেন্ড পর একটা কণ্ঠস্বর পেল রিচি, 'হ্যালো?'

'একশো বেয়াল্লিশ থেকে বলছি। দশ মিনিট পর চলে এসো।'

'ফাইন। শোনো, তুমি কি···?'

'শাট আপ!' কঠিন সুরে ধমকে দিল রিচি। 'কোন নাম নয়। দশ মিনিট।'

'দুঃখিত, সত্যি দুঃখিত···আমি···'

শালা ডোবাবে, মনে মনে কথাটা বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল রিচি। অসন্তোষ আর দুশ্চিন্তা, দুটোই আবার ফিরে এল মনে—এই রকম কাঁচা লোকের সাথে কিভাবে কাজ করবে সে? হারামজাদা আরেকটু হলে নিজের এবং তার দু'জনের নামই বলে ফেলত। পাবলিক লাইনে সেটা করা উচিত্ নয়, জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স ব্যাটাকে এইটুকুও শেখায়নি?

একটা সময় ছিল. এই ধরনের পরিস্থিতি দেখা দিলে ঘরের আলো নিভিয়ে দরজার দিকে মুখ করে বসে থাকত সে, হাতে থাকত রিভলভার। কিন্তু আজকাল অতটা সাবধান হবার দরকার আছে বলে মনে করে না। ব্যক্তিগত নিরাপত্তার সাড়ম্বর আয়োজন তার স্টাইল নয়। এমনকি সাথে রিভলভারও রাখে না সে. তাতে এয়ারপোর্টে অসুবিধে হতে পারে।

ছোট সুটকেসটা তাড়াতাড়ি খুলে ফেলল সে। মাত্র কয়েকটা জিনিস রয়েছে এতে—একটা ইলেকট্রিক রেজার, টুথব্রাশ, যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি একজোড়া ওয়াশ-অ্যান্ড-ওয়্যার শার্ট, একটা আন্ডারপ্যান্ট। রুম বার থেকে নিজের জন্যে গ্লাসে খানিকটা হুইস্কি ঢালল সে ঠিক দশ মিনিট পর নক হলো দরজায়। দরজা খুলে দিতেই ভেতরে ঢুকল ন্যাট কোহেন। এক গাল হাসল সে. বলল. 'হাউ আর ইউ?'

রিচি হাসল না বটে, কিন্তু হ্যান্ডশেকের জন্যে হাতটা বাড়িয়ে দিল। 'হাউ ডু ইউ ডু।'

'আবার দেখা হবে, ভাবতে পারিনি,' বলল কোহেন। 'উহ্. সেকি আজকের কথা! কেমন ছিলে অ্যাদ্দিন. রিচি?'

'ব্যস্ত।'

'কে জানত সেই মাসুদ রানাকে উপলক্ষ্য করে আবার আমাদের দেখা হবে!'

একটা চেয়ার দেখাল রিচি। 'বসো। রানা সম্পর্কে কি জানতে পেরেছ সব বলো আমাকে।' খাটের ওপর বসল সে। চেয়ারে বসে পায়ের ওপর পা তুলে দিল কোহেন। 'তোমার চোখে ধরা পড়ে রানা, তারপর তোমাদের লোকেরা আবার তাকে দেখতে পায়। এরপর কি ঘটল?'

'একটা নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশন দেখে ফেরার সময় আমাদের লোকের চোখে ধুলো দিয়েছে সে, তারমানে আবার আমরা তাকে হারিয়ে ফেলেছি।'

ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ ছেড়ে রিচি বলল, 'এভাবে হলেই সেরেছে!'

কাঁধ ঝাঁকাল কোহেন, বলল, 'ফেউ দেখতে পাবে, সেটা খসাতেও

পারবে—মাসুদ রানা সেই টাইপের এজেন্ট, তা নাহলে তাকে নিয়ে এতটা মাথা ঘামাবার দরকার হত কি? তোমার আমার চেয়ে তার ঘিলু যে বেশি, সে তো অনেক বছর আগেই প্রমাণিত হয়ে গেছে। দাবায় তুমি ওর সাথে কোনদিন জিততে পারোনি।'

কথাগুলো গ্রাহ্য না করে জানতে চাইল রিচি, 'চোখে ধুলো দেবার সময় ও কি কোন গাড়ি ব্যবহার করছিল?'

'হ্যাঁ। ভাড়া করা গাড়ি।'

'ঠিক আছে। তার আগে এখানে ওর গতিবিধি সম্পর্কে যা জানো বলো।'

রিচির কথা বলার ভঙ্গিটা সহজেই রপ্ত করে নিল কোহেন। কাজের কথা ছাড়া একটাও ফালতু শব্দ উচ্চারণ করল না সে। 'কুড রেলিক নামে আলফা হোটেলে এক হপ্তা ছিল ও। ঠিকানা দিয়েছিল একটা পত্রিকার—সায়েন্স ইন্টারন্যাশনাল। এই নামে একটা পত্রিকা আছে বটে, প্যারিসের একটা ঠিকানাও তাদের আছে, কিন্তু ওটা শুধু মেইলের জন্যে একটা ফরওয়ার্ডিং অ্যাড্রেস। কুড রেলিক নামে একজন ফ্রিল্যান্স জার্নালিস্টকে দিয়ে তারা কাজ করাত তাও ঠিক, কিন্তু এক বছরের বেশি হলো তার সাথে ওদের কোন যোগাযোগ নেই।'

ওপর নিচে মাথা দোলাল রিচি। 'তুমি হয়তো জানো, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের এটা একটা টিপিক্যাল কাভার স্টোরি। নাইস অ্যান্ড টাইট। আর কিছু?'

'হ্যাঁ। লুক্সেমবার্গ থেকে তার চলে যাবার আগের রাতে এখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটে। পেভমেন্টের ওপর প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় দুটো ছেলেকে পাওয়া যায়, বাজে ছেলে, নিষ্ঠুরভাবে মারধর করা হয়েছে ওদের। হাড় ভাঙার ধরন দেখে বোঝা যায়, প্রফেশন্যালের কাজ। পুলিস অবশ্য ব্যাপারটা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাচ্ছে না, কারণ ওরা দু'জনেই পরিচিত চোর। হোমোসেকশুয়ালদের ক্লাব থেকে কেউ বেরিয়ে এলেই তাকে ধরে ছিনতাই করবে, এই রকম কোন মতলব নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল ওরা।'

'এর সাথে রানার কি সম্পর্ক?'

'আপাতদৃষ্টিতে কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না,' বলল কোহেন। 'শুধু, এই ধরনের কাজ তার দ্বারা সম্ভব বলে মনে হয়, এই আর কি।'

'রানাকে হোমো বলে সন্দেহ হয় তোমার?'

'তেল আবিব বলছে বটে ওর ফাইলে এ-ধরনের কিছু নেই, কিন্তু আমার সন্দেহ আছে।'

'তুমি তাহলে রানা সম্পর্কে কিছুই জানো না,' চটে উঠে বলল রিচি। 'আমি জানি, এবং আমার জানার মধ্যে কোন ভুল নেই—সেকশুয়াল ব্যাপারে নোংরা কিছুর মধ্যে নেই রানা।'

'আমার মনে হয়, রানার ভাল দিকগুলো খুঁজে বের করার জন্যে এখানে আমরা আসিনি,' গম্ভীর সুরে বলল কোহেন। 'ঠিক আছে, তাহলে তুমিই বলো, ওই ক্লাব এলাকায় রানা যদি গিয়ে থাকে, কেন গিয়েছিল সে?'

'গিয়েই যদি থাকে, নিশ্চয়ই কোন তথ্য পাবার আশায় গিয়েছিল ও,' উঠে

দাঁড়াল রিচি, পায়চারি শুরু করল। মনে মনে ভাবল, কোহেনের সাথে তার এই আচরণটা উচিত কাজই হয়েছে। কিন্তু এর বেশি আর দরকার নেই। বেশি অপমান করলে এর কাছ থেকে কাজ আদায় করা কঠিন হবে। 'এসো, ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখি। নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশন দেখতে গেল রানা—কেন?'

কোহেন বলল, 'বেশ কিছুদিন হলো মিশরকে আর্মস সাপ্লাই বন্ধ করে দিয়েছে ফ্রান্স, কিংবা কমিয়ে দিয়েছে। কে জানে, মিশর হয়তো প্রতিশোধ নেবার জন্যে বিদেশী মাসুদ রানাকে কাজে লাগাচ্ছে। রানাকে দিয়ে ওরা হয়তো ফ্রান্সের রিয়্যাক্টর উড়িয়ে দিতে চায়।'

'মিশরীয়দের এতটা বোকা আর দায়িত্বহীন মনে কোরো না। তাছাড়া,' এদিক ওদিক মাথা নেড়ে হাসল রিচি, 'আবার বলতে বাধ্য হচ্ছি, রানাকে চিনতে আগাগোড়া ভুল করেছ তুমি। তোমার পরিচিত স্পাইদের দেখে ওকে হিসেবের মধ্যে আনতে চেষ্টা কোরো না। কেউ বললেই তার হয়ে আরেকজনের ক্ষতি করতে যাবে, রানা সে জিনিস নয়। আরেকটা কথা, ফ্রান্সের রিয়্যাক্টর উড়িয়ে দেবার প্ল্যান থাকলে লুক্সেমবার্গে কেন আসবে সে?'

'কি জানি।'

বিছানার কিনারায় আবার বসল রিচি। 'কি আছে লুক্সেমবার্গে? কিসের জন্যে বিখ্যাত লুক্সেমবার্গ? তার আগে বলো, তোমার ব্যাংকই বা এখানে কেন?'

'এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ইউরোপিয়ান রাজধানী। আমার ব্যাংক এখানে কারণ ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক এখানে। তাছাড়া, এখানে বেশ কয়েকটা কমন মার্কেট ইনস্টিটিউশনও রয়েছে।'

'যেমন?'

'সেক্রেটারিয়েট অভ দ্য ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট, দ্য কাউন্সিল অভ মিনিস্টারস, এবং কোর্ট অভ জাস্টিস। ও, হ্যাঁ, ইউরাটমও আছে।'

কোহেনের দিকে ঝুঁকে পড়ল রিচি। 'ইউরাটম?'

'ইউরোপিয়ান অ্যাটমিক এনার্জি কমিউনিটির সংক্ষেপ, মানে…'

'ওটা কি তা আমার জানা আছে,' বলল রিচি। 'যোগাযোগটা দেখতে পাচ্ছ, কোহেন? লুক্সেমবার্গে এল রানা, যেখানে ইউরাটমের হেডকোয়ার্টার রয়েছে—তারপরই সে একটা নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর দেখতে গেল।'

কাঁধ ঝাঁকাল কোহেন। 'হ্যাঁ, কি যেন একটা যোগাযোগ আছে বটে। ওটা তুমি কি হুইস্কি খাচ্ছ?'

'স্কচ। হেলপ ইওরসেলফ। যতদূর মনে পড়ে, ফ্রান্সই মিশরকে নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর বানিয়ে দিয়েছে। এখন সম্ভবত তারা সাহায্য-সহযোগিতা দিতে রাজি হচ্ছে না। মিশরের অনুরোধে রানা হয়তো তাদেরকে সায়েন্টিফিক সিক্রেট যোগান দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছে।'

গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে নিজের চেয়ারে আবার ফিরে এল কোহেন। 'তুমি আর আমি, আমরা অপারেট করব কিভাবে? তোমার সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করতে বলা হয়েছে আমাকে।'

'আজ সন্ধেয় আমার টীম এসে পৌঁছবে,' বলল রিচি। মনে মনে ভাবল, হাত

মিলিয়ে কাজ না ঘোড়ার ডিম, তুমি আমার নির্দেশ মেনে চলবে। 'বাইরে এলে এই দু'জনকেই সাথে নিই আমি—নিক কুয়েল আর অ্যালান হিলারী। আমার খুব ভক্ত এরা, যা বলি তাই শোনে। সবচেয়ে বড় কথা, যে-কোন কাজ কিভাবে করলে আমার মনমত হবে, সেটা ওরা বোঝে। আমি চাই, ওদের সাথে কাজ করবে তুমি, ওরা যা বলবে শুনবে—অনেক কিছু শিখতে পারবে তাহলে। ওরা খুব ভাল এজেন্ট।'

'আর আমার লোকেরা...'

'ওদেরকে তেমন দরকার হবে না,' পরিষ্কার জানিয়ে দিল রিচি। 'দল ছোট হওয়াই ভাল। এখন আমাদের প্রথম কাজ হলো, লুক্সেমবার্গে যখন এবং যদি আসে রানা, তাকে দেখতে পাবার ব্যবস্থা করা।'

'এয়ারপোর্টে আমার লোক আছে।'

'সেটা রানাও আন্দাজ করতে পারবে, কাজেই প্লেনে করে আসবে না সে। অন্যান্য জায়গাতেও আমাদের লোক থাকা দরকার। ইউরাটমেও যেতে পারে সে...'

'হ্যাঁ, জাঁ-মোনেট বিল্ডিঙেও লোক থাকলে ভাল হয়।'

'আলফা হোটেলের ডেস্ক ক্লার্ককে ঘুষ দিয়ে দলে টানতে পারি আমরা,' বলল রিচি। 'কিন্তু ওই হোটেলে আবার সে উঠবে বলে মনে হয় না। তবে হোমোদের ক্লাবগুলোর ওখানে একজন লোক থাকা দরকার। তুমি বলছ, একটা গাড়ি ভাড়া করেছিল রানা?'

'হ্যাঁ, ফ্রান্সে।'

'এতক্ষণে সেটা বদলে ফেলেছে—জানে, ওই গাড়ির নম্বর তোমরা জানো। রেন্টাল কোম্পানীকে ডেকে জিজ্ঞেস করবে, তাদের কোন্ ব্রাঞ্চে জমা দিয়ে গেছে গাড়িটা, তাহলে কোন্ দিকে গেছে সে তার একটা আভাস পাওয়া যেতে পারে।'

'ঠিক আছে।'

'ওয়াশিংটন থেকে রানার রেডিও ফটো পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, তারমানে দুনিয়ার সমস্ত ক্যাপিটাল সিটিতে আমাদের লোক ওকে খুঁজবে এখন।' শেষ চুমুক দিয়ে গ্লাসটা তেপয়ের ওপর নামিয়ে রাখল রিচি। 'তাকে আমরা পাবই।'

'তুমি তাই মনে করো?'

'ওর সাথে দাবা খেলেছি, ওর ব্রেন কিভাবে কাজ করে আমি জানি। ওর ওপেনিং মুভগুলো হয় রুটিন, আগে থেকে বলে দেয়া যায়। তারপর হঠাৎ করে এমন কিছু একটা করে বসে যা সমস্ত অর্থেই অপ্রত্যাশিত—সাধারণত এমন একটা কিছু, যাতে চিন্তার অতীত ঝুঁকি থাকে। মাথা বের করে উঁকি সে দেবেই, তুমি শুধু অপেক্ষা করতে থাকো—তারপর ধাঁই করে এক ঘা বসিয়ে দেবে মাথায়।'

'তাহলে জিজ্ঞেস করি, কিভাবে খেলে তা যদি বুঝতেই পারতে, প্রতিবার তুমি হারতে কেন?'

'হারতাম, স্বীকার করি, কিন্তু তাতে করে কিছুই প্রমাণ হয় না। দাবার সাথে বাস্তব জীবনের কোন সম্পর্ক নেই।'

নিক কুয়েলকে বুলডগ বলা হয়। আসলে তাগড়া জোয়ান একটা ঠগ সে। এই টাইপের লোকেরা সাধারণত ক্রিমিন্যাল নয়তো পুলিস হয়; কোন্‌টা হবে তা নির্ভর করে সম্পূর্ণভাবে ভাগ্যের ওপর। অফিশিয়ালি সে একজন শোফার, আন অফিশিয়ালি একজন দেহরক্ষী। তার চোখেই ধরা পড়ে গেল রানা।

খুব একটা লম্বা নয় কুয়েল, কিন্তু খুবই চওড়া। ছোট ছোট সোনালি চুল, ভেজা ভেজা সবুজ চোখ। তার দাড়ি খুব কম গজায়, পঁচিশ বছর বয়সেও রোজ কামাতে হয় না বলে বন্ধু-বান্ধবদের সামনে খুব আড়ষ্ট বোধ করে। লুক্সেমবার্গের এই নাইটক্লাবে কালো একটা জ্যাকেট পরে এসেছে সে।

কাল রাতেও ঘন্টাখানেকের জন্যে এখানে এসেছিল কুয়েল। লেদার জ্যাকেটে মোড়া তার বৃষ স্কন্ধ, চেহারার থমথমে ভাব ইত্যাদি দেখে কেউ কেউ ভেবেছিল, লোকটা বোধহয় কারও সাথে গোলমাল পাকাবার মতলব নিয়েই ঢুকেছে। কিন্তু আপনমনে হুইস্কি খাওয়া আর দরজার দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করতে দেখা যায়নি তাকে। এই নাটইক্লাবে যে-সব মেয়েরা নিয়মিত আসে তারাও ওর ধারে কাছে ঘেঁষতে সাহস পায়নি। ওদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী বলে সুনাম আছে যার আজ সে অনেক প্রস্তুতি নিয়ে কুয়েলের টেবিলের খুব কাছাকাছি এল। এবং দু'তিনটে ঢোক গিলে নাচবার প্রস্তাব দিল। তার দিকে ফিরেও তাকাল না কুয়েল। বাঁ হাতটা নেড়ে শুধু কেটে পড়তে বলল।

সে যে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে, এ-ব্যাপারে কুয়েলের কোন ধারণাই নেই। ধারণা থাকলেও কিছু এসে যেত না তার। একজন লোকের ফটো নিয়ে এই এলাকায় ঘুর ঘুর করতে বলা হয়েছে তাকে, মাঝে মাঝে দেখতে হবে ছবিটা, আর চারপাশে নজর রাখতে হবে—ঠিক সেই কাজটাই করছে সে। মারপিট পছন্দ করে, কিন্তু কেউ আঘাত না করলে উত্তেজিত হয় না। সাহস বা ভীতি, এ-দুটো সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা নেই তার। জানে, আদেশ পালন করার জন্যে চাকরি করে সে—কর্তৃপক্ষ আগুনে ঝাঁপ দিতে বললে বিনা দ্বিধায় সেই আদেশ পালন করতে রাজি আছে। এর বিনিময়ে মাত্র একটা জিনিসই আশা করে সে, মাস শেষে বেতনটা যেন ঠিকমত হাতে আসে। শখ বলতে মাত্র দুটো—মদ খাওয়া আর বিবস্ত্র মেয়েদের রঙিন ছবি দেখা। বেতনের টাকা বেশির ভাগ এই দুটোর পিছনেই খরচ হয়ে যায়।

নাইটক্লাবে রানাকে ঢুকতে দেখে মোটেও উত্তেজিত হলো না কুয়েল। কোন কাজে সে যদি সফল হয়, তার বস্‌ জ্যাক রিচি ধরে নেয়, তার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার ফল সেটা। কুয়েলও স্বীকার করে, প্রায় ক্ষেত্রেই কথাটা সত্যি। রানাকে একা একটা টেবিলে বসতে দেখল সে। ওয়েটারকে ডেকে বিয়ার চাইল। হাবভাবে কোন রকম তাড়া নেই, আবার মাঝে মধ্যেই দরজার দিকে তাকাচ্ছে। কুয়েল আন্দাজ করল, তার মত সে-ও কারও জন্যে অপেক্ষা করবে বলে এখানে এসেছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে টেলিফোন বুদে ঢুকল কুয়েল।

'আমি নিক। শিকার এইমাত্র রুডিকসের একটা নাইটক্লাবে ঢুকল। নাম, ড্রিমল্যান্ড।'

'ভেরি গুড!' হোটেল থেকে বলল রিচি। 'কি করছে?'

'অপেক্ষা।'

'গুড। একা?'

'হ্যাঁ।'

'চোখে চোখে রাখো। কিছু ঘটলে আমাকে জানাবে।'

'আচ্ছা।'

'হিলারীকে পাঠাচ্ছি। বাইরে অপেক্ষা করবে সে। শিকার যদি ক্লাব থেকে বেরোয়, পালা করে অনুসরণ করবে তোমরা। তোমাদের পিছনে ইহুদী সাহেবও থাকবে, একটা গাড়িতে। ওটা হবে…থামো…ওটা একটা সবুজ ফোক্সওয়াগেন।'

'ঠিক আছে।'

'এখন তাহলে ওর কাছে ফিরে যাও।'

বুদ থেকে বেরিয়ে নিজের চেয়ারে ফিরে এল কুয়েল, রানার দিকে ভুলেও তাকাল না।

মিনিট কয়েক পরে সুবেশী কিন্তু তালপাতার এক সেপাই ঢুকল ক্লাবে। লোকটার গলা এত বেশি লম্বা, দেখে আরেকটু হলে হেসেই ফেলেছিল কুয়েল। ক্লাবে ঢুকে চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল সে, তারপর শিকারের টেবিল ঘেঁষে এগিয়ে গেল বারের দিকে। কুয়েল দেখল, টেবিল থেকে ছোট একটুকরো কাগজ তুলে নিয়ে পকেটে ভরল রানা। গোটা ব্যাপারটার মধ্যে চাতুর্যের পরিচয় আছে, রানাকে গভীরভাবে কেউ লক্ষ্য না করলে টেরই পেত না কি ঘটে গেল।

আবার টেলিফোন বুদে গিয়ে ঢুকল কুয়েল। রিচিকে বলল, 'লম্বা আর রোগা এক লোক এসে কি যেন ফেলে গেল শিকারের টেবিলে—দেখে মনে হলো একটা টিকেট।'

'থিয়েটারের টিকেট—সম্ভবত?'

'তা জানি না।'

'ওরা কথা বলল?'

'না। শিকারের টেবিল ঘেঁষে যাবার সময় ওটা ফেলে গেল লোকটা। ওরা কেউ কারও দিকে তাকায়ওনি।'

'ঠিক আছে। শিকারের সাথে থাকো। ক্লাবের বাইরে এরই মধ্যে পৌঁছে যাবার কথা হিলারীর।'

'এক সেকেন্ড,' বলল কুয়েল। 'শিকার এইমাত্র লবিতে বেরিয়ে এল। দাঁড়ান…ডেস্কের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সে। ডেস্ক ক্লার্ককে কাগজটা দিল। হ্যাঁ, ওটা তাই, একটা টিকেটই—ক্লোক-রুম টিকেট।'

'লাইনে থাকো, কি ঘটে বলে যাও,' সম্পূর্ণ শান্ত শোনাল রিচির কণ্ঠস্বর।

'ডেস্কের পেছন থেকে একটা ব্রিফকেস বের করে শিকারের হাতে দিল ক্লার্ক। শিকার বকশিশ দিচ্ছে…'

'একটা হাত-বদলের ঘটনা। গুড।'

'শিকার ক্লাব ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।'

'পিছু নাও।'

'ব্রিফকেসটা কেড়ে নিতে হবে, বস্?'

'না। আসলে কি করছে সেটা না জেনে ওর চোখে পড়তে চাই না আমরা। শুধু লক্ষ্য রাখো, কোথায় যায়। আর, হ্যাঁ, চোখে পড়ে যেয়ো না।'

বুদ থেকে বেরিয়ে ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল কুয়েল। তাড়াতাড়ি বিল মিটিয়ে ক্লাবের বাইরে চলে এল।

বাইরে গ্রীষ্মের উজ্জ্বল সন্ধ্যা, মাথার ওপর নীল আকাশ, ফুরফুরে বাতাস ছেড়েছে—রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করার এই সুযোগটা অনেকেই ছাড়েনি। এদিক ওদিক তাকাল কুয়েল, তারপর রাস্তার উল্টোদিকের পেভমেন্টে দেখতে পেল রানাকে। বিশ গজ পিছনে থেকে তাকে অনুসরণ করল সে।

সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটছে রানা, ব্রিফকেসটা বগলের নিচে। ওর পিছু পিছু আধ মাইলটাক চলে এল কুয়েল। এই সময়ের মধ্যে রানা যদি একবারও ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে থাকে, কুয়েলকে দেখতে পেয়েছে ও। আর দেখতে পেলে হয়তো ভেবেছে, নাইটক্লাবে দেখা চেহারা ওর পিছনে কেন?

একটু পরই কুয়েলকে পাশ কাটাল মোটাসোটা, টেকো অ্যালান হিলারী। পিছিয়ে পড়ল কুয়েল, যেখান থেকে হিলারীকে সে দেখতে পাবে কিন্তু রানাকে পাবে না। এখন যদি পিছন ফিরে তাকায় রানা, কুয়েলকে দেখতে পাবে না, আর হিলারীকে চিনতে পারবে না। নজর রাখার এই প্যাটার্ন খুব কাজের, যার ওপর নজর রাখা হয়েছে তার পক্ষে কিছু আঁচ করা সম্ভব নয়। তবে এই প্যাটার্নের অসুবিধে হলো, পিছু নিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত যেতে হলে লোক সংখ্যা বেশি দরকার।

আরও প্রায় আধমাইল পর কুয়েলের পাশে এসে থামল সবুজ ফোক্সওয়াগেন। জানালা দিয়ে মাথা বের করে ন্যাট কোহেন বলল, 'নতুন আদেশ। উঠে পড়ো।'

কুয়েল গাড়িতে উঠতেই সেটা ঘুরিয়ে নাইটক্লাবের দিকে ফিরে চলল কোহেন। বলল, 'ভাল কাজ দেখিয়েছ তুমি, কুয়েল।'

প্রশংসায় কান দিল না কুয়েল। তার বুলডগ আকৃতির মুখটায় কোন ভাবান্তর লক্ষ করা গেল না।

'ক্লাবে ফিরে যেতে হবে তোমাকে,' বলল কোহেন। 'ডেলিভারিম্যানের ওপর নজর রাখবে। পিছু নিয়ে দেখে আসবে বাড়িটা।'

মেশিনের মত ঘড় ঘড় করে উঠল কুয়েলের গলা, 'কার আদেশ? আমার বসের?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে।'

নাইটক্লাবের কাছাকাছি গাড়ি থামাল কোহেন। নেমে গেল কুয়েল। ক্লাবের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরে তাকাল সে। খুঁটিয়ে দেখল। নেই।

চলে গেছে ডেলিভারিম্যান।

কম্পিউটর প্রিন্ট আউট গুনে দেখল রানা, একশো পাতার কিছু বেশি। এত কাঠ-খড় পুড়িয়ে যোগাড় করা গেছে, উল্টেপাল্টে দেখতে গিয়ে মনটা একেবারে দমে গেল

ওর। সমস্তটাই দুর্বোধ্য।

আবার প্রথম পৃষ্ঠায় ফিরে এসে পড়ার চেষ্টা করল ও। অক্ষর আর সংখ্যা এলোপাতাড়িভাবে ছড়িয়ে রয়েছে পৃষ্ঠা জুড়ে। তবে কি এটা কোড করা? তা হয় কি করে! ইউরাটমের সাধারণ অফিস কর্মীরা রোজ ব্যবহার করে, কোড তো হতেই পারে না। ক্ষীণ একটু আশার আলো দেখল রানা। তাহলে হয়তো চেষ্টা করলে পড়া যাবে।

আরও গভীরভাবে মনোনিবেশ করল ও। এক জায়গায় একটা অক্ষর আর তিনটে সংখ্যা পাশাপাশি সাজানো রয়েছে। 'ইউটুথ্রীফোর'। একটা ইউরেনিয়ামের একটা আইসোটোপ হবে। আরেক দল অক্ষর আর সংখ্যা এই রকম—'ওয়ানএইট জিরোকেজি'। তার মানে, একশো আশি কিলোগ্রাম। 'ওয়ানসেভেন এফ এইট জিরো'—একটা তারিখ, আশি সালের সতেরোই ফেব্রুয়ারি। এইভাবে একটু একটু করে কম্পিউটর অ্যালফাবেট অক্ষরগুলোর অর্থ পরিষ্কার হতে শুরু করল। ইউরোপিয়ান কিছু শহরের নাম সহজেই পড়া গেল। ট্রেন আর ট্রাক শব্দের পাশে বসানো সংখ্যাগুলো আসলে দূরত্বের হিসেব। কিছু কিছু শব্দ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, যেমন এস এ, আই এন সি ইত্যাদি। এগুলো প্রতিষ্ঠানের নাম, সংক্ষেপ করা হয়েছে। ধীরে ধীরে এন্ট্রিগুলোর লেআউট সহজবোধ্য হয়ে এল। প্রথম লাইনে পরিমাণ আর কি ধরনের মেটিরিয়াল তা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় লাইনে রয়েছে প্রেরকের নাম আর ঠিকানা। বাকি লাইনগুলোয় কি বলা হয়েছে তাও মোটামুটি ধরতে পারল রানা। বাহ্!

উৎসাহ বেড়ে গেল ওর। কিছু আবিষ্কার করতে পারলে তার একটা আনন্দ আছে, সেটা বেশ উপভোগ্য লাগল। প্রিন্ট আউট তালিকায় প্রায় ষাটটার মত কনসাইনমেন্ট রয়েছে। এগুলোকে মোটামুটি তিনটে টাইপে ভাগ করা যায়। এক, কানাডা, ফ্রান্স আর দক্ষিণ আফ্রিকার খনিগুলো থেকে প্রচুর পরিমাণে পাঠানো ক্রুড ইউরেনিয়াম ওর। দুই, ফুয়েল এলিমেন্ট—অক্সাইড, ইউরেনিয়াম মেটাল অথবা এনরিচড্ মিকশ্চার—ফ্যাব্রিকেশন প্ল্যান্টস থেকে রিয়্যাক্টরে আসছে। তিন, রিয়্যাক্টর থেকে স্পেন্ট ফুয়েল রিপ্রোসেসিঙে এবং শেষ গন্তব্যে যাচ্ছে। কিছু নন-স্ট্যান্ডার্ড শিপমেন্টের কথাও বলা হয়েছে—বেশির ভাগই স্পেন্ট ফুয়েল থেকে বের করে আনা প্লুটোনিয়াম আর ট্র্যান্সইউরেনিয়াম, ইউনিভার্সিটি আর রিসার্চ ইন্সটিটিউটে পাঠানো হয়।

পড়তে পড়তে চোখ আর মাথা ব্যথা শুরু হলো রানার। তারপর যা খুঁজছিল পেয়ে গেল ও। প্রতিটি শেষ পাতায় একটা করে শিপমেন্টের কথা বলা হয়েছে, যার হেডিং 'নন নিউক্লিয়ার'।

মিশরীয় পদার্থ বিজ্ঞানীর নামটা জানা হয়নি রানার, কিন্তু মনে আছে বসরাই গোলাপ আঁকা টাই পরেছিল সে, আর চুল ছিল মেয়েদের মত লম্বা। তার কাছ থেকে জেনেছে, ইউরেনিয়াম আর ইউরেনিয়াম কম্পাউন্ড নন-নিউক্লিয়ার কাজেও ব্যবহার করা হয়। ফটোগ্রাফি, ডাইং ছাড়াও গ্লাস আর সেরামিক শিল্পে কালারিং এজেন্ট হিসেবে এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাটালিস্ট হিসেবে এর ব্যবহার চলে আসছে। যতই নিরীহ আর সাধারণ কাজে এর ব্যবহার হোক, জিনিসটা ইউরেনিয়াম; আর

ইউরেনিয়াম বিপজ্জনক বলে ইউরাটমের নীতিমালা এসব ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে, রানা আশা করল, সাধারণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রির আওতায়-থাকার সময় এই ইউরেনিয়ামের ওপর অত কড়া নজর বোধহয় রাখা হয় না।

শেষ পাতার এন্ট্রিতে দুশো টন ইয়েলোকেক অর্থাৎ ক্রুড ইউরেনিয়াম অক্সাইডের কথা বলা হয়েছে। এটা বেলজিয়ামের একটা মেটাল রিফাইনারীতে রয়েছে। জায়গাটা ডাচ বর্ডারের কাছাকাছি। ফিশনেবল মেটিরিয়াল মজুদ করার লাইসেন্স রয়েছে এদের। এই রিফাইনারীর মালিক সোশিয়েটি জেনারেল দ্য লা চিমি, জমাট শিলার খনি রয়েছে এদের, হেডকোয়ার্টার ব্রাসেলসে। এস.জি.সি. তাদের এই ইয়েলোকেক একটা জার্মান কনসার্ন, বিজবাদেনের এফ.এ. মুলারের কাছে বেচে দিয়েছে। এই ইয়েলোকেক কিভাবে ব্যবহার করার প্ল্যান করেছে মুলার তার একটা বিবরণ দেয়া আছে প্রিন্ট আউটে—'ম্যানুফ্যাকচারিং অভ ইউরেনিয়াম কম্পাউন্ডস, এসপেশ্যালি ইউরেনিয়াম কারবাইড, ইন কমার্শিয়াল কোয়ানটিটিজ'। রানার মনে পড়ল, সিনথেটিক অ্যামোনিয়া উৎপাদনে এই কারবাইড ক্যাটালিস্ট হিসেবে কাজে লাগে।

এরপর জানা গেল, এফ. এ. মুলার কোম্পানী নিজে এই ইয়েলোকেক ব্যবহার করতে যাচ্ছে না, অন্তত প্রথম দিকে নয়। এরপরে যা বলা হয়েছে পড়তে গিয়ে রানার উৎসাহ আকাশচুম্বি হয়ে উঠল। নিজেদের বিজবাদেনে ইয়েলোকেক ব্যবহার করার জন্যে লাইসেন্স চায়নি এফ.এ. মুলার, তার বদলে সাগরপথে ইয়েলোকেক জেনোয়ায় নিয়ে যাবার জন্যে অনুমতি চেয়েছে তারা। ওখানের একটা প্রতিষ্ঠানে ইয়েলোকেকের 'নন-নিউক্লিয়ার প্রোসেসিং' শুরু হবে। প্রতিষ্ঠানের নাম, অ্যাঞ্জেলুযি ই বিয়ানকো।

সাগর পথে! এর অন্তর্নিহিত অর্থটা সাথে সাথেই ধরা পড়ল রানার কাছে—কার্গোটা আর কারও মাধ্যমে একটা ইউরোপিয়ান বন্দর হয়ে যাবে।

আবার পড়তে শুরু করল ও। পরিবহনের ব্যবস্থা এই রকম—এস.জি.সি.-র রিফাইনারী থেকে ট্রেন করে অ্যান্টওয়ার্প ডকে নিয়ে যাওয়া হবে ইয়েলোকেক। জেনোয়ায় শিপমেন্টের জন্যে মোটর ভেসেল ইমপেরিয়ালে তোলা হবে সেটা। ইতালীয় পোর্ট থেকে অ্যাঞ্জেলুযি ই বিয়ানকোর কারখানা খুব বেশি দূরে নয়, এটুকু পথ ইয়েলোকেক যাবে ট্রাকে করে।

এই পর্যায়ে ইয়েলোকেকের চেহারা বালির মত, কিন্তু হলুদাভ। সীল করা ভারী ঢাকনিসহ দুশো লিটারের অয়েলড্রামে ভরা হবে জিনিসটা, দুশো টনের জন্যে ড্রাম লাগবে পাঁচশো ষাটটা। ট্রেনে থাকবে এগারোটা কার, এই অভিযানের সময় জাহাজটা আর কোন কার্গো বহন করবে না, এবং যাত্রার শেষ অংশে ইতালীয়রা ব্যবহার করবে ছয়টা ট্রাক।

সাগর-পথটা কল্পনা করতে গিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠল রানা। ইংলিশ চ্যানেলের ভেতর দিয়ে, বে অভ বিসকে পেরিয়ে, স্পেনের উপকূল বরাবর আটলান্টিক সাগর পাড়ি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে জিব্রালটার প্রণালী গলে ঢুকে পড়বে মেডিটেরেনিয়ানে, তারপরও পাড়ি দিতে হবে জাহাজটাকে হাজার মাইল সাগর-পথ।

এত লম্বা পথ পাড়ি দেবার সময় কত কিছুই তো ঘটতে পারে।

মাটিতে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া—সোজাসুজি ব্যাপার, এর ওপর সংশ্লিষ্টদের নিয়ন্ত্রণ থাকে। একটা ট্রেন একদিন দুপুর বেলা রওনা হয়ে হয়তো পর দিন সকাল সাড়ে আটটায় পৌঁছে যায় গন্তব্যস্থানে। আর যে রোড ধরে ট্রাক যাবে সেখানে ট্রাফিক থাকবে, থাকবে পুলিস কার। প্লেন আকাশ-পথ ধরে যাবে বটে, কিন্তু মাটিতে কারও না কারও সাথে যোগাযোগ থাকবে তার। কিন্তু সাগর-পথ সম্পর্কে আগে থেকে কিছু জানার উপায় নেই। একটা অভিযান শেষ হতে দশ দিনও লাগতে পারে, বিশ দিনও লাগতে পারে। পথে আরেকটা জাহাজের সাথে সংঘর্ষ ঘটতে পারে, ঝড় উঠতে পারে, ইঞ্জিন গোলমাল করতে পারে, হঠাৎ সাহায্যের ডাক পেলে দিক পরিবর্তন করতে হতে পারে, আরও কত কি। প্লেন হাইজ্যাক করো, এক ঘণ্টার মধ্যে সারা দুনিয়ার লোক সেটা টেলিভিশনে দেখতে পাবে। একটা জাহাজ হাইজ্যাক করো, কয়েক দিন, কয়েক হপ্তা, এমন কি হয়তো চিরকাল তার কোন খবরই পাবে না কেউ।

ছিনতাই যদি করতেই হয়, সাগর-পথে ছাড়া বিকল্প কোন উপায় নেই রানার।

আশাটা বেশ নধর হয়ে উঠতে লাগল রানার মনে। অনুভব করল, সমস্যার সমাধান ওর নাগালের মধ্যে চলে আসছে। ইমপেরিয়ালকে হাইজ্যাক করা গেল—তারপর? নিজেকে জলদস্যুর ভূমিকায় কল্পনা করে রোমাঞ্চিত হলো ও। তারপর? ইমপেরিয়ালের কার্গো নিজের জাহাজের হোল্ডে ভরে নিতে হবে। নিশ্চয়ই নিজস্ব ডেরিক থাকবে ইমপেরিয়ালের।

মাঝ-সাগরের অবশ্য এক জাহাজ থেকে আরেক জাহাজে কার্গো সরানো ঝুঁকির ব্যাপার। যাই হোক, অভিযানের প্রস্তাবিত তারিখ জানার জন্যে আবার প্রিন্ট আউটে চোখ বুলাল রানা। নভেম্বর। খারাপ খবর, ভাবল ও। ওই সময় মেডিটেরেনিয়ানের আবহাওয়া ভাল থাকার কথা নয়, ঝড়-ঝাপটা দেখা দিতে পারে। তাহলে কি ইমপেরিয়ালকেই দখল করে সোজা পোর্ট সাঈদে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু চুরি করা একটা জাহাজকে গোপনে বন্দরে ভেড়ানো সহজ হবে না, মিশর সরকার বন্দরে যতই না কেন কড়াকড়ি আরোপ করুক।

আড়চোখে রিস্টওয়াচ দেখে নিল রানা। খানিক আগে মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। কাপড় ছাড়তে শুরু করল ও, শুতে হবে। পরবর্তী কাজের একটা ধারণা দিয়ে রাখল নিজেকে। ইমপেরিয়াল সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানতে হবে। তার ক্যাপাসিটি, ক্রুর সংখ্যা, বর্তমান ঠিকানা, কে মালিক এবং যদি সম্ভব হয় তার লে-আউট। কাল লন্ডনে যাবে ও। লন্ডনের লয়েড'স জাহাজ সম্পর্কে যে-কোন তথ্য দিতে পারে।

আরও একটা ব্যাপার জানা দরকার। ইউরোপে কারা ওকে অনুসরণ করছে? ফ্রান্সে বেশ বড়সড় একটা দল ওর পিছু নিয়েছিল। আজ রাতে নাইটক্লাব থেকে বেরিয়ে আসার পর বুলডগ চেহারার এক লোককে পিছনে দেখেছে ও। সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারেনি সত্যি ওকে অনুসরণ করছিল কিনা। খানিক পর লোকটাকে আর দেখা যায়নি। অকারণ সন্দেহ, নাকি আরও একটা বড় টীম? আসলে, ন্যাট কোহেন এসপিওনাজ জগতের বাসিন্দা কিনা তার ওপর নির্ভর করছে

এসব প্রশ্নের উত্তর। ইংল্যান্ডে এ-ব্যাপারেও খোঁজ-খবর করতে পারবে ও।

ইংল্যান্ডে কিভাবে পৌঁছনো যায় তাই নিয়ে খানিক চিন্তা করল ও। আজ যদি কেউ ওর গন্ধ পেয়ে থাকে, কাল ওকে যতটা সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। বুলডগ যদি কাকতালীয় ব্যাপারও হয়, লুক্সেমবার্গ এয়ারপোর্টে কেউ যাতে ওকে চিনতে না পারে সে-ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

ফোনের রিসিভার তুলে ডেস্কের নাম্বার চাইল রানা। ক্লার্ককে অনুরোধ করল, 'আমাকে সাড়ে ছ'টার সময় জাগিয়ে দেবেন, প্লীজ।'

'ভেরি গুড, স্যার।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে বিছানায় উঠল রানা। শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট একটা টার্গেট পেয়ে গেছে ও—ইমপেরিয়াল। এখনও কোন প্ল্যান তৈরি করেনি, কিন্তু মনের ভেতর কাঠামোটা চেহারা পেতে শুরু করেছে। নতুন যত অসুবিধেই দেখা দিক, নন-নিউক্লিয়ার কনসাইনমেন্ট আর সমুদ্রভ্রমণ দুটো মিলে একটা লোভনীয় টোপ হয়ে দেখা দিয়েছে ওর সামনে—হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওকে।

আলো নিভিয়ে দিয়ে চোখ বুজল রানা, ভাবল, কী ভাল একটা দিন!

আট

রিচির ওপর রেগে আছে কোহেন, কিন্তু সেটা প্রকাশ করতে রাজি নয়। তার সাথে খারাপ ব্যবহারের প্রতিশোধ নেবে সে, কিন্তু এখন নয়। মাঝখানে যা খুশি করে যাক, শেষ দিকে এমন একটা ছোবল মারবে, চিরকাল মনে রাখবে জ্যাক রিচি।

সি.আই.এ.-র এজেন্ট বলে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে রিচি। নিজের সমতুল্য তো নয়ই, কোহেনকে সে সহকারীদেরও এক ধাপ নিচের পর্যায়ে বসাতে চায়। আপাতত এটা মেনে না নিয়েও উপায় নেই কোহেনের। ইচ্ছে করলে অভিযোগ করতে পারে সে, কিন্তু তাতে হিতে বিপরীত হবার ভয় আছে। অ্যাসাইনমেন্ট থেকে রিচিকে নয়, তাকেই হয়তো বাদ দেয়া হবে। রিচির এত উন্নাসিকতার কারণ কি বুঝতে পারে কোহেন। সি.আই.এ. একটা বিশাল ব্যাপার, এসপিওনাজ জগতের সেই বিশাল সাম্রাজ্যে বড় একটা পদ দখল করে আছে সে। কিন্তু তাই বলে ছাত্র-জীবনের বন্ধুত্বের কথা তুই ভুলে গেলি? ভুলে গেলি, মাসুদ রানাকে এই কোহেনই প্রথম দেখে, তা না হলে এই ইনভেস্টিগেশনের প্রয়োজনই হত না?

এত সবের পরও রিচির শ্রদ্ধা আর প্রশংসা পাবার জন্যে কাজ করতে চায় কোহেন। ওর ওপর রিচির আস্থা বাড়ুক, কাজ কতটা এগোল তা নিয়ে ওর সাথে আলাপ করুক, ওর মতামত নিক—তা না হলে অন্ধকারে থাকতে হবে ওকে। আর রিচির আস্থা পেতে হলে নিজেকে যোগ্য আর প্রফেশন্যাল এজেন্ট হিসেবে প্রমাণিত করতে হবে।

ফোন বেজে উঠল। দ্রুত হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলল কোহেন। 'হ্যালো?'

'আমাদের উনি ওখানে আছেন?' জানতে চাইল হিলারী।

'বাইরে গেছে। ঘটনাটা কি?'

খানিক ইতস্তত করে হিলারী জানতে চাইল, 'কখন ফিরবেন?'

'জানি না,' মিথ্যে বলল কোহেন। 'তুমি আমাকে রিপোর্ট দাও।'

আবার কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করে হিলারী বলল, 'ঠিক আছে। আমাদের মক্কেল জুরিখে পৌঁছে ট্রেন থেকে নামে।'

'জুরিখে? বলে যাও।'

'ট্যাক্সি নিয়ে একটা ব্যাংকে আসে সে, ভেতরে ঢোকে, তারপর সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায় একটা ভল্টে। এই ব্যাংকে সেফ-ডিপোজিট বক্স আছে। হাতে একটা ব্রিফকেস নিয়ে বেরিয়ে আসে মক্কেল।'

'বেশ। তারপর?'

'শহরের শেষ মাথায় একজন কার ডিলারের কাছে যায় সে, তার কাছ থেকে একটা রিকন্ডিশন্ড ই-টাইপ জাগুয়ার কেনে। ব্রিফকেস থেকে টাকা বের করে গাড়ির দাম মেটায়।'

'বলে যাও।' কি ঘটেছে তা এরই মধ্যে আন্দাজ করতে পারছে কোহেন। মনে মনে বলল, শালারা! আমাকে তোমরা গ্রাহ্যই করো না! আমি নাকি অযোগ্য! তোমরা কি?

'গাড়ি নিয়ে জুরিখ থেকে বেরিয়ে যায় সে, ই-সেভেনটিন অটোবানে উঠে গাড়ির স্পীড বাড়াতে শুরু করে। ঘণ্টায় একশো চল্লিশ মাইল গতিতে...'

'থাক, আর কপচাতে হবে না। বুঝেছি!' ব্যঙ্গ করার এই মোক্ষম সুযোগ হাতছাড়া করল না কোহেন। 'শিকারকে কেটে পড়তে দিয়েছ তোমরা, এই তো? খুব ভাল কাজ করেছ!' আনন্দ এবং উদ্বেগ, একাধারে দুটোই অনুভব করল সে।

'আমাদের কি দোষ! ট্যাক্সি আর দূতাবাসের একটা মার্সিডিজ নিয়ে পিছু ধরেছিলাম আমরা...'

কল্পনায় ইউরোপের রোড ম্যাপের ওপর চোখ বুলাতে শুরু করল কোহেন। 'কোথায় গেছে সে, বলা মুশকিল। ফ্রান্স, স্পেন, জার্মানী, স্ক্যান্ডিনেভিয়া...এই সব দেশের যে-কোন একদিকে যেতে পারে—অবশ্য যদি না আবার ফিরতি পথ ধরে ইতালী, অস্ট্রিয়ার দিকে এসে থাকে। তার মানে, নাগালের বাইরে চলে গেছে সে। কি আর করা, বেসে ফিরে এসো তোমরা।' তার কর্তৃত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার আগেই রিসিভার নামিয়ে রাখল কোহেন।

সি.আই.এ.-র অযোগ্যতা প্রমাণিত হওয়ায় খুশি হয়েছে কোহেন, কিন্তু তার এই খুশি বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। রানা আবার পালিয়েছে, এই দুশ্চিন্তায় গরম হয়ে উঠল তার মাথা।

এ-ব্যাপারে কি করা যায় ভাবছিল, এই সময় ফিরল রিচি।

'নতুন কি?' জানতে চাইল কর্নেল।

'তোমার লোকেরা রানাকে হারিয়ে ফেলেছে।' হাসিটা গোপন করে গেল কোহেন।

চেহারা ঝুলে পড়ল রিচির। 'কিভাবে?'

সংক্ষেপে বর্ণনা করল কোহেন।

ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে জানতে চাইল রিচি, 'এখন ওরা তাহলে কি করছে?'

'আমি বললাম, ওরা এখানে ফিরে আসতে পারে। বোধহয় ফেরার পথেই রয়েছে।'

মাথার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে রিচি বলল, 'হুঁ।'

'এখন কি করব আমরা?' জানতে চাইল কোহেন।

'নিশ্চয়ই খই ভাজব না!' অকারণে চটে উঠে বলল রিচি। 'রানাকে আবার খুঁজে বার করতে হবে।'

'তা তো বটেই,' বলল কোহেন। 'কিন্তু তাছাড়াও আর কি করতে পারি আমরা?'

'কি বলতে চাও, পরিষ্কার করে বলো।'

'আমার ধারণা, ডেলিভারিম্যানকে পাকড়াও করা উচিত। ধরে একটু চাপ দিলেই বাপ বাপ করে বলে দেবে কি দিয়েছে রানাকে।'

পায়চারি শুরু করল রিচি। ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে মাথা। চিন্তিতভাবে বলল, 'ঠিক।' লক্ষ্য করল, কোহেনের চেহারায় খুশির ভাব ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

'তাকে আগে খুঁজে বের করতে হবে...'

'সেটা তেমন কঠিন হবে না,' বলল রিচি। 'নাইটক্লাব, এয়ারপোর্ট, আলফা হোটেল আর জেন-মোনেট বিল্ডিঙের ওপর দিন কয়েক নজর রাখলেই...'

'ঠিক বলেছ!'

'বুদ্ধিটা তোমার মাথায় এসেছে, সেজন্যে তোমার ধন্যবাদ পাওয়া উচিত,' বলল রিচি।

গর্ব অনুভব করল কোহেন। ভাবল, আসলে হয়তো লোক হিসেবে অতটা খারাপ নয় রিচি।

ক'বছর আগে দেখা অক্সফোর্ড শহরটাকে আগের মতই লাগল রানার। রাস্তায় রাস্তায় দামী গাড়ির ভিড়, দোকানগুলো রাজ্যের বিচিত্র সব পণ্য-সম্ভার নিয়ে ঝলমল করছে। কলেজ ভবনগুলোর ক্রীম কালার শরীর আগের চেয়ে একটু ম্লান মনে হলো, পাথরে কালের আঁচড় পড়লে যা হয়। খিলানের ভেতর ছোট বড় সবুজ মাঠ, রোদে পিঠ দিয়ে বসে আছে ছাত্র-ছাত্রীরা। ওদেরকে আগের মতই লাগল। বেল-বটম ট্রাউজার আর হাইহিল জুতোর জনপ্রিয়তা এখনও তুঙ্গে। উল্টোটাও চোখে পড়ল। কারও কারও পা একেবারে খালি, কেউ কেউ মোজা ছাড়া অদ্ভুত আকৃতির স্যান্ডেল পরে হাঁটছে। কোন কোন ছেলে-মেয়ে আঁটসাঁট ট্রাউজার পরেছে, দেখতে আসলে বিচ্ছিরিই লাগে। সবচেয়ে মজা লাগে এদের চুল দেখে। শুধু যে কানের নিচে পর্যন্ত নেমেছে তাই নয়, অনেক ছেলের পিঠ প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। অন্তত দু'জন ছাত্রকে দেখতে পেল, চুল বেণী করেছে তারা। কেউ কেউ আবার ওপর আর বাইরের দিকে বাড়তে দিয়েছে চুল, গোল আকৃতির অসংখ্য চুলের বন্ধনী তৈরি হয়েছে মাথায় এবং মুখের চারপাশে, দেখে যাতে মনে হয় ঝোপের মাঝখানে একটা

গর্ত থেকে মুখ বের করে আছে।

কলেজ এলাকা হয়ে আবাসিক এলাকায় চলে এল রানা। এদিকে তার অনেক বছর আসা হয়নি, কিছু চেনা কিছু অচেনা লাগল। ছোট ছোট অনেক ঘটনার স্মৃতি নিজের অজান্তেই ভিড় করে এল মনে। সেই সাথে মনে পড়ল অপরূপ সুন্দর একটা মুখের ছবি।

দ্রুত পা চালাল রানা। রাজিয়া ফিলমনটনরা কি এখনও সেই বাড়িতে আছেন? অনেক বয়স হয়েছিল প্রফেসর ফিলমনটনের, তিনি কি বেঁচে আছেন? ওদের কোন সন্তান ছিল না, কিন্তু পরে কি হয়েছিল এক-আধজন? বাড়িটা দূর থেকে দেখতে পেয়ে হাঁটার গতি আপনাআপনি শ্লথ হয়ে এল। ধীর পায়ে সামনে এসে দাঁড়াল রানা। যেমন ছিল তেমনি আছে, একটু বদলায়নি। সবুজ আর সাদায় রঙ করা দেয়াল, বাগানে আজও আছে কিছু ঝোপ-ঝাড়, সবুজ ঘাস এখনও তেমনি সবুজ আর নরম। গেট খুলে উঠানে চলে এল রানা। একটু দ্বিধা, একটু সংকোচ বোধ করছে ও। এতদিন কোথায় ছিলে, খবর নাওনি কেন?—রাজিয়া ফিলমনটন জিজ্ঞেস করলে কি উত্তর দেবে সে? যদি বলে, উত্তর জানা নেই, তিনি কি তা বিশ্বাস করবেন? সরু পথটা ধরে দরজা পর্যন্ত হেঁটে এল রানা। কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করল, তারপর হাত বাড়িয়ে টোকা দিল দরজায়।

টোকা দিয়েই উপলব্ধি করল, কাজটা বোকার মত করছে সে। প্রফেসর হয়তো অন্য কোথাও চলে গেছেন, মারা গিয়েও থাকতে পারেন, কিংবা হয়তো ছুটিতে আছেন। উচিত ছিল আগে ইউনিভার্সিটিতে খবর নেয়া। ভেতর থেকে কোন সাড়া নেই দেখে ভাবল, ফিরে যাবে নাকি?

দরজা খুলে গেল। অতীত থেকে ফিরে এল অতি পরিচিত একটা মুখ। জানতে চাইল, 'কাকে চাই?'

বিস্ময়ের ধাক্কায় হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল রানার, ঝুলে পড়ল মুখ। নিজের অজান্তেই শরীর একটু দুলে উঠল, তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে দেয়ালটা ধরে ফেলল ও। স্তম্ভিত বিস্ময়ে নিঃশ্বাস ফেলতেও ভুলে গেছে।

আগের মতই অপরূপ সুন্দর, বয়স যেন একদিনও বাড়েনি!

অবিশ্বাস ভরা গলায় রানা বলল, 'মিসেস ফিলমনটন…?'

রানাকে দেখে অনেক ভাবনা খেলে গেল মেয়েটার মনে। এই যুবক অত্যন্ত পরিচিত, নিশ্চয়ই এর আগে কোথাও দেখেছে, কিন্তু কোথায় তা স্মরণ করতে পারল না। তারপর রানার চেহারা, ভাব-ভঙ্গি ইত্যাদি খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল সে। ভারি সুন্দর স্বাস্থ্য, এক ছটাক মেদ নেই শরীরের কোথাও। আর চোখ, এ কেমন চোখ! মানুষের চোখে এত জাদু, এত মায়া থাকে! পরমুহূর্তে নিজের কাছেই লজ্জা পেল মেয়েটা। ধেত্তেরি, এসব কি ভাবছে সে! এতক্ষণে লক্ষ্য করল, আগন্তুক যুবক তাকে দেখে বিস্ময়ে একেবারে পাথর হয়ে গেছে। এই অভিজ্ঞতার সাথে পরিচয় আছে তার, তাকে দেখে অনেক লোকই এই ভুল করে। বলল, 'না, আমি মিসেস রাজিয়া ফিলমনটন নই, আমি এষা।'

'এষা!'

'লোকে বলে এই বয়সে মা নাকি ঠিক আমার মতই দেখতে ছিল,' বলল মেয়েটা। 'আপনি নিশ্চয়ই তাকে চিনতেন। ভেতরে আসবেন?'

এতক্ষণ অনেকটা স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে ছিল রানা, ঘোলা বুদ্ধি ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হয়ে এল। মেয়েটাকে খুঁটিয়ে দেখল ও। এযা যে শুধু মায়ের অপরূপ সুন্দর চোখই পেয়েছে তা নয়, সেই সাথে চেহারার সামান্য একটু খুঁতও যেমন পেয়েছে, দুধে-আলতায় মেশানো গায়ের রঙ আর তেমনি নদীর দু-কূল ছাপানো যৌবনও পেয়েছে। হুবহু এক! খোদার দুনিয়ায় নারী এক আশ্চর্য সৃষ্টি, দুর্লভ এমনি দু'একটা মেয়ে হঠাৎ চোখে পড়ে গেলে কথাটা বেশি করে মনে পড়ে। অনুভব করল, ওর হাতের তালু ঘামতে শুরু করেছে। সেই সাথে কেমন যেন আড়ষ্ট লাগছে, কাঁপুনি ধরে গেছে বুকের ভেতরে।

এষা দেখল, নড়া-চড়া করবে সে-শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে মানুষটা। বুঝল, বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠেছে সে, কিন্তু দ্বিতীয় ধাক্কাটা এইমাত্র লাগতে শুরু করেছে। সম্ভবত মেয়ে আর অসাধারণ লাবণ্যময়ী বলেই নিজের চেহারার প্রভাব সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখে এষা, রানার অবস্থা দেখে বুঝতে অসুবিধে হলো না, তার রূপ ওকে হতবাক করে দিয়েছে। গর্ব এবং লজ্জা, দুটোই অনুভব করল এষা। এই প্রথম মনে মনে একটু আশ্চর্য হলো। ব্যাপারটা কি? এর আগে তো আর কারও সামনে এমন লজ্জা পায়নি সে!

'আমি রানা, মাসুদ রানা,' মৃদু হেসে বলল রানা।

'হাউ ডু ইউ ডু?' দেখাদেখি এষাও হাসল। 'আপনি ভেতরে···।' নামটার তাৎপর্য হঠাৎ করে উপলব্ধি করল সে। এবার তার বিস্মিত হবার পালা। 'মাসুদ রানা! মাই গড!' সিঁড়ির দুটো ধাপ টপকে এসে খপ করে রানার হাত চেপে ধরল এষা। প্রচণ্ড ইলেকট্রিক শক খেল যেন রানা। সারা শরীর ঝিম ঝিম করতে লাগল ওর। 'সেজন্যেই তোমাকে আমার চেনা চেনা লাগছিল!'

'কিন্তু···' বোকার মত থেমে গেল রানা। মুখে কথা সরছে না। ওর হাতটা যেখানে ধরে আছে এষা, সেখানে যেন আগুন জ্বলছে। এ কী হলো ওর!

'আগে ভেতরে এসো তো,' বলে একরকম টেনেই রানাকে নিয়ে চলল এষা। বৈঠকখানায় ঢুকেও রানার হাত ছাড়ল না সে, দরজাটা এক হাত দিয়ে বন্ধ করে ওকে সোজা নিয়ে চলে এল কিচেনে। 'কেক বানাতে গিয়ে সব লণ্ডভণ্ড করে ফেলেছি!' রানাকে ছেড়ে দিয়ে খটাস করে ওর সামনে একটা টুল দিল। 'বসো।'

বসল রানা। ধীরে-সুস্থে এদিক ওদিক তাকাল। কত বছর আগের কথা, তবু অনেক কিছুই চিনতে পারল ও। সেই কিচেন টেবিল, ফায়ারপ্লেস, জানালার বাইরে ডালিম গাছটা। দৃষ্টি ফিরে এল এষার দিকে। ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল এষা, ধরা পড়ে গিয়ে লজ্জা পেল।

'কফি?' তাড়াতাড়ি বলল এষা। 'নাকি চা খাবে?'

'কফি, প্লীজ। ধন্যবাদ।'

গ্যাসের চুলোয় কফির পানি চড়িয়ে দিয়ে কিচেন থেকে বেরিয়ে এল এষা। যাবার সময়, দরজার কাছ থেকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানার দিকে। দু'জনেই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থেকে অনুভব করল, তাকাবার লোভ দু'জনের কেউই

সামলাতে পারছে না।

এক মিনিট পর ফিরে এল এষা, হাত দুটো পিছনে, কি যেন লুকিয়ে রেখেছে। রানার সামনে এসে দাঁড়াল সে। দম আটকে আসার অনুভূতিটা আবার ফিরে এল রানার মধ্যে। ঝট্ করে হাত দুটো সামনে নিয়ে এসে রানার চোখের সামনে একটা খোলা অ্যালবাম ধরল এষা।

অনেক বছর আগে তোলা নিজের ফটোর দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। মনে পড়ল, এই ছবিটা রাজিয়া ফিলমনটন নিজের হাতে তুলেছিলেন।

'তোমার এই ছবি ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি আমি,' বলল এষা। 'দেখেই চিনতে পারিনি কারণ তুমি অনেক বদলে গেছ। বাবা কিন্তু এখনও তোমার গল্প করে।'

'উনি...?'

'আজ সকালে বাবার ক্লাস আছে। লাঞ্চের সময় ফিরবে।' মুখে কথা বলছে এষা, হাত দুটো কফি বানাতে ব্যস্ত, আর চোখ দিয়ে উপভোগ করছে রানাকে। 'তোমাকে দেখে যা খুশি হবে না!'

খানিক ইতস্তত করে জানতে চাইল রানা, 'আর মিসেস ফিলমনটন?'

'মা বছর দশেক আগে মারা গেছে। ক্যানসার।' তাকিয়ে থেকে রানার প্রতিক্রিয়াটা লক্ষ্য করল এষা। আমি দুঃখিত বা এই ধরনের কিছু রানার মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে বলে আশা করছিল ও। তেমন কিছু ঘটল না। কিন্তু চেহারা আর চোখে বিষাদের ছায়া ফুটল। বুঝতে অসুবিধে হয় না, সাংঘাতিক মন খারাপ হয়ে গেছে রানার। এর জন্যে রানাকে অন্য পরিচিত সবার চেয়ে আলাদা এবং ভাল লাগল এষার। 'তোমাকে বোধহয় খুব ভালবাসত মা? প্রায়ই তোমার গল্প করত। প্রায়ই।'

রানা ভয় পাচ্ছিল, মেয়েটা বোধহয় অভিযোগ করে বসবে, এতদিন খবর নাওনি কেন? কিন্তু সে-ধরনের কোন প্রসঙ্গ তুলল না সে। এর জন্যে মেয়েটাকে আরও ভাল লাগল ওর।

'তুমি বুঝি ছুটিতে আছ?' রানার হাতে কফির কাপ ধরিয়ে দিয়ে জানতে চাইল এষা।

'না,' বলল রানা। 'ব্যবসা করতে এসেছি।' কাপটা ধরল ও, কিন্তু এষা সেটা তখুনি ছাড়ল না। বিদ্যুৎ চমকের মত মনে পড়ে গেল, এই অভ্যেস রাজিয়া ফিলমনটনেরও ছিল। তিনি ওকে ছেলেমানুষ মনে করতেন, ভাবতেন কাপ ছেড়ে দিলেই রানা সেটা হাত থেকে ফেলে দেবে।

আঙুলে আঙুলে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেল। চোখাচোখি হতে দৃষ্টি সরিয়ে নিল দু'জনেই।

'তুমি ব্যবসায়ী?' আড়ষ্ট ভাবটা কাটাবার জন্যে অকারণ উৎসাহ দেখাল এষা। 'কিসের ব্যবসা করো তুমি?'

'পাট বেচি। বাজার যাচাই করতে এসেছি। তোমার সম্পর্কে বলো। তুমি যে ইউনিভার্সিটির প্রফেসর নও এ আমি বাজি ধরে বলতে পারি।'

আগের চেয়ে অনেক সহজ হয়ে এসেছে রানা, লক্ষ করে খুশি হলো এষা।

খিলখিল করে হেসে উঠল সে, বলল, 'কেন, কেন? কি দেখে কথাটা মনে হলো তোমার?'

'তোমার বয়স কম,' হেসে ফেলে বলল রানা। 'তাছাড়া, ভারী চঞ্চল।'

'বাবার ইচ্ছে ছিল আমিও তার মত একজন প্রফেসর হব, কিন্তু নিজেই বুঝি তার মত অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন জয় করা আমার কম্মো নয়। কাজেই এয়ারহোস্টেস হয়েছি।' হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে জানতে চাইল, 'তোমরা যে যুদ্ধটা করে স্বাধীন হলে তাতে তোমার কোন অবদান ছিল?'

'সামান্য।' এষার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানা। সেই কখন একবার চুমুক দিয়েছে কফির কাপে, তারপর আর মনে নেই।

আবার লজ্জা অনুভব করল এষা। 'তোমার কফি কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

ব্যাপারটা নির্লজ্জের মত হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি বলল রানা, 'তোমার দিকে তাকিয়ে আছি, কারণ আঁকা ছবির মত লাগছে তোমাকে। তুমি রাজিয়া ফিলমনটন নও, এই বাস্তবতার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করছি।'

এই যুবক এখন যদি চলে যায়, একা একা নিজের মাথার চুল ছিঁড়ব আমি, ভাবল এষা। ফাঁকা ছবির মত—প্রশংসা অনেক শুনেছে সে, কিন্তু ঠিক এই আন্তরিক ভাষা আর মার্জিত ভঙ্গিতে নয়।

ঘন ঘন চুমুক দিয়ে কাপটা খালি করে এষার হাতে ফিরিয়ে দিল রানা। ডিশওয়াশার খুলে কাপ আর পিরিচগুলো তাতে ফেলতে যাবে এষা, পিরিচ থেকে পিছলে গেল একটা চামচ। টুং-টাং শব্দ তুলে নাচের ভঙ্গিতে বড়সড় ফ্রিজারের তলায় গিয়ে ঢুকল সেটা।

'ধ্যেৎ!'

টুল থেকে নেমে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে ফ্রিজারের তলাটা দেখতে চেষ্টা করল রানা।

'ওটা চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেছে,' বলল এষা। 'হাতি দিয়ে চেষ্টা করলেও এক চুল নড়ানো যাবে না ওই ফ্রিজার।'

এক হাত দিয়ে ফ্রিজারের একটা কোণ উঁচু করল রানা, আরেক হাত তলায় ভরে দিয়ে বের করে আনল চামচটা। ফ্রিজার মেঝেতে নামিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল ও, এষার হাতে গুঁজে দিল চামচ।

চোখে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল এষা। 'কে তুমি… মিস্টার ইউনিভার্স? না, ক্যাপ্টেন আমেরিকা? দুনিয়ার সবচেয়ে ভারী জিনিস বলতে বাড়ির লোকেরা ওটাকেই বোঝায়!'

'অবসর সময়ে হাতুড়ি-করাত নিয়ে কাজ করি, এই আর কি,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'ক্যাপ্টেন আমেরিকার কথা তুমি জানলে কিভাবে? ছেলেবেলায় আমার রক্তে আগুন ধরিয়ে রেখেছিল…'

'এখনও তার প্রতাপ কমেনি। যাই বলো, কমিকগুলোর শিল্পকর্ম কিন্তু ফ্যানটাসটিক।'

'কিন্তু আমাদেরকে ওগুলো লুকিয়ে পড়তে হত, কারণ তখন ওগুলোকে ট্র্যাশ বলা হত। আজ সেই জিনিসই আর্ট হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। পাওয়াই উচিত।'

'সত্যি তুমি কার্পেন্ট্রি ভালবাস?' হঠাৎ জানতে চাইল এষা। 'কিন্তু দেখে মনে হয়, ওয়েস্টার্ন ছবির নায়কের ভূমিকায় তোমাকে চমৎকার মানিয়ে যাবে।'

'কই, কেউ তো অফার করল না!'

হেসে উঠল এষা। তারপর চট করে রিস্টওয়াচ দেখল সে। আরে, রীতিমত আশ্চর্য লাগল তার, এতটা সময় কাটল কখন! 'বাবার ফেরার সময় হয়েছে। তুমি কিন্তু আমাদের সাথে খাবে। যদিও, শুধু স্যান্ডউইচ।'

'শুধু স্যান্ডউইচের কথা বলে তোমার মা আমার সামনে যা দিতেন, চারজনের পক্ষেও খেয়ে শেষ করা সম্ভব হত না,' বলল রানা।

'তাই বুঝি?'

একটা ফ্রেঞ্চ রুটি কেটে রেখে সালাদ তৈরি করতে বসল এষা। ধনে শাকগুলো ধুয়ে ফেলার প্রস্তাব দিল রানা। ওকে একটা অ্যাপ্রন নিয়ে এসে দিল এষা। দু'জনেই কাজ করছে, কিন্তু চুরি করে দু'জনেই পরস্পরকে দেখে নিচ্ছে। এ ওর কাছে মাঝে মধ্যে ধরাও পড়ে যাচ্ছে। এই সময় কিচেনের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন প্রফেসর ফিলমনটন।

আরও বুড়িয়ে গেছেন প্রফেসর, কয়েক গোছা ধবধবে সাদা চুল ছাড়া গোটা মাথায় টাক পড়েছে। আকারেও আগের চেয়ে একটু ছোট হয়ে গেছেন তিনি। চলাফেরায় শ্লথ, অলস একটা ভাব সহজেই চোখে পড়ে। কিন্তু চেহারায় এবং দৃষ্টিতে এখনও সেই বুদ্ধিমত্তা আর কৌতূহলের ছাপ স্পষ্ট।

'একজন সারপ্রাইজ গেস্ট, বাবা,' বলল এষা।

রানার দিকে তাকালেন প্রফেসর, সময় না নিয়ে বললেন, 'রানা! আমি খুশি হয়েছি, মাই ডিয়ার ফেলো!'

হ্যান্ডশেক করল রানা। বুড়োর মুঠো এখনও লোহার মত শক্ত। 'কেমন আছেন আপনি, প্রফেসর?'

'ফুর্তিতে আছি, ডিয়ার বয়। বিশেষ করে আমার লক্ষ্মী মেয়েটা যখন দেখ-ভাল্ করার জন্যে রয়েছে। এষাকে বোধহয় এই প্রথম দেখছ তুমি, তাই না?'

'জ্বী।'

'এরই মধ্যে অ্যাপ্রন পরিয়ে ছেড়েছে দেখছি!' সকৌতুকে বললেন প্রফেসর। 'ওর খপ্পরে পোড়ো না, তোমার ভালর জন্যেই বলছি, একেবারে নাস্তানাবুদ করে ছাড়বে।'

'বাবা!' কৃত্রিম রাগে ফোঁস করে উঠল এষা।

'আমি কিছু মিথ্যে বলেছি, বল্?' সহাস্যে বললেন প্রফেসর। রানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'কেউ বাড়িতে এলে হয়, তাকে দিয়ে বাজার করানো থেকে শুরু করে জুতো সেলাই পর্যন্ত কিছু করাতে আর বাকি রাখে না।' মেয়ের দিকে ফিরলেন এবার। 'রানাকে তুমি মা ওদের দলে ফেলো না। ও আমাদের মেহমান।'

'আপনি শুধু শুধু ওকে…'

রানার দিকে ফিরে একটা চোখ টিপলেন প্রফেসর, তারপর বললেন, 'অ্যাপ্রনটা খুলতে হলে এষার বোধহয় অনুমতি লাগবে। তারপর এসো, নিরিবিলিতে

বসে আমরা একটু গল্প জুড়ি।'

'আমার কাছ থেকে মেহমানকে ভাগিয়ে নিতে হলেও অনুমতি লাগবে,' বলল এষা। 'আর কফি খেতে চাইলেও অনুমতি দেয়া হবে না—তাতে খিদে নষ্ট হবে।'

বাপ-বেটির রসিকতাটুকু ভাল লাগল রানার। অ্যাপ্রন খুলে প্রফেসরের পিছু পিছু বৈঠকখানায় এসে ঢুকল ও। সোফায় বসলেন প্রফেসর, রানাকে সামনেরটায় বসতে ইঙ্গিত করে জানতে চাইলেন, 'তোমার খবর কি শোনাও দেখি?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিজের সম্পর্কে কিছু মিথ্যে কথা বলতে হলো রানাকে। এই সময় নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল ও, প্রফেসরকে কিছু বুঝতে না দিয়ে তার কাছ থেকে তথ্য যোগাড় করার জন্যে এখানে এসেছে সে। প্রায় আড়াই ঘণ্টা কাজের কথা বেমালুম ভুলে ছিল। এখন যখন মনে পড়েছে···কিন্তু ধীরে, বৎস, ধীরে! তাড়াহুড়ো করলে প্রফেসরের মনে সন্দেহ দেখা দিতে পারে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা, বিশ্ব-রাজনীতি থেকে শুরু করে ইরাক-ইরান যুদ্ধ, ইসরায়েলের উন্নতি, এমনকি ফারাক্কা সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা হলো। নীতিগতভাবে প্রফেসর ইসরায়েলের সমর্থক, জানে রানা, সেজন্যেই ইসরায়েল সম্পর্কে আলোচনার সময় কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকল ও। নিজের প্রশ্নগুলো তোলার আগেই লাঞ্চের জন্যে ডাকল এষা। তার ফ্রেঞ্চ স্যান্ডউইচ বিশাল আর অত্যন্ত সুস্বাদু লাগল। এর সাথে লাল ওয়াইনের একটা বোতল খুলে দিল সে।

কফির কাপ নেবার সময় আবার আঙুলে আঙুলে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেল। কাপে চুমুক দিয়ে প্রফেসরকে বলল রানা, 'আমার এক পুরানো সঙ্গীর সাথে হঠাৎ করে দেখা হয়ে গেল ক'দিন আগে—এত থাকতে লুক্সেমবার্গে।'

'নিশ্চয়ই ন্যাট কোহেনের সাথে?' জানতে চাইলেন প্রফেসর।

'বুঝলেন কিভাবে?'

'একমাত্র ওর সাথেই যোগাযোগ আছে আমার এখনও। আমি জানি ও লুক্সেমবার্গে থাকে।'

'ওর সাথে বুঝি প্রায়ই দেখা হয় আপনার?' জিজ্ঞেস করল রানা, নিজেকে আবার সাবধান করে দিল, ধীরে, বৎস, ধীরে!

'বছরে বারকয়েক তো হয়ই। আগের মত নেই আর, কেমন যেন হয়ে গেছে ও,' বলে ছোট একটা কেস থেকে দামী একটা চুরুট বের করলেন প্রফেসর। ইঙ্গিতে রানাকে দেখালেন সেটা, আপনমনে একগাল হাসলেন। 'এষা সাংঘাতিক কড়া শাসনে রেখেছে আমাকে, সারাদিনে দুটোর বেশি চুরুট ধরালে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দেয়।'

'কেমন যেন হয়ে গেছে?' প্রফেসরকে আবার কোহেন প্রসঙ্গে ফিরিয়ে আনতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ। তোমার মনে আছে, ইসরায়েলের পক্ষ নিয়ে লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিত কোহেন?' জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর। মাথা ঝাঁকিয়ে রানা ভাবল, আর আপনি তার প্রতিটি কথায় সায় দিতেন। 'কিন্তু আজকাল সে রাজনীতি সম্পর্কে কোন আলোচনায় থাকতেই চায় না। আমার কাছে একটু অবাকই লাগে।'

সন্দেহ বাড়ল রানার, কোহেন বোধহয় এসপিওনাজ জগতেরই লোক। বলল, 'আমার হাতে সময় ছিল না, প্লেন ধরার সময় পেরিয়ে যাচ্ছিল—ওর আর সব খবর কি?'

'বলে আর্থিক অবস্থা তেমন সুবিধের যাচ্ছে না, কিন্তু কাজ-কর্ম নিয়ে ছুটোছুটিও তো কম করে না। লন্ডনে হয়তো বেড়াতে এল, বলল, দিন কয়েক থাকব, কিন্তু পরদিনই একটা টেলিফোন পেয়ে অন্ধের মত ছুটল। আমার গত জন্মদিনে ওকে দাওয়াত করার জন্যে কত জায়গাতেই না খোঁজ করলাম, কিন্তু কোন হদিসই করতে পারলাম না। এ-ধরনের দুর্বোধ্য অনুপস্থিতির ঘটনা দু'একবার আরও ঘটেছে। জিজ্ঞেস করলে জবাব এড়িয়ে যায়। হতে পারে এত বয়সে বিয়ে না করার ফল।'

'হতে পারে,' বলল রানা। এখন ও বাজি ধরে বলতে পারে, ন্যাট কোহেন একজন সিক্রেট এজেন্ট। বুঝল, লুক্সেমবার্গে তার সাথে দেখা হয়ে যাওয়ায় ওর পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে। 'জ্যাক রিচির কোন খবর জানেন?'

'শুনেছি সরকারী চাকরি করে, বেশ বড় পদেই,' বললেন প্রফেসর। 'কিন্তু দেখা বা চিঠিপত্র পাই না।'

'আরেকটু কফি, রানা?' জানতে চাইল এষা।

'না, ধন্যবাদ।' উঠে দাঁড়াল রানা। 'চলো, ধোয়াধুয়ির কাজে তোমাকে একটু সাহায্য করি। তারপর আমাকে লন্ডনে ফিরতে হবে। আবার দেখা হওয়ায় মনটা খুব খুশি লাগছে, প্রফেসর।'

'যতদিন বাদে এসেছ আবার যদি অতদিন বাদে আসো আমাকে দেখতে পাবে এমন কথা কিন্তু দিতে পারি না!' বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলেন প্রফেসর ফিলমনটন।

'ধোয়াধুয়ির কাজ পরে হবে'খন,' বলল এষা। 'চলো, খানিকদূর এগিয়ে দিয়ে আসি তোমাকে। দাঁড়াও, এক ছুটে কোটটা নিয়ে আসি।'

প্রফেসর রানার সাথে হ্যান্ডশেক করলেন। 'এ রিয়েল প্লেজার টু সি ইউ, ডিয়ার বয়, এ রিয়েল প্লেজার।'

ভেলভেটের একটা জ্যাকেট পরে ফিরে এল এষা। ওদের সাথে দরজা পর্যন্ত এলেন প্রফেসর। হাসি মুখে হাত নেড়ে রানাকে বিদায় দিলেন তিনি।

রাস্তায় নেমে শুধু এষাকে দেখার জন্যে কথা বলতে শুরু করল রানা। কালো ভেলভেটের ট্রাউজারের সাথে জ্যাকেটটা দারুণ মানিয়েছে এষাকে। ঢোলা ক্রীম কালারের শার্টটাও ঝলমল করছে, বোধহয় সিল্ক। এখানে ঘন কালো চুল খুব কম মেয়েরই দেখা যায়, কিন্তু এষারটা তাই। প্রায় কোমর সমান লম্বা, তার মানে যত্ন নেয়।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে এষাকে স্পর্শ করার লোভটা অদম্য হয়ে উঠল। যেন সেটা টের পেয়েই রানার হাতটা ধরে হাসল এষা। হাসিটা দেখে রানার বুকের ভেতরটা নড়ে উঠল। ওর সাথে এই প্রথম আর শেষ দেখা, কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। একই সাথে সময় আর সুযোগ আর বোধহয় ঘটবে না।

হাঁটতে হাঁটতে রানার সাথে স্টেশন পর্যন্ত চলে এল এষা। কোন কারণ ছাড়াই

জিজ্ঞেস করল রানা, 'লন্ডনে প্রায়ই যাও নাকি?'

'সেটা বড় কথা নয়,' রানার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বলল এষা। 'বড় কথা হলো, কাল যাচ্ছি।'

'কোন কাজ আছে?'

'হ্যাঁ, অনেক বড় কাজ,' বলল এষা। 'তোমার সাথে ডিনার খাব।'

লন্ডনে পৌঁছে প্যাডিংটন স্টেশন থেকে মিশরীয় দূতাবাসে ফোন করল রানা। অপারেটরকে বলল, কমার্শিয়াল ক্রেডিট অফিসের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দাও। আসলে ওই নামে কোন ডিপার্টমেন্ট নেই, মিশরীয় সিক্রেট সার্ভিসের মেসেজ সেন্টারের সাঙ্কেতিক নাম এটা। কয়েক সেকেন্ড পর এক তরুণের গলা পেল রানা। জানে কথাবার্তা সব টেপ হয়ে যাচ্ছে, তাই সরাসরি মেসেজটা আউড়ে গেল ও: 'বিল দেখা করতে চায়। প্রতিযোগিতা তুঙ্গে, তাই কেনাবেচায় মন্দা দেখা দিয়েছে। হেনরি।' উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা।

স্টেশন থেকে নিজের হোটেল পর্যন্ত হেঁটে এল ও। বুক আর মাথার ভেতরটা সারাক্ষণ দখল করে থাকল এষা ফিলমনটন। কাল সন্ধের সময় প্যাডিংটন স্টেশনে আবার ওদের দেখা হবে। কাজের কথা তুলে এড়িয়ে যাবার একটা ইচ্ছে একবার উঁকি দিয়েছিল মনে, কিন্তু সেটাকে কোন পাত্তাই দেয়নি রানা। নিজে হয়তো প্রস্তাব দিত না, কিন্তু সেটা এষার তরফ থেকে ওঠায় দেখা করার লোভ সামলানো ওর পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। লন্ডনে এক বান্ধবীর বাড়িতে উঠবে এষা, রাতটা সেখানেই কাটাবে। আরও বলে গেছে, ওর বান্ধবী নাকি শহরে নেই।

হাইড পার্কের ভেতর দিয়ে এগোল রানা। মনটা অকারণ খুশি হয়ে আছে। সেজন্যে নিজেকে একটু তিরস্কারও করল। গুরুত্বপূর্ণ একটা দায়িত্ব রয়েছে ওর কাঁধে, এর সাথে মিশর তথা গোটা মুসলিম বিশ্বের বাঁচা-মরার প্রশ্ন জড়িত—এই পরিস্থিতিতে এত ফুর্তি আসে কোত্থেকে ব্যাটার? আচ্ছা, কাল এষার সাথে স্টেশনে দেখা না করলে কেমন হয়? সাথে সাথে চিন্তাটাকে বাতিল করে দিল ও। কিন্তু উপলব্ধি করল, এষার সাথে দেখা করার পক্ষে নিজেকে কোন যুক্তি দিতে পারল না সে।

কাজের কথা ভাবতে শুরু করল ও। পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে, এটা আবিষ্কার করার পর মিশরীয় সিক্রেট সার্ভিস চীফের সাথে কথা বলা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না ও। এই গুরু দায়িত্ব থেকে ওকে সরে যেতে হবে কিনা, সিদ্ধান্তটা তিনিই নেবেন।

পরদিন সকালে হোটেলের কাছাকাছি একটা ফোন বুদ থেকে মিশরীয় দূতাবাসে টেলিফোন করল রানা। মেসেজ সেন্টারের সাথে যোগাযোগ হতে বলল, 'হেনরি বলছি। উত্তর আছে?'

সেই তরুণ কণ্ঠস্বর জানাল, 'টাকা তিরানব্বই হাজার। কালকের মধ্যেই পেয়ে যাবেন।'

রানা বলল, 'আমার বক্তব্য: অ্যাকাউন্ট নাম্বার পেতে হলে এয়ারপোর্ট ইনফরমেশনের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।'

কাল সাড়ে ন'টার ফ্লাইটে আসছেন লে. জেনারেল আলি কারাম।

নয়

খোঁজ শুরু করে তিন দিনের দিন ডেলিভারি-ম্যান অর্থাৎ বগাকে দেখতে পেল নিক কুয়েল। সেদিন দুপুর থেকে জাঁ-মোনেট বিল্ডিঙের ওপর নজর ছিল তার।

রিপোর্ট পেয়ে নিজের একটা ভুল স্বীকার করল জ্যাক রিচি, 'আগেই আমার আন্দাজ করা উচিত ছিল। রানা যদি গোপন তথ্যের সন্ধানে থাকে, আলফা হোটেল বা এয়ারপোর্ট থেকে কেউ এসে সেটা তাকে দেবে না। কুয়েলকে আমার প্রথমেই ইউরাটমে পাঠানো উচিত ছিল

কথাগুলো বলা হলো মোটাসোটা, টেকো হিলারীকে, কিন্তু মন্তব্য করল ন্যাট কোহেন, 'এতদিক ভেবে সারা যায় না।'

'উচিত,' বলল রিচি। তারপর কালো, বড় একটা গাড়ি যোগাড় করার নির্দেশ দিল সে।

সেই কালো রঙের আমেরিকান বুইক গাড়িতেই এখন বসে আছে ওরা চারজন। সামনে হুইল নিয়ে ড্রাইভিং সীটে অ্যালান হিলারী, আঙুলের উল্টোপিঠ দিয়ে ড্যাশবোর্ডে টোকা দিচ্ছে সে—ঠকঠক-ঠক-ঠকঠক। তার পাশে বসে আছে কোহেন। রিচি আর কুয়েল পিছনে। কাঁকর ছড়ানো রাস্তার একধারে, একটা ফ্ল্যাটবাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছে বুইক।

ইউরাটম অফিস থেকে বগার পিছু পিছু এখানে চলে আসে কুয়েল। তারপর টেলিফোনে রিপোর্ট করে। পাঁচ মিনিট পর বুইক নিয়ে হাজির হয় ওরা তিনজন। গাড়িতে উঠে ওদের সাথে বসেছে কুয়েল, তাও প্রায় দু'ঘণ্টা হতে চলল। ফ্ল্যাটবাড়িতে সেই যে ঢুকেছে বগা, তার আর বেরোবার নাম নেই।

ছোটখাট কাজে ধস্তাধস্তি, আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার ইত্যাদি একদম পছন্দ নয় রিচির। এমনিতেও এসব ধরন-ধারণ পুরানো হয়ে গেছে। ত্রিশ-চল্লিশ সালের দিকে ভিয়েনা, ইস্তাম্বুল আর বৈরুতে এসবের চল ছিল, কিন্তু আশি সালের পশ্চিম ইউরোপে এ জিনিস একেবারেই অচল। রাস্তা থেকে একজন সিভিলিয়ানকে ছোঁ মেরে গাড়িতে তুলে নিয়ে গিয়ে বেদম মারধর করা, যতক্ষণ না তথ্য আদায় হয়—এরচেয়ে বিপজ্জনক ঝুঁকির কাজ আর কি হতে পারে? যে-কোন মুহূর্তে পথিক বা আশপাশের বাড়ির কারও চোখে পড়ে যেতে পারো তুমি, সে যদি বাধা দিতে নাও আসে, পুলিসে যে খবর দেবে এতে কোন ভুল নেই। সোজাসুজি, পরিষ্কার আর হিসেব কষা পথ ধরে হাঁটতে চায় রিচি, উটকো বিপদ এড়াতে হলে এর কোন বিকল্প নেই। গায়ের জোরের চেয়ে মাথার বুদ্ধি খাটানো তার কাছে বেশি প্রিয়। কিন্তু অন্ধকার থেকে আলোয় বেরোতে যতই দেরি করছে রানা, এই ডেলিভারি-ম্যানের গুরুত্ব প্রতি মুহূর্তে ততই বেড়ে যাচ্ছে । শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই এইরকম একটা অপ্রিয় কাজে হাত দিতে হয়েছে তাকে। এই লোকের কাছ থেকে কি

পেয়েছে রানা সেটা তাকে জানতেই হবে। আজকের মধ্যেই।

'ব্যাটা হারামখোর বেরিয়ে এলে বেঁচে যাই,' সামনের সীট থেকে বলল হিলারী। 'কাজ না করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে আমার একদম ভাল লাগে না।'

'এই অপেক্ষাও একটা কাজ,' গম্ভীর সুরে মনে করিয়ে দিল রিচি। 'এত অস্থির হবার দরকার কি? আমাদের কোন তাড়া নেই।' কথাটা সত্যি নয়, কিন্তু নিজের লোকদের অধৈর্য আর উত্তেজিত হতে দিতে চায় না সে; হলে কাজে ভুল করবে। উত্তেজনার ভাবটা দূর করার জন্যে কথা বলে চলল সে, 'রানাও ঠিক এই পদ্ধতিতে এগিয়েছে, বোঝা যায়। জাঁ-মোনেট বিল্ডিঙের ওপর নজর রেখেছিল ও, লোকটার পিছু নিয়ে তার এই বাড়ি পর্যন্ত এসেছিল, আমরা এখন যা করছি ও-ও তাই করেছে, তারপর আবার যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে লোকটা, তার পিছু নিয়ে পৌঁচেছে ড্রিমল্যান্ড নাইটক্লাবে। আমার বিশ্বাস, ওই ক্লাবে গিয়ে ঘটনাচক্রে লোকটার একটা মারাত্মক দুর্বলতার কথা জানতে পারে রানা। সেটাকে পুঁজি করে নিজের কাজ আদায় করতে কোন অসুবিধে হয়নি ওর।'

পাশ থেকে কুয়েল বলল, 'কিন্তু গত দু'রাত ওই নাইটক্লাবে যায়নি লোকটা।'

'হয়তো রানার মন যুগিয়েও ভয় কাটেনি তার,' বলল রিচি।

প্রায় আটটার মত বাজে। সবচেয়ে কাছের লাইট পোস্টের বালবটা নষ্ট হয়ে গেছে, জ্বলছে না। কিন্তু রাস্তায় আলো আছে যথেষ্ট। গাড়ির জানালা দিয়ে বাতাস ঢুকছে, কিন্তু সেটা কেমন যেন ভেজা ভেজা লাগল। দূরের বালবগুলোর নিচে ঝাপসা একটা ভাব। বোধহয় হালকা কুয়াশা।

'আরে, ব্যাপারটা কি?' চাপা গলায় বলল কুয়েল। 'ফ্ল্যাটবাড়ির দরজায় মেয়েলোক! সবুর, সবুর—ওকে আমার চেনা চেনা লাগছে…'

নীল গাউন, কালো শার্ট আর সাদা স্কার্ফ পরা একটা মেয়ে। কলিংবেলের বোতাম টিপে দু'পা পিছিয়ে এল সে, মুখ তুলে তাকাল তিনতলার খোলা, আলোকিত একটা জানালার দিকে। জানালার পর্দা একটু সরে গেল, ঘরের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল বগাকে। কুয়েলের ভাগ্য বলতে হবে, তিনতলার জানালা থেকে আলোর ছোট একটা টুকরো সোজা এসে পড়ল মেয়েটার মুখে।

'চিনতে পেরেছি, বস্!' ফিসফিস করে বলল সে। 'ইউরাটম অফিসে দেখেছি ওকে। পরী, পরী! কিন্তু ওখানে চাকরি করে বলে মনে হয় না। বুড়ো এক লোকের সাথে লাঞ্চ খেতে বেরিয়েছিল, হেসে হেসে এমনভাবে কথা বলছিল, হয় বাপ নাহয় স্বামী হবে…'

'চোপ!' নিচু গলায় বলল রিচি।

দরজার হাতল ধরল কোহেন।

হিসহিস করে উঠল রিচি, 'এখনও সময় হয়নি।'

'এই মেয়েটাই হয়তো ডেলিভারি-ম্যানের দুর্বলতা,' বলল কোহেন।

'ফর গডস সেক, শাট আপ!' ধমক লাগাল রিচি।

এক মিনিট পর ফ্ল্যাটবাড়ির সামনের দরজা খুলে গেল, সাথে সাথে ভেতরে ঢুকে পড়ল মেয়েটা। ডেলিভারি-ম্যান দরজা আবার বন্ধ করে দিল।

গাড়ির ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল। তারপর ড্যাশবোর্ডে আবার টোকা দিতে শুরু করল হিলারী। খসখস শব্দে ঘাড় চুলকাল কুয়েল। বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করে চুপ মেরে গেল কোহেন।

এক ঘণ্টা কেটে গেল।

'কে জানে, রাতটা ওরা হয়তো বাড়িতেই কাটাবে।'

'মেয়েটা যদি আর কারও স্ত্রী হয়, তা সম্ভব নয়,' বলল রিচি।

'কুয়েল জানতে চাইল, ভেতরে ঢুকতে অসুবিধে কি?'

'সমস্যা আছে,' বলল রিচি। 'দরজায় কে তা ওরা জানালা থেকে দেখতে পাবে। অচেনা লোক দেখলে দরজা খুলবে বলে মনে হয় না।'

'তাহলে কি আমরা সারারাত এখানে এই গাড়ির ভেতর অপেক্ষা করব?' ঝাঁঝের সাথে জিজ্ঞেস করল কোহেন।

'ক্ষতি কি?'

'ইচ্ছে করলে পাঁচিল টপকাতে পারি আমরা। তারপর ছাদ থেকে...'

রিচি অন্য কথা ভাবছে। শুধু ডেলিভারি-ম্যানকে নয়, তার সাথে মেয়েটাকেও হয়তো কিডন্যাপ করতে হতে পারে। আরও ঝামেলা আর ঝুঁকির কাজ। জানতে চাইল, 'আমাদের সাথে ফায়ার আর্মস আছে?'

গ্লাভ কমপার্টমেন্টে হাত ভরে একটা পিস্তল বের করে আনল হিলারী।

'গুড,' বলল রিচি। 'তবে কাউকে তোমার গুলি করতে হবে না।'

'লোড করা নেই।' রেনকোটের পকেটে পিস্তলটা ভরে রাখল হিলারী।

'একজন জেগে থাকুক,' বলল কোহেন, 'বাকি সবাই ঘুমাই এসো। কাল সকালে অফিসে যাবার জন্যে বেরুলে ডেলিভারি-ম্যানকে ধরা যাবে।'

'দিনে-দুপুরে এসব কাজ হয়?' ব্যঙ্গের সুরে জিজ্ঞেস করল রিচি।

'তাহলে কখন কিভাবে হবে তুমিই বলো!'

'অবস্থা বুঝে আজ রাতের মধ্যেই একটা ব্যবস্থা করা হবে।'

কি করা যায় মাঝ রাত পর্যন্ত চিন্তা করল রিচি, তারপর আপনা থেকেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। আধবোজা চোখে ফ্ল্যাটবাড়ির দরজার দিকে তাকিয়ে ছিল রিচি, সেটা ধীরে ধীরে খুলতে শুরু করায় শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল তার।

গাড়ির দরজা খুলতে যাবে কোহেন, তার হাত চেপে ধরল রিচি। ইতোমধ্যে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে পদ্মিনী আর বগা।

'আবার তুমি সুযোগ হারাতে চাও?' নিচু গলায় কিন্তু রাগের সাথে জানতে চাইল কোহেন।

মেয়েটাকে পাশে নিয়ে পেভমেন্ট ধরে হাঁটতে শুরু করেছে ডেলিভারি-ম্যান। রিচি বলল, 'লোকটা কি পরে আছে, দেখছ? স্লিপিং গাউন। পায়ে চপ্পল। তার মানে সামনের মোড় পর্যন্ত যাবে সে, মেয়েটাকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে এখুনি ফিরে আসবে আবার।'

'মেয়েটাকেও আমাদের কিডন্যাপ করা উচিত,' বলল কোহেন।

'না।'

সামনের মোড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ওরা। সম্ভবত ট্যাক্সির খোঁজেই এদিক ওদিক

তাকাচ্ছে। এইভাবে প্রায় মিনিট পাঁচেক কেটে গেল, তারপর একটা ট্যাক্সি পেল ওরা। তাতে মেয়েটাকে তুলে দিয়ে হন হন করে ফিরে আসতে লাগল ডেলিভারি-ম্যান।

'রেডি!' বলল রিচি। 'গো!'

গাড়ির দরজা খুলে প্রথমে নামল কুয়েল। তারপর কোহেন। সবশেষে হিলারী। ফ্ল্যাটবাড়ির দরজার কাছে পৌছে গেছে বগা. এই সময় সামনেই ওদেরকে দেখে আঁতকে উঠল সে।

'চুপ থাকো, নোড়ো না!' চাপা গলায় গর্জে উঠল কুয়েল। বগার একপাশে চলে এল সে। আরেক পাশে দাঁড়াল হিলারী, রেনকোটের পকেট থেকে বের করে পিস্তলটা বগাকে দেখিয়ে দিল সে।

'এসবের মানে কি?' সাহস করে প্রশ্নটা করল বটে, কিন্তু ভেতরে কাঁপুনি ধরে গেছে বগার। 'আবার আমাকে…'

'কথা নয়, গাড়িতে ওঠো!' বগার হাত ধরে ফেলল কোহেন, টেনে তাকে গাড়ির দিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

গাড়িতে বসে সব দেখছে আর শুনছে রিচি। জোর করে যাদেরকে গাড়িতে তোলার চেষ্টা করা হয় তারা ঠিক এই সময়ই সিদ্ধান্ত নেয়, বাধা দেবে নাকি কথা শুনবে। আলো-আঁধারিতে ঢাকা রাস্তার দু'দিকে চট করে চোখ বুলিয়ে নিল সে। ফাঁকা।

যা ভয় করেছিল রিচি, গোলমাল বেধে গেল। দুর্বোধ্য একটা শব্দ করে উঠে ওদের হাত থেকে ছুটে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল ডেলিভারি-ম্যান। বুদ্ধি করে তার মুখে একটা হাত চাপা দিল কুয়েল। ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে কোহেন আর হিলারী তফাতে সরে গিয়েছিল, আবার তারা ডেলিভারি-ম্যানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এরপর আর তেমন কোন অসুবিধে হলো না। প্রায় চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে আসা হলো তাকে। খোলা দরজা দিয়ে গাড়িতে তুলে পিছনের সীটে শুইয়ে দিল ওরা। কুয়েলের হাত লোহার তালার মত আটকে আছে তার মুখে। কোহেন আর হিলারী সামনের সীটে উঠল। স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল হিলারী। 'কোথায় যাব, বস্?'

'কোথাও না,' বলল রিচি। 'শহর দেখতে বেরিয়েছি আমরা। কিন্তু এক রাস্তায় দু'বার যাব না।' হিলারীর দিকে ফিরল সে। 'হাত সরাও।'

বগার মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিল কুয়েল।

'কি অন্যায় করেছি আমি…?' কেঁদে ফেলার অবস্থা হয়েছে বগার। সীটের ওপর উঠে বসে চোখ রগড়াতে শুরু করল।

'অন্যায় করোনি?' জিজ্ঞেস করল রিচি। 'তিন রাত আগে ড্রিমল্যান্ড নাইটক্লাবে একজন লোককে একটা ব্রিফকেস ডেলিভারি দাওনি তুমি?'

'ক্লুড রেলিক?'

'এই নাম তো নয়!'

'আপনারা পুলিস?' জানতে চাইল বগা।

'ওই জাতেরই,' বলল রিচি। 'কিন্তু প্রমাণ সংগ্রহ করা, কেস সাজানো বা

কাউকে বিচারের সামনে হাজির করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা শুধু জানতে চাই, ব্রিফকেসে কি ছিল।'

উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকল বগা।

বিশ সেকেন্ড পর জানতে চাইল রিচি, 'কি যেন নাম বললে? ক্লড রেলিক। তোমাকে সে ব্ল্যাকমেইল করেছে। আমরাও তাই করতে পারি, কথাটা ভুলো না। মেয়েটার স্বামী যদি জানে মাঝরাত পর্যন্ত তোমার ফ্ল্যাটে ছিল সে, তখন অবস্থা কি হবে?' আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ল সে, কিন্তু লেগে গেল।

'কি জানতে চান আপনি?' প্রশ্নের সাথে বগার নাক মুখ দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

'কি ছিল ব্রিফকেসে?'

'ইউরাটমের একটা কম্পিউটর প্রিন্ট আউট।'

'তথ্যগুলো কি ধরনের?'

'শিপমেন্টের অনুমতি পাওয়া ফিশনেবল মেটিরিয়ালের বিবরণ?'

'ফিশনেবল?' দ্রুত জানতে চাইল রিচি। 'তার মানে নিউক্লিয়ার স্টাফ?'

'ইয়েলোকেক, ইউরেনিয়াম মেটাল, নিউক্লিয়ার ওয়েস্ট, প্লুটোনিয়াম…'

সীটে হেলান দিয়ে জানালাপথে বাইরে তাকাল রিচি। দু'পাশে রঙ-বেরঙের আলো, মাঝখান দিয়ে ছুটে চলেছে গাড়ি। তাকিয়ে থাকলেও সে-সব কিছু দেখছে না সে। শরীরের রক্ত উত্তেজনায় ফুটতে শুরু করেছে। মাসুদ রানার অপারেশনের চেহারা পরিষ্কার হয়ে গেছে তার কাছে। শিপমেন্টের অনুমতি পাওয়া ফিশনেবল মেটিরিয়াল…মিশর নিউক্লিয়ার ফুয়েল চায়। তালিকার দুটো জিনিসের মধ্যে একটার কথা জানতে চাইবে রানা—হাতে ইউরেনিয়াম আছে এমন কোন লোক সেটা চোরা-বাজারে বিক্রি করতে চায় কিনা, কিংবা এমন একটা কনসাইনমেন্টের খবর আছে কিনা যেটা তার পক্ষে চুরি বা ডাকাতি করা সম্ভব হবে।

ইউরেনিয়াম পেলে মিশর সেটা দিয়ে কি করবে বুঝতে অসুবিধে হয় না।

তার চিন্তায় বাধা দিল ডেলিভারি-ম্যান। 'আমাকে ছেড়ে দিন, আমি বাড়ি যাব।'

'ওই প্রিন্ট আউট আমারও এক কপি দরকার,' বলল রিচি।

'তা সম্ভব নয়। একটা গায়েব হয়ে যাওয়ায় এরই মধ্যে আমাকে সন্দেহ করা হচ্ছে…' মিথ্যে কথা বলল বগা।

'নাহয় আরও একটু বাড়বে সন্দেহ,' শান্ত সুরে বলল রিচি। 'ধরা না পড়লেই হলো। ওটা আমার দরকার, তোমারও না দিয়ে উপায় নেই। আমরা ওটার ফটো তোলার পর ইচ্ছে করলে মূল কপিটা তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।'

'না…'

'কেন?' সামনের সীট থেকে পিছন দিকে তাকাল কোহেন। বগার পাঁজরে তিন আঙুল দিয়ে একটা খোঁচা দিল সে। 'আমরা বুঝি তোমার সৎ-মায়ের ছেলে? ক্লড রেলিক যদি পেতে পারে…'

'ঠিক আছে, কিন্তু এই শেষ, এরপর আমি আর…'

'ঠিক আছে, এই শেষ,' মুচকি হেসে অভয় দিল রিচি। 'আমরা কেউ আর

তোমাকে বিরক্ত করব না।' কিন্তু মনে মনে ভাবল, পরিস্থিতি কেমন দাঁড়ায় বলা কঠিন, এমনও হতে পারে তোমাকে খুন না করে উপায় থাকবে না। হিলারীকে বলল, 'গাড়ি ঘোরাও।'

ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে ফিরে এল বুইক। দরজা খুলে তাড়াতাড়ি নেমে যাবার চেষ্টা করল বগা, তার ঘাড়ে হাত দিয়ে বাধা দিল রিচি। 'কাল রাতে বাড়িতে নিয়ে এসে রাখবে প্রিন্ট আউট। সন্ধের পর আমাদের একজন লোক ক্যামেরা নিয়ে দেখা করবে তোমার সাথে।'

'ঠিক আছে।'

'কাল থেকে তোমার প্রেমিকার ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখব আমরা,' বলল রিচি। 'তোমার ওপরও। যদি দেখি কোন রকম চালাকি করার চেষ্টা করছ তুমি, দু'জনেই মারা পড়বে। সত্যিই মারা পড়বে—এর অর্থ তুমি নিজে বুঝে নাও।'

'আমি তো কথাই দিয়েছি···'

বগাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে তার ঘাড় ধরে একটা ধাক্কা দিল রিচি। 'বেরোও!'

গাড়ি থেকে নেমে প্রায় হোঁচট খেতে খেতে এগোল বগা। খোলা দরজা দিয়ে ফ্ল্যাটবাড়ির ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

'কাজটা শালা করবে বলে মনে হয়?' জানতে চাইল কোহেন।

'তা করবে,' জোর দিয়ে বলল রিচি।

'ধরো করল···তারপর?' আবার জিজ্ঞেস করল কোহেন।

'এখুনি কিছু বলা সম্ভব নয়,' গম্ভীর সুরে বলল রিচি। 'আমাদেরকে হয়তো হাত রাঙাতে হতে পারে।'

নদীর ধারে সবুজ আর সাদা রঙের একটা বাড়ি, ছবির মত সুন্দর। নদীর পাড়ে সার সার দাঁড়িয়ে আছে নারকেল আর সুপারী গাছ—পাতার সাথে বাতাসের মধুর মিতালি, অবিরত শন শন আলাপচারিতা। জানালার ধারে বসে গুন গুন করছে এষা আপন মনে। গোটা বাড়িতে একা সে।

তারপর অলস ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে মধুর আবেশে আড়মোড়া ভাঙল, বাথরূমে ঢুকে ধীরে ধীরে খুলে ফেলল গায়ের সব কাপড়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মোহ-মুগ্ধ চোখে দেখল নিজেকে, জিজ্ঞেস করল, 'সবাই বলে আমি নাকি আমার মায়ের মত সুন্দর। সত্যিই তাই?'

বাথটাবে সুগন্ধ-পানি, তাতে আধশোয়া অবস্থায় কিছুটা সময় কাটল। তারপর ড্রেসিং রূমে এসে দু'পাশে আর সামনে দাঁড় করানো তিনটে আয়নার সামনে বসে সেন্ট আর পাউডার মাখল শরীরে। ওয়ার্ডরোব খুলে তাকাল ভেতরে, আশা করল মায়ের পুরানো কাপড়গুলো দেখতে পাবে। কিন্তু না, ন্যাপথ্যালিনের একটু গন্ধ পাওয়া গেল বটে, কিন্তু কাপড়গুলো সবই নতুন, পরিষ্কার, আর ওর সাইজ মত। বকের পালকের মত সাদা একটা নাইট-গাউন নিল এষা, প'রে নিজেকে কতভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল আয়নায়। তারপর বেডরূমে এসে বিছানায় উঠে শুলো।

কতক্ষণ এইভাবে শুয়ে আছে বলতে পারবে না এষা, হঠাৎ তার খেয়াল হলো,

রাত প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। কান পাতল সে। পায়ের কোন আওয়াজ পাওয়া গেল না কিন্তু নদী ফিসফিস করছে। গাছের পাতা খস খস করছে। ঠাণ্ডা বাতাস এসে চোখে মুখে লুটিয়ে পড়তে লাগল; কিন্তু কই, সে তো এল না!

তাকে আমার চাই, ভাবতে ভাবতে এক বস্ত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল এষা নদীর কিনারায় এসে থামল সে। চোখের পানি টপ টপ করে ঝরে পড়ল নদীতে মুখ তুলে আধখানা চাঁদের দিকে তাকাল সে। ঘাড় ফিরিয়ে বাতাসের দিকে মুখ করল। কিন্তু কেউ তাকে কোন রকম আশ্বাস দিতে পারল না। চোখের পানি মুছতে মুছতে রওনা দিল এষা। মনে একটাই প্রশ্ন—কোথায় পাব তাকে? হাঁটতে হাঁটতে কত নদী, কত পাহাড়, কত গ্রাম আর হাট-মাঠ-ঘাট পেরোল সে, কিন্তু কোথাও পেল না তাকে। এইভাবে দিন গেল, মাস গেল, বছর গেল,—শতাব্দী, হাজার বছর পেরিয়ে গেল। বুড়ি হয়ে গেছে এষা, মুখের চামড়া ঝুলে পড়েছে। কোমরে ব্যথা, লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটতে হয়। কিন্তু আজও তার খোঁজা শেষ হয়নি। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে, কানে আগের মত শোনে না। দুনিয়ার লোক তাকে পাগল বলে চেনে, বিদ্রূপ করে, দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু বুড়ি এষার সেই পণ এখনও অটুট, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত খুঁজবে সে তাকে।

তারপর একদিন তার মনের আশা পূরণ হলো। আকাশ ছোঁয়া এক পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে সূর্যের উদয় দেখছে তার মনের মানুষ। এক নিমেষে বয়সের খোলস ঝরে পড়ল এষার শরীর থেকে। আবার সে যুবতী হয়ে গেল। তারপর ছুটল।

হাঁপাতে হাঁপাতে পাহাড়ের মাথার কাছে উঠে এল এষা। এই সময় রানা তাকে দেখতে পেয়ে পিছু হটতে শুরু করল। তারপর ঘুরে দাঁড়াল সে, পাহাড়ের আরেক দিকের গা বেয়ে ছুটে নেমে যাচ্ছে। তার পিছু ধাওয়া করল এষা, গলা ফাটিয়ে কত ডাকল, কত হাত নাড়ল—কিন্তু কোন সাড়া দিল না রানা। মাঝখানের দূরত্ব ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল, তারপর একসময় চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেল মাসুদ রানা।

ঘুম থেকে জেগে স্বপ্নটার অর্থ নিয়ে বেশ খানিক মাথা ঘামাল এষা। কিন্তু খানিক পর স্বপ্ন স্বপ্নই এই ভেবে পাশ ফিরে শুলো সে। আবার ঘুমিয়ে পড়ল। পরদিন সকালে এই স্বপ্নের কথা কিছুই সে মনে করতে পারল না।

'রানা কিছু ইউরেনিয়াম বাগাবার তালে আছে,' বলল কোহেন।

মাথা ঝাঁকিয়ে সমর্থন করল রিচি। তার মন অন্যদিকে ব্যস্ত। কিভাবে কি করলে কোহেনকে ভাগানো যায় তার একটা উপায় খুঁজছে সে।

পাহাড়ের নিচে নদী আর উপত্যকা, পুরানো লুক্সেমবার্গ শহর। পেট্রেস নদীর পাড় ধরে হাঁটছে ওরা।

'মিশরের কাতারায় ওদের একটা রিয়্যাক্টর আছে, ফ্রান্সের সাহায্যে বানিয়েছিল,' বলে চলল কোহেন। 'সেটা চালু রাখার জন্যে ফ্রান্সই ওদেরকে ফুয়েল সাপ্লাই দিত, কিন্তু আর্মস সাপ্লাইয়ের সাথে সাথে ইউরেনিয়াম সাপ্লাইও বোধহয় বন্ধ করে দিয়েছে।'

এটুকু পরিষ্কার হয়ে গেছে, কাজেই স্বীকার করতে আপত্তি নেই রিচির। কিন্তু

এরপর যেটুকু কল্পনার সাহায্যে বুঝে নিতে হয় সেটা বোঝার ক্ষমতা কোহেনের নেই. তাকে কোনরকম সাহায্যও করতে যাচ্ছে না সে। কোহেনকে অন্ধকারে রাখা দরকার. আর তা করতে হলে তাকে অন্তত কিছুদিনের জন্যে হলেও অন্য কোথাও সরিয়ে দেয়া দরকার। নেগেভ মরুভূমির ডায়মোনায় ইসরায়েলীদের নিউক্লিয়ার প্রজেক্ট আছে. জানে সে প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়. কোহেন জানে না। লুক্সেমবার্গে কাজ করছে এমন একজন খুদে এজেন্টকে এ-ধরনের গোপন তথ্য তেল আবিব জানাবে বলে মনে হয় না।

-কিন্তু জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সে ফুটো থাকায় মিশরীয়রা ইসরায়েলী বোমার কথা নিশ্চয়ই জানে। জানার পর কি করার থাকবে তাদের নিজেদের বোমা বানানো ছাড়া? আর সেজন্যেই তাদের দরকার. ইউরাটম কর্মচারীর ভাষায়. ফিশনেবল মেটিরিয়াল। মিশরীয়রা বোমা বানাবে. আর এই কাজের জন্যে বাংলাদেশ তাদেরকে ইউরেনিয়াম যোগাড় করে দেবে—সেটা যোগাড় করার জন্যেই হন্যে হয়ে ফিরছে রানা. এটুকু পরিষ্কার ধরতে পারল সে। কিন্তু চিন্তা-ভাবনা যতই করুক. এত তাড়াতাড়ি এই উপসংহারে পৌছনো ন্যাট কোহেনের পক্ষে সম্ভব নয় অন্তত এখুনি ব্যাপারটা ধরতে পারছে না সে। এ-ব্যাপারে সে-ও তাকে কোন আভাস দেবে না। রানার উদ্দেশ্য সি. আই. এ. ধরে ফেলেছে. মিশরকে সেটা জানতে দিতে চায় না রিচি।

আজ রাতে প্রিন্ট আউট হাতে এলে আরও অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। নিজের পাশে ওই সময় কোহেনকে রাখা চলবে না। এই প্রিন্ট আউট দেখেই রানা তার টার্গেট বেছে নিয়েছে। সেটা কি. কোহেনকে জানতে দেয়া উচিত হবে না।

ওর চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে কোহেন। চঞ্চল. ব্যাকুল অ্যামেচার কোহেন খুঁটিনাটি যা জানছে সব রিপোর্ট করছে তেল আবিবে—রানার চেয়ে সেই এখন তার বড় শত্রু। কাজে যতই ভুল করুক. কোহেন ঠিক বোকা নয়। আজেবাজে কোন কাজের কথা বলে দূরে সরাতে চাইলে ধরে ফেলবে. এর পিছনে কোন গোপন উদ্দেশ্য আছে। একটা কাজের কাজ দিয়ে ভাগাতে হবে ওকে।

পন্ট অ্যাডোলফির নিচে দিয়ে এগোল ওরা। একবার থেমে পিছন দিকে তাকাল রিচি। ব্রিজের মাথায় খিলান, দেখে অক্সফোর্ডের কথা মনে পড়ে গেল ওর। সেইসাথে হঠাৎ আবিষ্কার করল. কোহেনকে দেবার মত একটা কাজ পেয়ে গেছে ও।

বলল. 'রানা জানে. কেউ তার পিছু নিয়েছে। তোমার সাথে হঠাৎ দেখা হয়ে যাবার ঘটনাটা এর সাথে মেলাবে সে। তুমি কি মনে করো?'

'ব্যাপারটার মধ্যে চিন্তার খোরাক পাবে সে, কিন্তু পরিষ্কার কিছু বুঝতে পারবে না।'

'ঠিক বলেছ,' হাসি গোপন করে বলল রিচি। আড়চোখে তাকিয়ে দেখল. কোহেন বেশ খুশি হয়েছে। ঠিক বলেছ কথাটা শোনার জন্যে কাঙাল হয়ে থাকে ব্যাটা, ভাবল সে। জানে, ও তাকে পছন্দ করে না, কিন্তু ওর কাছ থেকেই স্বীকৃতি আর প্রশংসা পাবার জন্যে মুখিয়ে থাকে কোহেন। এটাকে কাজে লাগাতে হবে। 'শোনো, কোহেন, রানার ব্যাপারটা চেক করা দরকার। কিন্তু তার আগে বলো.

মিশরীয় সিক্রেট সার্ভিসের তালিকায় তুমি আছ নাকি?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে কোহেন বলল, 'কে জানে!'

'রাশান, বাংলাদেশী, সৌদী বা মিশরীয় এজেন্টদের সাথে সামনাসামনি যোগাযোগ কতবার হয়েছে তোমার?'

'একবারও না,' বলল কোহেন। 'আমি খুব সাবধানে থাকি।'

অন্যদিকে ফিরে নিজের একটা হাত কামড়ে ধরল রিচি, তা না হলে অট্টহাসিটা সামলানো যেত না। আসল ব্যাপার হলো এজেন্ট হিসেবে কোহেন এতই নগণ্য যে তার ওপর দুনিয়ার আর সব দেশের ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের নজরই পড়েনি। সে তার এসপিওনাজ জীবনে এমন কিছু করেনি যাতে প্রফেশন্যাল এজেন্টদের সাথে দেখা হওয়ার সুযোগ ঘটে। 'মিশরীয় বা বাংলাদেশী ফাইলে তুমি যদি না থাকো, তোমার বন্ধু-বান্ধব বা পরিচিতদের সাথে যোগাযোগ করে তোমার সম্পর্কে খোঁজ নেবে রানা। তুমিও চেনো, রানাও চেনে—এই রকম কেউ আছে নাকি?'

'নেই। মাঝখানে বহু বছর দেখা সাক্ষাৎ হয়নি ওর সাথে। তাছাড়া আমার পরিচিত কারও কাছ থেকে কিছু জানতে পারবে না ও। আমি যে স্পাই সেটা তাদের কারও জানা নেই। লোককে তো আর আমি বড়াই করে বলে বেড়াই না যে...'

'আহা, তা কেন বলে বেড়াবে,' বিরক্তি চেপে বলল রিচি। 'কিন্তু রানাও সরাসরি কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে না। তোমার ভাল-মন্দ খবর জানতে চাইবে সে, সাধারণ আচরণ সম্পর্কে কৌতূহল দেখাবে—যেমন, তুমি হঠাৎ করে উধাও হয়ে যাও কিনা, কোন কারণ ছাড়াই অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করো কিনা, রাজনীতি সম্পর্কে তোমার মধ্যে উদাসীনতা লক্ষ করা যায় কিনা। এইসব প্রশ্নের উত্তর থেকেই তুমি স্পাই কিনা বুঝে নেবে সে। এখন, ভাল করে মনে করে দেখো তো দেখি, অক্সফোর্ডে এমন কেউ আছে নাকি যার সাথে আজও তোমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়?'

'ছাত্রদের মধ্যে কারও সাথে হয় না,' কণ্ঠস্বর আগের চেয়ে একটু খাদে নামিয়ে বলল কোহেন। 'ও, হ্যাঁ, প্রফেসর ফিলমনটনের সাথে মাঝে মধ্যে দেখা হয় বটে। তাঁর কথা মনে আছে তোমার?'

ইসরায়েলের ঘোর সমর্থক প্রফেসর, সেজন্যেই যোগাযোগটা আজও রেখেছ তুমি, মনে মনে ভাবল রিচি। প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে বলল, 'আমার ধারণা, প্রফেসর ফিলমনটনের ওখানে রানাও যেতে পারে। কি? পারে না?'

'অবশ্যই।'

'দেখলে তো! রানাকে শুধু প্রফেসরের সাথে দেখা করে তোমার নামটা উচ্চারণ করতে হবে। মানলাম, তোমার স্পাই জীবন সম্পর্কে কিছুই প্রফেসর জানেন না। কিন্তু তোমার সাধারণ আচরণ সম্পর্কে তিনি যা বলবেন তা থেকেই যা বোঝার বুঝে নেবে রানা। আমার বিশ্বাস, এরই মধ্যে কাজটা সেরে ফেলেছে ও। তার মানে, তুমি যে একজন এজেন্ট, রানা তা জানে।'

'এত জোর দিয়ে কথাটা কেন বলছ, বুঝতে পারছি না!'

'বলছি এইজন্যে যে এটাই স্ট্যান্ডার্ড টেকনিক। আমি নিজে এই টেকনিক

ব্যবহার করে ফল পেয়েছি।'

'তাই যদি হয়, রানা যদি প্রফেসর ফিলমনটনের কাছে গিয়ে থাকে...'

বাধা দিয়ে রিচি বলল, 'তাহলে আবার তার লেজ চেপে ধরবার সুযোগ হবে আমাদের। কোহেন, আমি চাই, আর দেরি না করে তুমি অক্সফোর্ডে একবার ঢুঁ মেরে এসো।'

'বলো কি!' কোথাকার পানি কোথায় গড়াচ্ছে, কিছুই আন্দাজ করতে পারল না কোহেন। 'কিন্তু রানা হয়তো প্রফেসরের সাথে টেলিফোনে...'

'তা-ও হতে পারে, কিন্তু এক্ষেত্রে তা ঘটেছে বলে মনে হয় না। এই ধরনের নাজুক তদন্ত ফোনে মানায় না, সশরীরে উপস্থিত হয়ে গল্পচ্ছলে প্রসঙ্গটা তুলতে হয়। ঠিক সেই একই কারণে, ফোন করার চেয়ে তোমার নিজের যাওয়াটাই উচিত হবে।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল কোহেন, 'বোধহয় তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু আমি ভাবছিলাম, প্রিন্ট আউটটা দেখে আগে তেল আবিবে রিপোর্ট...'

সেটাই হতে দিতে চায় না রিচি। বলল, 'চমৎকার আইডিয়া। কিন্তু ভেবে দেখো, রানাকে আবার খুঁজে পেয়েছ এটা যদি তোমার ওই রিপোর্টে বলতে পারো, সেটা সব দিক থেকে ভাল হয় না?'

পাহাড় আর নদীর দিকে তাকিয়ে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল কোহেন, বোধহয় বহুদূরের অক্সফোর্ডকে কল্পনায় দেখার চেষ্টা করছে। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করে বলল, 'চলো, এবার ফেরা যাক। অনেক হাঁটাহাঁটি হয়েছে। হাঁপিয়ে উঠেছি।'

এবার একটু দরদের ভাব দেখানো যেতে পারে। 'শরীরের যত্ন নিতে হবে, কোহেন। আমাদের এটা এমন একটা পেশা, মানসিক যন্ত্রণা তো আছেই, শারীরিক ধকলও কম পোহাতে হয় না,' বলল রিচি।

'আচ্ছা,' হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় কোহেনের চেহারায় রাজ্যের কৌতূহল ফুটে উঠল। 'বলছিলে, কি একটা কাজে গিয়ে রাশিয়ায় ধরা পড়েছিলে তুমি। খুব টরচার করেছিল ওরা?'

'সে-গল্প আরেকদিন হবে 'খন,' বলল রিচি। 'ওখানে থাকার সময় অনেক মজার মজার রাশিয়ান জোক শুনেছিলাম, দু'একটা শুনতে চাও তো বলি।'

'অশ্লীল?' সাগ্রহে জানতে চাইল কোহেন।

'তা না হলেও ভারি মজার,' বলল রিচি। 'শোনো। ব্রেজনেভ তাঁর মাকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন কোত্থেকে কোথায় উঠেছেন তিনি, জীবনে কতটা উন্নতি করেছেন। মাকে তিনি নিজের অ্যাপার্টমেন্ট দেখালেন। সে এক বিশাল ব্যাপার। বিদেশী ফার্নিচার, ডিশওয়াশার, ফ্রিজার, রঙিন টেলিভিশন, দামী কার্পেট, চাকরবাকর—সমস্ত কিছু। মা কিন্তু ভাল মন্দ কিছুই বললেন না। ব্রেজনেভ এবার ব্ল্যাক সী-র তীরে নিজের বাগান বাড়িতে নিয়ে এলেন মাকে। সুইমিং পুলসহ বিরাট একটা ভিলা, প্রাইভেট বীচ আছে, এখানে চাকরবাকরের সংখ্যা আরও বেশি, আরাম-আয়েশের আরও ব্যাপক আয়োজন। কিন্তু হলে কি হবে, এত কিছু দেখেও খুশি হলেন না মা। এরপর নিজের জিল লিমোসিনে চড়িয়ে মাকে ব্রেজনেভ নিয়ে

এলেন নিজস্ব হান্টিং লজে। সুদৃশ বনভূমির মাঝখানে ওটাকে একটা রাজপ্রাসাদ বলা যেতে পারে। আগ্নেয়াস্ত্র, কুকুর, চাকরবাকর—কত কি-ই না দেখার আছে মাকে সব দেখালেনও ব্রেজনেভ। কিন্তু মা নির্বিকার। শেষ পর্যন্ত ব্যাকুল সুরে জানতে চাইলেন ব্রেজনেভ, "মা: মা, তুমি কিছু বলছ না কেন? আমার এতসব দেখে তুমি খুশি হওনি? ছেলের জন্যে তোমার গর্ব হচ্ছে না?" এতক্ষণে মুখ খুললেন মা, "সবই খুব সুন্দর, লিওনিদ। কিন্তু ভাবছি কম্যুনিস্টরা যদি ফিরে আসে তখন তুই কি করবি"!'

নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো হা হা করে হাসতে লাগল রিচি। কিন্তু কোহেন সামান্য একটু হাসল, যেন নেহাতই ভদ্রতার খাতিরে।

'কি, তোমার মজা লাগেনি?' জানতে চাইল রিচি।

'সামান্য,' তাকে বলল কোহেন। 'যেহেতু মিথ্যে আর বানোয়াট একটা জোক এটা, তাই অপরাধবোধটাই তোমাকে হাসতে সাহায্য করছে। আমি অপরাধী বোধ করছি না, কাজেই আমার হাসি পাচ্ছে না।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ হয়ে গেল রিচি। বড় রাস্তায় উঠে একটু বিশ্রাম নেবার জন্যে দাঁড়াল ওরা। এই সময় রিচি বলল, 'আচ্ছা, ভাল কথা মনে পড়েছে—ব্যাপারটা জানার কৌতূহল এখনও আমার মেটেনি। সত্যি করে বলো তো, তুমি কি প্রফেসর ফিলমনটনের স্ত্রীকে কাবু করতে পেরেছিলে?'

'ভদ্রমহিলার একটা দুর্বলতা ছিল।'

'কি?'

'তিনি এক যুবকের সাথে প্রেম করতেন। আমি সেটা জেনে ফেলি এর বেশি কিছু বলল না কোহেন।

'কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর কই?' জানতে চাইল রিচি। 'মহিলাকে তুমি শোয়াতে পেরেছিলে?'

'প্রতি হপ্তায় মাত্র দু'তিন বার,' বলেই গলা ছেড়ে হেসে উঠল কোহেন।

হাসল না রিচি। জিজ্ঞেস করল, 'এখন কে অপরাধী বো'' করছে?'

চাঁদপানা মুখ, ডাগর চোখ, হাসি নয় মিষ্টি জলতরঙ্গ—টিকেট ব্যারিয়ার পেরিয়ে হরিণীর চঞ্চলতা নিয়ে ছুটে এল এষা। খপ্ করে রানার হাত চেপে ধরে মরাল গ্রীবা নেড়ে জানতে চাইল, 'অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ?'

হাঁটু ঢাকা স্কার্ট পরেছে এষা, পায়ের হাই বুট সেই স্কার্টের হেমের ভেতর ঢুকে গেছে, এমব্রয়ডারির কাজ করা ওয়েস্ট কোটের নিচে সিল্কের শার্ট মুখে কোন মেকআপ নেই। হাত খালি—কোট নেই, হ্যান্ডব্যাগ নেই, একটা ওভারনাইট কেস পর্যন্ত নেই। প্ল্যাটফর্মের ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসছে। দু'জনের কেউই যেন জানে না এরপর কি করতে হবে। তারপর এষাই টেনে নিয়ে চলল রানাকে। ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়াল ওরা।

গাড়িতে উঠে জিজ্ঞেস করল এষা, 'কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে?'

হেসে ফেলল রানা। 'আমি তো ভেবেছিলাম তুমিই আমাকে নিয়ে যাবে

'কিংস রোড,' ড্রাইভারকে বলল এষা। তারপর খেয়াল হলো, সেই যে

স্টেশনে রানার হাত ধরেছে সে, সেটা আর ছাড়া হয়নি। লজ্জা লাগল, কিন্তু হাতটা সরিয়ে নিতে গিয়ে পারল না, ছাড়ল না রানা। মুখ ফিরিয়ে রানার চোখে তাকাল সে, বলল, 'হ্যালো, মাসুদ।'

কোন মেয়ে ওকে মাসুদ বলে ডাকেনি কখনও। ভাল লাগল রানার।

এমার পছন্দ করা হোটেলটা প্রায় নির্জন, খুব ছোট, আলোটা ম্লান। টেবিলে বসে এদিক-ওদিক তাকাতে কয়েকটা চেনা মুখ দেখতে পেল রানা। আতঙ্কটা বেড়ে ওঠার আগেই বুঝল, পত্রিকার পাতায় এদের ছবি দেখেছে সে, এরা সবাই পপ গায়ক।

এমার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে এসে হালকা সুরে জানতে চাইল রানা, 'তোমার সব বয়-ফ্রেন্ডকে এখানেই বুঝি নিয়ে আসো?'

এমন চোখে তাকিয়ে থাকল এমা, রানার প্রশ্ন যেন বুঝতে পারেনি। তারপর, ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা একটু হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। বলল, 'এই প্রথম তুমি একটা নীরস কথা বললে।'

নিজের গালে কষে একটা চড় কষতে ইচ্ছে করল রানার। 'শুধরে নেবার একটা সুযোগ পাব তো?'

'কি খাবার ইচ্ছে তোমার?' জানতে চাইল এমা। সেই সাথে মুহূর্তের সঙ্কট কেটে গেল।

'বীফ রোস্ট, স্টেক আর কিডনি পুডিং। তুমি?'

'বীফ রোস্ট, স্টেক আর কিডনি পুডিং—তার আগে বিয়ার।'

খাওয়াটা অজুহাত মাত্র, আসলে ওরা পরস্পরকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে, আরও বেশি সময় ধরে দেখতে এসেছে। সারাটা সময় ঠিক তাই করে কাটাল ওরা। কয়েকবারই নিজেকে জিজ্ঞেস করল রানা, কি ব্যাপার, এই রকম ছেলেমানুষি করছি কেন আমি? সুন্দরী মেয়ে আমার জীবনে এই প্রথম নয়। তবু এমার দিকে তাকালেই আমার সমস্ত অস্তিত্বে আগুন ধরে যাচ্ছে কেন? কেন আমি ওর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছি না? সমস্ত কিছুর বিনিময়ে ওকে পাবার লোভ, কই, সে-ধরনের কিছু অনুভব করছি না তো; অথচ ওকে জানার আর বোঝার জন্যে আমার মধ্যে এই যে ব্যাকুলতা, এটা কেন? পাবার লোভ জিনিসটা কি তা রানা ভালই বোঝে। তার মধ্যে স্বার্থপরতা থাকে, দখল করে ছিবড়ে বানিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবার একটা গোপন ষড়যন্ত্র থাকে। এই লোভ অনেক মেয়েকেই পাবার জন্যে ওর মধ্যে জেগেছে। কিন্তু এমার বেলায় তেমনটি ঘটছে না। তবে কি…? এমন ভীতিকর একটা প্রশ্ন নিজেকেও করতে সাহস পেল না রানা।

নিজের কথা বলতে শুরু করল এমা। ছোটবেলা থেকে মা না থাকায় বাবার সাথে মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করে আসছে সে, ফলে অল্প বয়স থেকেই ঘাড়ে দায়িত্ব নেয়ার একটা প্রবণতা তৈরি হয়েছে তার মধ্যে। বুড়ো বাপের সব কাজে তার হয়তো সায় নেই, কিন্তু তাকে ছাড়া আর কিছু বোঝেও না। তবে দায়িত্ববোধ যতই প্রখর হোক, কলেজ লাইফে বান্ধবীদের পাল্লায় পড়ে এল-এস-ডি, মারিজুয়ানা ইত্যাদির স্বাদ নেয়া তার হয়ে গেছে। না, এসব জিনিসের প্রতি তার কোন আসক্তি জন্মায়নি। কারণ যে যাই বলুক না কেন, নেশা তো আর দুনিয়ার সব সমস্যার

সমাধান এনে দিতে পারে না! সেটা শুধু একভাবেই সম্ভব—ভালবাসা দিয়ে এই সভ্যতা যদি টিকে থাকে, তাতে প্রেমের অবদান থাকবে সবচেয়ে বেশি।

তারপর এষা জিজ্ঞেস করল, 'কাকে তুমি ভালবাস, রানা?'

'বুড়ি এক মেয়েলোককে,' বলল রানা। 'তার নাম পদার মা। ঢাকার কোম্পানীগঞ্জে থাকে, রাস্তার মোড়ে ডালপুরি আর পিঁয়াজু বেচে পেট চালায়।' বলা শেষ হতে, তার আগে নয়, আবিষ্কার করল রানা, পদ্ র মা নামে কোন মেয়েলোককে সে চেনে না, কিন্তু জানে, এদের অস্তিত্ব আছে, এবং এদের জন্যে তার বুকে সীমাহীন ভালবাসাও আছে।

'আর কাকে, রানা?'

'কিশোর এক ছেলেকে, তার নাম জানি না, কোথায় থাকে জানি না, কেমন দেখতে জানি না, কিন্তু জানি এখনও ট্রেজার আইল্যান্ড আর রবিনহুড পড়া শুরু করেনি সে, জানি হয়তো কখনোই তার এই পড়াটা শুরু হবে না,' এরপর কি বলবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে গেল রানা।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে, রানার মুখে তাকিয়ে আছে এষা। ব্যগ্র-ব্যাকুল চোখে কি যেন খুঁজছে সে। 'আর কাউকে?'

নার্ভাস একটু হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে। 'হ্যাঁ। আর...একটা ভূতকে ভালবাসি আমি।'

'ভূত?'

'স্ট্রবেরি চলবে তোমার, এষা?'

'হ্যাঁ, প্লীজ।'

'ক্রীম?'

'না, ধন্যবাদ। বুঝলাম, নিজেকেও তুমি ভালবাস। কিন্তু নামকরণটা ভূত কেন?'

'আসলে তুমি জানতে চাও আমি কোন মেয়ের সাথে চুক্তিবদ্ধ কিনা—তাই না? উত্তরটা হচ্ছে: না। এবার তুমি বলবে, এষা, কাকে তুমি ভালবাস?'

জুন মাস, স্ট্রবেরির স্বাদ অপূর্ব।

'হ্যাঁ,' বলে ঝাড়া একমিনিট চিন্তা করল এষা। 'হ্যাঁ বলতে চাই। তাহলে শোনো, মাসুদ রানা, আমি ভালবাসি... তোমাকে।'

বলেই এষার মাথায় প্রথম যে চিন্তাটা এল, আমার হয়েছেটা কি? কেন বললাম কথাটা?

তারপর ভাবল, আমি কেয়ার করি না, যা সত্যি তাই বলেছি।

সবশেষে, কিন্তু কেন? ওকে আমি ভালবাসি কেন?

কেন, জানে না এষা। কিন্তু কখন থেকে, জানে। অন্তত একটি বার সুযোগ ঘটেছে এষার যখন রানার গভীরে তাকাবার সৌভাগ্য হয়ে ছে তার, আসল রানাকে দেখে নিতে পেরেছে। ঘটনাটা ঘটে রানা যখন পদার মায়ের কথা বলেছিল। এই সময় নিজের মুখোশ খুলে ফেলেছিল রানা। তখন সেই চেহারায় এষা দেখতে পেয়েছে দুনিয়ার একশো কোটি অনাহার-ক্লিষ্ট মানুষের জন্যে গভীর দরদ।

এই সামান্য সময়ে রানার মধ্যে যা দেখেছে এষা, সব মিলিয়ে মানুষটাকে তার

রহস্যময়, রোমান্টিক আর আশ্চর্য বলে মনে হয়েছে। ওর সান্নিধ্য তার ভাল লাগছে—ওর মন জানতে চায়, বুঝতে চায় ওকে, ওর গোপন ভাবনাগুলো আবিষ্কার করতে চায়।

এর আগে আর কেউ বা আর কিছু এমন উন্মাদিনী করে তোলেনি তাকে

রানা ভাবল, গোটা ব্যাপারটাই একটা ভুল। নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল ও, হুট করে প্রেমে পড়া তার অন্তত সাজে না। যখনই সুন্দরী একটা মেয়ে কোন স্পাইয়ের প্রেমে পড়ে, স্পাই তখন নিজেকে জিজ্ঞেস করতে বাধ্য, কোন্ বৈরী ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের হয়ে কাজ করছে মেয়েটা?

যদিও, ভাবল রানা, এষার ব্যাপারটা অন্য রকম। সারল্য আর ভাবাবেগ, উষ্ণ আন্তরিকতা আর প্রখর বুদ্ধিমত্তার দুর্লভ সমন্বয় ঘটেছে মেয়েটার মধ্যে—অসাধারণ রূপের কথা না হয় বাদই দেয়া গেল। এ মেয়ে আর যাই করুক, অভিনয় করছে না।

কিন্তু তবু, হঠাৎ করে এই প্রেমে পড়া, এটা যে কতটা গভীর, সে-সম্পর্কে রানা কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারল না। প্রথম দর্শনে প্রেম, এর মধ্যে হয়তো দোষের কিছু নেই, কিন্তু সেই প্রেম গভীর হতে কিছুটা সময় দরকার। ভাল চেহারা, ভাল স্বভাব, ভাল আচরণ—প্রথম প্রথম শুধু এগুলোই চোখে পড়ে। খারাপগুলোও চোখে পড়ে, কিন্তু নেশার প্রথম ঘোরটা কেটে যাবার আগে নয়; তখন যদি তুমি ভালগুলোর সাথে খারাপগুলোকেও মেনে নিতে পারো, কি কি খারাপ এবং সংশোধনের অতীত জানার পরও তাকে প্রথমবারের মত ভালবাসতে পারো, তাহলে ধরে নেয়া চলে তোমার প্রেম গভীরতা পেতে যাচ্ছে। রানা অনুভব করল, কথাগুলো শুধু একা এষার জন্যেই সত্যি নয়, তার জন্যেও সমানভাবে সত্যি। এষার মতই, সে-ও প্রথম দর্শনে প্রেমে পড়ে গেছে; ওর নিজের অন্তত সন্দেহ নেই তাতে।

পরস্পরের শরীর অনুভব এবং আবিষ্কারের মধ্যেও গভীর প্রেমের উপাদান আছে, কিন্তু তা শুরু করতে হলে ভদ্রোচিত একটু ঘনিষ্ঠতা দরকার। হোটেল থেকে বেরিয়ে সেই ঘনিষ্ঠতাটুকু অর্জনের জন্যে নিঃশব্দে কিন্তু ব্যাকুলতার সাথে কাজ শুরু করে দিল ওরা দু'জন। আগেই ঠিক করা ছিল, বান্ধবীর ফ্ল্যাটে রাত কাটাবে এষা। কিন্তু চার দেয়ালের ভেতর এখুনি মুখোমুখি হতে চায় না ওরা, তাই ট্যাক্সি নিল না। প্রায় নির্জন রাস্তা ধরে ওরা হাঁটতে লাগল। পাশাপাশি হাঁটছে, মাঝখানে কয়েক ইঞ্চি দূরত্ব, হাতে হাত ঠেকছে, আর তাতেই বিদ্যুৎ তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছে দু'জনের শরীরে। কারও দিকে তাকাতে হলে কিছু বলতে হয়, চুপ করে শুধু তাকিয়ে থাকা বেহায়ার মত লাগে। পরস্পরের দিকে তাকাবার জন্যে অপ্রাসঙ্গিক, অর্থহীন কথা বলছে ওরা, অকারণে হাসছে, সেই সাথে পরস্পরের কাছে ধরা পড়ে গিয়ে অদ্ভুত এক ধরনের লজ্জাও পাচ্ছে।

মেইন রোড ধরে হাঁটছিল ওরা, অন্ধকার একটা গলির মুখ দেখে দু'জনেই দাঁড়িয়ে পড়ল। গলির মুখটাই শুধু চোখে পড়ল, এত অন্ধকার যে ভেতরে কি আছে বোঝা গেল না।

'বিশ্বাস করো,' আ...দনের সুরে বলল এষা, যেন তার এই কথা রানা বিশ্বাস

না করলে মহা সর্বনাশ হয়ে যাবে. 'এই রাস্তা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে আমি জানি।'

'কোথায়?' জানতে চাইল রানা। তারপর তাড়াতাড়ি বলল, 'দাঁড়াও. গলিটা আমারও কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে।'

'এই গলির শেষ মাথায়, জানো,' ভয় পাওয়া ছোট্ট মেয়ের মত ফিসফিস করে বলল এষা, 'একটা সিঁড়ি আছে। সেই পাতালে নেমে গেছে সিঁড়িটা। পাতালপুরীতে বাস করে একদল পেত্নী…'

'আর একদল ভূত…'

ঠোঁট উল্টে এষা বলল, 'তুমি সাথে আছ, ভূতকে আমি ভয় পাই না।'

'হ্যা, ওদের সর্দার আমি, তোমার ভয় পাবার কোন কারণ নেই।'

'তুমি পেত্নীদের ভয় পাও?' জিজ্ঞেস করল এষা, রানার একটু কাছে সরে এল। আঙুলের সাথে আঙুলের ছোঁয়া লাগল, ঝট করে হাত সরিয়ে নিল—দু'জনেই।

'না!' অকারণ জোর দিয়ে বলল রানা, যেন পেত্নীদের ভয় মন থেকে দূর করার জন্যেই।

'ভয় পেয়ো না,' তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল এষা। 'আমি ডাইনী, পেত্নীরা আমাকে ওদের রাণী নির্বাচন করেছে।'

'তাহলে চলো, ওদের খবর জেনে আসি?'

'চলো।'

অন্ধকার গলিতে ঢুকে ওদের হাঁটার গতি কমতে কমতে শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়াল। মাঝখানে চলে এসেছে ওরা, গলির দুই মুখের কোনটাই এখান থেকে দেখতে পাওয়া যায় না। পায়ের তলায় মাটির শক্ত স্পর্শ পাচ্ছে বলে এখনও ওরা বিশ্বাস করছে, পৃথিবীতে আছে ওরা।

'দাঁড়িয়ে পড়লে কেন?'

রানার গায়ের কাছে সরে এল এষা। 'আমার ভয় করছে!'

গায়ে গা ঠেকল। রানা অনুভব করল, এষা কাঁপছে। কিন্তু জানে, এটা ভয়ের কাঁপুনি নয়।

'তুমি কাঁপছ কেন?' ফিসফিস করে জানতে চাইল এষা। কিন্তু কারণটা জানে সে।

'চারদিকে আমি পেত্নী দেখতে পাচ্ছি,' চাপা গলায় বলল রানা।

'আমার একটা হাত ধরবে?' রানার কাঁধের কাছে মুখ তুলে বলল এষা, কানে কানে।

এষার একটা হাত ধরল রানা। কয়েক সেকেন্ড আর কেউ কথা বলল না ঝিমঝিম ঝিমঝিম করছে শরীর। এষার হাতটা নরম লাগল রানার। তারপর বলল, 'আমার হাত কে ধরবে?'

রানার সামনে দাঁড়াল এষা। অন্ধকারে হাতড়ে খুঁজে নিল রানার হাত। পরস্পরের হাত ধরে পরস্পরকে কাছে টানল ওরা।

'এসো,' ফিসফিস করে বলল এষা, 'আমরাও ভূত-পেত্নী হয়ে যাই!'

'কিন্তু তারপর?'

মুখে রানার গরম নিঃশ্বাস পেল এষা 'তুমি কিচ্ছু জানো না তারপর ভূতপেত্নীরা যা করে আমরাও তাই করব—তুমি আমার ঘাড়ে চাপবে, আমি তোমার ঘাড়ে!' রানার হাত ছেড়ে দিল সে, বলল, 'কই দেখি, তোমার ঘাড় যথেষ্ট চওড়া কিনা, ওখানে আমার জায়গা হতে হবে তো!' রানার কাঁধে হাত রাখল এষা আঙুলগুলো সাপের মত কিলবিল করতে করতে উঠে গেল মাথার পিছনে রানার মাথাটা নিচের দিকে নামাবার জন্যে একটু একটু চাপ দিল সে

এবার হাত ছেড়ে দিল রানা। এক হাতে জড়িয়ে ধরল ক্ষীণ কটি।

কানের পাশে, তারপর মুখে রানার আঙুলের স্পর্শ পেয়ে শিউরে উঠল এষা। এবার আরও ব্যস্ততার সাথে রানার মাথা নিচের দিকে নামাতে শুরু করল সে। নিষ্ঠুর একজোড়া ঠোঁট স্পর্শ করল ওর কোমল অধর। রানার গায়ের সাথে সেঁটে এল এষা, সেই সাথে কেমন যেন নেতিয়ে পড়ছে। পিঠে হাত রাখল রানা। ঠোঁট থেকে ঠোঁট তুলে নিয়ে নাক দিয়ে নাক, ঠোঁট দিয়ে বন্ধ চোখ, গাল দিয়ে কপাল স্পর্শ করল ও। অস্পষ্ট একটা গোঙানির আওয়াজ পেল, এষার নিঃশ্বাসের সাথে বেরিয়ে এল শব্দটা।

কথা হলো না, কিন্তু কেউ কাউকে ছাড়ল না আর। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে রেখে অন্ধকার গলিপথ ধরে আবার শুরু হলো হাঁটা, আস্তে আস্তে। দু'জনেই জানে, পরস্পরের কাছে এখন আর ওরা কিছুক্ষণ আগের মত অচেনা নয়। একসময় হাত ধরাধরি করে আলোয় ফিরে এল ওরা। অনির্বচনীয় কিছু পাওয়ার প্রত্যাশায় দু'জনেই উন্মুখ হয়ে আছে। হাঁটতে হাঁটতে একটা সুপারমার্কেটে চলে এল ওরা, সারারাত খোলা থাকে এই মার্কেট। টুকিটাকি কটা শখের জিনিস কিনল এষা। রাস্তায় বেরিয়ে এসে রানার হাতে ধরিয়ে দিল প্যাকেটটা। মুখে শুধু বলল, 'তোমার।'

খপ করে এষার একটা হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে তাকে নিজের বুকের ওপর নিয়ে এসে ফেলল রানা। এক সেকেন্ড আগে এষা যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখান দিয়ে স্যাঁৎ করে বেরিয়ে গেল কালো একটা গাড়ি। লাইটপোস্টের আলোয় ড্রাইভারকে দেখেছে রানা, মাতাল এক মেয়েলোক। এষাও শেষ মুহূর্তে পাশ থেকে দেখেছে তাকে।

'সন্দেহ নেই,' বলল রানা, 'তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী!'

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু দম নিল এষা, তারপর সগর্বে বলল, 'ভয় করি না! ওরা কুচক্রী, ওদের অস্ত্র ভায়োলেন্স—কিন্তু আমার অস্ত্র ভালবাসা, আমি তোমাকে ভালবাসা দিয়ে জিতে নেব!'

'এই,' রাস্তা পেরিয়ে এসে ফিসফিস করে জানতে চাইল রানা, 'আর কোন অন্ধকার গলির কথা জানা আছে তোমার?'

মারার জন্যে কিল তুলল এষা। 'অসভ্যতা হচ্ছে, না?'

বলা নেই কওয়া নেই, একটা ট্যাক্সি এসে থামল ওদের পাশে। পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা, কেউ মুখ খুলল না, কথা হলো চোখে চোখে। আধবুড়ো ড্রাইভারকে ভাল করে দেখে নিল রানা, মিটিমিটি হাসছে লোকটা, যেন ওদেরকে আরও ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ করে দিতে চায় সে। দরজা খুলে উঠে পড়ল ওরা।

সংকোচ কেটে গেছে, গায়ে গা ঠেকিয়ে বসল ওরা। ড্রাইভারকে অভিজাত একটা এলাকার ঠিকানা বলল এষা। কিছু জিজ্ঞেস করল না রানা, জানে, এষার বান্ধবীর ঠিকানা ওটা। 'দেখি তোমার ভাগ্যে কি আছে,' বলে এষার হাতটা তুলে নিল ও। গাড়িতে আলো নেই, প্রায় অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। 'এই সেরেছে!' আঁতকে উঠল রানা।

'কেন, কি দেখছ?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল এষা।

'সর্বনাশ!' এষার হাতটা ছেড়ে দিয়ে আতঙ্কিত সুরে বলল রানা 'তোমার দেখছি এক ডজন ছেলেমেয়ে!'

এবার শুধু হাত তুলে ক্ষান্ত হলো না এষা, দুম করে রানার পিঠে কিল বসিয়ে দিল। এষা হাত তুলছে দেখে পিঠটা রানাই পেতে দিল।

ট্যাক্সি থেকে নেমে ফ্ল্যাটবাড়িতে ঢুকল ওরা। লেটারবক্সের ভেতর থেকে একটা চাবি নিল এষা, বলল, 'আমার বান্ধবী শহরে নেই। আমরা একা থাকব এখানে।'

'সারাজীবন?'

'সারাজীবন তোমাকে পাব, সে-ভাগ্য কি হবে আমার?' পাল্টা প্রশ্ন করল এষা।

'জানি না,' সত্যি কথাই বলল রানা। 'অত লম্বা সময়ের কথা কি এই মুহূর্তে ভাবতে চাই আমরা?'

'না। ভেবে কোন লাভও নেই আসলে, অঙ্ক মিলবে না।'

'আমরা এখানে রাত কাটাব, তোমার ভয় করবে না?'

সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে পড়ল এষা, চেহারায় ফুটে উঠল অবাক ভাব, যেন রানার কথার অর্থ বুঝতেই পারেনি। 'ভয়? কিসের ভয়?'

'না...মানে, তুমি খুব সুন্দরী...আর আমিও সুস্থ সবল এক যুবক। ভাবছিলাম...'

'তোমাকে আমি চাই,' স্পষ্ট করে বলল এষা। 'যদি পাই, সেটা হবে পরম আনন্দের পাওয়া। ভয়ের কথা ওঠে কেন?'

'এমন সাহসী মেয়ে বাপের কালে দেখিনি!' বিড়বিড় করে বলল রানা। 'আমার ভয়ই করছে!'

'কোন ভয় নেই, সব ভয় তোমার ভেঙে দেব আমি!'

তিন কামরার ছোট একটা ফ্ল্যাট, পুরানো আমলের, কিন্তু আরামদায়ক আসবাব-পত্রে সাজানো। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল এষা, কিন্তু এরপর কি করবে, দু'জনের কেউ ভেবে পেল না। কয়েক মুহূর্ত বোকার মত চেয়ে রইল পরস্পরের মুখের দিকে।

'এসো আমরা জানোয়ার হয়ে যাই,' প্রস্তাব দিল এষা!

'এসো,' সাগ্রহে রাজি হয়ে গেল রানা।

'রেডি, ওয়ান...টু...থ্রী...!' বলেই দু'জন দু'দিকে হাঁটা ধরল। এষা গিয়ে ঢুকল কিচেনে, রানা বাথরুমে।

বাথরুম থেকে ফিরে এসে রানা দেখল, ধূমায়িত কফির কাপ নিয়ে বেডরুমে

ঢুকছে এযা। তার পিছু পিছু ঝুল-বারান্দায় বেরিয়ে এল ও. বসল এষার সামনের চেয়ারটায়। হাত বাড়িয়ে নিজের কাপটা নিল। একটা চুমুক দিয়ে মেঝেতে নামিয়ে রাখল কাপ. কান পাতার ভঙ্গি করে কি যেন শুনল. তারপর বলল. 'শুনতে পাচ্ছ কে যেন ডাকছে?'

রানার চোখে কৌতুকের ঝিলিক দেখে এক সেকেন্ড কি যেন চিন্তা করল এষা. তারপর জবাব দিল. 'হ্যাঁ. পাচ্ছি। আওয়াজটা বেডরুম থেকে আসছে বলে মনে হচ্ছে।'

'কে ডাকতে পারে, এত রাতে?'

'রাত যখন, নিশ্চয়ই বিছানা।' বলে খিলখিল করে হেসে উঠল এষা

বেডরুমে ফিরে এল এষা. কিন্তু কখন এল নিজেরাও জানে না একটাই সিঙ্গেল বিছানা। সেদিকে রানাকে টেনে নিয়ে চলল এষা 'সাহস করছি বটে. কিন্তু আমার ভীষণ ভয়ও করছে, রানা।'

'কেন?'

'তুমি যদি চেঁচামেচি করো?'

'কেন, চেঁচাব কেন?'

'বাহ্, এখনও বুঝতে পারোনি. তোমার ওপর জোর খাটাবার মতলব নিয়েই এখানে নিয়ে এসেছি?'

'ওরে বাবা! সত্যিই বাঁচাও, বাঁচাও বলে চিৎকার করব আমি.' বলল রানা। 'কিন্তু. ধরো, যদি উল্টোটা ঘটে? আমি যদি রেপ করার চেষ্টা করি তুমি কি করবে?'

'তোমাকে সাহায্য করব.' এষার খিলখিল হাসিতে রক্ত গরম হয়ে উঠল রানার। হাসি থামিয়ে আবার বলল এষা. 'নাহ্. তোমাকে নিয়ে পারা মুশকিল! আলোটা কে অফ করবে, মশাই? ও-ই কাজটাও কি তুমি আমাকে দিয়েই করাতে চাও?' বলেই নিভিয়ে দিল বাতি। 'কুক্! আমাকে খুঁজে বের করো দেখি?'

অনেক খুঁজে বিছানায় পেল ওকে রানা।

দশ

ইউরাটম প্রিন্ট আউট দারুণভাবে নিরাশ করল জ্যাক রিচিকে। তিনজন মিলে তিন-চার ঘণ্টা গাধার খাটুনি খাটার পর বুঝল, কনসাইনমেন্টের তালিকাটা অস্বাভাবিক লম্বা। এতগুলো টার্গেট কাভার করা কোন ভাবেই সম্ভব নয়। রানা কোন্‌টাকে বেছে নিয়েছে জানতে হলে একটাই রাস্তা আছে, আবার ওর খোঁজ পেতে হবে।

কাজেই কোহেনের অক্সফোর্ড মিশনের গুরুত্ব হঠাৎ করে বেড়ে গেল।

কোহেন ফোন করবে এই আশায় বসে থাকল ওরা। ঘুম-কাতুরে লোক কুয়েল, দশটার দিকে বিছানা নিল সে। তার চেয়ে দু'ঘণ্টা বেশি টিকল হিলারী. বারোটার দিকে সে-ও মাফ চেয়ে নিয়ে শুতে চলে গেল কিন্তু রিচি অনড়. তার

দৃঢ় বিশ্বাস, অক্সফোর্ডে কি হলো না হলো ফোন করে নিশ্চয়ই তা জানাবে কোহেন। রাত একটায় আশা পূরণ হলো তার। সত্যিই ফোন করল কোহেন।

ঝন ঝন শব্দে ফোনের বেল বাজতেই ভয় পেয়ে লাফ দিয়ে উঠল রিচি। খপ্ করে ধরল রিসিভার। কিন্তু নিজেকে সামলে নেবার জন্যে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে তুলল সেটা। 'ইয়েস?'

ইন্টারন্যাশনাল টেলিফোন কেব্‌ল্ ধরে তিনশো মাইল দূর থেকে ভেসে এল কোহেনের গলা, 'কাজ হয়েছে। মক্কেল এখানে এসেছিল। দু'দিন আগে।'

সারা শরীরে উত্তেজনার ঢেউ বয়ে গেল রিচির। 'জেসাস! একেই বলে ভাগ্য।'

'এখন?'

পরিস্থিতিটা বোঝার জন্যে দু'সেকেন্ড চিন্তা করল রিচি। 'আমরা যে জানি, রানা সেটা জানে।'

'হ্যাঁ। আমি বেসে ফিরব?'

'সেটা উচিত হবে না। প্রফেসর কিছু বলেছে, মক্কেল ইংল্যান্ডে ক'দিন থাকবে না থাকবে?'

'না। আমি সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিলাম। প্রফেসর জানেন না মক্কেল বলেনি।'

'তা বলবেও না।' ভুরু কুঁচকে খানিক চিন্তা-ভাবনা করল রিচি। 'মক্কেলের প্রথম কাজ হবে সে যে ফাঁস হয়ে গেছে সেটা রিপোর্ট করা। তার মানে, নিজের বা বন্ধু দেশের লন্ডন অফিসের সাথে যোগাযোগ করবে সে।'

'হয়তো এরই মধ্যে করেছে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু কারও সাথে দেখা করতেও চাইতে পারে। এই মক্কেল অত্যন্ত সাবধানী, আর সাবধানতা অবলম্বনের আয়োজনে সময় লাগে। ঠিক আছে, ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। আজ যে-কোন সময় লন্ডনে আসছি আমি। তুমি কোথায়?'

'এখনও অক্সফোর্ডে। প্লেন থেকে মেমে সোজা এখানে চলে এসেছি। সকালের আগে লন্ডনে ফিরে যেতে পারছি না।'

'ঠিক আছে, হিলটনে ওঠো। লাঞ্চের সময় যোগাযোগ করব।'

'বেশ।'

'দাঁড়াও।'

'লাইনে আছি।'

'নিজে উদ্যোগী হয়ে ভাল-মন্দ কিছু করতে যেয়ো না যেন। আমি না পৌছনো পর্যন্ত অপেক্ষা করো। কাজ খুব ভাল দেখিয়েছ, কিন্তু সেটাকে লেজে-গোবরে করে ছেড়ো না আবার।'

যোগাযোগ কেটে দিল কোহেন।

ফোনের দিকে তাকিয়ে কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ বসে থাকল রিচি। বোকার মত কিছু একটা করে বসবে কোহেন? নাকি গুড-বয় শোনার লোভে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে প্রলুব্ধ হবে?

রানার কথা মনে পড়ল। ওর ছায়া মাড়াবার দ্বিতীয় কোন সুযোগ তাদেরকে

দেবে না ও। যা করার তাড়াতাড়ি, এখুনি করতে হবে রিচিকে। গায়ে জ্যাকেট চড়িয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ল সে, ট্যাক্সি নিয়ে চলে এল মার্কিন দূতাবাসে।

এত রাত বলে ভেতরে ঢুকতে একটু ঝামেলাই হলো। এক এক করে চারজন লোককে নিজের পরিচয়-পত্র দেখাল রিচি। কমিউনিকেশন রূমে ঢোকার সময় ডিউটি অপারেটরকে রেডি হয়ে থাকতে দেখল সে। তাকে বলল, 'বসো। আগে লন্ডন অফিসের সাথে যোগাযোগ করো। কাজ না হলে ওয়াশিংটনের সাথে কথা বলতে হবে।'

সি.আই.এ.-র লন্ডন হেডের সাথে তেমন বনিবনা নেই রিচির, ওপরমহলের সুপারিশ ছাড়া তার অনুরোধ নাও রাখতে পারে লোকটা। সেক্ষেত্রে সরাসরি সি.আই.এ. চীফের সাথে যোগাযোগ না করে উপায় থাকবে না রিচির।

স্ক্র্যাম্বলার ফোন তুলে নিয়ে লন্ডনের মার্কিন দূতাবাসকে ডাকতে লাগল অপারেটর। জ্যাকেট খুলে শার্টের আস্তিন গুটিয়ে তৈরি হলো রিচি।

অপারেটর বলল, 'কর্নেল জ্যাক রিচি ওখানের সিনিয়র সিকিউরিটি অফিসারের সাথে কথা বলবেন।' ইঙ্গিতে এক্সটেনশনটা ধরতে বলল সে।

'কর্নেল চেজিং,' মাঝ-বয়েসী এক লোকের গলা।

'চেজিং, আমি রিচি। হঠাৎ জরুরী সাহায্য দরকার পড়েছে আমার। মাসুদ রানা নামে বাংলাদেশী এক এজেন্ট ইংল্যান্ডে আছে বলে মনে করা হচ্ছে। তুমি হয়তো জানো, মিশরীয় সিক্রেট সার্ভিসের চীফ কিছুদিন আগে বাংলাদেশে গিয়েছিলেন, তাঁর এই যাওয়ার সাথে মাসুদ রানার ইংল্যান্ড উপস্থিতির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। সম্ভবত মিশরীয়দের গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ করে দেবার দায়িত্ব নিয়েছে রানা।'

ব্যঙ্গ আর বিরক্তির সাথে চেজিং বলল, 'তুমি দেখছি রেলগাড়ি ছেড়ে দিলে। সংক্ষেপ করো, বাবা, সংক্ষেপ করো। তুমি যা বললে তার প্রায় সবটুকু জানা আছে আমার। ডিপ্লোম্যাটিক পাউচে তার ছবিও এসে পৌঁচেছে আমাদের এখানে। কিন্তু সে যে লন্ডনে আসতে পারে সে আভাস তো কেউ দেয়নি।'

'শোনো। আমার ধারণা, বাংলাদেশী বা মিশরীয় দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করতে পারে সে। আমি চাই আজ সকাল থেকে লন্ডনে সি.আই.এ.-র যত ফিল্ড এজেন্ট আছে তাদের সবাইকে এই দুই দূতাবাসের ওপর নজর রাখার জন্যে পাঠাবে তুমি। ওরা আমার নির্দেশে কাজ করবে।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হলো, রিচি?' অপর প্রান্ত থেকে অবহেলার সাথে বলল চেজিং। 'অত লোক আমি দিই কিভাবে?'

'বোকার মত কথা বোলো না,' গম্ভীর হলো রিচি। 'লন্ডনে তোমার একশোর ওপর লোক আছে। আর এদের দুই দূতাবাসে সব মিলিয়ে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজনের বেশি হবে না।'

'ঠিক আছে, আমাকে একটু ভেবে দেখতে দাও।'

'তাড়াতাড়ি করো। তুমি দেরি করলে আমি ওয়াশিংটনের কাছ থেকে অনুমতি চাইব।'

'কাল সকালে যদি জানাই, চলবে?'

ইচ্ছে হলো, লোকটার গলা চেপে ধরে রিচি। 'এটা একটা জরুরী পরিস্থিতি, চেজিং।'

বিশ সেকেন্ড অকারণে দেরি করে চেজিং বলল, 'ঠিক আছে। কিন্তু মনে রেখো, আমি তোমার একটা উপকার করলাম।'

'এর আগে অনেক অপকার করেছ তুমি আমার,' বলল রিচি। 'ঠিক আছে, তার একটার কথা ভুলে গেলাম।' রিসিভার নামিয়ে রাখল সে।

বেলা এগারোটায় ফুলহ্যাম রোডের একটা রেস্তোরাঁয় আলি কারামের অপেক্ষায় বসে আছে রানা। হিথরো এয়ারপোর্টের ইনফরমেশনে একটা মেসেজ রেখে এসেছে ও, সিকিউরিটি আর গার্ডদের দলবল ছাড়া, সম্ভব হলে একা, ওর রেস্তোরাঁর ঠিক উল্টো দিকের একটা কাফেতে মিশরীয় চীফকে আসতে হবে।

সকাল ছ'টায় ঘুম ভেঙেছে রানার। সারা শরীরে তৃপ্তির একটা আবেশ অনুভব করলেও, মুহূর্তের জন্যে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল ও, এ কোথায় রয়েছে সে! তারপর খেয়াল হলো, ওর কোলে মাথা রেখে গুটিসুটি মেরে শুয়ে রয়েছে এষা। রাতের কথা মনে পড়ে গেল। ঠিক করল, এষার ঘুম ভাঙাবে না। মাথাটা কোল থেকে আলগোছে নামাতে যাবে, স্পষ্ট গলায় নিষেধ করল এষা, 'ভাল হচ্ছে না কিন্তু!'

'আরে, তুমি জেগে গেছ?'

'ঘুমালাম কখন যে জাগব?' ঠাট্টা করে বলল এষা। চোখ মেলল সে। 'সারারাত তোমাকে দেখেছি।'

'একটা ধাক্কা দিলেই পারতে, আমিও দেখতাম,' মৃদু হেসে বলল রানা।

মিষ্টি জলতরঙ্গের মত হাসল এষা।

এষা বাথরুমে ঢুকতেই কিচেনে চলে এল রানা, ব্রেকফাস্ট তৈরি করবে। রুটি সেঁকতে গিয়ে বেশির ভাগই পুড়িয়ে ফেলল ও, আর কফি বানাল ঠিক যেন কানা চোখের পানি একচোট হাসাহাসির পর আবার নতুন করে শুরু করতে হলো এষার সব।

তৃপ্তির সাথে নাস্তা সেরে কফিতে চুমুক দিচ্ছে রানা। অনেক কাজ পড়ে আছে ওর। কিন্তু এই পরিবেশ ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। স্বপ্নের ঘোরে আছে যেন। মনে পড়ল, ঠিক এমনি লেগেছিল ওর প্রথম প্রেমে পড়ে।

রানার গেঞ্জিটা দু'আঙুলে ধরে ওপরে তুলল এষা, আতঙ্কে চেঁচিয়ে বলল, 'এটা কি?'

'কি আবার, আমার গেঞ্জি।'

'গেঞ্জি? আজ থেকে আইন জারি হলো, তোমার গেঞ্জি পরা চলবে না। এটা একটা পুরানো ফ্যাশন, আর অস্বাস্থ্যকর। তোমার বুক ছুঁতে চাইলে ওটা আমার জন্যে একটা মস্ত বাধা হয়েও দেখা দেবে।'

হেসে ফেলল রানা, 'ঠিক আছে, পরব না।'

'লক্ষ্মী ছেলে,' বলে জানালা দিয়ে নিচে ফেলে দিল এষা গেঞ্জিটা।

'কিন্তু তোমারও ট্রাউজার পরা চলবে না,' বলল রানা।

'কেন?'

'বাতাস লাগে না, ফলে ঘেমে যায় পা,' বলল রানা, 'তাছাড়া, তোমার পায়ের স্পর্শ ওরা কেন পাবে?'

'ঠিক আছে, মেনে নিলাম। আজ থেকে ট্রাউজার পরব না।'

খানিক পর রানা প্রস্তাব করল, 'গোসল করবে?'

'দু'জন একসাথে?' সাগ্রহে জানতে চাইল এষা।

'মন্দ কি!' হাসল রানা।

'ঠিক আছে,' বলল এষা, 'কিন্তু পেছন ফিরতে হবে। তোমার সামনে আমি জামা খুলতে পারব না।'

'আমিও না,' বলল রানা। 'আমারও ভীষণ লজ্জা করে।'

জামা-কাপড় ছেড়ে রেডি ওয়ান-টু-থ্রী বলে ফিরল ওরা পরস্পরের দিকে। ধক্ করে উঠল রানার বুকের ভেতরটা—জিভ শুকিয়ে কাঠ। সমস্ত রক্ত সরে গেল এষার মুখ থেকে, ঢোক গিলল পরপর দু'বার। অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে দু'জন দু'জনের দিকে। এক পা দু'পা করে এগিয়ে যাচ্ছে নিজেরই অজান্তে। গলার পাশে রানার ঠোঁটের স্পর্শ পেয়ে শিউরে উঠল এষা, দু'হাতে জড়িয়ে ধরে গাল রাখল রানার বুকে—ধুপধাপ লাফাচ্ছে ভেতরে হৃৎপিণ্ডটা।

পরমুহূর্তে পাগল হয়ে গেল দু'জনে।

গোসল সারার পর কফি নিয়ে বসল ওরা। হুট করে জানতে চাইল এষা, 'ধরো, আমরা বিয়ে করতে চাই। আমাকে কি নতুন করে মুসলমান হতে হবে?'

'আমার সাথে তোমার বিয়ে হচ্ছে, আপাতত এই কথাটা মাথায় না রাখাই ভাল,' ধীরে ধীরে বলল রানা। 'আমি একটা জরুরী কাজে আছি। বিপজ্জনক কাজ। এটা শেষ হলে তখন ভেবেচিন্তে দেখা যাবে, কেমন?'

'ঠিক আছে। তবে আমার ছেলের কিন্তু আমি ইসলামী নাম রাখব,' বলল এষা আহ্লাদী গলায়।

এখন রেস্তোরাঁয় বসে এষার কথাই ভাবছে রানা। বুঝতে পারছে, তার জীবনে নতুন একটা সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এষা ওকে ভালবাসে, সে-ও কি এষাকে ভালবাসে না? কিন্তু ভালবাসার শুভ পরিণতি বলতে যা বোঝায় সেটা কি করে ঘটবে বুঝতে পারে না ও। ও জানে, আদর্শ গৃহিণী আর প্রিয় সঙ্গিনী হবার সমস্ত গুণ রয়েছে এষার মধ্যে। কিন্তু ওর কাজের সাথে ঘর-সংসারের যে বিরোধ রয়েছে, বাঁধনের কথা ভাবলেই বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চায় মন—এসব কথা কি গুছিয়ে বোঝাতে পারবে সে এষাকে?

রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। জুন মাসের সাথে মানানসই আবহাওয়া—একনাগাড় বৃষ্টি আর বেশ শীত। রাস্তা দিয়ে দ্রুতবেগে যাওয়া আসা করছে লাল বাস আর কালো রঙের ট্যাক্সিগুলো, পানির ছিটে এসে পড়ছে ফুটপাতে। উল্টোদিকের কাফের সামনে একটা ট্যাক্সি এসে থামল দেখে উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠল রানা। জানালার কাঁচে নাক ঠেকিয়ে বৃষ্টির ফোঁটার ভেতর দিয়ে ভাল করে দেখার চেষ্টা করল ও। লে. জেনারেল আলি কারামের বিশাল কাঠামো দেখেই চিনতে পারল। মস্ত একটা হ্যাট পরে আছেন তিনি, গায়ে ঢোলা,

কালো রঙের রেনকোট। গাড়ি থেকে তাঁর পিছু পিছু আরও একজন লোক নামল, কিন্তু চিনতে পারল না রানা. দু'জনেই কাফেতে ঢুকল। রাস্তার এদিক ওদিক তাকাল রানা।

গ্রে-রঙের একটা মার্ক টু জাগুয়ার জোড়া-হলুদ লাইনের ওপর দাঁড়িয়েছে. কাফে থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে। এখন সেটা পিছু হটে একটা সাইড রোডে ঢুকল, কিন্তু পুরোপুরি অদৃশ্য না হয়ে নাক একটু বের করে রাখল। সেটা থেকে একজন আরোহী নামল, ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে কাফের দিকে।

টেবিল ছেড়ে রেস্তোরাঁর মুখের কাছে টেলিফোন বুদে ঢুকল রানা। বুদের ভেতর থেকে উল্টোদিকের কাফে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও। ওই কাফের নাম্বারে ডায়াল করল।

'ইয়েস?'

'আমাকে বিলের সাথে কথা বলতে দিন, প্লীজ।'

'বিল? ওই নামে তো কেউ এখানে নেই।'

'আছে। একটু জিজ্ঞেস করে দেখুন না।'

'ঠিক আছে। এই যে, এখানে বিল নামে কেউ আছেন নাকি?' মুহূর্তের বিরতি, তারপর, 'হ্যাঁ, আসছেন।'

কয়েক সেকেন্ড পর মেজর জেনারেল আলি কারামের গলা পেল রানা। 'ইয়েস?'

'আপনার সাথে নতুন মুখটা কে?'

'আমাদের লন্ডন স্টেশনের হেড। তোমার কি মনে হয়, ওকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি?'

রসিকতার উত্তর না দিয়ে রানা বলল, 'আপনাদের কেউ পিছনে ফেউ নিয়ে এসেছেন। গ্রে রঙের জাগুয়ারে দু'জন লোক।'

'ওদের আমরা দেখেছি।'

'খসান।'

'অবশ্যই। শোনো, এই শহরের রাস্তাঘাট তোমার জানা আছে—কিভাবে কি করলে সহজে…এনি সাজেশন?'

'একটা ট্যাক্সি করে দূতাবাসে পাঠিয়ে দিন লন্ডন হেডকে, তাতে জাগুয়ারটাকে বোধহয় খসানো যাবে। এরপর দশ মিনিট অপেক্ষা করে একটা ট্যাক্সি নিন আপনি; চলে যান…' কোথায় যেতে বলবে ঠিক করার জন্যে একটু সময় নিল রানা, রাস্তাটা নির্জন এবং এখান থেকে কাছাকাছি কোথাও হতে হবে। 'চলে যান র‍্যাডক্লিফ স্ট্রীটে। ওখানে আমি আপনার সাথে দেখা করব।' কিভাবে দেখা করবে, কিভাবে খসাতে হবে ফেউটাকে—বুঝিয়ে বলল রানা।

'ঠিক আছে,' হেসে উঠলেন লে. জেনারেল। 'তোমার মাথায় বেশ বুদ্ধি খেলে তো, হে!'

রাস্তার দিকে তাকাল রানা। 'আপনার ফেউ কাফেতে ঢুকছে।' রিসিভার রেখে দিল ও।

নিজের টেবিলে ফিরে এসে জানালার দিকে মুখ করে বসল রানা। লন্ডন হেড

ছাতা নিয়ে বেরিয়ে এল কাফে থেকে। ছাতাটা খুলে মাথার ওপর ধরল এদিক ওদিক তাকাল ট্যাক্সির খোঁজে। ফেউয়েরা হয়তো আলি কারামকে এয়ারপোর্টে দেখে চিনতে পেরেছে, অথবা লন্ডন হেডের ওপর অন্য কোন কারণে নজর রাখছে তারা। ট্যাক্সি পেয়ে তাতে উঠে বসল লন্ডন হেড। ট্যাক্সি ছুটল, সাইড রোড থেকে বেরিয়ে তার পিছু নিল জাগুয়ার। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে নিজের জন্যে একটা ট্যাক্সি ডাকল রানা। ভাবল, বিভিন্ন দেশের এজেন্টদের কাছ থেকে ভালই রোজগার করে ট্যাক্সি ড্রাইভাররা।

র‍্যাডক্লিফ স্ট্রীটে পৌছল ট্যাক্সি। ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলল রানা। এগারো মিনিট পর বাঁক নিয়ে আরও একটা ট্যাক্সি ঢুকল রাস্তায়, থামল, দরজা খুলে সেটা থেকে নামলেন আলি কারাম। 'আলোটা জ্বালো, তারপর নেভাও,' ড্রাইভারকে বলল রানা। 'ওই ভদ্রলোকের সাথে দেখা করতেই আমি এসেছি।'

আলোটাকে জ্বলে উঠে নিভে যেতে দেখলেন আলি কারাম, হাত নেড়ে পাল্টা সাড়া দিয়ে ট্যাক্সির ভাড়া মেটালেন। ভাড়া দেয়া শেষ করেছেন, এই সময় রাস্তার মোড়ে আরও একটা ট্যাক্সিকে দেখা গেল। রাস্তার ভেতর খানিকটা ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়ল সেটা। সরাসরি না তাকিয়েও ওটার উপস্থিতি টের পেলেন আলি কারাম।

তিন নম্বর ট্যাক্সির ফেউ গাড়ির ভেতর অপেক্ষা করছে, কি ঘটে না ঘটে দেখতে চায়। সেটা বুঝতে পেরে নিজের ট্যাক্সির কাছ থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করলেন আলি কারাম। ড্রাইভারকে বোতামের কাছ থেকে হাত সরিয়ে রাখতে বলল রানা।

রানার ট্যাক্সিকে পাশ কাটিয়ে গেলেন আলি কারাম। নিজের ট্যাক্সি থেকে নেমে ড্রাইভারকে ভাড়া দিল ফেউ, তারপর আলি কারামের পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করল। ফেউয়ের ট্যাক্সি রাস্তা থেকে চলে যাবার পর ঘুরে দাঁড়ালেন আলি কারাম, ফিরতি পথ ধরে রানার ট্যাক্সির পাশে এসে দাঁড়ালেন তিনি। দরজা খুলে দিল রানা, আলি কারাম উঠে পড়লেন। বলতে হলো না, বুদ্ধিমান ড্রাইভার সাথে সাথে ছেড়ে দিল ট্যাক্সি।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। বোকার মত এদিক ওদিক তাকাচ্ছে ফেউ, কিন্তু রাস্তায় আর কোন ট্যাক্সি নেই। অন্তত মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা না করে উপায় নেই তার।

সকৌতুকে আলি কারাম বললেন, 'চমৎকার! তাই না?'

'সত্যিই,' জবাব দিল রানা।

ড্রাইভার জানতে চাইল, 'ঘটনাটা কি?'

'চিন্তা কোরো না,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'আমরা সিক্রেট এজেন্ট।'

প্রৌঢ় ড্রাইভার হেসে ফেলল, 'এখন কোথায়? এম আই ফাইভ, না স্কটল্যান্ডইয়ার্ড?'

'সায়েন্স মিউজিয়াম।'

সীটে হেলান দিল রানা, লে. জেনারেলের দিকে ফিরে হাসল মৃদু, 'কেমন আছেন?'

ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন আলি কারাম, 'তুমি কেমন

আছ, তুমি জানো?'

'বোধহয় জানি।' গম্ভীর হয়ে গেল রানা।

কাঁচের জানালায় বৃষ্টির ফোঁটাগুলোকে চোখের পানির মত লাগল রানার ড্রাইভার থাকায় কথা বলতে পারছে না ওরা, সেজন্যে হঠাৎ করে খুশি হয়ে উঠল ও। পেভমেন্টে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনজন হিপ্পি, গায়ে কোট নেই, কাপড়চোপড় ভিজে একেবারে সপসপে হয়ে গেছে, তাদের হাত আর মুখ ওপর দিকে উঁচু করা—বৃষ্টির আনন্দ উপভোগ করছে। এই কাজটা শেষ করতে পারলে আমি ওদের মত ভিজব, ভাবল রানা। পাশে থাকবে এষা।

চিন্তাটা আশ্চর্য খুশি করে তুলল ওকে। হঠাৎ হুঁশ ফিরল ওর। ও আপনমনে হাসছে, আর আলি কারাম ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। রানা বুঝে নিল, ভদ্রলোক ওর ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে আছেন, তার কারণটাও অনুমান করতে পারল ও।

মিউজিয়ামে পৌঁছে ভেতরে ঢুকল ওরা। নতুন করে জোড়া লাগানো বিশাল এক ডাইনোসরের সামনে এসে দাঁড়াল। গম্ভীর সুরে আলি কারাম বললেন, 'তোমাকে নিয়ে আমি খুব দুশ্চিন্তায় আছি, রানা।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। যা আশঙ্কা করেছিল নিশ্চয়ই তাই ঘটেছে, ভাবল ও।—কোহেন রিপোর্ট করেছে তেল আবিবে, আলি কারামের লোক সেই রিপোর্টগুলো দেখে দরকারী খবর পাচার করেছে কায়রোয়। 'আমি জানি আমি ফাঁস হয়ে গেছি,' শান্ত সুরে বলল ও। 'সে-খবর আপনার কানে পৌঁচেছে, তাও জানি।'

'কিন্তু কথা ছিল, কাজটা গোপনে সারতে হবে,' কঠিন সুরে বললেন আলি কারাম। 'জানাজানি হয়ে গেলে ওই ইউরেনিয়াম আমাদের কোন কাজেই লাগবে না। সব ভুলে গেছ তুমি?'

'তাহলে?' মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন আলি কারাম। কি বলবেন ভেবে পেলেন না।

আবার সেই একই প্রশ্ন করল রানা, 'তাহলে, মি. আলি কারাম?' এবারও আলি কারাম কিছু বললেন না। 'আপনার যখন ধারণা হয়েছে, এ-কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়, দয়া করে রেহাই দিন আমাকে, সালাম দিয়ে বাড়ি ফিরে যাই।'

'আমার সমস্যাটা তুমি বোঝার চেষ্টা করো, রানা,' গলা নরম করে বললেন আলি কারাম। চোটপাট দেখানোটা ভুল হয়ে গেছে, বুঝতে পেরেছেন তিনি। 'আমার সমস্যা হলো...'

'আমি তো আপনার কোন সমস্যা দেখছি না,' তাকে বাধা দিয়ে বলল রানা, 'একটাই সমস্যা ছিল আপনার, সেটা আপনি আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে খালাস হয়ে গেছেন।'

'কিন্তু তুমি সমস্যাটা সমাধান করতে পারবে কিনা...'

'না পারার আমি তো কোন কারণ দেখি না,' বলল রানা। 'তাছাড়া, পারব না বলে মনে হলে আমিই তো জানাব আপনাকে।'

উত্তেজনায়, আগ্রহে রানার দিকে ঝুঁকে পড়লেন আলি কারাম, জানতে চাইলেন, 'সম্ভব? এখনও তাহলে সম্ভব?'

'অবশ্যই সম্ভব,' বলল রানা।

'কিন্তু ওরা যে তোমার কথা জেনে ফেলেছে?' ফিসফিস করে বললেন আলি কারাম, 'ছাত্র-জীবন থেকে চেনে তোমাকে, নাম কোহেন। সে-ই দেখেছে...'

'আর কি জানে ওরা?'

'তুমি লুক্সেমবার্গ আর ফ্রান্সে গিয়েছিলে।'

'এটা খুব বেশি জানা হলো না, এই অ্যাসাইনমেন্টের কোন ক্ষতি হবে না তাতে,' বলল রানা। তারপর পাল্টা জেরা শুরু করল, 'আপনাদের সাথে আমার সম্পর্কের কথা ওরা জানল কিভাবে?'

'কি জানি...'

'একটু চিন্তা করুন, বুঝতে পারবেন।'

চুপ করে থাকলেন আলি কারাম।

'আপনি ঢাকায় গিয়েছিলেন, ওরা জানে। এর জন্যে কে দায়ী?'

'আমাকে ভুল বুঝো না, রানা,' তাড়াতাড়ি বললেন আলি কারাম। 'তোমাকে আমি একবারও দায়ী করেছি? হ্যাঁ, ঢাকায় গিয়ে ওদের চোখে ধরা পড়ে গেছি আমি। সম্পর্ক বুঝে নিয়েছে ওরা।' প্রসঙ্গ পাল্টালেন তিনি, রানাকে এখন খুশি করা দরকার। 'আমি শুধু অ্যাসাইনমেন্টের কথা ভেবে দুশ্চিন্তায় ছিলাম তা নয়, রানা। আমি তোমার নিরাপত্তার কথা ভেবেও এ ক'দিন ঘুমাতে পারিনি।' কথাটা আংশিক হলেও সত্যি।

প্রদর্শনীর আলোয় লে. জেনারেলের চেহারাটা ভাল করে দেখার চেষ্টা করল রানা। উদ্বেগ, ভয়, দুশ্চিন্তা আর অনিদ্রায় সত্যিই কাহিল হয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক। 'আপনি শুধু শুধু চিন্তা করছেন। আমার কোন বিপদ হয়নি, আশা করি হবেও না।'

'শুধু কোহেন একা নয়, সি.আই.এ.-র একটা দলও কাজ করছে তার সাথে।'

'কিছু এসে যায় না,' বলল রানা।

খানিক ইতস্তত করে আলি কারাম জানতে চাইলেন, 'কতদূর এগিয়েছ তুমি, মানে...'

'বলব না,' স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল রানা। 'মনে আছে, আপনিই বলেছিলেন, তেল আবিবে আপনার এজেন্ট থাকতে পারলে কায়রোয় ইসরায়েলের এজেন্ট থাকা বিচিত্র কি?'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি যেভাবে ভাল বোঝো...'

'যে-জন্যে আপনাকে ডেকেছি,' বলল রানা। 'হঠাৎ করে বেশ কিছু টাকা দরকার হতে পারে আমার। ডলার, মার্ক এবং পাউন্ড স্টার্লিঙে।'

'কত টাকা?'

'কত লাগবে এখনও ঠিক জানি না।'

'ঠিক কি ধরনের কাজে...?'

'এই ধরুন কয়েকটা ওশেনগোয়িং জাহাজ বা বোয়িং সাতশো সাত

আপনাদের জন্যে কিনতে হতে পারে আমাকে।'

'মাই গড!'

'কি ব্যাপার?' হাসি চেপে জানতে চাইল রানা। 'টাকার টানাটানি যাচ্ছে নাকি?'

'না-না, তা নয়,' উৎসাহে-উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছেন আলি কারাম। 'তোমার কথা শুনে বুঝতে পারছি, বেশ অনেকদূর এগিয়ে গেছ তুমি!'

'তা তো কিছুটা গেছিই।'

'ঠিক আছে, তোমার কি কি লাগতে পারে তার একটা আন্দাজ পাওয়া গেল—সেই পরিমাণ টাকার ব্যবস্থা করে রাখব আমি। কোথায় যোগাযোগ করতে হবে তা তো তুমি জানোই। আর কিছু?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'বারোজনের একটা কমান্ডো গ্রুপ দরকার হতে পারে আমার, ডাকলেই যেন জায়গামত হাজির থাকে। ইন্টেলিজেন্সের সেরা লোক চাই আমার। বিশ্বস্ত।'

রানা সত্যি অনেকদূর এগিয়ে গেছে, এই আনন্দে ঝাড়া পাঁচ সেকেন্ড কথাই বলতে পারলেন না আলি কারাম। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, রানা। সব রেডি থাকবে তোমার জন্যে।' ব্যস্ত হাতে পকেট থেকে একটা চুরুট আর লাইটার বের করলেন তিনি।

'এখানে ধূমপান নিষেধ,' বলল রানা।

লাইটার আর চুরুট পকেটে ভরে রাখলেন আলি কারাম। 'নেগেভের ডায়মোনা থেকে রিপোর্ট পেয়েছি, বোমা বানাবার কাজে মার্কিনীরা ওদেরকে সাহায্য করছে। আমি বলতে চাইছি, তুমি যদি একটু তাড়াতাড়ি করতে পারো, তাহলে খুব ভাল হয়, এই আর কি। পিছিয়ে পড়লে নির্ঘাত মারা পড়বে মিশর—শুধু মিশর কেন, গোটা আরব বিশ্বই।'

'নভেম্বরে হলে চলবে তো?'

একটু চিন্তা করলেন আলি কারাম। 'তার বেশি একটি দিনও চেয়ো না,' বললেন তিনি। 'কিন্তু তোমাকে খুব সাবধান থাকতে হবে, রানা।'

নিঃশব্দে হাসল রানা। 'কোন দুশ্চিন্তা করবেন না, জেনারেল। জাদুর কাঠি দিয়ে ওদের চারদিকে গোল একটা চক্কর এঁকে রাখব আমি, তার ভেতর থেকে শত চেষ্টা করলেও কেউ বেরোতে পারবে না ওরা।'

কেনসিংটনের প্যালেস গ্রীনে, মিশরীয় দূতাবাসে ফেরার সময় লে. জেনারেল আলি কারাম ভাবলেন, রানা কি তবে প্রেমে পড়েছে? ওর খুশি খুশি ভাবের আর কোন কারণ খুঁজে পাননি তিনি। এত খুশির কি ঘটেছে জানতে না পারলে কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। সিদ্ধান্ত নিলেন, রানার ওপর নজর রাখতে হবে। কম করেও দুটো গাড়ি আর তিনজন লোকের একটা টীম লাগবে। আট ঘণ্টার শিফটে কাজ করবে তারা। লন্ডন স্টেশনের হেড একটু অসন্তুষ্ট হবে বটে, কিন্তু এই কাজের গুরুত্বকে খাটো করে দেখার উপায় নেই।

রানা হঠাৎ কেন বদলে গেল সেটা জানা দরকার।

*

বাংলাদেশ আর মিশরীয় সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্ট যারা লন্ডনে আছে তাদের প্রায় সবার ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করেছে জ্যাক রিচি। কর্নেল চেজিঙের বিশ জন লোকসহ কুয়েল আর হিলারীকে নিয়ে নিজেও নেমে পড়েছে কাজে। লন্ডনের ওয়েস্ট এন্ডে কিছু আকাশচুম্বি হোটেল আছে, যেগুলোর ওপরতলা থেকে প্রিন্সেস মার্গারেটের বাড়ি অথবা বাড়ির উঠান দেখতে পাওয়া যায় বলে গুজব শোনা যায়--সেই রকম একটা হোটেলের বিশ তলায় স্যুইট ভাড়া করেছে রিচি। এই মুহূর্তে তেপায়ার ওপর দাঁড় করানো একটা শক্তিশালী টেলিস্কোপের সামনে রয়েছে সে, পাশেই একটা ট্র্যান্সমিটার। হোটেলের জানালা দিয়ে গোটা কেনসিংটন এলাকাটা দেখতে পাওয়া যায়। আজ যারা রিচির নির্দেশে কাজ করছে তাদের প্রত্যেকের কাছে একটা করে মিনি ওয়াকি-টকি আছে। কোথায় কি ঘটছে প্রতি মুহূর্তে জানতে পারছে রিচি।

এতসব আয়োজনের পিছনে একটাই উদ্দেশ্য, রানাকে খুঁজে পাওয়া। ধরে নেয়া হয়েছে লন্ডনেই আছে ও, এবং বাংলাদেশী মিশরীয় দূতাবাসের কোন অফিসারের সাথে যোগাযোগ করতেই হবে তাকে। দূতাবাসের লোকেদের বেশিরভাগই স্পাই, কাজেই সবার ওপরই কড়া নজর রাখা হয়েছে।

'টোয়েনটি?'

হিলারীর নম্বর ওটা, কেনসিংটন চার্চস্ট্রীটের একটা পাবে রয়েছে সে, সিগারেট কেসের মত দেখতে ছোট একটা বাক্স মুখের কাছাকাছি তুলে সাড়া দিল, 'ইয়েস?'

'সৈয়দ আজাহারের পিছু নিতে হবে তোমার।'

'ঠিক আছে। চেহারার বর্ণনা?'

'লম্বা, মাথার মাঝখানে ছোট টাক, ছাতা, বেল্টেড কোট। হাই স্ট্রীট গেট।'

'রওনা হলাম।' বিল মিটিয়ে দিয়ে পাব থেকে বেরিয়ে এল হিলারী। বৃষ্টি হচ্ছে। রেনকোটের পকেট থেকে ছোট একটা কলাপসিবল ছাতা বের করে মাথার ওপর মেলল সে। হন হন করে প্যালেস গেটের দিকে এগোল।

প্যালেস গেটে পৌঁছে প্যালেস এভিনিউয়ের দিকে তাকাল হিলারী। দেখল, রিচির বর্ণনার সাথে হুবহু মিল আছে এই রকম একটা লোক তার দিকে এগিয়ে আসছে। তাকে পাশ কাটিয়ে সোজা চলে গেল সৈয়দ আজাহার। রাস্তা পেরোবার ভান করে পিছন দিকে একবার তাকাল হিলারী। দেখল, বাঁক নিয়ে পশ্চিম দিকে হাঁটছে আজাহার। রাস্তা পেরিয়ে তার পিছু নিল সে।

হাই স্ট্রীটে প্রচুর লোকজন, কাজেই অনুসরণ করতে কোন অসুবিধে হলো না হিলারীর। কিন্তু মক্কেল দক্ষিণ দিকে বাঁক নিয়ে একটা সাইড রোডে ঢুকতে একটু নার্ভাস হয়ে পড়ল সে। এখানে লোকজন খুবই কম, পিছন ফিরে এক-আধবার তাকালেই মক্কেলের চোখে ধরা পড়ে যেতে হবে। কিন্তু ভাগ্য ভাল হিলারীর, সৈয়দ আজাহার ভুলেও একবার পিছন ফিরে তাকাল না। ছাতার নিচে মাথাটা নিচু করে হন হন করে হাঁটছে সে, যেন কোথাও পৌঁছবার তাড়া আছে তার।

খুব বেশি দূর গেল না মক্কেল। ক্রমওয়েল রোড ছাড়িয়ে একটু এগিয়েই ছোট কিন্তু আধুনিক একটা হোটেল, সেখানে ঢুকল সে। হোটেলের পাশ দিয়ে যাবার

সময় ভেতরে তাকিয়ে তাকিয়ে কাঁচের দরজা পথে হিলারী দেখল, লবির একটা ফোন বুদে ঢুকল সৈয়দ আজাহার।

'টোয়েনটি?'

হোটেলের উল্টো দিকের রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে হিলারী। মিনি ওয়াকি-টকি শার্টের পকেটে ভরে রেখেছে। কিন্তু নাম্বারটা পরিষ্কার শুনতে পেল সে। পকেটের দিকে মুখ একটু নামিয়ে বলল, 'ইয়েস?'

'জ্যাকোবিয়ান হোটেলের কাছাকাছি সবুজ একটা ফোক্সওয়াগেন। মিশরীয় দূতাবাসের গাড়ি। দায়েশ একাই রয়েছে ওতে। থারটিন কাভার করছে ওকে। তুমি কোথায়?'

'জ্যাকোবিয়ান হোটেলের সামনে।'

'গুড। আজাহার কোথায়?'

'হোটেলের লবিতে, ফোন বুদে ঢুকেছে।' রাস্তার ডান দিকে তাকাল হিলারী। সবুজ ফোক্সওয়াগেন একটা সাইড রোড থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। ব্যাপারটা কি? এই রাস্তায় এই একটাই হোটেল। আজাহার তাতে ঢুকেছে, এখন আবার ফোক্সওয়াগেন নিয়ে দায়েশ ঢুকল রাস্তায়। তবে কি হোটেলটাকে কাভার করছে ওরা?

'চোখে চোখে রাখো ওকে।'

'ঠিক আছে,' বলল হিলারী। এখন ওকে একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সামনের দরজা দিয়ে হোটেলে যদি ঢোকে, আজাহার ওকে দেখে চিনে ফেলতে পারে। তা না করে সে যদি পিছনের দরজা খুঁজতে যায়, সেই ফাঁকে আজাহার হোটেল থেকে বেরিয়ে অন্যদিকে চলে যেতে পারে।

দেখা না গেলেও, এই রাস্তায় নিজেদের আরও লোক আছে, কাজেই হোটেলের পিছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকবে বলে সিদ্ধান্ত নিল হিলারী। হোটেলের পাশে সরু একটা গলি, ডেলিভারি ভ্যান ঢোকার জন্যে। সেটা ধরে খানিকদূর যেতেই খোলা একটা ফায়ার এগজিট দেখতে পেল। ভেতরে ঢুকে কংক্রিটের একটা সিঁড়ির মুখোমুখি হলো সে, বোঝাই যায় শুধু মাত্র ফায়ার এস্কেপের জন্যে তৈরি করা হয়েছে এটা। ধাপ বেয়ে ওঠার সময় ছাতাটা বন্ধ করে রেনকোটের পকেটে ভরল। তারপর গা থেকে রেনকোট সিঁড়ির একটা হাফ-ল্যান্ডিঙের কোণে ফেলে রাখল। সোজা তিন তলায় উঠে এসে এলিভেটরে ঢুকল, নেমে এল লবিতে। সোয়েটার আর ট্রাউজার পরা অবস্থায় হোটেলের একজন গেস্ট বলেই মনে হচ্ছে তাকে।

মিশরীয় লোকটা ফোন বুদ থেকে এখনও বেরোয়নি। লবির সামনের দিকে কাঁচের দরজা পর্যন্ত হেঁটে এল হিলারী, বাইরেটা দেখল, রিস্টওয়াচে চোখ বুলাল, তারপর সোফার কাছে ফিরে এসে বসল, যেন কারও সাথে দেখা করবে বলে অপেক্ষা করছে।

কয়েক সেকেন্ড পরই বুদ থেকে বেরিয়ে এল সৈয়দ আজাহার। কোন দিকে না তাকিয়ে বারের দিকে চলে গেল সে। লোকটার পিছু পিছু বারে যাবে কিনা ভাবছে হিলারী, এই সময় হাতে কোল্ড ড্রিঙ্কের গ্লাস নিয়ে বার থেকে আবার লবিতে

ফিরে এল আজাহার। হিলারীর ঠিক উল্টোদিকের একটা সোফায় বসল সে। খবরের কাগজ তুলে নিয়ে নিজের চেহারা ঢাকল হিলারী।

কোল্ড ড্রিঙ্কে চুমুক দেয়ার সময় পেল না মক্কেল।

হিস হিস শব্দে খুলে গেল এলিভেটরের দরজা, ভেতর থেকে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা।

বিস্ময়ের ধাক্কাটা এমন প্রচণ্ডভাবে লাগল, নিজের অজান্তেই রানার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল হিলারী। তার এই তাকিয়ে থাকাটা লক্ষ্য করল রানা, ছোট্ট করে একটু মাথা ঝাঁকাল ও। হয়তো কোন সন্দেহ করেনি, ভদ্রতার রীতি অনুসরণ করেই মাথাটা ঝাঁকাল, ভাবল হিলারী। ক্ষীণ একটু হেসে রিস্টওয়াচ দেখল সে। মনে মনে নিজেকে গালাগাল করলেও, সেই সাথে আশা করল, তাকিয়ে থাকাটা এমনই মারাত্মক ভুল যে রানা হয়তো সেটা লক্ষ করে ধরে নেবে সে আসলে এজেন্ট নয়।

লম্বা লম্বা পা ফেলে ডেস্কের পাশ দিয়ে এগোল রানা। ডেস্কের সামনে থামল না ও, কিন্তু রুমের চাবিটা ফেলে রেখে গেল। কাঁচের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ও, হাতের গ্লাস টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়াল আজাহার।

আজাহারকে অনুসরণ করে হোটেলের বাইরে বেরিয়ে এল হিলারী। ব্যাপারটা এতক্ষণে হাসির একটা খোরাক হয়ে উঠেছে তার কাছে। জানে মাসুদ রানা মিশরীয়দের হয়ে কাজ করছে। তাহলে মিশরীয়রা রানাকে চোখে চোখে রাখছে কেন?

দ্রুত চিন্তা করে আবার হোটেলের লবিতে ফিরে এল হিলারী। এলিভেটরে চড়ে তিন তলায় উঠল, সেখান থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল সরু গলিতে। আসার পথে রেনকোট পরে নিয়েছে সে। হোটেলের সামনের দিকে সরে এসেই মেসেজ পাঠাল, 'টোয়েনটি বলছি। মাসুদ রানাকে পেয়েছি আমি।'

'ঠিক আছে, টোয়েনটি। থারটিনও ওকে দেখতে পেয়েছে।'

বাঁক নিয়ে আজাহার ক্রমওয়েল স্ট্রীটে ঢুকল। হন হন করে হাঁটছে হিলারী, মোড় ঘুরে আজাহার এবং রানা, দু'জনকেই দেখতে পেল সে। 'আমি আজাহারকে ফলো করছি।'

'ফাইভ আর টোয়েনটি, তোমরা দু'জনেই আমার কথা শোনো। ফলো কোরো না। বুঝতে পেরেছ, ফাইভ?'

'ইয়েস।'

'টোয়েনটি?'

'হ্যাঁ, বুঝেছি,' বলল হিলারী। আসলে কিছুই বুঝতে পারেনি। রাস্তার এক ধারে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। দেখল, সামনের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে রানা, আজাহার তাকে অনুসরণ করছে।

'টোয়েনটি, জ্যাকোবিয়ান হোটেলে ফিরে যাও তুমি। ওর রুম নাম্বার জানো। ওর কামরার কাছাকাছি একটা কামরা ভাড়া করো। কাজ শেষ করে টেলিফোন করো আমাকে।'

'ঠিক আছে।'

জ্যাকোবিয়ান হোটেলে ফিরে এল হিলারী। রানার রুম নাম্বার জানার জন্যে কোন চেষ্টাই করতে হলো না তাকে। রানার ফেলে যাওয়া চাবিটা তখনও পড়ে রয়েছে ডেস্কে।

'বলুন, আপনার জন্য কি করতে পারি?' ডেস্ক ক্লার্ক জিজ্ঞেস করল তাকে।

'চারতলায় আমার একটা রুম দরকার,' বলল হিলারী।

জ্যাকোবিয়ান হোটেলের করিডর ধরে দ্রুত হাঁটছে জ্যাক রিচি, তার পাশে থাকার জন্যে রীতিমত ছুটতে হচ্ছে মোটাসোটা হিলারীকে।

'ইলেকট্রনিক্সের যে-কোন সমস্যা দিন, চ্যালেঞ্জ দিয়ে সমাধান বের করে দেব,' বলল সে, 'কিন্তু বুদ্ধির একটা প্যাঁচ খুলতে বলুন—সরি, ওটা আমার কাছে ইস্পাত চিবিয়ে তরল করার মত কঠিন। এত কাঠ-খড় পুড়িয়ে মক্কেলকে পাওয়া গেল, অথচ আপনি তার পিঠ থেকে আমাদেরকে সরিয়ে নিলেন—এই রহস্য আমি ভেদ করতে পারছি না।'

'এর মধ্যে কোন রহস্য নেই, একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে,' বলল রিচি। তারপর নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল, হিলারীর বিশ্বস্ততার একটা মূল্য আছে, কাজেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। 'কয়েক হপ্তা ধরে প্রচুর লোককে রানার পিছনে লাগানো হয়েছে। প্রত্যেক বারই তার চোখে ধরা পড়ে গেছে আমাদের লোক, তাদেরকে খসাতেও দেরি করেনি রানা। এই লাইনে অনেকদিন ধরে আছে এবং নাম করেছে এমন স্পাইয়ের পিছনে ফেউ লাগবেই, এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। কিন্তু নির্দিষ্ট একটা অপারেশনে থাকার সময় যত বেশি নজরে রাখা হবে তাকে ততই নিজের দায়িত্ব আর কারও কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে আমাদেরকে বোকা বানাবার সম্ভাবনা বাড়বে। নতুন যে লোকটা দায়িত্ব নেবে তাকে আমরা নাও চিনতে পারি। এই রকম প্রায়ই হয়, একজনকে অনুসরণ করে আমরা হয়তো একটা তথ্য জানতে পারলাম, কিন্তু সেটা আমাদের কোন কাজেই লাগল না—কারণ, তারাও জানতে পেরেছে যে তাদেরকে অনুসরণ করে তথ্যটা আমরা জেনে নিয়েছি। কিন্তু এই পদ্ধতিতে, আজ যেটা কাজে লাগাচ্ছি—কোথায় সে তা আমরা জানি, কিন্তু আমরা যে জানি সেটা তার জানা নেই।'

'আই সী!'

'মিশরীয়রা ওর পিছু নিয়েছে, এটা সহজেই বুঝতে পারবে রানা। নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে হাইপারসেনসিটিভ হয়ে উঠেছে ও।'

'রানাকে তো ওদের লোকই বলা যেতে পারে, তাই না? তাহলে ওরা তার পিছু নিয়েছে কেন?'

'এই ব্যাপারটা আমারও বোধগম্য হচ্ছে না,' ভুরু কুঁচকে, যেন নিজের সাথেই কথা বলছে রিচি। 'লে. জেনারেল আলি কারামের সাথে আজ সকালে দেখা করেছে রানা, এ-ব্যাপারে আমি শিওর। ট্যাক্সি বদল করে আমাদের লোককে খসালেন আলি কারাম, তারমানে রানার সাথে কোথাও দেখা করতে যাচ্ছিলেন তিনি।' একটু বিরতি নিয়ে আবার বলল সে, 'এমন হতে পারে, আলি কারাম হয়তো অ্যাসাইনমেন্ট থেকে সরিয়ে দিয়েছেন রানাকে, তারপর রানা সত্যি সরে

গেছে কিনা জানার জন্যে তার পিছনে লোক লাগিয়েছেন।' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সে. 'কিন্তু এটাও বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। আবার এমনও হতে পারে, আলি কারাম হয়তো যে-কোন কারণেই হোক, রানার ওপর এখন আর আগের মত ভরসা রাখতে পারছেন না...' আবার মাথা নাড়ল সে. 'তা-ও মানতে ইচ্ছে করছে না। এবার সাবধানে, হিলারী।'

রানার হোটেল রুমের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। ছোট, শক্তিশালী একটা টর্চ বের করে দরজার প্রতিটি কিনারা পরীক্ষা করল হিলারী। 'নো টেলটেলস,' বলল সে।

মাথা একটু ঝাঁকিয়ে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল রিচি। এই ধরনের কাজে ওস্তাদের ওস্তাদ বলা যেতে পারে হিলারীকে। রিচির বিচারে, সমস্ত অসাধারণ টেকনিক্যাল ব্যাপারে হিলারীর মত মেধাবী সি.আই.এ.-তে আর একজনও নেই। পকেট থেকে মাত্র একটা স্কেলিটন কী বের করল হিলারী, কারণ ইতোমধ্যে নিজের কামরার তালা পরীক্ষা করে জেনে নিয়েছে সে ঠিক কোন্ চাবিটা রানার কামরার তালায় ফিট করবে। দরজার কবাট খুলে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল সে, উঁকি দিয়ে ভেতরে তাকাল। মিনিটখানেক পর সন্তুষ্টচিত্তে বলল, 'নো বুবি ট্র্যাপস।'

হিলারীর পিছু পিছু একটা প্যাসেজে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল রিচি। এই ধরনের লুকোচুরি খেলা একেবারেই পছন্দ নয় তার। নজর রাখা, বুদ্ধি দিয়ে শত্রুর মতিগতি আন্দাজ করা, প্ল্যান তৈরি করা ইত্যাদি কাজে তার উৎসাহ আছে, মাথাটাও খেলে ভাল। এখন যদি রুমসার্ভিস এসে পড়ে? কিংবা কেউ যদি দেখা করতে আসে রানার সাথে? খোদ রানাই যদি ফিরে আসে? লবিতে লোক আছে, কিন্তু সে যদি সাবধান করার সময় না পায়? অস্বস্তি বোধ করল সে। বলল, 'তাড়াতাড়ি করো, হিলারী।'

প্যাসেজের একপাশে বাথরুম, আরেক পাশে ওয়ার্ডরোব। বাথরুম ছাড়িয়ে একটা দরজা, সেটা খুলে চৌকো বেডরুমে ঢুকল ওরা। একটা দেয়াল ঘেঁষে সিঙ্গেল বেড, আরেক দেয়ালের কাছে টেলিভিশন। দরজার উল্টোদিকে বিশাল একটা জানালা।

ফোনের রিসিভার তুলে মাউথপীসের স্ক্রু খুলতে শুরু করল হিলারী। বিছানার গোড়ায় দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাল রিচি, যে লোক এই ডেরায় বাস করে তার সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা পাবার চেষ্টা করছে। লক্ষ করার মত তেমন কিছু নেই। কামরাটা ঝাড়া-মোছা করা হয়েছে, নতুন করে পাতা হয়েছে বিছানা। বেড-সাইড টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে দাবা খেলার জটিল সমস্যার ওপর লেখা একটা বই, একটা সান্ধ্য দৈনিক। তামাক বা অ্যালকোহলের গন্ধ পর্যন্ত নেই কোথাও। ওয়েস্টপেপার বাস্কেটটা খালি দেখল রিচি। চামড়ার ছোট একটা সুটকেসে পরিষ্কার আন্ডারওয়্যার আর একটা শার্ট দেখা গেল। বিড়বিড় করে বলল রিচি, 'মাত্র একখানা শার্ট!' ড্রেসারের দেরাজ খুঁজল সে, খালি। বাথরুমে পাওয়া গেল টুথব্রাশ, একটা রিচার্জেবল ইলেকট্রিক শেভার। ঘরে ফিরে এসে দেখল, মাউথপীসের স্ক্রু আঁটছে হিলারী।

'হয়ে গেছে,' বলল হিলারী।

'হেডবোর্ডের পিছনেও একটা ছারপোকা রাখো।'

খুদে আড়িপাতা যন্ত্র অর্থাৎ ছারপোকা টেপ দিয়ে আটকাচ্ছে হিলারী, এই সময় বেজে উঠল ফোন। রানা ফিরে এলে লবি থেকে ওদের লোক দু'বার রিং দিয়েই রিসিভার নামিয়ে রাখবে।

ফোনের বেল দ্বিতীয়বারও বাজল। অনড় দাঁড়িয়ে আছে হিলারী আর রিচি, অপেক্ষার মুহূর্তগুলো যেন শেষ হতে চাইছে না। তারপর আবার বাজল ফোন। ওদের টান টান পেশীতে ঢিল পড়ল।

পর পর পাঁচবার বেজে থেমে গেল ফোন। রিচি বলল, 'ওর একটা গাড়ি থাকলে, আর তাতে যদি একটা ছারপোকা রাখতে পারতাম, খুব সুবিধে হত।'

'আমার কাছে শার্টের একটা বোতাম আছে।'

'কি আছে?'

'ছারপোকারই খুদে সংস্করণ, একটা বোতাম,' বলল হিলারী।

'এই প্রথম শুনলাম!'

'নতুন যে।'

'সুঁচ সুতো আছে?'

'নেই মানে?'

'তাড়াতাড়ি করো তাহলে।'

রানার সুটকেস খুলল হিলারী। শার্টটা বের না করেই তার একটা বোতাম খুলে ফেলল সে। সেটার জায়গায় নতুন বোতাম সেলাই করতে এক মিনিটও লাগল না তার। রিচি সব দেখছে বটে, কিন্তু তার মন রয়েছে অন্যদিকে। রানা কি বলে, আর কি করে জানার জন্যে আরও ভাল কোন উপায় বের করতে পারলে মনটা শান্ত হত তার। ফোন আর হেডবোর্ডে রোপণ করা এই ছারপোকা রানার চোখে ধরা পড়ে যেতে পারে, শার্টটাও সারাক্ষণ পরে থাকবে না সে। দেয়ালের ওপর চোখ বুলাল রিচি। মনে মনে নিরাশ হলো সে। রানা গভীরভাবে ভালবাসে এমন কারও একটা ছবি থাকলেও কাজ হত।

'এই যে দেখুন,' হাতের কাজটা রিচিকে দেখাল হিলারী। সাদামাঠা নাইলনের সাদা শার্ট, চলতি ফ্যাশনের বোতাম। নতুন বোতামটার সাথে ওগুলোর কোন পার্থক্য ধরার উপায় নেই।

'গুড,' বলল রিচি। 'সুটকেস বন্ধ করো।'

সুটকেস বন্ধ করে জানতে চাইল হিলারী, 'আর?'

'এসো, আরেকবার খুঁজে দেখি। কোন টেলটেলস রেখে যায়নি রানা, এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।'

দ্রুত কিন্তু নিঃশব্দে আবার খোঁজাখুঁজি শুরু করল ওরা। টেলটেলস রোপণ করার অনেক পদ্ধতি আছে। সবচেয়ে সহজটা হলো, দরজার একটা ফাটলে মাথার একটা ছোট চুল কোনরকমে আটকে রাখা। দেরাজের পিছনে কাগজের টুকরোও রাখা যায়, দেরাজ খুললে পিছন দিকে পড়ে যাবে কাগজ। সুটকেস-ঢাকনির লাইনিঙে খুচরো একটা পয়সা রাখা যেতে পারে, ঢাকনি খুললে সামনে থেকে গড়িয়ে পিছন দিকে চলে যাবে সেটা। কার্পেটের নিচে চিনির একটা ডেলা রাখে

কেউ কেউ, পা পড়লে নিঃশব্দে ভেঙে যাবে।

কিছুই পেল না ওরা।

'ব্যাপারটা কি!' তাজ্জব বনে গেল রিচি। 'রানা সাবধান হয়নি কেন?'

'হয়তো কোন মেয়ের প্রেমে পড়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছে ওর,' মন্তব্য করল হিলারী।

ধমক লাগাতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল রিচি। ভাবল, হতেও তো পারে!

কামরা থেকে বেরিয়ে এল ওরা। আচ্ছা! তাহলে এই ব্যাপার! প্রেমেই পড়েছে মাসুদ রানা।

একটু দুশ্চিন্তায় পড়লেন মিশরীয় সিক্রেট সার্ভিসের চীফ আলি কারাম। দূতাবাসে তাঁর জন্যে আলাদা একটা কামরা দেয়া হয়েছে, পিছনে হাত বেঁধে সেখানে পায়চারি শুরু করলেন তিনি।

মিশরীয় এজেন্টরা রানাকে অনুসরণ করে চেলসী এলাকার একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে গিয়ে হাজির হয়। একটা অ্যাপার্টমেন্টে একজন মেয়েকে দেখেছে তারা, তার সাথেই রাত কাটিয়েছে রানা। ওদের আচরণ দেখার সুযোগ হয়নি এজেন্টদের, কিন্তু তাদের ভাষায় 'সম্পর্কটা যে যৌন-সম্পর্ক তাতে কোন সন্দেহ নেই'। বাড়ির কেয়ারটেকারের সাথে কথা বলা হয়েছে, কিন্তু ভাড়াটিয়ার বান্ধবী ছাড়া মেয়েটার আর কোন পরিচয় তার কাছ থেকে উদ্ধার করা যায়নি।

রানার উপর বিশ্বাস হারাচ্ছেন আলি কারাম, ব্যাপারটা তা নয়। কিন্তু প্রেম জিনিসটা অন্ধ, মানুষের বুদ্ধি ঘোলা করে দেয়। মেয়েটা যদি বৈরী কোন ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট হয়, রানার পাশে তাকে যদি রোপণ করা হয়ে থাকে তাহলেই সর্বনাশ।

সাবধান হবার প্রয়োজন বোধ করছেন আলি কারাম।

প্রথম কাজ, মেয়েটা কে জানা। আলি কারাম ঠিক করলেন, লন্ডন স্টেশনকে দায়িত্বটা দিয়ে কায়রোয় ফিরে যাবেন তিনি। ইতোমধ্যে তিনি শুধু আশা করতে পারেন, মেয়েটা যদি শত্রুপক্ষের এজেন্ট হয়, তাকে গোপন কিছু না বলার বুদ্ধিটুকু নিশ্চয়ই হারায়নি রানা।

এগারো

অনেক মজা হয়েছে, নিজেকে বলল রানা, এবার কাজে ফিরতে হয়।

সকাল দশটায় নিজের হোটেল কামরায় ঢুকছে ও। হঠাৎ প্রায় আঁতকে উঠে ভাবল, স্পাই জীবনে এই প্রথম এই ধরনের একটা ভুল করেছে সে—ঘর ছেড়ে যাবার সময় কোন সাবধানতা অবলম্বন করেনি। ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকল ও, চোখ বুলিয়ে দেখে নিল চারদিকটা। এষা ওর ওপর কি সাংঘাতিক প্রভাব ফেলেছে, সেটা যেন এই প্রথম উপলব্ধি করতে পারছে।

বাথরুমে ঢুকে শাওয়ারের নিচে দাঁড়াল ও। এষা চলে যাচ্ছে, কাজে আর

ব্যাঘাত ঘটবে না। বি.ও.এ.সি.-তে চাকরি করে সে. এইবারের ট্যুর প্রায় গোটা দুনিয়া ঘোরার সুযোগ করে দেবে তাকে। একুশ দিন পর ফিরে আসার কথা থাকলেও আরও দেরি হতে পারে। তিন হপ্তা পর কোথায় থাকবে ও, রানার কোন ধারণা নেই। তার মানে আবার কোথায় দেখা হবে এখুনি তা বলা যাচ্ছে না। তবে দেখা যে হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই, ও যদি বেঁচে থাকে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে কাপড়চোপড় পরল রানা। তারপর বিছানায় বসে হাত বাড়িয়ে ফোনের রিসিভার তুলল। আপন মনে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল ও, ক্র্যাডলে নামিয়ে রাখল রিসিভার। এখন থেকে একটু বেশি করে সাবধান হওয়া দরকার।

বাইরে বেরিয়ে রানা দেখল, এরই মধ্যে বদলে গেছে আবহাওয়া। ঝলমলে রোদ উঠেছে, বৃষ্টির সাথে সাথে শীত শীত ভাবটাও দূর হয়ে গেছে। হোটেলের সবচেয়ে কাছের টেলিফোন বুদটা ছাড়িয়ে এল ও, আধ মাইল হেঁটে পরেরটায় ঢুকল। ফোন-গাইড খুলে লয়েডস-এর নাম্বার বের করে রিসিভার তুলল ও।

'লয়েড'স, গুড মর্নিং।'

'একটা জাহাজ সম্পর্কে আমি কিছু তথ্য চাইছিলাম।'

'সেটা আপনাকে দিতে পারবে লয়েড'স অভ লন্ডন প্রেস—লাইন পাইয়ে দিচ্ছি, দাঁড়ান।'

ফোন বুদের জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল রানা। তথ্যগুলো লয়েড'স ওকে দেবে তো? আর কোন উৎস আছে কিনা জানা নেই ওর।

'লয়েড'স অভ লন্ডন প্রেস।'

'গুড মর্নিং, একটা জাহাজ সম্পর্কে আমি কিছু খবর জানতে চাই।'

'কি ধরনের খবর?' একটু সন্দেহের সুরে জানতে চাইল লোকটা।

'জাহাজটা সিরিজের একটা অংশ হিসেবে তৈরি হয়েছে কিনা, যদি হয়, তার সিসটার-শিপগুলোর নাম কি, তাদের মালিক কে, আর কোন্টা কোথায় আছে? সেই সাথে প্ল্যানস, যদি সম্ভব হয়।'

'দুঃখিত, আমি বোধহয় এ-ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারব না।'

দমে গেল রানা। 'কেন?'

'প্ল্যান আমরা রাখি না, ওটা লয়েড'স রেজিস্টারের কাজ। শুধু মালিকদের দেয় ওরা।'

'আর সব তথ্য?'

'দুঃখিত, এখানেও আমি আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারব না।'

লোকটার নাকে দুম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিতে ইচ্ছে করল রানার। 'তাহলে কে পারবে?'

'এ-ধরনের তথ্য একমাত্র আমাদের কাছেই আছে।'

'আর আপনারা ওগুলো গোপন করে রাখেন?'

'না, তা কেন? তবে ফোনে এসব তথ্য জানাবার নিয়ম নেই।'

'তারমানে আপনি শুধু ফোনে আমাকে সাহায্য করতে পারবেন না, তাই বলতে চান?'

'হ্যাঁ।'

'লিখলে বা নিজে হাজির হলে পারবেন?'

'হ্যাঁ। খোঁজ করতে বেশি সময় লাগবে না, কাজেই আপনি নিজেই চলে আসতে পারেন।'

'ঠিকানা বলুন,' লিখে নিল রানা। 'আমি পৌঁছবার আগেই তথ্যগুলো যোগাড় করে রাখতে পারবেন, নাকি দেরি হবে?'

'খুব বেশি দেরি হবে না।'

'ঠিক আছে, জাহাজের নামটা বলছি আমি, লিখে নিন। ইমপেরিয়াল।'

'আপনার নাম?'

'ক্লুড রেলিক।'

'কোম্পানী?'

'সায়েন্স ইন্টারন্যাশনাল।'

'বিল কি কোম্পানীর নামে পাঠাব?'

'না, পার্সোন্যালি দেব আমি।'

'পরিচয়-পত্র থাকলে অবশ্য কোন অসুবিধে হবে না।'

'জানি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে যাব। গুডবাই।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে বুদ থেকে বেরিয়ে এল রানা। ভাগ্যকে হাজারো শুকরিয়া। রাস্তা পেরিয়ে একটা কাফেতে ঢুকল ও, কফি আর স্যান্ডউইচ দিতে বলল। আশায় নিরাশায় দোদুল্যমান লে. জেনারেল আলি কারামের চেহারাটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। ভদ্রলোককে মিথ্যে কথা বলেছে ও। কিভাবে ইমপেরিয়ালকে হাইজ্যাক করতে হবে পরিষ্কার জানা আছে তার। যমজ জাহাজের একটা কিনবে ও, যদি থাকে, তারপর ইমপেরিয়ালের সাথে দেখা করার জন্যে দলবল নিয়ে রওনা হবে। হাইজ্যাকের পর, মাঝসাগরে এক জাহাজ থেকে আরেক জাহাজে কার্গো সরাবার ঝুঁকি আর ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে ও বরং নিজের জাহাজটাকে ডুবিয়ে দেবে, আর সেই জাহাজের কাগজপত্র নিয়ে উঠবে ইমপেরিয়ালে। ইমপেরিয়াল নামটা ধুয়েমুছে সে-জায়গায় ডুবিয়ে দেয়া সিসটার-শিপের নাম লেখাবে। এরপর যে-জাহাজটা চালিয়ে পোর্ট সাঈদে পৌঁছবে ও সেটাকে ওর নিজের জাহাজ বলেই মনে হবে।

প্ল্যানটা মন্দ নয়, কিন্তু এটা প্ল্যানের একটা ভগ্নাংশ মাত্র। ইমপেরিয়ালের ক্রুদের নিয়ে কি করবে সে? আপাতঃদৃষ্টিতে হারিয়ে যাওয়া ইমপেরিয়াল সম্পর্কেই বা কি ব্যাখ্যা দেবে? সাগর থেকে গায়েব হয়ে যাওয়া টন টন ইউরেনিয়ামের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক তদন্ত হবে, সেটা এড়াবার উপায় কি?

যতই চিন্তা করল রানা ততই বিকট হয়ে উঠল সমস্যাগুলো। বড় কোন জাহাজ গভীর সাগরে ডুবে গেছে বলে সন্দেহ করা হলে ব্যাপক অনুসন্ধান চালাবার রেওয়াজ আছে। আর তাতে যদি ইউরেনিয়াম থাকে, সে-খবর সারা দুনিয়ায় বাতাসের আগে ছড়িয়ে পড়বে, ফলে অনুসন্ধানটা হবে অত্যন্ত ব্যাপক আর জোরাল। তারপর, সবশেষে যদি বেরিয়ে পড়ে যে না, ইমপেরিয়াল নয়, তার সিসটার-শিপ ডুবেছে, এবং সেটার মালিক বাংলাদেশের মাসুদ রানা—তাহলে?

কোন সমাধান ছাড়াই সমস্যাগুলো নিয়ে আরও খানিক মাথা ঘামাল রানা। আরও অনেক উটকো বিপদ ঘটবে, যেগুলোর কথা এই মুহূর্তে আন্দাজ করা সম্ভব নয়। সম্ভবত নিজের ওপর রেগে উঠল বলেই স্যান্ডউইচটা বিস্বাদ লাগল ওর মুখে।

প্রতিপক্ষদের কথা মনে পড়ল ওর। পিছনে কোথাও পায়ের দাগ রেখে আসেনি তো সে? এখন পর্যন্ত কাজের কাজ খুব একটা হয়নি, কিন্তু সামান্য যা একটু হয়েছে, যথেষ্ট সাবধানে করতে পেরেছে তো? জানলে একমাত্র আলি কারামই ওর প্ল্যানের কথা জানতে পারেন। এমন কি ওর হোটেলের কামরা আর হোটেল থেকে সবচেয়ে কাছের ফোন বুদেও যদি আড়িপাতা যন্ত্র থাকে, ইমপেরিয়ালের ওপর তার আগ্রহের কথা কারও জানার কথা নয়। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সাবধান ছিল সে।

কাপে চুমুক দিয়ে দেখল ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, সেটা নামিয়ে রাখতে যাবে এই সময় একজন খদ্দের পাশ দিয়ে যাবার সময় ওর কনুইয়ের সাথে ধাক্কা খেলো। কাপ থেকে উথলে উঠল কফি। কলঙ্কের কালো ছাপ পড়ল পরিষ্কার সাদা শার্টের সামনের দিকে।

'ইমপেরিয়াল?' উত্তেজনায় শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রিচির। 'কোথায় শুনেছি নামটা? ইমপেরিয়াল…ইমপেরিয়াল…ইমপেরিয়াল নামের জাহাজ…কোথায় শুনেছি নামটা?'

'আমার কাছেও নামটা চেনা চেনা লাগছে,' বলল কোহেন।

'কম্পিউটর প্রিন্ট আউটটা দাও তো দেখি!'

জ্যাকোবিয়ান হোটেলের কাছেই দাঁড়ানো লিসনিং ভ্যানের পিছনের সীটে রয়েছে ওরা। সি.আই.এ.-র ভ্যান এটা, সবুজ গায়ে কিছু লেখা নেই, ভয়ঙ্কর নোংরা। ভেতরের বেশিরভাগ জায়গা দখল করে রেখেছে শক্তিশালী রেডিও ইকুইপমেন্ট। সামনে হুইল নিয়ে বসে আছে হিলারী। ওদের মাথার উপর সিলিঙে আটকানো বড় আকারের স্পীকার থেকে অনেক লোকের গুঞ্জন আর তৈজসপত্রের বিচিত্র আওয়াজ ভেসে আসছে অস্পষ্টভাবে। এই খানিক আগে সবিনয়ে ক্ষমা চাইছিল একজন লোক, উত্তরে রানা তাকে বলল, ও কিছু না। ব্যাপারটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট বৈ তো নয়। তারপর থেকে স্পষ্টভাবে আর কিছু শোনা যায়নি।

রানার কথা শুনতে পাচ্ছে, সেজন্যে আনন্দের সীমা নেই রিচির, কিন্তু সেটা একটু কম উপভোগ্য হচ্ছে এই কারণে যে তার সাথে সাথে কথাগুলো কোহেনও শুনতে পাচ্ছে। রানা ইংল্যান্ডে আছে এটা আবিষ্কার করার পর থেকে কোহেনের আত্মবিশ্বাস সাংঘাতিক বেড়ে গেছে, ভাব-ভঙ্গি দিয়ে এখন সে বোঝাতে চাইছে প্রফেশন্যাল স্পাই হিসেবে তাকে আর কারও চেয়ে খাটো করে দেখা চলবে না। লন্ডন অপারেশন সম্পর্কে বিস্তারিত সব জানতে তো চেয়েছেই, সেই সাথে হুমকি দিয়ে বলেছে তাকে যদি অন্ধকারে রাখা হয় বা এড়িয়ে চলা হয়, সোজা তেল আবিবে অভিযোগ পাঠাবে সে। কোহেন মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না বুঝতে পেরে আপস করতে রাজি হয়েছে রিচি। কংগ্রেস, সিনেট এবং অন্য আর সব ইনস্টিটিউটের মত সি.আই.এ-তেও ইসরায়েল-ভক্ত লোকের অভাব নেই, তেল আবিব থেকে অভিযোগ গেলে রিচিকে সরিয়ে নেবার জন্য সি.আই.এ. চীফকে

কুমন্ত্রণা দেবে তারা। আপস হয়েছে এক শর্তে, সমস্ত কাজে কোহেনকে সাথে রাখা হবে কিন্তু কাজ কতটুকু এগোল সে-সম্পর্কে রিচির অনুমতি না নিয়ে তেল আবিবে রিপোর্ট করবে না সে।

প্রিন্ট আউটটা উল্টেপাল্টে দেখছিল কোহেন. রিচি চাইতে সেটা তার হাতে ধরিয়ে দিল সে। দ্রুত পাতা উল্টাতে শুরু করল রিচি। এই সময় স্পীকার থেকে ভেসে আসা শব্দের চরিত্র বদলে গেল। যানবাহনের ঘড় ঘড় আওয়াজ হলো। তারপর অপরিচিত একটা কণ্ঠস্বর।

'কোথায় স্যার?'

'লাইম স্ট্রীট,' রানার গলা।

প্রিন্ট আউট থেকে মুখ তুলে হিলারীর দিকে তাকাল রিচি। 'ফোনে রানাকে লয়েড'সের এই ঠিকানাই দেয়া হয়েছে। চলো, ওদিকে যাওয়া যাক।'

স্টার্ট দিয়ে ভ্যান ছেড়ে দিল হিলারী, সিটি ডিসট্রিক্টের দিকে যাচ্ছে।

'এই যে, পেয়েছি!' আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রিচির মুখ। 'ইমপেরিয়াল! গুড, গুড!' খুশির আধিক্যে নিজের হাঁটু চাপড়ে দিল সে।

'কই, আমাকে দেখাও,' বলল কোহেন।

মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করল রিচি, কিন্তু আপত্তি করে লাভ হবে না বুঝতে পেরে জোর করা হাসির সাথে বলল, 'এই যে—নন-নিউক্লিয়ার হেডিঙের নিচে। দুশো টন ইয়েলোকেক। মোটর ভেসেল ইমপেরিয়ালের কার্গো হিসেবে অ্যান্টোয়ার্প থেকে জেনোয়ায় যাবে।'

প্রিন্ট আউটের ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখল কোহেন। 'এটাই! এটাই রানার টার্গেট!'

'কিন্তু তুমি যদি ব্যাপারটা তেল আবিবে রিপোর্ট করো, নির্ঘাত্ টার্গেট বদল করবে রানা। কোহেন…'

রাগে লাল হয়ে উঠল কোহেনের চেহারা। 'তোমার এসব কথা আগেও একবার শুনেছি, রিচি,' ঠাণ্ডা সুরে বলল সে।

'এখন তাহলে জানা গেল, সত্যিই ইউরেনিয়াম বাগাবার তালে আছে সে,' বলল রিচি। 'জিনিসটা কার কাছ থেকে মারবে তাও জানতে পারলাম। বাহ্, চমৎকার এগোচ্ছি আমরা, কি বলো?'

'কিন্তু কখন, কোথায় আর কিভাবে, এই তিনটে প্রশ্নের উত্তর এখনও আমাদের জানা নেই।'

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকিয়ে কোহেনের কথা মেনে নিল রিচি। 'এই যে সিসটার-শিপ নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছে রানা, নিশ্চয়ই এর সাথে ওর হাইজ্যাকিং প্ল্যানের একটা সম্পর্ক আছে।' নাকের পাশটা তর্জনী দিয়ে ঘষল সে। 'কিন্তু সম্পর্কটা যে কি…'

'ভাঙতিটা রেখে দাও,' রানার গলা।

'একটা জায়গা বেছে গাড়ি দাঁড় করাও, হিলারী,' বলল রিচি।

'এদিকে এই একটা অসুবিধে…'

'তাহলে যেখানে খুশি থামো,' বলল রিচি। 'পার্কিং টিকেট পাব, বয়েই গেল!'

'গুড মর্নিং। আমার নাম ক্রুড রেলিক।'

'ও, হ্যাঁ! গুড মর্নিং···এক মিনিট, প্লীজ।'
আর কোন শব্দ নেই।
তারপর, 'আপনার রিপোর্ট এইমাত্র টাইপ করা শেষ হলো, মি. রেলিক। এই যে, বিল।'
'আপনারা এখানে দারুণ এফিশিয়েন্ট দেখছি!'
'যা শ্লা!' হতাশাসূচক শব্দ করে কোহেন বলল, 'মৌখিক নয়, লেখা রিপোর্ট!'
'না, না। আমাদের কাজই তো এই।'
'গুডবাই, মি. রেলিক।'
'কথা দেখছি খুব কমই বলে,' অভিযোগের সুরে বলল হিলারী।
'ভাল এজেন্টদের সেটা একটা গুণ,' বলল রিচি। 'কথাটা মনে রাখলে উপকার পাবে।'
'জ্বী, স্যার!'
'রানার প্রশ্নের উত্তরে লয়েড'স কি বলল, জানা হলো না!'
কোহেনের দিকে ফিরল রিচি। 'কিছু আসে যায় না। প্রশ্নগুলো কি তা আমরা জানি। রানার মত আমরাও লয়েড'সকে প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করব। ওই শোনো, আবার রাস্তায় বেরিয়েছে রানা। ওদিকে চলো, হিলারী। দেখি ওকে দেখতে পাওয়া যায় কিনা।'
রওনা হলো ভ্যান, কিন্তু নির্দিষ্ট রাস্তায় পৌঁছবার আগেই স্পীকারের আওয়াজ বদলে গেল।
অচেনা গলা, 'বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি, স্যার?'
'দোকানে ঢুকেছে রানা,' বলল কোহেন।
'নতুন একটা শার্ট দরকার আমার।'
'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল হিলারী।
'দেখেই বুঝতে পেরেছি, স্যার। কিসের দাগ ওটা?'
'কফি।'
'এখন ওই দাগ তোলা খুব কঠিন হবে, স্যার। সাথে সাথে যদি ধুয়ে ফেলতে পারতেন, উঠে যেত। আপনি কি, স্যার, ঠিক এই রকমই একটা শার্ট চান?'
'হ্যাঁ।'
'এই নিন, স্যার। চার পাউন্ড।'
'ইস, একেবারে গলাকাটা দাম ধরছে!' দুঃখ করে বলল হিলারী।
'ধন্যবাদ, স্যার। আপনি এখুনি এটা পরবেন?'
'হ্যাঁ।'
'ওদিকে যান, স্যার—সবুজ দরজা দিয়ে ঢুকলেই ফিটিং রুম।'
পায়ের আওয়াজ। কিছুক্ষণ আর কোন শব্দ নেই।
'পুরানোটা একটা ব্যাগে ভরে দেব, স্যার?'
'ভাল হয়, আমার হয়ে ওটাকে আপনি যদি কোথাও ফেলে দেন।'
'ওই একটা বোতামের দাম চার হাজার ডলার!' করুণ সুরে বলল হিলারী।

'একশোবার, স্যার।'

'শেষ,' বলল কোহেন। 'আর কিছু শুনতে পাব না

'চার হাজার ডলার!'

'কিন্তু আমার হিসেবে, আমাদের লোকসান হয়নি,' বলল রিচি।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' জানতে চাইল হিলারী।

'দূতাবাসে। পা দুটো না মেলতে পারলে মনে হচ্ছে চিরকালের জন্যে বাঁকা হয়ে যাবে।'

ঝড় তুলে ছুটে চলল ভ্যান। কোহেন বলল, 'জানতে হবে, ঠিক এই মুহূর্তে কোথায় আছে ইমপেরিয়াল।'

'সি.আই.এ. হেডকোয়ার্টার থেকে জেনে নেয়া কঠিন হবে না,' জানাল রিচি।

'তারপর? ইমপেরিয়ালের খোঁজ পাবার পর ঠিক কি করব আমরা?'

'জানা কথা,' বলল রিচি, 'ওতে আমরা একজন লোক রাখব।'

কার মুখ দেখে উঠেছিল কে জানে, মাফিয়া চীফ আলবার্তো ফেলিনির সারাটা দিনই আজ খারাপ গেল।

ব্রেকফাস্টের সময় থেকে শুরু। প্রথম খবর এল, একটা ট্রাককে থামিয়ে সার্চ করেছে পুলিস, ফার দিয়ে কিনারা মোড়া বেডরূম স্লিপার আর হেরোইন যা ছিল সব তারা নিয়ে গেছে, কম করেও পাঁচ লাখ ডলারের মালামাল। ট্রাকটা কানাডা থেকে নিউ ইয়র্ক সিটিতে আসছিল, ধরা পড়ে গেছে শহরে ঢোকার মুখে। অত টাকার জিনিস তো গেছেই, তড়িঘড়ি বিচার করে ড্রাইভার আর হেলপারকে দীর্ঘ মেয়াদী জেলও দেয়া হয়ে গেছে।

জিনিসগুলো ডনের নয়। কিন্তু এই ব্যবসার যারা হোতা তারা নিয়মিত ডনের পাওনা মিটিয়ে দিয়ে আসছে, কাজেই বিনিময়ে তারা প্রোটেকশন আশা করে। তারা এখন চাইছে, ডন যেন লোকগুলোকে জেলখানা থেকে বের করে আনে, আর পুলিসের কাছ থেকে হেরোইন চেয়ে দেয়। এই পুলিস যদি শুধু টেস্ট পুলিস হত তাহলে তাদের এই দাবি পূরণ করা কঠিন হত না ডনের পক্ষে। অবশ্য টেস্ট পুলিস হলে এই ঘটনাটা ঘটতই না।

বড় ছেলে বিদ্বান হবার জন্যে হার্ভার্ডে গেছে, তার ওপর নজর রাখার জন্যে গোটা একটা দল রাখতে হয়েছে সেখানে। দলপতির কাছ থেকে চিঠি এল, আপনার ছেলে দু'হাতে টাকা ওড়াচ্ছে। রোজ রাতে জুয়া খেলে। শুধু তাই নয়, একদিনও জিততে পারে না সে। লেখাপড়া শিকেয় উঠেছে। দুপুরটা কাটল রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ে চলতি বছর এরই মধ্যে তিন লাখ ডলার কেন লোকসান হলো তার কারণ খুঁজে বের করার কাজে। আর বিকেলে আলবার্তো ফেলিনি তার উপপত্নীর সাথে দেখা করে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল, এ-বছর কোনমতেই তারা ইউরোপে বেড়াতে যেতে পারবে না। সবশেষে ডাক্তার তাকে জানাল, তার গনোরিয়া হয়েছে—আবার।

সন্ধের সময় বাড়ির গেট থেকে চীফ সিকিউরিটি গার্ড টেলিফোন করে বলল, 'একজন বাংলাদেশী ভদ্রলোক আপনার সাথে দেখা করতে চান, স্যার। কিন্তু তিনি

নিজের নাম বলতে রাজি হচ্ছেন না।'

'বাংলাদেশী ভদ্রলোক?' ভুরু কুঁচকে উঠল প্রৌঢ় ফেলিনির। 'কোন বাংলাদেশীকে আমি চিনি বলে তো মনে পড়ছে না।'

'উনি বলেছেন, অক্সফোর্ডে থাকার সময় আপনার সাথে পরিচয় হয়েছিল...'

'সেকি! আচ্ছা, চেহারার বর্ণনা দাও তো শুনি।'

'সুদর্শন, হিরো টাইপ। প্রায় কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল। জ্যাকেট আর ট্রাউজার পরে আছে।'

'বয়স?' রিসিভারটা জোরে চেপে ধরল ডন ফেলিনি।

'আন্দাজ করা কঠিন,' বলল সিকিউরিটি চীফ। 'ত্রিশের কাছাকাছি মনে হয়

'নো জোক!' দুর্লভ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মাফিয়া চীফের চেহারা 'ওর জন্যে লাল কার্পেট পেতে দাও। তার আগে ওকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে বলে ক্ষমা চেয়ে নিতে ভুলো না।'

রোমহর্ষক একটা ঘটনা, মনে পড়লে এখনও গায়ে কাঁটা দেয় রানার। প্রফেসর ফিলমনটনের বাড়ি থেকে খেলার মাঠ বেশ অনেকটা দূরে, আজে বাজে জায়গা পেরিয়ে অনেক অলিগলির ভেতর দিয়ে সেখানে যেতে হয়। একদিন সন্ধে হব হব সময় মাঠ থেকে ফিরছিল রানা। এক জায়গায় একটা ডোবা আছে, ডোবার ধারে পাশাপাশি বিশাল দুটো ওক গাছ, ওখানে এলেই গা ছমছম করে। চারদিকে বাড়ি-ঘর কিছু নেই, তার ওপর ওক গাছ দুটোর একটায় আধ-বুড়ি এক মেয়েলোক কিছুদিন আগে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে—সন্ধের পর থেকেই ওদিকটায় লোক চলাচল একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

ওক গাছের নিচ দিয়ে কাঁচা রাস্তা, সোজা তিনশো গজ এগিয়ে একটা মহল্লায় ঢুকেছে। দুরু দুরু বুকে হন হন করে হাঁটছে রানা, যেই বট গাছের নিচে এসেছে, অমনি চাপা গলায় কে যেন বলল, 'একটু দাঁড়াবে?'

ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক। দেখল, ডোবার পচা পানি থেকে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে আসছে একটা মানুষের ছায়া। বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল রানা, ছুটে পালানো তো দূরের কথা, এক চুল নড়ার শক্তিও পেল না ও। ঢালু পাড় বেয়ে অনেক কষ্টে রাস্তার ওপর উঠল লোকটা। পর মুহূর্তে শিউরে উঠল ও। কে বা কারা যেন ধারাল কিছু দিয়ে লোকটার পেট আড়াআড়িভাবে এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত চিরে দিয়েছে, লম্বা ফাটলটা দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে বন্ধ করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে সে। তার হাত গলে পিচ্ছিল নাড়িভুঁড়ি, মাংস আর চর্বি বেরিয়ে আসছে বারবার, কিন্তু সাথে সাথে সেগুলো ধরে ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে সে। ডোবার পচা পানি আর রক্তে গোসল হয়ে গেছে। অশরীরী আত্মার মত লোকটা উঠে এসে দাঁড়াল রানার সামনে। নিজের অজান্তেই পিছিয়ে যেতে শুরু করেছে রানা।

'আমাকে ওরা এখনও খুঁজছে,' লোকটা পিছন দিকে তাকাল একবার, মনে হলো ডোবা ছাড়িয়ে ওপারের আলোকিত পাড়াটার ওপর চোখ বুলাল সে 'এদিকে আমি নতুন, হাসপাতালটা কোন দিকে বলতে পারো?'

পিছু হটা বন্ধ করল রানা কিন্তু লোকটা কি যেন দেখতে পেয়ে 'ওই

আসছে!' বলেই হুড়মুড় করে পড়ে গেল, তারপর গড়াতে গড়াতে একেবারে ঝপাৎ করে ডোবায়। কচুরিপানা ভর্তি ডোবার পানিতে পড়ে স্থির হয়ে গেল লোকটা, একটু নড়ল চড়ল না। ইতোমধ্যে সন্ধে হয়ে গেছে, ক্ষীণ একটু আলোয় রানা শুধু তার মাথাটা কোন রকমে দেখতে পাচ্ছে।

আওয়াজ শুনে সামনের রাস্তার দিকে তাকাল রানা। দেখল হন হন করে এগিয়ে আসছে একদল লোক। উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথা বলছে তারা, কিন্তু কি বলছে তার কিছুই বুঝতে পারল না রানা। সেই মুহূর্তে ও যদি উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় না দিত, একজন আহত মানুষের প্রাণ বাঁচানো কোনভাবেই সম্ভব হত না। দাঁড়িয়ে থাকলে লোকগুলো ওকে সন্দেহ করবে ভেবে নিজের পথে হাঁটতে শুরু করল ও। এর ঠিক দু'সেকেন্ড পর লোকগুলো ওকে প্রথম দেখতে পেল। ওদের মধ্যে একজন লোক চাপা গলায় কাকে যেন বলল, 'ওকে জিজ্ঞেস করো, ও দেখে থাকতে পারে।'

রানার সামনে পথরোধ করে দাঁড়াল লোকগুলো। কয়েক সেকেন্ড ধরে নিঃশব্দে ওকে লক্ষ করল তারা। পিস্তল, ছোরা, লোহার রড, সাইকেলের চেইন—ওদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে অস্ত্র দেখল রানা।

'এইদিকে কোন লোককে আসতে দেখেছ তুমি?'

এক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর শান্ত গলায় জবাব দিল রানা, 'হ্যাঁ।'

'কই? কোথায়? কোন্‌দিকে গেছে?' লোকগুলো ঘিরে ধরল ওকে।

হাত তুলল রানা, বুড়ো আঙুল দিয়ে ডানদিক দেখিয়ে দিল। 'ওদিকে ছুটতে দেখলাম।'

রানাকে ধাক্কা দিয়ে ছুটল লোকগুলো। ডানদিকের পথ ধরে প্রায় চোখের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল তারা। সেখানে আর দাঁড়াল না রানা। কাঁচা রাস্তা ধরে ফিরে এল বাড়িতে। প্রফেসর ফিলমনটন বাড়িতে ছিলেন না, স্ত্রীকে নিয়ে কোথায় যেন বেড়াতে গিয়েছিলেন। কিন্তু বৈঠকখানার চাবি ছিল রানার কাছে। ফোন গাইড দেখে হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স বিভাগে ফোন করে ও। আহত লোকটাকে কোথায় পাওয়া যাবে, এবং কোত্থেকে ফোন করছে ও জানিয়ে কর্তব্য শেষ করে।

ঘটনাটা এখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু তা হয়নি। ফিলমনটনরা বাড়ি ফিরে এলে সমস্ত ঘটনাটা তাদেরকে বলেছে রানা। পরদিন সন্ধের সময় কলেজ থেকে ফিরে প্রফেসর ফিলমনটন রানাকে বললেন, 'আহত লোকটা কে, জানো? এক মাফিয়া চীফের ছেলে। ফাইনাল ইয়ারে পড়ত। ইংল্যান্ডে লেখাপড়া করতে এসে বখে গেছে।' এসব খবর তিনি খবরের কাগজ থেকে পেয়েছিলেন।

এর এক বছর পর সেই চীফের ছেলে কিভাবে যেন ঠিকানা যোগাড় করে ফিলমনটনদের বাড়িতে রানার সাথে দেখা করতে এসেছিল। কিন্তু রানা তাকে এড়িয়ে যাবারই চেষ্টা করে। লোকটা একটু অদ্ভুত টাইপের। কিভাবে যেন তার ধারণা হয়েছে, রানার কোন বিশেষ উপকার করতে না পারলে তার জীবনই ব্যর্থ হয়ে যাবে। কিন্তু রানা তার কাছ থেকে কিছু নিতে অস্বীকার করে। বেশ কয়েকবারই রানার সাথে দেখা করে লোকটা। কিন্তু রানা তার কোন উপকার চায় না বুঝতে পেরে ধীরে ধীরে আসা-যাওয়া কমিয়ে দেয় সে। তারপর শেষ একদিন

দেখা করে বলে যায়, 'জীবনে কখনও যদি কোন বিপদে পড়ো, আমাকে শুধু একটা খবর পাঠাবার ব্যবস্থা কোরো—যেখানেই থাকি না কেন, যদি বেঁচে থাকি, তোমার সাথে দেখা করব আমি।'

এরপর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। সেই চীফের ছেলের সাথে আর কখনও দেখা হয়নি রানার। কিন্তু দেখা না হলেও খবরের কাগজ এবং অন্যান্য নানা সূত্র থেকে লোকটা সম্পর্কে কিছু কিছু খবর পেয়ে এসেছে রানা। জানে, আলবার্তো ফেলিনি এখন আর মাফিয়া চীফের ছেলে নয়, নিজেই একজন মাফিয়া চীফ—ডন।

সেই ডন ফেলিনিকে এত বছর পর দেখে চিনতেই পারল না রানা। সাংঘাতিক মুটিয়ে গেছে লোকটা, থলথলে মাংসের একটা ডিপো বললেই হয়। আগের সেই তীক্ষ্ণ চেহারা আশ্চর্য ভোঁতা আর কদাকার হয়ে উঠেছে। মস্ত এক টাক পড়েছে সামনের অর্ধেক মাথা জুড়ে।

বিশাল হলরুমের মাঝখানে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে পরস্পরকে দেখল ওরা। তারপর বিরাট বপু নিয়ে এক রকম বলতে গেলে রানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ফেলিনি। ওকে আলিঙ্গন করে বলল, 'কেমন আছ, ভাই?'

নরম মাংসের সাথে পিষ্ট হবার ফাঁকে দম ফেলার প্রথম সুযোগেই বলল রানা, 'এই খানিক আগে পর্যন্ত তো ভালই ছিলাম, কিন্তু তোমার আদরের ঠেলায় প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারব কিনা বুঝতে পারছি না।'

দিলখোলা অট্টহাসিতে হলরুমটা কাঁপিয়ে তুলল ফেলিনি। তারপর বলল, 'আরে, আরে! এত কথাও বলতে শিখেছ! তুমি তো বলতে গেলে বোবা ছিলে হে!'

পরবর্তী দু'ঘণ্টায় খাতির যত্নের ঠেলায় সত্যি সত্যি প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠল রানার। সবচেয়ে ভীতিকর হলো ডিনারের আয়োজনটা। খেতে বসল ওরা দুজন, কিন্তু পরিবেশনের জন্যে পাশে মোতায়েন থাকল দশ-বারোজন লোক, তারা যা পরিবেশন করল তা দিয়ে গোটা একটা ব্যাটালিয়নকে ভরপেট খাইয়ে খুশি করে দেয়া যায়।

ডিনারের পর সিটিং রুমে বসল ওরা। চুরুট ধরাল ফেলিনি। রানা ধূমপান করে না শুনে সবজান্তার মত মাথা দোলাল সে। কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলল সে। 'পুরানো দিনের অনেক গল্পই তো হলো, কিন্তু তোমার সেই বন্ধুটি... কোহেন, তার খবর কি বলো তো?'

'সে এখন আমার বন্ধু নয়,' বলল রানা। 'চরম শত্রু।'

মুহূর্তে বদলে গেল ফেলিনির চেহারা। 'বলো কি! ব্যাটা ইহুদীর পাখা গজিয়েছে বুঝি?'

'ফেলিনি,' এই সুযোগে প্রসঙ্গটা তুলল রানা, যে-জন্যে এখানে ওর আসা, 'তোমার মনে আছে, অক্সফোর্ডে তুমি আমাকে কি বলেছিলে?'

'অবশ্যই মনে আছে। ফেলিনি তার মুখ থেকে বেরুনো কোন কথা কখনও ভোলে না। বলেছিলাম, তোমার কাছে আমি ঋণী, কারণ তুমি আমার জান বাঁচিয়েছ, এবং এর বিনিময়ে যখনই হোক যা খুশি চেয়ো, পাবে।'

সব লোক বদলায় না, মনে মনে ভাবল রানা। অন্তত ফেলিনি তার ঋণের কথা ভোলেনি। এক সেকেন্ড পর বলল রানা, 'সেই উপকারটার প্রতিদান চাইতে এসেছি আমি, ফেলিনি।'

'চাও। চেয়ে দেখো পাও কিনা!' পরম আনন্দে বলল মাফিয়া চীফ।

'রেডিওটা অন করলে তুমি কিছু মনে করবে?'

হেসে উঠল ফেলিনি। 'হপ্তায় দুবার চেক করা হয় এই কামরা—আড়িপাতা যন্ত্র আছে কিনা দেখার জন্যে।'

'গুড,' বলল রানা। তবু উঠে গিয়ে রেডিওটা চালু করে দিল ও। 'আমি একজন সরকারী চাকুরে, ফেলিনি। আমার চাকরির ধরনটা আর সব চাকরির মত নয়, একটু আলাদা টাইপের, আর বিপজ্জনক।'

'বুঝেছি, আর বলতে হবে না।' কিন্তু কি বুঝেছে, কতটুকু বুঝেছে তা আর ব্যাখ্যা করল না ফেলিনি।

'এই মুহূর্তে মিশর সরকারের অনুরোধে একটা কাজ করে দিচ্ছি আমি,' বলল রানা। 'কাজটা শেষ হবে নভেম্বরে। ওই নভেম্বর মাসেই মেডেটেরেনিয়ানে একটা অপারেশন চালাতে হবে আমাকে—এটা এমন একটা কাজ, আমি যদি সফল হই তাহলে হয়তো মধ্যপ্রাচ্যে আর কোন যুদ্ধ বাধবে না।'

গভীর মনোযোগ দিয়ে রানার কথা শুনছে ফেলিনি, চোখ দুটো আধবোজা।

'এর সাথে আমি বা মিশরীয়রা জড়িত এটা কোনভাবেই প্রকাশ পাওয়া চলবে না, আর এই প্রকাশ না পাওয়ার ওপরই নির্ভর করছে আমার অ্যাসাইনমেন্টের সাফল্য। আমার একটা বেস দরকার হবে, যেখান থেকে কাজ চালাতে পারব আমি। উপকূলে বড় আকারের একটা বাড়ি চাই আমার, যেখানে ছোট বোট ভিড়তে পারবে, যেখান থেকে বড় জাহাজ চলাচলের পথ খুব বেশি দূরে নয়। ওখানে যে ক'দিন থাকব আমি, দু'হপ্তা কিংবা তার কিছু বেশি, পুলিস বা অন্য কোন নাক গলানো স্বভাবের বাহিনী যেন আমাকে বিরক্ত না করে। এত সব শর্ত পূরণ করে আমাকে একটা বেস যোগাড় করে দিতে পারবে, সেই রকম একজনকেই চিনি আমি। তার নাম ফেলিনি।'

'এই মুহূর্তে মনে পড়ে গেল, সিসিলিতে একটা জায়গা আছে ঠিক তোমার বর্ণনার সাথে মিলে যায়…তবে সেখানে ফোন নেই, এয়ারকন্ডিশন নেই…'

'টেরিফিক!' হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল রানার চেহারা। 'ঠিক ওই জায়গাটাই তোমার কাছে চাইতে এসেছি আমি।'

চেহারা দেখে মনে হলো, ঘাবড়ে গেছে মাফিয়া চীফ। 'ঠাট্টা করছ, রানা? আর কিছু না, শুধু এ-ই জন্যে এসেছ তুমি?'

'শুধু এ-ই,' বলল রানা।

'আরে, পাগল নাকি!' কপাল চাপড়াল মাফিয়া চীফ 'তবে কি সত্যিই তোমার ঋণ শোধ করার ভাগ্য আমার কোনদিনই হবে না?'

মিশরীয় ইন্টেলিজেন্সের লন্ডন স্টেশন হেডকোয়ার্টার কায়রোয় রিপোর্ট পাঠাল। এষা ফিলমনটনের জন্ম-বৃত্তান্ত, বয়স এবং চেহারার বিশদ বর্ণনা দেবার পর লিখল

সে—'প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যায়, এষা ফিলমনটন জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের একজন এজেন্ট। অক্সফোর্ড এলাকায় তার বাবা ইসরায়েল এবং ইহুদীবাদের একজন ঘোর সমর্থক হিসেবে পরিচিত। যুদ্ধাহত ইসরায়েলী সৈনিকদের জন্যে যারা চাঁদা তোলে, প্রফেসর ফিলমনটন তাদের একজন নেতা।

'এষা ফিলমনটন বি.ও.এ. সি-র ইন্টারন্যাশনাল রুটে এয়ার হোস্টেসের চাকরি করে। দেখতে অত্যন্ত সুন্দরী সে, কিন্তু সম-বয়সী কোন বয়-ফ্রেন্ড তার বলতে গেলে একজনও নেই। তাকে এজেন্ট হিসেবে সন্দেহ করার আরও একটা যুক্তি পাওয়া গেল। ইন্টারন্যাশনাল রুটে আছে বলে তেহরান, সিঙ্গাপুর, জুরিখসহ দুনিয়ার প্রায় সব বড় ক্যাপিটাল সিটিতে যাওয়া পড়ে তার, অর্থাৎ জিওনিস্ট এজেন্টদের সাথে দেখা করার সুযোগ তার প্রায়ই ঘটে।

'সবশেষে, এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—ইসরায়েলী এজেন্ট ন্যাট কোহেন, লুক্সেমবার্গে রানার সাথে যার দেখা হয়েছিল, ছাত্র-জীবনের কিছুটা সময় প্রফেসর ফিলমনটনের বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হিসেবে ছিল। প্রফেসরের সাথে তার সম্পর্ক এখনও অটুট রয়েছে, লন্ডনে এলে কোহেন তার সাথে দেখা না করে ফেরে না। এষা ফিলমনটন কোহেনের অধীনে কাজ করলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। রানার সাথে এষা ফিলমনটনের অ্যাফেয়ার শুরু হবার কাছাকাছি সময়ে কোহেনের বর্ণনার সাথে মিলে যায় এমন একজন লোক ফিলমনটনের বাড়িতে গিয়েছিল।'

এই রিপোর্টের উত্তরে কায়রো হেডকোয়ার্টার থেকে কোড করা টেলিগ্রাম পাঠালেন লে. জেনারেল আলি কারাম—'মেয়েটাকে খুন করার অনুমতি চাওনি কেন বুঝলাম না!'

লন্ডন স্টেশন হেড জবাব পাঠাল—'পাঁচটি কারণে মেয়েটাকে আমি মেরে ফেলার সুপারিশ করিনি:

১। মেয়েটার বিরুদ্ধে আমাদের সন্দেহ আর অভিযোগ খুবই কড়া, কিন্তু তার বিরুদ্ধে নিশ্চিতভাবে কিছুই আমরা প্রমাণ করতে পারিনি।

২। রানাকে আমি যতটুকু চিনি, এষাকে ও কোন তথ্য দিয়েছে বলে বিশ্বাস হয় না—মেয়েটার সাথে ওর সম্পর্ক যতই না কেন হৃদয় ঘটিত হোক।

৩। মেয়েটাকে আমরা মেরে ফেললে, শত্রুরা তখন অন্য কোন পথে রানার কাছ থেকে সুযোগ আদায়ের চেষ্টা করবে। তারচেয়ে চেনা ডাইনীই আমাদের জন্যে ভাল।

৪। শত্রুপক্ষকে ভুল তথ্য যোগান দেয়ার কাজে এযাকে ব্যবহার করতে পারি আমরা।

৫। রানা ভালবাসে এইরকম একটা মেয়েকে আমরা যদি খুন করি, তাহলে আমার ধারণা—আমি, আপনি, এবং সংশ্লিষ্ট আর যারা আছে তাদের সবাই একে একে খুন হয়ে যাব। সিকিউরিটির কথা বলে কোন লাভ নেই···কাপু উ-সেনের সিকিউরিটির ব্যবস্থা আমাদের চেয়ে খারাপ ছিল না—আজ সে কোথায়?'

এর উত্তরে ছোট্ট একটা জবাব পাঠালেন লে. জেনারেল আলি কারাম—'তুমি যা ভাল বোঝো।'

কুৎসিত, নোংরা, বুড়ি একটা। সারা গায়ে বসন্তের ফোঁটার মত খোলে মরচে ধরেছে তার। মান্ধাতা আমলে যদি গায়ে রঙের প্রলেপ পড়েও থাকে, রোদ-বৃষ্টি-বাতাস লেগে কবে তা উঠে গেছে কেউ জানে না। তার স্টারবোর্ড সাইডের উঁচু কিনারা, নাকের ঠিক একটু পিছনে, বিচ্ছিরিভাবে তুবড়ে আছে, ঠুকে-ঠাকে সেটাকে সোজা করার গরজ নেই কারও। দশ বছর ধরে ফানেলের গায়ে ময়লা জমেছে, ছাল-চামড়া ওঠা ডেকের ওপর নোংরা দাগ। মাঝে মধ্যে ঝাড় দেয়া হয় বটে, কিন্তু যত্নের সাথে নয়, তাই পচা তরিতরকারির টুকরো, গমের দানা, ছেঁড়া সুতো, পাটের রশি, কাঠের গুঁড়ো ইত্যাদি আরও কত কি লাইফবোটের নিচে, দড়ি-দড়ার চারপাশে আর ফাটলের ভেতর লুকিয়ে থাকে। গরমের দিনে দুর্গন্ধে ভারী হয়ে ওঠে বাতাস।

প্রায় আড়াই হাজার টনী জাহাজ, লম্বায় দু'শো ফিট, চওড়ায় ত্রিশ ফিটের একটু বেশি। ভোঁতা নাকের কাছে লম্বা একটা রেডিও মাস্ট মাথা তুলে আছে। দুটো বড় আকারের হ্যাচ ওপেনিং তার ডেকের বেশিরভাগটা দখল করে রেখেছে, ওই দুই পথে মেইন কার্গো হোল্ডে নামা যায়। ডেকে তিনটে ক্রেন—একটা হ্যাচগুলোর সামনে, একটা পিছনে, বাকিটা দুটোর মাঝখানে। হুইলহাউস, অফিসার্স কেবিন, গ্যালি আর ক্রুদের কোয়ার্টার—সব জাহাজের পিছনে, ফানেলের চারদিকে ভিড় করে আছে। ছয় সিলিন্ডারের ডিজেল এঞ্জিন, সার্ভিস স্পীড থারটিন নট।

ধারণ ক্ষমতার কাছাকাছি মালামাল তোলা হলেও, টালমাটাল অবস্থা হয় তার। কার্গো সাজাবার দোষে ভারসাম্য একটু কমবেশি হলে সামান্য বাতাসের ইশারা পেলেই জংলী নাচ শুরু হয়ে যায়।

ক্রু আর অফিসারের সংখ্যা একত্রিশ, তাদের একজনও এই জাহাজ সম্পর্কে প্রশংসা করার মত কিছু খুঁজে পায় না। আরোহী বলতে তার গ্যালিতে আশ্রয় নিয়েছে কয়েকশো ইঁদুর, ছুঁচো, তেলাপোকা আর লাখ দু'য়েক মাছি।

কেউ তাকে ভালবাসে না।

নাম তার ইমপেরিয়াল।

বেনামী বন্দর-২

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ১৯৮৪

এক

একটা জাহাজ কোম্পানীর মালিক হওয়ার জন্যে নিউ ইয়র্কে এল মাসুদ রানা। কাজটা সারতে দু'ঘন্টা বেরিয়ে গেল।

ম্যানহাটন ফোন গাইড ঘেঁটে, লোয়ার ইস্ট সাইডে অফিস আছে এই রকম একজন লইয়ারকে বেছে নিল ও। ফোনে কথা না বলে ঠিকানা ধরে নিজেই চলে এল। অফিস আর অফিস-কর্তা কি রকম দেখতে হবে কল্পনায় তার একটা ধারণা আগেই করে নিয়েছিল, সেটা মিলে গেল দেখে সন্তুষ্টি বোধ করল ও। চাইনিজ একটা রেস্তোরাঁর ওপরতলায় এক কামরার অফিস। শুকনো, ঢ্যাঙা লইয়ারের নাম শিয়াং শাং।

লাইবেরিয়ান কর্পোরেশন সার্ভিসেস ইনকরপরেটেড, পার্ক এভিনিউয়ে এদের অফিস রয়েছে। লাইবেরিয়ান কর্পোরেশনের নাম রেজিস্ট্রি করতে চায় অথচ তিন হাজার মাইল পাড়ি দিতে রাজি নয় যারা তাদের সাহায্য করার জন্যে খোলা হয়েছে এই কোম্পানী। একটা ট্যাক্সি নিয়ে এখানে এসে হাজির হলো রানা, সাথে শিয়াং শাং।

রানার কাছ থেকে কোন রকম রেফারেন্স চাওয়া হলো না। ও সৎ, সচ্ছল, এবং সুস্থ-মস্তিষ্ক কিনা এসব জানারও কোন গরজ দেখাল না কেউ। দেড় হাজার ডলার ফি, সেটা নিজের পকেট থেকে নগদই দিয়ে দিল রানা। ব্যস, কাজ শেষ। বুভাইল শিপিং কর্পোরেশন অভ লাইবেরিয়া রেজিস্টার করা একটা কোম্পানী হিসেবে অস্তিত্ব লাভ করল। এই পর্যায়ে রানা যে এক-আধখানা ডিঙি নৌকোরও মালিক নয় সে-ব্যাপারে কারও কোন মাথা ব্যথা নেই।

সদ্য গজানো এই জাহাজ কোম্পানীর ঠিকানা দেয়া হলো—৮০, ব্রড স্ট্রীট, মনরোভায়া, লাইবেরিয়া। ডিরেক্টরদের নাম—পি. ঠনঠনিয়া, ই.কে. শোবে, জে. ডি, পয়েড—সবাই লাইবেরিয়ার বাসিন্দা। লাইবেরিয়ান ট্রাস্ট কোম্পানীসহ বেশির ভাগ লাইবেরিয়ান কর্পোরেশনের হেড অফিসেরও এই একই ঠিকানা। ঠনঠনিয়া, শোবে আর পয়েড এই রকম অনেক কোম্পানীরই প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক, আসলে এই করেই খায় ওরা। এরা তিনজন লাইবেরিয়ান ট্রাস্ট কোম্পানীর চাকুরে।

নিজের ফি বাবদ দেড়শো ডলার আর ট্যাক্সি ভাড়া চাইল শিয়াং শাং, ফি নিয়ে কোন দর কষাকষি না করে নগদ দিয়ে দিল রানা, কিন্তু ফিরতে বলল বাসে করে। এইভাবে নিজের কোন ঠিকানা না দিয়ে সম্পূর্ণ আইনসম্মত একটা জাহাজ কোম্পানী তৈরি করল ও, নাক ঠেকিয়ে যার গা শুঁকলেও ওর বা মিশরের গন্ধ পাওয়া যাবে না।

যা নিয়ম, ঠনঠনিয়া, শোবে আর পয়েড ঠিক চব্বিশ ঘন্টা পর কোম্পানীর ডিরেক্টরের পদ থেকে পদত্যাগ করল এবং সেই একই দিন লাইবেরিয়ার মন্টেসেরাডোর নোটারী পাবলিক একটা এফিডেভিটে সীল-ছাপ্পর মারল, যাতে বলা হয়েছে, বুভাইল শিপিং কর্পোরেশনের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণভার এখন থেকে এককভাবে বর্তাল ভিনসেন্ট গগলের হাতে।

ঠিক ওই সময় জুরিখ এয়ারপোর্ট থেকে বাসে করে শহরে আসছে রানা, গগলের সাথে লাঞ্চ খাবার ইচ্ছে।

দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গার পাঁচটা টেলিফোন নম্বর দেয়া আছে রানাকে, গগলের সাথে যোগাযোগ করতে হলে এগুলোর যে কোন একটা নম্বরে রিঙ করতে হবে। যে নম্বরেই রিঙ করুক রানা, গগলকে সেখানে পাওয়া যাবে না, তবে রানার মেসেজ ঠিকই পৌঁছে যাবে তার কাছে। জুরিখে আসার আগে, নিউ ইয়র্কে থাকতেই, মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছে রানা, কখন আর কোথায় ওর সাথে দেখা হবে সব বলা হয়েছে তাতে।

রেলওয়ে স্টেশনের সামনে বাস থেকে নামল রানা, দেখল, লাইটপোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে পেভমেন্টের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে গগল। পরনে নেভী ব্লু-স্যুট, ম্লান ব্লু শার্ট, গাঢ় নীল ডোরাকাটা টাই। চেহারায় তেমন কোন ভাব নেই, হাসছেও না, আবার গোমড়ামুখো হয়েও নেই। লালচে ফ্রেঞ্চকাট দাড়িটা ওর চেহারায় আভিজাত্য এনে দিয়েছে। এই লোকই যে আর্মস চোরাচালানের রাজা, শিপিং কোম্পানীর মালিক, পুরানো জাহাজ কেনাবেচা ব্যবসায়ে অত্যন্ত প্রভাবশালী একটা ফিগার, কে বলবে দেখে!

হ্যান্ডশেক করল ওরা। 'ব্যবসা কেমন?' জানতে চাইল রানা।

'ওঠানামার মধ্যে আছে,' স্মিত হেসে বলল গগল। 'প্রায় সময়ই উঠছে।' নিজে থেকে কিছু না বললে সাধারণত যেচে পড়ে রানাকে কোন প্রশ্ন করা স্বভাব নয় তার, কাজেই এমন কি কুশলাদি পর্যন্ত জানতে চাইল না সে।

জুরিখের রাস্তা-ঘাট, বাড়ি-ঘর এত বেশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়, সব যেন আয়নার মত ঝকঝক করছে। কিছুদিন থেকে এই নতুন একটা বিড়ম্বনা দেখা দিয়েছে, ভাল বা সুন্দর কিছু দেখলেই দু'রকমের অনুভূতি হয় ওর। প্রথমে খুশি লাগে, কিন্তু তারপরই খারাপ হয়ে যায় মন। এই ভেবে দুঃখ পায়, এই জিনিস তো আমার দেশে নেই।

'এই শহরটা আমার খুব পছন্দ,' বলল রানা পেভমেন্টের ওপর দিয়ে পাশাপাশি হাঁটছে ওরা।

'তোমার কথামত পুরানো শহরের বেল্টলাইনারে আমি একটা টেবিল বুক করেছি।'

'পেলিকানসট্রেসে গিয়েছিলে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ।'

'গুড।' লাইবেরিয়ান কর্পোরেশন সার্ভিসেসের জুরিখ অফিস ওই পেলিকানসট্রেসেই। মেসেজে রানা অনুরোধ করেছিল গগল যেন ওখানে গিয়ে বুভাইল শিপিং কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট এবং চীফ এগজিকিউটিভ হিসেবে নিজের নাম

রেজিস্টার করে। এর জন্যে ত্রিশ হাজার ডলার পাবে সে. একটা সুইস ব্যাংকের মিশরীয় ইন্টেলিজেন্সের অ্যাকাউন্ট থেকে ওই ব্যাংকের একই শাখায় গগলের অ্যাকাউন্টে চলে যাবে টাকাটা। টাকা হাত-বদলের এমন একটা কৌশল এটা. সহজে কারও নজরে পড়ার উপায় নেই।

'গুড কিনা সেটা তোমার সব কথা শোনার পর আমি বিবেচনা করব,' বলল গগল। 'জানিয়েছ. কাজটা করলে ত্রিশ হাজার মার্কিন ডলার পাব আমি। কিন্তু তুমি খুব ভাল করেই জানো, দু'একজন ছাড়া আমি কারও উপকার করি না, আর যদি করি বিনিময়ে টাকা নেই না।'

'যার উপকার করার জন্যে তোমাকে আমি ধরেছি,' মুচকি একটু হেসে বলল রানা, 'সে তোমার ওই দু'একজনের মধ্যে পড়ে না।'

'কাজটা তাহলে তোমার নয়?' একটু অবাক হয়েই জানতে চাইল গগল।

'নিজের কাজের জন্যে তোমাকে টাকা সাধব, এত বড় দুঃসাহস বা নির্বুদ্ধিতা আমার কোনদিনও হবে না,' বলল রানা।

গগল লক্ষ করল, কাজটা কার তা কিন্তু বলল না রানা। জানে, প্রয়োজন না থাকলে বা সময়ের আগে কোন কথা ফাঁস করা স্বভাব নয় রানার, কাজেই কিছু মনে করল না সে। শুধু বলল, 'কাজটা যদি তোমার না হয়ে থাকে, আমি করবই এমন কথা কিন্তু দিতে পারি না।'

'আমি জানি তুমি করবে।'

রেস্তোরাঁয় পৌঁছল ওরা। টাকা-পয়সা লেনদেনের জন্যে জুরিখে প্রায়ই আসতে হয় গগলকে, তাই রানার ধারণা হয়েছিল. রেস্তোরাঁয় ওকে বোধহয় সবাই চিনবে। কিন্তু হেড ওয়েটারের আচরণে তেমন কিছু বোঝা গেল না। দু'জনের অর্ডার নিয়ে চলে গেল ওয়েটার। রানা শুধু খাবারের জন্যে বলল, কিন্তু গগল খাবারের সাথে ওয়াইনও চাইল। খাওয়াদাওয়া শুরু হয়েছে, এই সময় বুভাইল শিপিং কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট হিসেবে গগলের কি কি করণীয়, এক এক করে তার বিবরণ দিতে শুরু করল রানা।

'এক—ছোট কিন্তু খুব জোরে ছুটতে পারে এইরকম একটা জাহাজ কেনো, টনেজ যেন এক হাজার থেকে দেড় হাজারের মধ্যে হয়, ক্রুর সংখ্যা যেন কম থাকে। লাইবেরিয়ায় রেজিস্টার করো ওটাকে।' তার মানে আবার যেতে হবে পেলিকানসট্রেসে, এবং টন প্রতি তিন ডলার করে ফি দিতে হবে। 'কেনাকাটার কাজ, কাজেই ব্রোকার হিসেবে তোমার যে পার্সেন্টেজ পাওনা হবে সেটা তুমি নেবে। কেনার পর জাহাজটাকে খাটাও, ব্রোকার হিসেবে তোমার পাওনা আদায় করে নাও। সাতই অক্টোবর বা তার আগে পোর্ট সাঈদে অভিযান শেষ করতে হবে জাহাজটাকে, মাঝখানের সময়টায় সে কি করল বা কোথায় গেল তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। পোর্ট সাঈদে পৌঁছে ক্রুদের ডিসমিস করে দাও। এসব তুমি ঠিকে নিতে চাও?'

ক্ষীণ একটু হাসল গগল। বলল, 'না।'

রানা জানে, গগলের এই না একাধিক অর্থ বহন করতে পারে। ওর কথা শুনছে বটে. কিন্তু কাজটা করবে বলে এখনও কোন প্রতিশ্রুতি দেয়নি সে। আবার শুরু

করল রানা, 'দুই—এই তালিকার যে-কোন একটা জাহাজ কেনো,' বলে গগলের হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিল ও. এতে ইমপেরিয়ালের চারটে সিসটার-শিপের নাম রয়েছে, কে মালিক এবং এই মুহূর্তে কোন্‌টা কোথায় আছে তার বিবরণসহ। 'দাম যাই হোক, কিনতে দ্বিধা কোরো না—এর একটা আমার চাই-ই। ব্রোকার'স পারসেন্টেজ হিসেবে তোমার পাওনা বুঝে নিয়ো। অক্টোবরের সাত তারিখের মধ্যে পোর্ট সাঈদে ডেলিভারি দিতে হবে। বন্দরে ভেড়ার সাথে সাথে ডিসমিস করে দাও ক্রুদের।'

পুডিং খাচ্ছিল গগল, হাতের চামচ প্লেটে নামিয়ে রেখে তালিকাটায় চোখ বুলাবার জন্যে গোল্ডরিমের একটা চশমা তুলল নাকের ওপর। এইবার চোখ বুলিয়ে কাগজ ভাঁজ করল সে, তারপর বিনা মন্তব্যে রেখে দিল টেবিলের ওপর।

তাকে আরও একটা কাগজ দিল রানা। 'তিন—এবার এই জাহাজটা কেনো। এর নাম ইমপেরিয়াল। কিন্তু একে কেনার ব্যাপারে, সময়ের একটা হিসেব আছে; সেই হিসেবের বাইরে যাওয়া চলবে না। অ্যান্টওয়ার্প থেকে নভেম্বরের সতেরো তারিখ, রোববারে রওনা হবে সে। তাকে আমাদের কিনতে হবে রওনা হবার পর, কিন্তু জিব্রালটার প্রণালী গলে বেরিয়ে যাবার আগে।'

খাওয়া বন্ধ করে সরাসরি রানার দিকে তাকাল গগল, কি যেন জিজ্ঞেস করতে চায়।

তার আগেই বলল রানা, 'থামো, সবটা বলতে দাও আমাকে। চার—আগামী বছরের প্রথম দিকে এক নম্বর জাহাজ, ছোটটা, বেচে দেবে তুমি। একই সাথে বা পরপরই বেচবে তিন নম্বর জাহাজ ইমপেরিয়াল। আমার কাছ থেকে একটা সার্টিফিকেট পাবে তুমি, তা থেকে জানা যাবে দুই নম্বর জাহাজটাকে ভেঙে ফেলার জন্যে বেচে দেয়া হয়েছে। সার্টিফিকেটটা লন্ডনের লয়েডসে পাঠিয়ে দেবে তুমি। তার মানে,' ক্ষীণ একটু হেসে কফির কাপে চুমুক দিল রানা, 'বুভাইল শিপিং লালবাতি জ্বালবে।'

'তুমি আসলে কোন হদিস ছাড়াই একটা জাহাজকে গায়েব করে দিতে চাইছ,' বলল গগল।

মাথা ঝাঁকাল রানা। গগল ঠিক ছুরির মতই ধারাল।

'সবই ঠিক আছে,' বলল গগল, 'কিন্তু ইমপেরিয়ালকে কেনার ব্যাপারে ঝামেলা হতে পারে। মাঝ-সাগরে রয়েছে, এই অবস্থায় জাহাজ কেনাবেচার নিয়ম নেই। সাধারণ রীতি হলো—কোথাও বসে সমঝোতা হয়, দাম ঠিক হয়, সব চূড়ান্ত করে চুক্তিপত্র লিখে ফেলা হয়, শুধুমাত্র এরপরই জাহাজটাকে ড্রাই ডকে পাঠানো হয় ইন্সপেকশনের জন্যে। কোথাও মারাত্মক ধরনের ত্রুটি নেই জানার পর ডকুমেন্টে সই করিয়ে নিয়ে বিক্রেতাকে টাকা দিয়ে দেয়া হয়। নতুন মালিক তার সদ্য কেনা জাহাজ ড্রাই ডক থেকে নামিয়ে নিয়ে যায়। কার্গো নিয়ে কোথাও যাচ্ছে এইরকম একটা জাহাজ কিনতে চাওয়া খুবই অস্বাভাবিক ঘটনা।'

'কিন্তু অসম্ভব নয়।'

'না, তা হয়তো নয়।'

গগলকে চিন্তায় মগ্ন হয়ে উঠতে দেখল রানা, মাথা একদিকে একটু কাত করে

কোন্ সুদূরে যেন তাকিয়ে আছে। শুভ লক্ষণ, সমস্যার ভেতর ঢুকছে সে।

একটু পর গগল বলল, 'কাজকর্ম সব নিয়ম ধরেই শুরু করতে হবে। ইমপেরিয়ালের মালিককে নিয়ে আলোচনায় বসব আমি। দর কষাকষি করে একটা দামে রাজি হব। মালিক বলবে, নভেম্বর ভয়েজ সেরে ফিরলেই ইন্সপেকশনের জন্যে ড্রাই ডকে পাঠানো হবে ইমপেরিয়ালকে। আমরা রাজি হব। কিন্তু তারপর, ইমপেরিয়াল রওনা হয়ে গেলে, তাকে বলা হবে ভদ্রলোক তাঁর টাকা এখুনি খরচা করতে চান, কারণ তাতে করে ট্যাক্স সংক্রান্ত কিছু ঝামেলা থেকে রেহাই এবং মোটা অঙ্কের রেয়াত পাওয়া যাবে। টাকা পেয়ে জাহাজ দিয়ে দেবে মালিক, এতে তার আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু একজন শিপার হিসেবে নিজের গুডউইলের কথা ভাবতে হবে তাকে। নতুন মালিক ইমপেরিয়ালের কার্গো জায়গামত ডেলিভারি দেবে কিনা এটাই হবে তার একমাত্র দুশ্চিন্তা। তবে ফুল-প্রুফ গ্যারান্টি দেয়া হলে সে হয়তো...'

'তোমার গুডউইল কি রকম তা আমার ঠিক জানা নেই,' বলল রানা। 'তুমি যদি ব্যক্তিগত গ্যারান্টি দাও, সেটা তার কাছে যথেষ্ট বলে মনে হবে?'

'তা হবে,' বলল গগল। 'কিন্তু কাজটা তোমার নয়, আমি ব্যক্তিগত গ্যারান্টি দিতে যাব কেন?'

গগলের চোখে চোখ রেখে জবাব দিল রানা; 'আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, কার্গোর মালিক কোন অভিযোগ করবে না।'

সবজান্তার ভঙ্গিতে, কিন্তু চেহারায় গাম্ভীর্য ফুটিয়ে ওপর-নিচে মাথা দোলাল গগল। 'বোঝাই যাচ্ছে, এইখানে কোথাও কিছুএকটা কারচুপি করবে তুমি। আমার সুনামটুকু কাজে লাগাতে চাইছ, সেই সাথে কথা দিচ্ছ, আমার গুডউইলের কোন ক্ষতি হবে না।'

'হ্যাঁ,' খানিক চিন্তা করে দেখল রানা, গগলকে একেবারে অন্ধকারে রাখা উচিত হচ্ছে না। 'শোনো, এর আগেও মিশরের হয়ে কাজ করেছ তুমি, ওদেরকে বিশ্বাস করেছ, কখনও ঠকতে হয়েছে তোমাকে?'

এক সেকেন্ড রানার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকল গগল, তারপর বলল, 'না।'

'নিশ্চয়ই তোমার নীতি বদলায়নি, এখন আবার ওদের কাজ করতে আপত্তি করবে না?'

'না।'

'তাহলে তো সব চুকেই গেল।'

'ঠিক আছে,' রাজি হলো গগল। 'করব।'

সুন্দরী একজন ওয়েট্রেস দু'প্লেট সুইস চকোলেট নিয়ে এল, কফির সাথে খাবার জন্যে। গগল একটা প্লেট রাখল, কিন্তু রানা ফিরিয়ে দিল।

'খুঁটিনাটি,' বলল রানা। 'এখানে তোমার ব্যাংকে বুভাইল শিপিঙের নামে একটা অ্যাকাউন্ট খোলো। এখানকার মিশরীয় দূতাবাস এই অ্যাকাউন্টে প্রয়োজনীয় ফান্ড সাপ্লাই দেবে। আমাকে কিভাবে রিপোর্ট করবে, বলে দিচ্ছি। ব্যাংকে চিরকুট রেখে যাবে, বলবে শুধু দূতাবাস থেকে কেউ এসে চাইলেই যেন

দেয়া হয়। আর যদি দেখা করে কথা বলতে চাও, আমার ফোন নাম্বার তোমার জানা আছে।'

'বেশ।'

'কোন প্রশ্ন?'

মুচকি একটু হাসল গগল। 'না।'

'হাসছ যে?'

'দু'নম্বর জাহাজটা ইমপেরিয়ালের যমজ বোন,' সকৌতুকে বলল গগল। 'তোমার মতলব আমি আন্দাজ করতে পারি। একটা ব্যাপার জানতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে আমার, কিন্তু আমি তোমাকে জিজ্ঞেসও করব না, তুমি নিজে থেকে আমাকে বলবেও না। তবে, আমার মনের প্রশ্নটা বেরিয়ে আসুক, কি বলো? তোমাকে তো আর উত্তর দিতে হবে না!'

'আসুক,' মুচকি হেসে বলল রানা।

'কি কার্গো থাকবে ইমপেরিয়ালে? ইউরেনিয়াম?'

ইমপেরিয়ালের ওপর চোখ বুলিয়ে অ্যালান হিলারী বলল, 'এটা?'

জ্যাক রিচি কোন মন্তব্য করল না। কারডিফ ডকের জেটির মুখে ভাড়া করা একটা ফোর্ডে বসে রয়েছে ওরা। ইমপেরিয়াল আজ এখানে ভিড়বে এই খবর সি.আই.এ-র হেডকোয়ার্টার থেকে এসেছে। ইতোমধ্যে নোঙর ফেলেছে ইমপেরিয়াল, বাঁধাছাঁদার কাজ এখনও শেষ হয়নি। জাহাজটা এখানে সুইডিশ টিম্বার খালাস করবে, তারপর কার্গো হিসেবে নেবে ছোটখাট মেশিনারি আর কাপড়চোপড়। লোড করতে বেশ ক'টা দিন লেগে যাবে তার।

'তবু ভাল যে মেস ডেকটা ফোকাস্‌লে নয়,' বিড়বিড় করে বলল হিলারী, অনেকটা আপনমনে।

'পুরানো বটে, কিন্তু অত পুরানো নয়,' বলল রিচি।

এই বিষয়েও রিচির জ্ঞান আছে বুঝতে পেরে মনে মনে আশ্চর্যই হলো হিলারী।

গাড়ির পিছন থেকে জানতে চাইল কুয়েল, 'জাহাজের এদিকটা পাছা, নাকি আগা?'

রিচি আর হিলারী পরস্পরের দিকে তাকাল, কুয়েলের অজ্ঞতা দেখে নিঃশব্দে হাসল ওরা। 'পাছা,' বলল হিলারী। 'আমরা ওটাকে স্টার্ন বলি।'

সেই কখন থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে তার আর থামার নাম নেই।

ওয়েলসের বৃষ্টি ইংল্যান্ডের বৃষ্টির চেয়ে একঘেয়ে একগুঁয়ে তো বটেই, অনেক বেশি ঠাণ্ডাও। এই রকম দিনে বার বার নিউ ইয়র্ক আর বউয়ের কথা মনে পড়ে যায় হিলারীর। কিন্তু মনটা যে শুধু সেজন্যে খারাপ, তাও নয়। মার্কিন নেভিতে বছর দুয়েক ছিল, সেই ঘটনার সাথে যোগ হয়েছে: সে একজন রেডিও আর ইলেকট্রনিকস এক্সপার্ট, কাজেই ইমপেরিয়ালে যে তাকেই উঠতে হবে সেটা কোন আলোচনা ছাড়াই ধরে নেয়া হয়। অথচ সাগরে ফিরে যাবার মন নেই হিলারীর। আসলে, নেভি থেকে কেটে পড়ার একটা সুযোগ পাবার জন্যেই সি.আই.এ.-তে চাকরির আবেদন করেছিল সে। সাগরের আবহাওয়া, দুলুনি, নেভির খাবার আর

শৃঙ্খলা তার ভাল লাগে না। কিন্তু রিচির নির্দেশ অমান্য করার উপায় নেই।

রিচি বলেছে, একজন রেডিও অপারেটর হিসেবে ইমপেরিয়ালে তুলে দেয়া হবে তাকে। তার সাথে নিজস্ব ইকুইপমেন্টও থাকবে। এই অসম্ভবকে কিভাবে সম্ভব করা যায় ভাবতে শুরু করল হিলারী। প্রথম কাজ হবে ইমপেরিয়ালের রেডিও-ম্যানকে খুঁজে বের করা। তারপর ভোঁতা কিছু দিয়ে তার মাথায় দুম করে এক ঘা বসিয়ে, ঠেলে ফেলে দিতে হবে পানিতে। জাহাজে উঠে ক্যাপ্টেনকে বলতে হবে, 'শুনলাম আপনার নাকি একজন নতুন রেডিও-ম্যান দরকার?' আপনমনে কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাল ছেড়ে দিল হিলারী। এসব বিষয়ে তার মাথা তেমন খেলে না। বস্ নিশ্চয়ই আরও বাস্তব কিছু বের করে ফেলবে, তা না হলে সে বস্ বা কর্নেল হবে কেন।

ডেকের ওপর এখন আর কোনরকম ব্যস্ততা নেই, ইমপেরিয়ালের এঞ্জিনও চুপ মেরে গেছে। গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক ধরে একদল নাবিক জেটিতে নেমে এল, ডাঙায় ফেরার আনন্দে হৈ-চৈ, হাসাহাসি করছে। জেটি থেকে রাস্তায় উঠে এসে শহরের দিকে হাঁটা দিল ওরা। রিচি বলল, 'কোন্ পাবে যায় দেখো, কুয়েল।' গাড়ি থেকে নেমে নাবিকদের পিছু নিল কুয়েল।

অপারেশনটা যেভাবে এগোচ্ছে, ঠিক মনে ধরছে না হিলারীর। রিচির হাসি-আনন্দে ভাগ বসাতে পারছে না সে। রানা এখন কোথায় জানা নেই ওদের, যদিও তাকে ওরা আবার হারিয়ে ফেলেছে এ-কথাও বলা চলে না, ইচ্ছে করেই চোখের আড়ালে সরে যেতে দিয়েছে। সিদ্ধান্তটা ছিল রিচির, রানার কাছাকাছি থাকতে খুব ভয় তার; তাতে নাকি আতঙ্কিত হয়ে উঠে কাজটাই ছেড়ে দিতে পারে রানা। 'আমরা বরং ইমপেরিয়ালকে চোখে চোখে রাখব, তাহলে রানাই আমাদের কাছে আসবে।' রিচির এই কথা শুনে তার সাথে অনেক তর্ক করেছে ন্যাট কোহেন, কিন্তু সুবিধে করতে পারেনি। মনে মনে রিচির যুক্তি সে-ও একরকম সমর্থন করে, কিন্তু তাই বলে এতটা আত্মবিশ্বাসী হওয়া উচিত নয় রিচির।

'তোমার পয়লা কাজই হবে ক্রুদের সাথে দোস্তি পাতানো,' হিলারীর চিন্তায় বাধা দিয়ে বলল রিচি। 'গল্পটা হবে এই রকম। তুমি একজন রেডিও অপারেটর। তোমার জাহাজের নাম ভয়েজার, ওতে থাকার সময় ছোট একটা অ্যাক্সিডেন্ট করো, তাতে তোমার আঙুল ভেঙে যায়। ফলে লম্বা একটা ছুটি দিয়ে জাহাজ থেকে তোমাকে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। মালিকের কাছ থেকে মোটা টাকার ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি পেয়েছ, কাজেই দু'হাতে টাকা ওড়াতে তোমার কোন আপত্তি নেই। কাথায় কথায় বলবে, পকেটে যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ ফুর্তি ছাড়া আর কিছু ভাবতে চাও না তুমি, কিন্তু টাকা শেষ হয়ে গেলে একটা কাজ তোমার দরকার হবে।' হিলারীর চোখের সামনে দুটো আঙুল খাড়া করল রিচি। 'দুটো জিনিস তোমাকে জানতেই হবে। এক, রেডিও অপারেটরের পরিচয়। দুই, আবার কবে রওনা দেবে জাহাজ তার তারিখ আর সময়।'

মুখে বলল বটে, 'ঠিক আছে,' কিন্তু মনে মনে ভাবল হিলারী, ঘোড়ার ডিম ঠিক আছে! চাইলেই কি কারও সাথে দোস্তি পাতানো যায়? নিজের অভিনয় ক্ষমতার ওপর কোন কালেই তার কোন আস্থা ছিল না। ক্রুদের দলটা ওকে যদি অবাঞ্ছিত

বলে মনে করে. যদি মনে করে ওদের হাসি-খুশিতে নিঃসঙ্গ একজন মোটা লোক বাগড়া দিতে এসেছে? কিংবা. এমন যদি হয়. কোন কারণ ছাড়াই স্রেফ ওকে পছন্দ করতে পারল না ওরা?

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হিলারী ব্যাপারটাকে মেনে নিল। হয় কাজটা তাকে করতে হবে, তা না হলে যুক্তি দেখিয়ে বোঝাতে হবে. কাজটা সম্ভব নয়। দেখাবার মত কোন যুক্তি যখন নেই, সাধ্যমত চেষ্টা করা ছাড়া উপায় কি!

জেটির দিকে ফিরে আসতে দেখা গেল কুয়েলকে। রিচি বলল. 'পেছনে চলে যাও তুমি। কুয়েল গাড়ি চালাবে।'

নিচে নেমে কুয়েলের জন্যে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকল হিলারী। বৃষ্টিতে ভিজে একেবারে গোসল হয়ে গেছে কুয়েল, গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল সে। পিছনের সীটে উঠে দরজা বন্ধ করল হিলারী। গাড়ি ছেড়ে দিল কুয়েল সীটের ওপর ঘুরে বসে হিলারীর হাতে কিছু টাকা ধরিয়ে দিল রিচি। 'পাঁচশো পাউন্ড আছে,' বলল সে। 'সরকারের মাল, দরিয়ায় ঢালার জন্যে দেয়া হলো তোমাকে।'

রাস্তার মোড়ে, ছোট একটা পাবের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল কুয়েল। সাইনবোর্ডে উজ্জ্বল, গোটা গোটা লাল হরফে একটা শব্দ লেখা হয়েছে—টুইংকল। কাঁচের জানালা দিয়ে হলদেটে আলো বেরিয়ে আসছে বাইরে। এই রকম বৃষ্টির দিনে ভেতরটা তবু একটা আশ্রয় হতে পারে, ভাবল হিলারী।

তারপর হঠাৎ করেই জানতে চাইল সে, 'কোথাকার মানুষ ওরা?'

'সুইডেনের।'

নকল কাগজ-পত্রে হিলারীকে একজন অস্ট্রিয়ান হিসেবে দেখানো হয়েছে। 'তাহলে কোন ভাষায় কথা বলব ওদের সাথে?'

'সব সুইডিশই ইংরেজী বলতে পারে,' বলল রিচি। কয়েক সেকেন্ড নিস্তব্ধতার মধ্যে কাটল। তারপর জানতে চাইল সে, 'তোমার আর কোন প্রশ্ন আছে? কোথাও কিছু গোলমাল করে ফেলার আগেই কোহেনের কাছে ফিরে যেতে চাই আমি।'

'না, কি আর জিজ্ঞেস করব!' বলে গাড়ির দরজা খুলল হিলারী।

'যত দেরিই হোক, হোটেলে ফিরে আজ রাতেই কথা বলবে আমার সাথে।'

'ঠিক আছে।'

'গুডলাক।'

দরজা বন্ধ করে গাড়ির রাস্তা পেরোল হিলারী। পাবে ঢুকতে যাবে, এই সময় ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একজন। মদ আর তামাকের গন্ধ মুহূর্তের জন্যে ঘিরে ধরল হিলারীকে। মনের বিষণ্ন ভাবটা অনেকটাই কেটে গেল। কাঁচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল সে।

ভেতরটা তেমন সুবিধের নয়। প্লাস্টিকের টেবিল, মেঝের সাথে আটকানো চেয়ার নেই, দেয়াল ঘেঁষে ফেলা হয়েছে লম্বা বেঞ্চ। চারজন নাবিক চারমাথা এক করে কিছু একটা দেখছে, সম্ভবত অশ্লীল বই-টই হবে। আরেকজন নাবিক কাউন্টারে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে খ্যাক খ্যাক করে হাসছে।

বারম্যান হিলারীকে ঢুকতে দেখে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'গুড মর্নিং।'

'একবোতল হুইস্কি আর একজোড়া হ্যাম স্যান্ডউইচ।'

সাথে সাথে ঘাড় ফিরিয়ে হিলারীর দিকে তাকাল নাবিকরা! তাদের চেহারায় ঃসা আর শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠল। হ্যাম স্যান্ডউইচ অত্যন্ত দামী খাবার, আর গোটা এক বোতল হুইস্কির অর্ডার সহজে কেউ দেয় না, বিশেষ করে তার সাথে ়ার কেউ যদি না থাকে। পাশে দাঁড়ানো নাবিক ওর দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল। সেটা ধরল হিলারী, জানতে চাইল, 'তোমরা বুঝি এই মাত্র বন্দরে ভিড়লে?'

'হ্যাঁ। ইমপেরিয়াল।'

'ভয়েজার। বেটি আমাকে ফেলে রেখে চলে গেছে।'

'কেন, কেন?'

'আর বোলো না! পড়ে গিয়ে চোট পেয়েছিলাম হাতে।'

'তাতে কি?' নিঃশব্দে হাসল সুইডিশ নাবিক। 'মদ খাবার জন্যে একটা হাতই যথেষ্ট।'

'বাহ্, তুমি তো দেখছি মজার লোক, ভাই। তোমাকে তাহলে এক গ্লাস খাওয়াতে হয় আমার। বলো, কি খেতে চাও?'

সেই যে শুরু, দু'দিন পর দেখা গেল, দলটা তখনও মদ খেয়ে চলেছে। ইতোমধ্যে অবশ্য দলের লোক বদল হয়েছে, কেউ ডিউটিতে ফিরে গেছে, কেউ ডিউটি থেকে এসে দলে যোগ দিয়েছে। রাত চারটের পর থেকে সকালের দিকে আবার পাব না খোলা পর্যন্ত বিরতিও পেয়েছে ওরা, কারণ বন্দর এলাকায় ওই সময় মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও এক ফোঁটা মদ পাবার উপায় নেই।

নাবিকরা কি রকম মদ খেতে পারে সেটা একরকম ভুলেই গিয়েছিল হিলারী। নেশা আর আচ্ছন্নভাব তাকে একেবারে পেয়ে বসল। যদিও মুহূর্তের জন্যেও দায়িত্বের কথা নিজেকে ভুলতে দেয়নি সে। অন্তত একটি ব্যাপারে তার খুশি হবার কারণ ঘটল। এমন কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো না যাতে বেশ্যা পাড়ায় যেতে বাধ্য হয় সে। সুইডিশরা মেয়ে-পাগল বটে, কিন্তু আজেবাজে মেয়েলোকের ওপর তাদের কোন মোহ নেই। হিলারী তার স্ত্রীকে কোন ভাবেই বোঝাতে পারত না যে মাতৃভূমির সেবা করতে গিয়ে যৌনরোগ বাধিয়ে বসেছে সে। সুইডিশ নাবিকদের সবচেয়ে বড় নেশা জুয়া। নিজের পকেট থেকে সি.আই.এ.-র পঞ্চাশ পাউন্ড হারল হিলারী। কিন্তু কাজ হয়েছে মেলা। নাবিকদের সাথে এতটাই ভাব জমিয়ে ফেলল সে, তারা ওকে গত রাতে দুটোর দিকে নিজেদের জাহাজে দাওয়াত করে নিয়ে গিয়েছিল। মেস ডেকে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে, সকাল আটটার আগে কেউ তার ঘুম ভাঙায়নি।

আজ রাতে সে-ধরনের কিছু ঘটবে না। সকালে জোয়ার এলেই রওনা দেবে ইমপেরিয়াল, আজ মাঝরাতের আগেই সমস্ত অফিসার আর ক্রুদের জাহাজে ফিরে রিপোর্ট করতে হবে।

এরই মধ্যে এগারোটা দশ হয়ে গেছে। পাবের মালিক ঘুরে ঘুরে গ্লাস আর প্লেট জড় করছে এক জায়গায়। জকির সাথে তাস খেলছে হিলারী। ইমপেরিয়ালের রেডিও অপারেটর সে। নেশায় একেবারে চুর হয়ে আছে। নেশা হিলারীকেও

ধরেছে, কিন্তু যতটা ধরেছে তারচেয়ে বেশি ভান করছে সে। ওদিকে উত্তেজনায় ছটফট করছে মন—সময় নেই, সময় নেই, যা করার দু'চার মিনিটের মধ্যে করতে হবে!

পাবের মালিক বলল, 'এবার তো ভাই তোমাদের উঠতে হয়। ধন্যবাদ. আবার এসো কিন্তু।'

আর সব নাবিকেরা পাব ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে হিলারীও উঠে দাঁড়াল। 'ওহে, জকি, আমার যে পা টলছে!'

হেসে উঠল জকি। 'দূর! তোমার আর কি নেশা হয়েছে! বলে কিনা পা টলছে। আরে, আমি তো দেখতে পাচ্ছি, গোটা দুনিয়া টলমল করছে!' বলে হিলারীর একটা হাত ধরে সে-ও বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

হিলারীর কাঁধে ভর দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল জকি। রাতটা ঠাণ্ডা আর ভেজা ভেজা, গরম বিছানা আর কোমল বউয়ের জন্যে কাঙাল হয়ে উঠতে চায় মন। মাথা থেকে এসব বের করে দিয়ে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল হিলারী, এখন থেকে জকির একেবারে গা ঘেঁষে থাকতে হবে তাকে। আশা করল, কুয়েল ঠিক সময়েই পৌঁছে যাবে। যা পুরানো গাড়ি, সেটা ভেঙে না গিয়ে থাকলেই হয়। যীশু, মনে মনে প্রার্থনা করল সে, আর যাই ঘটুক, জকি যেন মারা না যায়।

কথা বলতে শুরু করল হিলারী। জকির বাড়ি এবং পরিবার সম্পর্কে জানতে চাইল। নাবিকদের দলটাকে ওদের সামনে বেশ কয়েক গজ এগিয়ে থাকতে দিল সে।

সোনালি চুলের একটা মেয়েকে পাশ কাটাল ওরা। বাঁ স্তন স্পর্শ করে ওদেরকে বলল সে, 'ওহে, চলবে নাকি?'

মর মাগী! হিলারীর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল মেয়েটার ওপর। এক হাত দিয়ে জকিকে আরও ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল সে। এখন যদি মেয়েটার সাথে গল্প জুড়ে দেয় জকি, তাহলেই সর্বনাশ। সময় হয়ে এসেছে। কুয়েল, কোথায় তুমি?

ওই যে! গাঢ় নীল রঙের ফোর্ড টু থাউজ্যান্ড, আলো নিভিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হিলারী চোখ ফিরিয়ে নেবার আগেই গাড়ির ভেতর দু'বার জ্বলে নিভে গেল আলোটা। হুইলে বসা লোকটাকে দেখতে পেল সে। কুয়েলই। পকেট থেকে চ্যাপ্টা সাদা রঙের একটা ক্যাপ বের করে মাথায় বসিয়ে নিল হিলারী। এটা একটা সিগন্যাল, কুয়েল এখন তার কাজ শুরু করতে পারে।

নাবিকের দলটা পাশ কাটিয়ে গেল গাড়িটাকে। এক সেকেন্ড পর স্টার্ট নিল ফোর্ড, ছোট একটা ইউ-টার্ন নিয়ে উল্টোদিকে ছুটতে শুরু করল। নাবিকদের ছাড়িয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে।

আর কতক্ষণই বা লাগবে!

'জানো, আমার একজন প্রেমিকা আছে,' বলল জকি।

জকির জন্যে দুঃখে বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল হিলারীর। মনে মনে বলল, থাক ভাই, এসব কথা থাক!

খিক খিক করে হাসল জকি। 'কি আর বলব তোমাকে, শালী বড় খাসা মাল।'

'বিয়ে করার ইচ্ছে আছে?' তীক্ষ্ণ চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে হিলারী। কান খাড়া। কথা বলছে শুধু জকিকে নিজের পাশে রাখার জন্যে।

'বিয়ে? কেন, বিয়ে করব কেন?'

'মেয়েটা বিশ্বাসী?'

'হলে নিজেরই ভাল করবে, তা না হলে আমি ওর গলায় ছুরি চালাব।'

'কিন্তু আমার ধারণা ছিল, সুইডিশরা ফ্রী লাভে বিশ্বাস করে।' মাথায় যা আসছে বলে যাচ্ছে হিলারী।

'ফ্রী লাভ, হ্যাঁ, তা বটে। কিন্তু ও আমাকে কথা দিয়েছে।'

'আচ্ছা।'

'তুমি যদি গল্পটা শুনতে চাও…'

আর সহ্য হয় না, কুয়েল! চলে এসো, চলে এসো…

নাবিকদের একজন নর্দমার সামনে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে শুরু করল। আর তাই নিয়ে বাকি সবাই হাসি-ঠাট্টা জুড়ে দিল। শালা আর পেশাব করার সময় পেলো না, ভাবল হিলারী। অনেক হয়েছে, বন্ধ কর এবার। শালা যেন একেবারে হোস পাইপ ছেড়ে দিয়েছে!

একসময় শেষ করল লোকটা, তাকে নিয়ে আবার হাঁটা ধরল নাবিকের দল। নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল হিলারী…গাড়ির আওয়াজ।

'কি হলো?' জানতে চাইল জকি।

'কিছু না,' দ্রুত বলল হিলারী। জোড়া হেডলাইট দেখতে পেল সে। মাঝ রাস্তা ধরে আসছে গাড়িটা। নাবিকের দল রাস্তার একধারে সরে এসে পথ করে দিল সেটাকে। ব্যাপার কি? ঘাবড়ে গেল হিলারী। এমন তো কথা ছিল না! খরগোশের মত আসছে, এতে কাজ হবে না। হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে পড়ল সে, পরমুহূর্তে গাড়িটাকে একটা লাইটপোস্টের নিচে দিয়ে আসতে দেখে নিজের ভুল বুঝতে পারল; এ-গাড়ি সে-গাড়ি নয়। এটা প্যাট্রল পুলিসের বাহন, অলস ভঙ্গিতে ওদেরকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

রাস্তার মাথা বিশাল একটা চৌরাস্তার মুখে গিয়ে পড়েছে। ওরা এই ক'জন নাবিক আর ক্রু ছাড়া চারদিক ফাঁকা আর নির্জন। চৌরাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়ে রাস্তা পেরোতে শুরু করল নাবিকের দলটা।

এখনই সময়! এসো, কুয়েল, এসো!

বিশাল চৌরাস্তার ঠিক মাঝখানে চলে এসেছে ওরা।

এসো!

একটা সাইড রোড থেকে খেপা ষাঁড়ের মত লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল গাড়িটা। চাকার সাথে কংক্রিটের ঘষা লেগে তীক্ষ্ণ আওয়াজ উঠল। চোখের পলকে গাড়ি সিধে করে নিল ড্রাইভার, তারপর ঝড় তুলে ছুটে এল ওদের দিকে। হেডলাইটের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল ওদের, কিন্তু ফোর্ডটাকে চিনতে কোন অসুবিধে হলো না হিলারীর। জকির কাঁধ আরও জোরে খামচে ধরল সে, ছুটে যেন পালিয়ে যেতে না পারে। মাঝরাস্তা ধরে এঁকেবেঁকে ছুটে আসছে গাড়ি।

'সাবধান,' বলল জকি। 'ড্রাইভার শালা মাতাল…'

গাড়িটাকে দেখে হৈ-চৈ থেমে গেছে নাবিকদের। রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছে সবাই। পরমুহূর্তে উন্মাদের মত যে যেদিকে পারল ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল।

ছড়িয়ে পড়া নাবিকদের এড়াবার জন্যে পেভমেন্টের একেবারে গা ঘেঁষে ছুটে এল ফোর্ড। দাঁড়িয়ে পড়েছে জকি আর হিলারী। হিলারী টের পেল, জকির পেশীতে ঢিল পড়ল। পরমুহূর্তে ঘুরে গেল গাড়ির নাক। সোজা ওদের দিকে ছুটে এল সেটা।

'সাবধান, জকি!' চিৎকার করে বলল হিলারী, সবাই যাতে শুনতে পায়।

গাড়িটা যখন ওদের ওপর চড়াও হতে যাচ্ছে, হ্যাঁচকা একটা টান দিয়ে জকিকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করল হিলারী। আসলে জকিকে তাল হারিয়ে ফেলতে সাহায্য করল সে, তারপরই লাফ দিয়ে তফাতে গিয়ে পড়ল নিজে। ইস্পাতের সাথে হাড় মাংসের সংঘর্ষ—স্থূল, ভোঁতা শোনাল কানে। সবাই মিলে আর্তনাদ করে উঠল, কাঁচ ভাঙার আওয়াজটা তেমন শোনা গেল না। গাড়িটা ছুটেই চলেছে।

কাজ হাসিল হয়েছে, ভাবল হিলারী। চেহারায় হতভম্ব ভাব নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে। জকির খোঁজে এদিক ওদিক তাকাল। কয়েক ফিট দূরে হাত ছড়িয়ে রাস্তার ওপর পড়ে রয়েছে জকি। লাইটপোস্টের আলোয় চিকচিক করছে রক্ত। কাতর একটা দুর্বোধ্য আওয়াজ বেরিয়ে এল তার গলা থেকে।

যীশুকে ধন্যবাদ, বেঁচে আছে!

খানিকদূর এগিয়ে ব্রেক করল গাড়ির ড্রাইভার। দরজা খুলে মাথা বের করে পিছন দিকে তাকাল। মনে হলো, নিচে নামবে। কিন্তু তারপর কি মনে করে মাথা ভেতরে টেনে নিয়ে আবার ছেড়ে দিল গাড়ি। দ্রুত অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা।

এগিয়ে গিয়ে জকির সামনে দাঁড়াল হিলারী। তারপর হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল তার পাশে। ওদেরকে ঘিরে দাঁড়াল নাবিকের দল। সুইডিশ ভাষায় কথা বলছে সবাই। জকির পায়ে হাত দিল হিলারী, ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল সে।

'ওর পা…বোধহয় ভেঙে গেছে,' বলল হিলারী। তবু ভাল!

চৌরাস্তার চারদিকে কয়েকটা বাড়ির আলো জ্বলে উঠেছে। একজন অফিসারের নির্দেশ পেয়ে ছুটল একজন ক্রু, আশপাশের কোন বাড়ি থেকে অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করবে। আরেকজনকে পাঠানো হলো ইমপেরিয়ালে।

জকির পা থেকে রক্ত বেরোচ্ছে, তবে খুব বেশি না। হিলারীর পাশে বসে তার ওপর ঝুঁকে থাকল অফিসার, কাউকে জকির পা ছুঁতে দিতে রাজি নয়।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেল অ্যাম্বুলেন্স, কিন্তু হিলারীর মনে হলো অ্যাক্সিডেন্টের পর কয়েক যুগ পেরিয়ে গেছে। তার স্পাই জীবনে কখনও মানুষ খুন করেনি সে, করতেও চায় না।

ধরাধরি করে স্ট্রেচারে তোলা হলো জকিকে। অ্যাম্বুলেন্সে উঠে বাইরে মাথা বের করে দিল অফিসার, হিলারীকে বলল, 'তুমিও এসো।'

'ঠিক আছে।'

'তোমার জন্যেই বেঁচে গেছে ও।'

'কি জানি।'

অ্যাম্বুলেন্সে উঠে অফিসারের পাশে বসল হিলারী। ভিজে রাস্তা ধরে ছুটে চলল অ্যাম্বুলেন্স. ছাদের ফ্ল্যাশিং লাইটটা দু'পাশের বাড়ির দেয়ালে নীল আভা ফেলল। উরুর ওপর হাত দুটো ফেলে চুপচাপ বসে আছে হিলারী. জকি বা অফিসার কারও দিকেই তাকাতে পারছে না। এর আগে দেশ আর বসের জন্যে অনেক খারাপ কাজ করেছে সে—টেরোরিস্টদের শিখিয়েছে কিভাবে বোমা বানাতে হয়, আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে প্রেমিক-প্রেমিকাদের আলাপ টেপ করেছে. পরে যাতে ওদেরকে ব্ল্যাকমেইল করা যায়; রাস্তা থেকে লোককে ধরে নিয়ে গেছে. অন্য লোকেরা পরে তার ওপর টরচার করেছে, কিন্তু তার নিজের ষড়যন্ত্রে আহত কোন লোকের সাথে অ্যাম্বুলেন্সে চড়তে বাধ্য হতে হয়নি কখনও।

হাসপাতালে পৌঁছল ওরা। স্ট্রেচারটা ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো। অফিসারকে নিয়ে ওয়েটিং রূমে অপেক্ষা করতে লাগল হিলারী। দুশ্চিন্তায় কাহিল হওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই এখন। দেয়াল ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে আশ্চর্য হয়ে গেল সে। ঘড়ির কাঁটা এখনও মাঝ রাত পেরোয়নি। অথচ মনে হলো, পাব থেকে বেরোবার পর কত যুগ যেন পেরিয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ডাক্তারের দেখা মিলল। 'পা ভেঙেছে, খানিকটা রক্তও ঝরেছে, তাছাড়া সব ঠিকই আছে,' বলল সে। ভীষণ ক্লান্ত দেখাল তাকে। 'পেট ভরা মদ, সেজন্যে একটু অসুবিধেই হবে। তবে বয়স কম, স্বাস্থ্যটা ভাল। জায়গামত হাড় বসিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয়া হচ্ছে, হপ্তা কয়েকের মধ্যে আবার হাঁটতে পারবে।'

স্বস্তির পরশ অনুভব করল হিলারী। বুঝল শরীরটা কাঁপছে তার।

'কিন্তু আমাদের জাহাজ কাল সকালে নোঙর তুলবে, ডাক্তার,' বলল অফিসার।

'ওকে ফেলে রেখে যেতে হবে,' বলল ডাক্তার। 'আপনাদের ক্যাপ্টেন কি আসছেন?'

'লোক পাঠিয়েছি।'

'ঠিক আছে,' বলে ওয়েটিং রূম থেকে বেরিয়ে গেল ডাক্তার।

পুলিস আর ক্যাপ্টেন প্রায় একই সময়ে পৌঁছল। ক্যাপ্টেন সুইডিশ ভাষায় তার অফিসারের সাথে কথা বলতে শুরু করল, এদিকে হিলারীর কাছ থেকে জবানবন্দী নিল পুলিস। পুলিস সার্জেন্ট ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক প্রশ্ন করল বটে, কিন্তু গাড়িটার স্পষ্ট কোন বর্ণনা হিলারীর কাছ থেকে আদায় করতে পারল না সে।

খানিক পর ইমপেরিয়ালের ক্যাপ্টেন কথা বলল হিলারীর সাথে। 'শুনলাম, তুমি না থাকলে জকি আরও মারাত্মক ভাবে আহত হত।'

এই একই কথা শুনতে আর ভাল লাগছে না হিলারীর। বলল, 'টেনে সরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পড়ে গেল ও। খুব বেশি মদ খেয়েছিল…'

'আমার অফিসার বলছে, তুমি নাকি লম্বা ছুটিতে আছ?'

'ইয়েস, স্যার।'

'তুমি কি একজন কোয়ালিফায়েড রেডিও অপারেটর?'

'ইয়েস, স্যার।'

'বেচারা জকির জায়গায় আমার একজন লোক চাই। সকালে আমাদের সাথে তুমি যাবে নাকি?'

দুই

'তোমাকে আমি সরিয়ে নিচ্ছি, রানা।'

ঠাণ্ডা চোখে লে. জেনারেল আলি কারামের দিকে তাকাল রানা।

'আমি চাই,' আবার বললেন মিশরীয় সিক্রেট সার্ভিসের চীফ, 'আমার সাথে কায়রোয় ফিরে যাবে তুমি, অপারেশনটা আমাদের হেডকোয়ার্টারে বসে পরিচালনা করবে।'

'আপনি বরং আরও একবার ভেবে দেখুন।'

জুরিখ লেকের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। ছোট বড় হাজার রকম বোটে গিজ গিজ করছে লেক। সুইস রোদে ঝলমল করছে বহুরঙা পালগুলো। টানা বাতাসে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে রানার চুল।

'আমার আর কিছু ভেবে দেখার নেই, রানা,' আলি কারাম বললেন।

'আমারও আর কিছু বলার নেই, মিস্টার কারাম,' বলল রানা। 'আমি সরছি না।'

রানার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর আলি কারাম গম্ভীর সুরে জানালেন, 'আমি তোমাকে অর্ডার করছি!'

এক চিলতে হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটের কোণে। 'সেটা শুধু মেজর জেনারেল রাহাত খানই পারেন।'

'শোনো,' গভীর একটা শ্বাস টানলেন আলি কারাম। 'তোমার প্ল্যানে ত্রুটি দেখা দিয়েছে, রানা—শত্রুরা জানে, তুমি আমাদের হয়ে একটা কাজ করে দিচ্ছ। কি করতে যাচ্ছ, সম্ভবত তা-ও জানে। ওরা তোমার পিছনে লেগে আছে, কারণ তোমার কাজে ওরা বাধা দিতে চায়। তোমাকে আমি প্রজেক্ট ড্রপ করতে বলছি না, শুধু অনুরোধ করছি, মুখ লুকাও, গা ঢাকা দাও—ওরা যেন তোমাকে দেখতে না পায়।'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা। 'না,' বলল ও। 'এটা সাদামাঠা একটা প্রজেক্ট নয় যে অফিসে বসে বোতাম টিপলেই সব ঠিকঠাক মত ঘটে যাবে। এর মধ্যে হাজারো জটিলতা আছে, প্রতি মুহূর্তে পরিস্থিতি বদলে যেতে পারে। তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেবার জন্যে মাঠে আমাকে থাকতেই হবে। এবং একা।' কথা শেষ করে ভাবল রানা, কাজটা আমি নিজে একা কেন করতে চাইছি? মিশর আর বাংলাদেশে আমি কি একাই আছি যাকে ছাড়া হবে না এ-কাজ? আমাকে কি খ্যাতির মোহ পেয়ে বসেছে?

মনের চিন্তা-ভাবনা মুখে প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করলেন না আলি কারাম, 'এ তোমার হিরো হবার বায়না, রানা! তোমাকে একেবারেই মানায় না। তুমি একজন

়শন্যাল, নির্দেশ মানাই তোমার কাজ।'

আবার এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা। 'আপনি আমার সাথে ভুল সুরে কথা বলছেন, মিস্টার আলি কারাম।'

'তুমি যদি আমার কথা না শোনো, আমি অভিযোগ করব, রানা!' স্পষ্ট হুমকি দিয়ে বললেন আলি কারাম।

'কার কাছে?' জানতে চাইল রানা।

'তোমার বস্, মেজর জেনারেল রাহাত খানের কাছে।'

'অযৌক্তিক নির্দেশ আমি মানি না, এ-কথা তিনি সবার চেয়ে ভাল জানেন।'

'আমার প্রতিটা কথায় যুক্তি আছে,' জোর দিয়ে বললেন আলি কারাম। 'ঠেকায় পড়ে তোমার সাহায্য চেয়েছি বলে তুমি যা খুশি তাই করে বেড়াবে…'

আপনমনে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আপনি আমাকে থামাতে পারেন। সমর্থন প্রত্যাহার করে নিতে পারেন। কিন্তু সেই সাথে একটা কথা আপনাকে মনে রাখতে হবে, ইউরেনিয়ামও আপনি পাচ্ছেন না। কারণ, কিভাবে ওটা সংগ্রহ করা যাবে তা আমি কাউকে বলব না।'

রানার মুখের কথাই মনের কথা বুঝতে পেরে আগের চেয়ে একটু নরম হলেন আলি কারাম। বললেন, 'এ তোমার অন্যায় জেদ, রানা।'

রানা ভাবল, ভদ্রলোক খেপে উঠছেন না, কারণ বুঝতে পেরেছেন তাতে কোন লাভ হবে না। কিন্তু তারপরই আলি কারাম এমন একটা কথা বলে বসলেন, রীতিমত চমকে উঠল রানা।

মুখে মৃদু, জোর করা হাসি টেনে তিনি বললেন, 'আমার সন্দেহ, তুমি বোধহয় ডাবল এজেন্ট হিসেবে কাজ করছ।'

দম আটকে এল রানার। কেউ যেন পিছন থেকে ওর মাথায় হাতুড়ির ঘা বসিয়ে দিয়েছে। এ-ধরনের কথা ওকে শুনতে হবে, কল্পনাও করেনি কখনও। অকারণ অপরাধবোধে মনটা দমে গেল ওর। লজ্জা বোধ করল ও, কারও প্রিয় কিছু নষ্ট করে ফেললে যেমন হয়ে থাকে। বুঝল, ওর ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে চাইছেন মিশরীয় ইন্টেলিজেন্স চীফ। তার নিজস্ব জগৎ থেকে টেনে বের করে আনতে চাইছেন এষাকে। এখুনি উঠবে এষার প্রসঙ্গ।

'কথাটা আরেকবার বলুন,' ঠাণ্ডা সুরে বলল রানা।

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে আলি কারাম বললেন, 'হেডিংগুলো শোনো শুধু। এক, এষার বাবা ইসরায়েলের একজন অন্ধ সমর্থক। দুই, চমৎকার একটা কাভার তৈরি করে নিয়েছে এষা, সেই কাভার তাকে সারা দুনিয়ায় ঘুরে জিওনিস্ট এজেন্টদের সাথে যোগাযোগের সুযোগ করে দিচ্ছে। তিন, ইসরায়েলী এজেন্ট, লুক্সেমবার্গে তোমাকে যে চিনে ফেলে, সেই ন্যাট কোহেন ওদের পারিবারিক বন্ধু।'

আলি কারামের চোখে চোখ রেখে ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকাল রানা। 'ব্যস?'

'আর কিছুর দরকার আছে কি?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন আলি কারাম। 'ব্যস বলে কি বোঝাতে চাও তুমি? কারও বিরুদ্ধে এর চেয়ে কম এভিডেন্স পেলেও তাকে আমরা গুলি করি।'

'আমরা করি না।'

'এষা তোমার কাছ থেকে কোন ইনফরমেশন পেয়েছে?'

শরীরের পাশে ঝুলে থাকা হাত দুটো শক্ত মুঠো হয়ে গেল রানার। 'আপনি প্রলাপ বকছেন, জেনারেল। আর একটু এগোলেই শ্রদ্ধা হারাবেন আমার।'

'ভুল করেছ, সেজন্যেই রেগে যাচ্ছ তুমি!'

মুখ ফিরিয়ে লেকের দিকে তাকাল রানা। নিজেকে শান্ত রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করল ও। একজন প্রফেশন্যাল এজেন্টের রাগ করা উচিত নয়, তাতে ঘোলা হয়ে যায় বুদ্ধি। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল ও, 'হ্যাঁ, আমার একটা ভুল হয়েছে। এষার কথা আমারই আপনাকে বলা উচিত ছিল, উল্টোটা ঘটা উচিত হয়নি। আপনার কাছে ব্যাপারটা কি রকম মনে হচ্ছে…'

'মনে হচ্ছে? তুমি বলতে চাইছ, এষা একজন এজেন্ট এ তুমি বিশ্বাস করো না?'

'আপনি তেল আবিবকে দিয়ে ব্যাপারটা চেক করিয়েছেন?'

তাচ্ছিল্যের সাথে একটু হাসলেন আলি কারাম। 'তুমি এমন ভাবে কথা বলছ, যেন জিওনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল আমারই ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস।'

'ইসরায়েলী ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসে খুব ভাল একজন ডাবল এজেন্ট আছে আপনার,' বলল রানা।

'খুব ভাল আর হলো কিভাবে? সবাই দেখছি তার কথা জানে!'

'আমার প্রশ্ন এড়িয়ে যাবেন না,' বলল রানা। 'এষার ব্যাপারটা আপনি কি তেল আবিবকে দিয়ে চেক করিয়েছেন?'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন আলি কারাম। 'ঠিক আছে, তাই হবে—তেল আবিবকে দিয়েই চেক করাব। এতে কিছু সময় লাগবে। ইতিমধ্যে তোমার নিজের হাতে লেখা একটা রিপোর্ট চাই আমি, যে প্ল্যানটা তুমি তৈরি করেছ তার বিশদ বিবরণ থাকতে হবে তাতে। সেটা হাতে পেলেই আমি তোমাকে সরিয়ে আর কাউকে এই অপারেশনের দায়িত্ব দিতে পারি।'

আলবার্তো ফেলিনি আর গগলের কথা ভাবল রানা, দু'জনের কেউই ওর ছাড়া আর কারও অনুরোধে একটা আঙুলও নাড়বে না। 'এতে কাজ হবে না, মিস্টার আলি কারাম,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'আপনার ইউরেনিয়াম দরকার, আর সেটা আমিই শুধু আপনাকে নিয়ে এসে দিতে পারি। আর যদি বলেন, না, ইউরেনিয়াম আপনার দরকার নেই, তবু এই অপারেশন থেকে আমি সরে যাচ্ছি না। ইউরেনিয়াম কিভাবে যোগাড় করা সম্ভব, অনেক খেটে-খুটে আমি তার একটা রাস্তা বের করেছি—আপনাদের যদি জিনিসটা না লাগে, আমাদের আরও বন্ধু-দেশ আছে, যাদের লাগবে।'

'কি বললে?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলেন মিশরীয় ইন্টেলিজেন্স চীফ।

'প্রথমবারই আপনি শুনেছেন।'

সম্ভবত প্রচণ্ড রেগে উঠলেন বলেই অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলেন না আলি কারাম। তারপর কঠিন সুরে জানতে চাইলেন, 'কিন্তু যদি তেল আবিব থেকে খবর আসে, এষা ফিলমনটন আসলেই একজন এজেন্ট?'

'আমি জানি তা সে নয়।'

'কিন্তু যদি হয়?'

'আপনি ওকে খুন করবেন, সম্ভবত।'

'না,' আলি কারাম রানার নাকের দিকে মোটা একটা আঙুল তাক করলেন. 'আমি না, রানা। এষা যদি এজেন্ট হয়, তুমি তাকে খুন করবে।'

ইচ্ছে করেই ধীর ভঙ্গিতে আলি কারামের আঙুলটা ধরল রানা, দৃঢ়তার সাথে মুখের সামনে থেকে সেটা সরিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা সুরে বলল. 'হ্যাঁ. মিস্টার আলি কারাম, তাই হবে—আমিই খুন করব তাকে।'

তিন

হিথ্রো এয়ারপোর্টের বারে বসে আরেক প্রস্থ হুইস্কির অর্ডার দিল জ্যাক রিচি, সিদ্ধান্ত নিল, কোহেনের সাথে জুয়াই খেলবে সে। সমস্যাটা এখনও সেই আগের মতই আছে, কোহেনের কাছ থেকে তেল আবিব যা জানবে, ডাবল এজেন্টের মাধ্যমে সেটা পাচার হয়ে যাবে কায়রোয়। এই ভয়েই কোহেনকে সব কথা জানতে দিতে চায়নি রিচি। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি একটু অন্য রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে। যতটুকু জানে কোহেন, তাও কম নয়, এসব কথা কায়রো জানলে ক্ষতি হতে আর কিছু বাকি থাকবে না। পরিস্থিতি যাচাই এবং নতুন নির্দেশ পাবার জন্যে ওরা দু'জনেই যে যার দেশে ফিরে যাচ্ছে, কাজেই সিদ্ধান্তটা এখুনি নিতে হয়। কোহেনকে সব বলবে রিচি, তারপর ওর প্রফেশন্যালিজমের দোহাই দিয়ে তেল আবিবকে খুব কম জানাবার আবেদন করবে। কোহেন হয়তো বুদ্ধি এঁটেছে নিজের বাহাদুরি ফলাবার জন্যে তেল আবিবে গিয়ে গড় গড় করে বলে ফেলবে সব, সেটা বন্ধ করার জন্যে এই ধরনের একটা উদ্যোগ দরকার বলে অনুভব করছে রিচি।

'এটা দেখো,' বলল রিচি, তারপর কোহেনের হাতে একটা ডিকোডেড মেসেজ ধরিয়ে দিল সে।

কাগজের ভাঁজ খুলে মেসেজটা পড়তে শুরু করল কোহেন।

প্রাপক: কর্নেল জ্যাক রিচি

প্রেরক: সি.আই.এ. হেডকোয়ার্টার।

তারিখ: তেসরা সেপ্টেম্বর, উনিশশো আশি

কর্নেল রিচি,

তোমার অনুসন্ধানের উত্তরে আমরা শেষ যে মেসেজটা পাঠিয়েছিলাম তাতে চারটে জাহাজের নাম ছিল, তুমি ওগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চেয়েছ।

মোটর ভেসেল অরিয়ন, আড়াই হাজার টন, রেজিস্ট্রেশন আর মালিকানা ডাচ, সম্প্রতি হাত-বদল হয়েছে। লাইবেরিয়ান কোম্পানী বভাইল শিপিং কর্পোরেশনের তরফ থেকে ভিনসেন্ট গগল নামে একজন

শিপ ব্রোকার পঁয়তাল্লিশ লক্ষ ডি-মার্ক দিয়ে কিনে নিয়েছে ওটা। চলতি বছরের ছয়ই আগস্টে লাইবেরিয়ান কর্পোরেশন সার্ভিসেসের নিউ ইয়র্ক অফিসে নাম রেজিস্ট্রি করে বুভাইল শিপিং, শেয়ার ক্যাপিটাল ধরা হয় পনেরোশো ডলার করে। শেয়ারহোল্ডারদের নাম, সি. লি শিয়াং শাং এবং এড রোজারস। লি শিয়াং শাং একজন লইয়ার, তার অফিসের ঠিকানাই এড রোজারসের ঠিকানা হিসেবে দেখানো হয়েছে। তিনজন ডিরেক্টর হলো—পি. ঠনঠনিয়া, ই. কে, শোবে, জে.ডি, পয়েড। যা নিয়ম; এদেরকে যোগান দিয়েছে লাইবেরিয়ান কর্পোরেশন সার্ভিসেস, এবং কোম্পানী খাড়া হবার পরদিনই তারা পদত্যাগ করে। বুভাইল শিপিঙের প্রেসিডেন্ট এবং চীফ এগজিকিউটিভ হিসেবে দায়িত্ব নেয় ভিনসেন্ট গগল।

বুভাইল শিপিং আরও একটা জাহাজ কিনেছে, তার নাম ওয়াটার হেন, দেড় হাজার টন, দু'লাখ চল্লিশ হাজার পাউন্ড দিয়ে।

নিউ ইয়র্কে আমাদের লোক লি শিয়াং শাঙের সাথে কথা বলেছে। শাং জানিয়েছে এড রোজারস রাস্তা থেকে তার অফিসে উঠে আসে, নিজের কোন ঠিকানা দেয়নি এবং তার ফি নগদ ডলারে মিটিয়ে দেয়। লোকটাকে তার ল্যাটিন আমেরিকান বলে মনে হয়েছে। এড রোজারসের চেহারার বর্ণনা আমাদের এখানে ফাইলে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু তবু তাকে সনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না।

ভিনসেন্ট গগল সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানি বটে, কিন্তু জানলে উপকার হত এমন অনেক কিছুই জানি না। ধনী একজন ব্যবসায়ী সে, কিন্তু কোন্ দেশের নাগরিক জানা সম্ভব হয়নি। জাহাজ কিনে ভেঙে মন দরে বিক্রি করা তার অনেক ব্যবসার একটা। আমাদের ফাইল বলছে, এই লোক মস্তবড় এক চোরাচালানী, আইনকে বুড়ো আঙুল দেখাতে ওস্তাদ। তার কোন ঠিকানা আমাদের কাছে নেই। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ অনেক, কিন্তু বেশিরভাগই অনুমান আর ধারণা ভিত্তিক। আমাদের এখানে কেউ কেউ বিশ্বাস করে, বছর কয়েক আগে মিশরকে একটা কাজে সাহায্য করেছিল সে। তবে জানামতে, রাজনীতির সাথে কোনভাবেই জড়িত নয় সে।

তালিকার বাকি জাহাজগুলো সম্পর্কে তথ্য যোগাড় করছি আমরা।

—সি.আই.এ. হেডকোয়ার্টার।

মেসেজটা রিচিকে দিয়ে কোহেন জানতে চাইল, 'এত খবর ওরা যোগাড় করল কিভাবে?'

কাগজটা ছিঁড়ে টুকরো করল রিচি। 'এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। অরিয়ন বিক্রি হয়েছে এ খবর লন্ডনের লয়েড'সকে জানাতেই হয়, সেখান থেকে আমরা জেনেছি। লাইবেরিয়ায় আমাদের কনস্যুলেটের লোক মনরোভায়ার পাবলিক রেকর্ডস থেকে বুভাইল শিপিং সম্পর্কে সব জানতে পেরেছে। আমাদের নিউ ইয়র্ক

এজেন্ট ফোন গাইড থেকে লি শিয়াং শাঙের ঠিকানা পেয়েছে। আর গগলের ফাইল সি.আই.এ-র কাছে আগে থেকেই ছিল। আসল কথা হলো কোথায় গিয়ে খোঁজ করতে হবে সেটা জানা। সি.আই.এ-র ডেস্ক কর্মীরা এসব ব্যাপারে ওস্তাদ। ওদেরকে তো আর কিছু করতে হয় না।'

'বুঝলাম।'

কাঁচের বড় ছাইদানীতে কাগজের টুকরোগুলো ফেলে আগুন ধরিয়ে দিল রিচি। 'তোমাদের হেড অফিসেও এই রকম ডেস্ক কর্মী থাকা দরকার।'

'যতদূর জানি সে ধরনের কোন পরিকল্পনা আপাতত নেই।'

'সাজেশনটা তুমি দিয়ে দেখো না, মেনে নিতে পারে,' বলল রিচি। 'কে জানে, হয়তো তোমাকেই ব্যবস্থা করার দায়িত্ব দেয়া হবে।'

মাথা ঝাঁকাল কোহেন। 'মন্দ বলোনি, একটা খোঁচা দিয়ে দেখা যেতে পারে।'

নতুন করে আরেক প্রস্থ হুইস্কি এল। সৎ পরামর্শ শুনে কোহেন খুশি হয়ে উঠেছে লক্ষ্য করে সন্তোষ বোধ করল রিচি। ছাইদানীর ছাই পরীক্ষা করল সে, কাগজের প্রতিটি টুকরো পুড়েছে।

'তোমার ধারণা,' জানতে চাইল কোহেন, 'বুভাইল শিপিঙের পেছনে আসলে রানা রয়েছে?'

'হ্যাঁ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওই এড রোজারস রানা ছাড়া আর কেউ নয়।'

'তাহলে অরিয়নের ব্যাপারে কি করতে পারি আমরা?'

'আমার বিশ্বাস,' গ্লাস খালি করে সেটা টেবিলে নামিয়ে রাখল রিচি, 'সিসটার-শিপ ইমপেরিয়ালের নিখুঁত লে-আউট পাবার জন্যেই অরিয়নকে দরকার হয়েছে রানার।'

'একটা ব্লুপ্রিন্টের জন্যে এত টাকা খরচ করবে?'

'জাহাজটা আবার বিক্রি করে দিলেই তো সব টাকা উঠে আসবে। তবে, অরিয়নকে অন্য কাজে লাগাবার কথাও ভেবে থাকতে পারে রানা।'

'যেমন?'

'হয়তো ইমপেরিয়ালকে হাইজ্যাক করার জন্য অরিয়নকে ব্যবহার করবে সে। কিন্তু কিভাবে, এখনও সেটা আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'ইমপেরিয়ালে যেমন হিলারীকে তোলা হয়েছে, সেই রকম অরিয়নেও কাউকে তুলতে চাও নাকি?'

'লাভ নেই। পুরানো ক্রুদের বাদ দিয়ে মিশরীয় ক্রু নেবে রানা। চিন্তা-ভাবনা করে নতুন কৌশল খাটাতে হবে।'

'অরিয়ন এখন কোথায় আমরা জানি?'

'জানতে চেয়ে মেসেজ পাঠিয়েছি, ওয়াশিংটনে পৌঁছে উত্তর পেয়ে যাব।'

স্পীকারে কোহেনের ফ্লাইট ঘোষণা করা হলো, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'আবার তাহলে লুক্সেমবার্গে দেখা হচ্ছে আমাদের?'

'সেটা এখুনি ঠিক বলতে পারছি না। তোমাকে আমি জানাব। একটু বসো, তোমার সাথে জরুরী একটা কথা আছে আমার।'

বসল কোহেন।

ভূমিকা না করে শুরুতেই মাফ চেয়ে নিল রিচি। 'প্রথমদিকে তোমার সাথে ভাল আচরণ করিনি. সেজন্যে আমাকে ক্ষমা করো. কোহেন। কিন্তু তবু বলব. আমার ওই আচরণের একটা কারণ ছিল। তুমি বুদ্ধিমান. নিশ্চয়ই বুঝতে পারো. তেল আবিব নিরাপদ নয়। ওখানে একজন ডাবল এজেন্ট না থেকেই পারে না। আমার ভয় ছিল—এখনও আছে. তুমি যা রিপোর্ট করবে. তেল আবিব থেকে সেটা নির্ঘাত কায়রোয় পৌঁছে যাবে। তার মানে, আমরা কতদূর এগিয়েছি বা কি করতে যাচ্ছি সব জানতে পারবে রানা। ফলে নিজের পরিকল্পনা বদলাবে ও, অর্থাৎ আমরা আবার সেই আগের তিমিরে গিয়ে পড়ব।'

'এতদিনে তুমি মন খুলে কথা বলছ, সেজন্যে ভাল লাগছে।'

'এই অপারেশন সম্পর্কে সবই এখন জানো তুমি.' বলল রিচি। 'সেগুলো যাতে কায়রোয় পৌঁছে না যায় তার একটা ব্যবস্থা করা দরকার বলে আমি মনে করি, তুমি কি বলো?'

'এ-ব্যাপারে তোমার কোন পরামর্শ আছে?' জানতে চাইল কোহেন।

খানিক চিন্তা করার ভান করে রিচি বলল, 'আমরা যা জানতে পেরেছি সেগুলো তুমি তেল আবিবকে রিপোর্ট করতে পারো, কিন্তু সমস্ত খুঁটিনাটি ওদেরকে না জানালেই হয়। পরিষ্কার করে কিছু না বলে সব ব্যাপারেই অস্পষ্ট একটা ধারণা দিতে পারো। নাম, জায়গা, সময় এসব কিছুই জানাবে না। যদি চাপ দেয়া হয়, আমার ঘাড়ে দোষ চাপাবে, বলবে, জ্যাক রিচি এসব ব্যাপার আমার কাছে গোপন করে গেছে। যার কাছে রিপোর্ট করতে হবে তার সাথে ছাড়া এসব বিষয়ে আর কারও সাথে কোন আলাপ করবে না। বুভাইল শিপিং, অরিয়ন আর ইমপেরিয়াল, বিশেষ করে এই তিনটে বিষয়ে কারও কাছেই মুখ খুলবে না তুমি। ইমপেরিয়ালে হিলারী আছে, এটা মন থেকে স্রেফ মুছে ফেলার চেষ্টা করো।'

উদ্বিগ্ন দেখাল কোহেনকে। 'তাহলে বলার আর থাকল কি?'

'অনেক। রানা, ইউরাটম, ইউরেনিয়াম, আলি কারামের সাথে রানার দেখা…এর অর্ধেকও যদি বলো, তেল আবিবে হিরো বনে যাবে তুমি।'

কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারল না কোহেন। 'আমিও খোলা মন নিয়ে বলছি। তোমার কথা শুনলে, আমার রিপোর্ট তোমারটার মত গুরুত্বপূর্ণ হবে না।'

চেহারায় আবেদনমাখা হাসি ফুটিয়ে জানতে চাইল রিচি, 'সেটা কি অন্যায় হবে?'

'না,' ম্লান মুখে বলল কোহেন, 'বেশিরভাগ কৃতিত্ব তোমারই পাওনা।'

'তাছাড়া, দু'জনের রিপোর্ট যে দু'রকম সেটা শুধু তুমি আর আমি জানব। আর, শেষবেলায় সমস্ত কৃতিত্ব তোমার হবে। ভদ্রলোকের জবান, কৃতিত্বের এক কণাও দাবি করব না আমি।'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হলো কোহেন। 'সব ব্যাপারে ওদেরকে আমি ভাসা ভাসা ধারণা দেব।'

'গুড,' বলে হাতছানি দিয়ে ওয়েটারকে ডাকল রিচি। 'আর একবার গলা ভেজাবার সময় আছে তোমার হাতে।' চেয়ারে হেলান দিল সে, পায়ের ওপর পা তলল। ভারি সন্তুষ্ট বোধ করছে সে। বিশ্বাস, কোহেন তার কথার খেলাপ করবে

না। 'হোম, সুইট হোম! বুঝলে, বাড়ির কথা মনে পড়তে ভীষণ খুশি লাগছে আমার!'

'বাড়ি ফিরে কি করবে ভেবেছ কিছু?'

'বউকে নিয়ে মিয়ামী বীচে চলে যাব. ওখানে ছোট একটা বাড়ি আছে আমাদের। তুমি?'

'আমার কপালে অত সুখ নেই, রিচি,' ম্লান হেসে বলল কোহেন। 'সময়টা আমাকে নোংরা গ্রামের বাড়িতেই কাটাতে হবে।'

কেন যেন রিচির ধারণা হলো, কোহেন মিথ্যে বলছে।

র্মানী যুদ্ধে হেরে যাওয়ায় ফ্রাঞ্জ আলব্রেখট মুলারের জীবন একেবারে ধ্বংস হয়ে .গল। ত্রিশ বছর বয়সে জার্মান সেনাবাহিনীর একজন ক্যারিয়ার অফিসার ছিল, তারপর হঠাৎ করেই কপর্দকহীন, ঘর-ছাড়া, বেকার হয়ে পড়ল সে। তাই বলে হতাশায় ভেঙে পড়ল না মুলার। লক্ষ লক্ষ জার্মানের মত সে-ও একেবারে প্রথম থেকে শুরু করল আবার।

একটা ফ্রেঞ্চ ডাই ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীতে সেলসম্যান হিসেবে বহাল হলো মুলার—অল্প কমিশন, বেতন নেই। উনিশশো ছেচল্লিশ সালে ক্রেতার সংখ্যা ছিল খুবই কম, কিন্তু উনিশশো একান্ন সালের মধ্যে জার্মান ইন্ডাস্ট্রি নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করল এবং চারদিকে যখন উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা যেতে লাগল মুলার ততদিনে সুযোগ নেবার মত অবস্থায় পৌঁছে গেছে। বিজবাদেনে একটা অফিস নিল সে, জায়গাটা রাইন নদীর ডান পাড়ে, সাথেই একটা রেল জাংশন, অদূর ভবিষ্যতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকা হিসেবে গণ্য হবার প্রচুর সম্ভাবনা। ধীরে ধীরে তার উৎপাদনের তালিকা লম্বা হতে লাগল, শুধু তাই নয়, এখন সে সাবানও তৈরি করে। এই করতে করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেসগুলোয় ঢুকে পড়ল মুলার, হেরে যাওয়া জার্মানীর ওই সব এলাকায় তখনও মার্কিন প্রশাসন চালু রয়েছে। সুযোগ তৈরি করার কৌশল জীবনের কঠিন দিনগুলোয় শিখেছিল মুলার। মার্কিন সেনাবাহিনীর একজন প্রকিওরমেন্ট অফিসার যদি পাইন্ট সাইজ বোতলে ডিজ-ইনফেকট্যান্ট চায়, মুলার ডিজ-ইনফেকট্যান্টের দশ গ্যালনী কিছু ড্রাম কিনে ভাড়া করা একটা গোলাবাড়িতে নিয়ে যায়, সেখানে বসে সেকেন্ডহ্যান্ড বোতলে ওগুলো ভরে গায়ে লেবেল সাঁটে—'এফ. এ. মুলার'স স্পেশাল ডিজ-ইনফেকট্যান্ট'। আর্মির চাহিদা পূরণ করে চারগুণ লাভ করে সে। এইভাবে তার ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল।

ষাট সালের দিকে একদিন একটা বই পড়ল মুলার। বইটা কেমিক্যাল ওয়রফেয়ার সম্পর্কে লেখা। বইটা শেষ করে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত দেখতে পেল সে। বড় ধরনের ডিফেন্স কন্ট্রাক্ট পাবার জন্যে চেষ্টা-তদ্বির শুরু করল। লেগে থাকলে যে-কোন কাজই হয়, মুলারেরও হলো। বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল উইপন নিউট্রালাইজ করার জন্যে হরেক রকম জটিল সলিউশন দরকার হয়, টেন্ডার জিতে সেগুলো আর্মিকে যোগান দেয়ার মস্ত কাজটা পেয়ে গেল সে।

মুলার এখন একজন মিলিটারি সাপ্লায়ার। ব্যবসাটা বড়, অথচ নিরাপদ, লাভও

মেলা। ভাড়া করা গোলাবাড়িটা কিনে নিল সে, দশতলার ভিত দিয়ে চারতলা তৈরিও করে ফেলল। যুদ্ধের সময় প্রথম স্ত্রী মারা গিয়েছিল, আবার বিয়ে করল সে। বছর ঘুরতে না ঘুরতে ছেলেরও মুখ দেখল। কিন্তু সুযোগ তৈরি করার লোভ এবং আরও বড় হবার বাসনা তাকে ছাড়ল না। আর তাই যেই তার কানে এল ইউরেনিয়ামের ছোটখাট একটা পাহাড় সস্তায় বিক্রি হবে, সাথে সাথে লাভের গন্ধ পেল মুলার।

ইউরেনিয়ামের মালিক একটা বেলজিয়ান কোম্পানী, নাম সোসাইটি জেনারেল দ্য লা চিমি। চিমি সেই সব কোম্পানীর একটা, যারা বেলজিয়ামের আফ্রিকান কলোনি বেলজিয়ান কঙ্গোয় ব্যবসা করে। খনিজ সম্পদে দেশটা ঠাসা, সেটাই এর কারণ। উনিশশো ষাট সালে বিদেশী কোম্পানীগুলো যখন পাততাড়ি গুটিয়ে দলে দলে বেলজিয়ান কঙ্গো থেকে বেরিয়ে আসছে, চিমি কিন্তু তাদের দলে যোগ দিল না। কিন্তু চিমি এ-ও জানত, যারা থেকে যাবে তাদেরকে শেষ পর্যন্ত লাথি মেরে তাড়ানো হবে, আর তাই দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবার আগেই যতটা সম্ভব কাঁচামাল সরিয়ে ফেলার জন্যে নিজেদের সমস্ত ক্ষমতা কাজে লাগাল তারা। ষাট থেকে পঁয়ষট্টি সালের মধ্যে ইউরেনিয়ামের বিরাট একটা অংশ ডাচ বর্ডারের কাছে নিজেদের মেটাল রিফাইন্যারীতে সরিয়ে ফেলা হলো। চিমির দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, ইতোমধ্যে পরীক্ষামূলক আণবিক বিস্ফোরণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। অবশেষে চরম বিপর্যয়টাও ঘটে গেল, বেলজিয়ান কঙ্গো থেকে তাড়িয়ে দেয়া হলো চিমিকে। এই অবস্থায় ইউরেনিয়ামের ক্রেতা পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠল। অগত্যা সাইলো গুদামে পড়ে থাকল জিনিসটা, সেই সাথে আটকা পড়ে গেল মোটা অঙ্কের একটা পুঁজি।

ডাই তৈরির কাজে খুব বেশি ইউরেনিয়াম ব্যবহার করে না মুলার, কিন্তু এ-ধরনের জুয়া খেলা তার খুব পছন্দ। প্রস্তাবের মধ্যে অতিরিক্ত কিছু সুবিধের কথাও বলা ছিল—দামটা নেহাতই কম, কেনার পরও যতদিন খুশি চিমির সাইলো গুদামে ফেলে রাখা যাবে। মুলারের ইচ্ছেও তাই। ইউরেনিয়ামের বাজারে আবার একদিন তেজি ভাব আসবেই, জিনিসটা রিফাইন করে তখন মোটা লাভে বিক্রি করা যাবে। কাজেই ইউরেনিয়াম কিনল সে।

তারপর থেকে জিনিসটা চিমির সাইলোতেই পড়ে ছিল। অনেকগুলো বছর কেটে গেছে, জিনিসটার কথা এক রকম ভুলেই গিয়েছিল মুলার। তারপর আবার যখন মনে পড়ল, ভাবল, ইউরেনিয়ামটা আঞ্জেলুজি ই বিয়ানকোয় পাঠিয়ে দিয়ে রিফাইন করে রাখলে মন্দ হয় না।

মুলারকে দেখেই পছন্দ হয়ে গেল রানার। উনসত্তর বছর বয়সেও শক্ত সমর্থ, সরল হাসিটি লেগেই আছে মুখে, সাদা হয়ে গেলেও মাথায় এখনও সব ক'টা চুল জড় গেড়ে আছে। এক শনিবার সকালে দেখা হলো ওদের। রঙিন একটা স্পোর্টস জ্যাকেট পরেছে মুলার, ট্রাউজার পরেছে নাভীর নিচে। মার্কিন ধাঁচে ইংরেজী বলে, বলেও চমৎকার।

বিজবাদেনের একটা হোটেল থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়ে ফোন করে রানা। এর আগে মিশরীয় দূতাবাস থেকে মুলারকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে, মিস্টার

মাসুদ রানা নামে একজন সিনিয়র আর্মি প্রকিওরমেন্ট অফিসার বিরাট লম্বা শপিং লিস্ট নিয়ে হাজির হতে যাচ্ছে।

ফোনে রানাকে জানানো হয়, শনিবার সকালে মুলার ওকে নিয়ে ফ্যাক্টরি দেখাতে বেরোবে, ছুটির দিন বলে ফ্যাক্টরি সেদিন ফাঁকা থাকবে, ফিরে এসে মুলারের বাড়িতে লাঞ্চ খাবে ওরা।

ফ্যাক্টরি থেকে নিরাশ হবারই কথা। জার্মান নৈপুণ্যের ছিটেফোঁটাও নেই কোথাও। লম্বা লম্বা চালা ঘর আর মস্ত আকারের উঠান, দেখার মত আর কিছুই নেই। জায়গাটা নোংরা করে রাখা হয়েছে। রাত জেগে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিঙের ওপর লেখা একটা টেক্সটবুক আগেই পড়ে নিয়েছে রানা। কোয়ালিটি কন্ট্রোল, মেটিরিয়াল হ্যান্ডলিং আর প্যাকেজিং সম্পর্কে চমকে দেয়ার মত কিছু প্রশ্ন করবার যোগ্যতা অর্জন করেছে সে। কোথাও যদি ভুল-ভাল হয়ে যায় সেটা ভাষার অসুবিধেজনিত কারণে ঘটেছে বলে চালিয়ে দেয়া যাবে।

কিন্তু পরিস্থিতিটা যে একটু অদ্ভুত তাতে কোন সন্দেহ নেই। ক্রেতার ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে ওকে, কিন্তু সন্দিহান ভাবটা বজায় রাখতে হবে সারাক্ষণ, হঠাৎ করে কোন প্রতিশ্রুতিও দেয়া চলবে না। আর মুলার তাকে এটা সাধবে ওটা সাধবে, নানাভাবে পটাবার চেষ্টা করবে। রানার আসল উদ্দেশ্য, লোভ দেখিয়ে জার্মান ব্যবসায়ীর সাথে এমন একটা সম্পর্ক তৈরি করা, কোনভাবেই যেন সেই সম্পর্ক নষ্ট করতে রাজি না হয় লোকটা। মুলারের ইউরেনিয়ামটুকু দরকার ওর, কিন্তু আজ বা অন্য কোনদিন তার কাছ থেকে সেটা চাইতে যাচ্ছে না ও। তার বদলে টোপ ফেলে মুলারকে এমন এক অবস্থায় নিয়ে আসতে চেষ্টা করবে ও, লোকটা যেন তার রুজি-রোজগারের জন্যে ওর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

ফ্যাক্টরি থেকে নতুন একটা মার্সিডিজে চড়ে মুলারের বাড়িতে এল রানা। পাহাড়ের ধারে প্রাসাদোপম অট্টালিকা, অনেক চাকর-বাকর আরাম-আয়েশের সাড়ম্বর আয়োজন। মুলারের স্ত্রীর বয়স ত্রিশ পেরিয়ে গেছে, কিন্তু দেখতে সুন্দরী। ঘেরা ঝুল-বারান্দায় বসল ওরা, ফ্রাউ মুলার নিজে এসে ওদেরকে কোল্ড ড্রিঙ্ক দিয়ে গেল।

আধ হাত লম্বা একটা পাইপ ধরিয়ে কাজের কথা পাড়ল মুলার। 'এবার বলুন, কেমন দেখলেন?'

'যতটা ভেবেছিলাম তারচেয়ে ছোট লাগল ফ্যাক্টরি,' বলল রানা।

'তাই নাকি? ছোট লাগল?' ঘন ঘন পাইপে টান দিয়ে মুখের সামনে ধোঁয়ার একটা মেঘ তৈরি করল মুলার।

'তারচেয়ে আমার কি দরকার সেটা বরং ব্যাখ্যা করি।'

'প্লীজ।'

শান্ত, অলস ভঙ্গিতে কথা বলতে শুরু করল রানা, 'এই মুহূর্তে আমাদের আর্মি অনেকগুলো কোম্পানীর কাছ থেকে ক্লিনিং মেটিরিয়াল কিনছে। একজনের কাছ থেকে ডিটারজেন্ট, একজনের কাছ থেকে সাধারণ সাবান, মেশিনপত্রের জন্যে সলভেন্ট অন্যজনের কাছ থেকে, এইভাবে। কিন্তু খরচা কমাবার চেষ্টা করছি

আমরা, আর তাই ভাবছি এই এলাকার মাত্র একজনের কাছ থেকে সব জিনিস যদি কেনা সম্ভব হয়, খরচা আপনা থেকেই কম পড়বে।'

চোখ জোড়া ছানাবড়া হয়ে উঠল মুলারের। 'একজনের কাছ থেকে সব জিনিস···' হঠাৎ তার খেয়াল হলো মাত্রা ছাড়া বিস্ময় প্রকাশ করা উচিত হচ্ছে না, '···হ্যাঁ, এই রকম অর্ডারকেই লম্বা অর্ডার বলে।'

'আপনার জন্যে বোধহয় একটু বেশি লম্বা হয়ে যাচ্ছে,' বলল রানা। মনে মনে ভাবল, হ্যাঁ বলে ফেলো না আবার।

'না-না, ঠিক তা নয়,' তাড়াতাড়ি বলল মুলার। 'ওই ধরনের বিশাল ম্যানুফ্যাকচারিং ক্যাপাসিটি নেই আমাদের, তার একমাত্র কারণ হলো, এত বড় অর্ডার সাপ্লাইয়ের সুযোগ আমরা আগে কখনও পাইনি। ম্যানেজারিয়্যাল আর টেকনিক্যাল নো-হাউ অবশ্যই আছে আমাদের, আর নিরেট এবং লম্বা অর্ডার পেলে ক্যাপাসিটি বাড়াবার জন্যে ফাইন্যান্স যোগাড় করা কোন সমস্যাই নয়। আসলে গোটা ব্যাপারটা নির্ভর করে, কত টাকার ব্যবসা হবে তার ওপর।'

চেয়ারের পাশ থেকে ব্রিফকেস তুলে সেটা খুলল রানা। 'এই নিন, এগুলো প্রোডাক্টসের স্পেসিফিকেশনস,' তালিকাটা মুলারের হাতে ধরিয়ে দিল ও। 'পরিমাণ আর সময়-সীমাও বলা হয়েছে। ডিরেক্টরদের সাথে কথা বলার জন্যে আপনি হয়তো কিছুটা সময় চাইবেন···'

'আমিই বস্,' মুচকি হেসে বলল মুলার। 'কারও সাথে পরামর্শ করার দরকার নেই আমার । দর-দাম যাচাই করে দেখার জন্যে কালকের দিনটা শুধু সময় দিন আমাকে। পরশু আমি ব্যাংকের সাথে কথা বলব। মঙ্গলবারে আপনাকে ডেকে কোন্টার কি দাম পড়বে জানিয়ে দেয়া যাবে।'

'শুনেছি, আপনার সাথে কাজ করার একটা মস্ত সুবিধে হলো, আপনি ঝামেলা করেন না।'

একগাল হাসল বুড়ো। 'কোম্পানী ছোট হলে তার কিছু সুবিধে তো আছেই।'

দরজায় ফ্রাউ মুলারকে দেখা গেল। মৃদু হেসে লক্ষ্মী খদ্দেরকে বলল সে, 'আসুন, লাঞ্চ তৈরি।'

মঙ্গলবার সকালে মুলারের সেক্রেটারি ফোন করল রানাকে। দুপুরে লাঞ্চ খাবার কথাটা মনে করিয়ে দিল সে।

হোটেল থেকে রানাকে বেলা একটার সময় নিজের গাড়িতে তুলে নিল মুলার। প্রথম শ্রেণীর একটা রেস্তোরাঁয় টেবিল রিজার্ভ করা হয়েছে। কাজের মধ্যে রয়েছে বলে ওয়াইনের বদলে বিয়ারের অর্ডার দিল মুলার। মনে মনে ভীষণ অস্থিরতা অনুভব করলেও, চেহারায় শান্ত একটা ভাব ফুটিয়ে রাখল রানা। পটাবার চেষ্টা করবে মুলার, সে নয়।

বিয়ার আসার আগেই মুলার মুখ খুলল, 'হ্যাঁ, আপনার অর্ডার সাপ্লাই দিতে পারব আমরা, মি. রানা।'

হিপ-হিপ-হুররে! চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করল রানার, কিন্তু চেহারাটা নির্লিপ্ত করে রাখল ও।

মুলার বলে চলেছে, 'কোন্‌টার কি দর, একটু পর বলছি—কিন্তু দর নির্ধারিত হবে কিছু শর্তসাপেক্ষে। আমরা পাঁচ বছরের একটা কন্ট্রাক্ট চাই। প্রথম বারো মাসের জন্যে দর বাড়বে না, এই গ্যারান্টি দেব আমরা। কিন্তু তারপর নির্দিষ্ট কিছু কাঁচামালের বাজার-দর যদি উঠতে শুরু করে, আমরা বেশি দরের জন্যে আবেদন করতে পারব। আর চুক্তি যদি বাতিল করা হয়, সেজন্যে একটা পেনালটির ব্যবস্থা রাখতে চাই আমরা। এক বছরে যা সাপ্লাই দেয়া হবে তার মোট দামের ওপর শতকরা দশ পার্সেন্ট হবে পেনালটির হার।'

রানার বলতে ইচ্ছে করল, 'রাজি!' কিন্তু কথা না বলে নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে থাকল ও। বিয়ার এল। ওয়েটার চলে গেল। তারপর বলল রানা, 'দশ পার্সেন্ট বেশি হয়ে যায়।'

'কিন্তু আপনিই বিবেচনা করে দেখুন,' দর কষাকষি শুরু করল মুলার। 'চুক্তি যদি বাতিল করে দেন আপনারা, তাতে যে পরিমাণ ক্ষতি হবে আমাদের, ওই দশ পার্সেন্ট দিয়ে তা পূরণ হবার নয়। তবে, হ্যাঁ, এ-কথা ঠিক, এই দশ পার্সেন্ট ক্ষতিপূরণ দেবার ভয়ে একান্ত বাধ্য না হলে আপনারা চুক্তি বাতিল করার কথা ভাববেন না। আপনাদের কেউ স্রেফ খামখেয়ালীর বশে চুক্তি বাতিল করবেন না, আমি শুধু এই গ্যারান্টিটুকুই পেতে চাই।'

'বুঝলাম,' বলল রানা। 'কিন্তু আমরা আরও কম পার্সেন্টেজের কথা বলব।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে মুলার বলল, 'সেটা বিবেচনা করতে আমার কোন আপত্তি নেই। এই নিন, দর-দামের তালিকা।'

তালিকায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে রানা বলল, 'আমরা যা আশা করছিলাম এটা তার কাছাকাছি বটে।'

'এর মানে কি আমাদের মধ্যে চুক্তি হলো?' সাগ্রহে জানতে চাইল মুলার।

রানা ভাবল, হ্যাঁ-হ্যাঁ। কিন্তু বলল, 'না। এর মানে হলো, আমি মনে করি, আমাদের মধ্যে ব্যবসা হতে পারে।'

গাল ফুলিয়ে ভুরু নাচাল বুড়ো। 'তাই যদি হয়,' বলল সে, 'আসুন, আসল জিনিস দিয়েই গলা ভেজাই। ওয়েটার!'

একজন জাহাজীর জীবন একঘেয়ে আর কষ্টকর, তবে ইমপেরিয়ালের পরিবেশ যতটা খারাপ হবে বলে ভয় পেয়েছিল অ্যালান হিলারী, ততটা খারাপ লাগল না তার। ক্যাপ্টেন এরিকসন অমায়িক ভদ্রলোক, ক্রুদের সুবিধে অসুবিধের দিকে নজর রাখেন তিনি। জাহাজের কোথাও নতুন করে রঙ চড়ানো বা পালিশ করা হয় না বটে, তবে মাঝে মধ্যে ধোয়া-মোছা হয়। বড় খবর, ইমপেরিয়ালের খাবারটা খুবই ভাল, আর ভাগ্য গুণেই বলতে হবে কুকের সাথে একই কেবিনে জায়গা পেয়েছে হিলারী। নিয়মের মধ্যে বলা আছে, রাত বা দিনের যে-কোন সময় রেডিও সিগন্যাল পাঠাবার জন্যে ডাক পড়লে ছুটতে হবে তাকে, কিন্তু আসলে দেখা গেল সাধারণ আটঘণ্টা ডিউটি শেষ হবার আগেই সমস্ত সিগন্যাল পাঠাবার ঝামেলা চুকে যায়, কাজেই রাতের ঘুমে কোন ব্যাঘাত হয় না তার।

কিন্তু আরাম হারাম করে দিল জাহাজের দোলা। কেপ র‍্যাথ ঘুরে, দ্য মিঞ্চ

ছেড়ে এসে উত্তর সাগরে পড়তেই প্রচণ্ড স্রোত ইমপেরিয়ালকে হিড়হিড় করে যেদিক খুশি টানা-হ্যাঁচড়া শুরু করে দিল। আর প্রকাণ্ড এক একটা ঢেউ তাকে মাথায় তুলে নিয়ে আছাড় দিয়ে ফেলতে লাগল নিচে। ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ল হিলারী, কিন্তু ব্যাপারটা গোপন করে রাখতে হলো। নাবিকরা সী-সিকনেসে ভোগে না, আর ইমপেরিয়ালের সবাই তাকে নাবিক বলেই জানে। তবু ভাগ্যটা ভালই বলতে হবে, ঘটনাটা ঘটার সময় গ্যালিতে ব্যস্ত ছিল কুক, আর রেডিও-রূমে একবারও ডাক পড়েনি হিলারীর। সাগর আবার শান্ত না হওয়া পর্যন্ত নিজের বাঙ্কে চিৎ হয়ে শুয়ে সময়টা কাটিয়ে দিল সে।

কেবিনগুলোয় আলো-বাতাস চলাচলের তেমন ব্যবস্থা নেই, হিটিং সিস্টেমেও গোলমাল আছে। দেয়াল আর সিলিং সারাক্ষণ স্যাঁতসেঁতে থাকে। তার রেডিও গিয়্যারটা সী-ব্যাগেই রয়ে গেছে। পলিথিন, ক্যানভাস আর কয়েকটা সোয়েটারের নিচে বেশ নিরাপদেই আছে সেটা। নিজের কেবিনে ওটাকে সেট করা সম্ভব নয়, কে কখন হুট করে ঢুকে পড়ে। জাহাজের রেডিও ব্যবহার করে এরই মধ্যে ওয়াশিংটনের সাথে রুটিন রেডিও কন্ট্যাক্ট করেছে সে। কেউ যখন শুনছে না, চিন্তা ভাবনা করে এই রকম একটা সময় বেছে বের করতে হয়েছে তাকে। মাত্র এক-আধ মিনিটের যোগাযোগ, কিন্তু ধরা পড়ে যাবার ভয়ে তাতেই ঘেমে নেয়ে উঠেছিল সে। এভাবে সম্ভব নয়, বড় বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে যায়, যত তাড়াতাড়ি পারা যায় নিজের রেডিও নিরাপদ কোথাও সেট করে নিতে হবে তাকে।

নিরাপদ, পরিচিত আর ঘরোয়া পরিবেশের জন্যে অনেক কিছু ত্যাগ করতে পারে হিলারী। জ্যাক রিচির ঠিক উল্টো স্বভাব তার। দূতাবাস, সেফ-হাউস, হোটেল—কোথাও নিজেকে মানিয়ে নিতে অসুবিধে হয় না রিচির। কিন্তু হিলারী নিজের পছন্দ মত একটা জায়গা না পেলে না পারে ঘুমাতে, না পারে কাজ করতে; সারাক্ষণ একটা অশান্তি আর অস্বস্তি দুর্বল করে রাখে তাকে। বোধহয় সেজন্যেই পাখির মত নীড় বাঁধার সহজাত একটা প্রবণতা রয়েছে তার মধ্যে। খুঁজতে খুঁজতে এই ইমপেরিয়ালেও ঘর তৈরি করার একটা চমৎকার জায়গা পেয়ে গেল সে।

দিনের বেলা জাহাজের এখানে সেখানে ঢুঁ মারার সময় একটা গোলকধাঁধা আবিষ্কার করল সে, ফরওয়ার্ড হ্যাচের সামনে বোতে জায়গাটা স্টোর হিসেবে ব্যবহার হবার কথা। হোল্ড আর প্রাউ-এর মাঝখানে খালি জায়গাটা ভরার জন্যে ন্যাভাল আর্কিটেক্ট এই গোলকধাঁধা তৈরি করেছে। একসার সিঁড়ির ধাপের আড়ালে একটা দরজা আছে, মেইন স্টোরে ঢোকার পথ ওটা। কিছু যন্ত্রপাতি, ক্রেনের জন্যে গ্রিজ ভরা কয়েকটা ড্রাম, আর একটা ঘাস ছাঁটার মেশিন রয়েছে ওখানে। ঘাস ছাঁটার মেশিনটা এখানে কেন, এর কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পেল না হিলারী। মেইন স্টোর থেকে ছোটবড় বেশ কয়েকটা ঘরে যাওয়ার রাস্তা আছে, কোনটায় মেশিনারি পার্টসের বাক্স, দড়ি-দড়া, চটের বস্তা, নাট-বল্টুর বাক্স ইত্যাদি গাদা হয়ে আছে, কোনটা পোকা-মাকড় আর ইঁদুরের আস্তানা। মেইন স্টোরসহ সংলগ্ন কামরাগুলোয় কাউকে ঢুকতে দেখেনি হিলারী, জাহাজের পিছন দিকে যে বড় স্টোর আছে, কাজের জিনিস সব সেখানে রাখা এবং সেখান থেকে বের করে ব্যবহার করা হয়।

অন্ধকার হয়ে আসছে। সবাই যখন সান্ধ্য নাস্তায় বসতে যাবে, সী-ব্যাগটা হাতে নিজের কেবিন থেকে গুটিগুটি বেরিয়ে এল হিলারী। দুরুদুরু বুকে কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে ডেকে উঠে এল সে। ব্রিজের নিচে একটা লকার আছে, সেটা থেকে একটা ফ্ল্যাশলাইট বের করল, কিন্তু তখুনি জ্বালল না। আলম্যানাকে বলা হয়েছে, চাঁদ থাকবে আজ, কিন্তু ঘন মেঘের আড়ালে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে সেটা। গানেল ঘেঁষে এগোল সে, সাদা ডেকে যাতে তার ছায়া না পড়ে। হুইল-হাউস আর ব্রিজ থেকে আলো বেরিয়ে আসছে, তবে ডিউটি অফিসার নিশ্চয়ই ডেকের ওপর নজর রাখেনি, তার কাজ সাগরের মতিগতি লক্ষ্য করা।

লাফিয়ে এসে গায়ে পড়ল ঠাণ্ডা হিম পানির ছিটে, ইমপেরিয়াল আবার একদিকে কাত হতে শুরু করেছে। দু'হাত দিয়ে রেইল ধরে ফেলল হিলারী, তা না হলে ছিটকে সাগরে পড়তে হত। ডেকের ওপর বন্যা বয়ে যাচ্ছে, জুতোর ভেতর পানি ঢুকল। ঝড়ের সময় এই অভিশপ্ত জাহাজের কি অবস্থা হয় ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল হিলারী। বোতে পৌঁছে বাতিল স্টোরে ঢুকে ঠাণ্ডায় থর থর করে কাঁপতে শুরু করল।

দরজা বন্ধ করে ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল হিলারী। কাঠের বাক্স আর বাতিল লোহা-লক্কড়ের মাঝখান দিয়ে পথ করে নিয়ে ছোট একটা কামরায় ঢুকল। এই দরজাটাও বন্ধ করল সে। অয়েলস্কিন খুলে সোয়েটারের ওপর হাত ঘষে একটু গরম করে নিল। ব্যাগ থেকে ট্র্যান্সমিটার বের করে রাখল এক কোণে। ডেকের গায়ে রিঙ রয়েছে, তার ভেতর দিয়ে এসেছে শক্ত তার, সেই তার দিয়ে বাল্কহেডের সাথে বাঁধল ট্র্যান্সমিটারটা।

রাবার সোল জুতো পরে আছে, তবু আরও সাবধান হবার জন্যে হাতে রাবার গ্লাভস পরল হিলারী। তার মাথার ওপর ডেক হেড বরাবর একটা পাইপের ভেতর দিয়ে জাহাজের রেডিও মাস্কের কেব্‌ল্ চলে গেছে। এঞ্জিনরূম থেকে চুরি করা একটা ছোট হ্যাকস দিয়ে পাইপটা ইঞ্চি ছয়েক কেটে ফেলল সে, আবরণ সরে যেতে ভেতরের কেব্‌ল্ বেরিয়ে পড়ল। পাওয়ার কেব্‌লের সাথে ট্র্যান্সমিটারের পাওয়ার ইনপুটের সংযোগ ঘটিয়ে নিজের রেডিওর এরিয়াল সকেটের সাথে মাস্টের সিগন্যাল ওয়্যার আটকে নিল।

রেডিওর সুইচ অন করে ওয়াশিংটনকে ডাকল হিলারী।

নিজেই সে রেডিও অপারেটর বলে হিলারীর আউটগোয়িং সিগন্যাল জাহাজের রেডিওতে কোন বিঘ্ন ঘটাবে না, কারণ এই মুহূর্তে আর কেউ রেডিও রূম থেকে সিগন্যাল পাঠাচ্ছে না। তবে সে যখন নিজের রেডিও ব্যবহার করবে, ইনকামিং সিগন্যাল জাহাজের রেডিওতে পৌঁছবে না। তার নিজেরও সেটা শুনতে পাবার কোন উপায় নেই, কেননা, অন্য আরেক ফ্রিকোয়েন্সিতে রেডিও সেট করেছে সে। এমন ব্যবস্থা করা সম্ভব, যাতে একই সময়ে দুটো রেডিও রিসিভ করতে পারবে, কিন্তু তাতে একটা অসুবিধে আছে—ওয়াশিংটন থেকে যে উত্তর পাঠানো হবে সেটা জাহাজের রেডিওতেও শুনতে পাওয়া যাবে। এই ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না। ছোট একটা জাহাজ তার সিগন্যাল রিসিভ করতে দু'এক মিনিট দেরি করলে কারও মনে সন্দেহ না জাগাই স্বাভাবিক। ইমপেরিয়ালের জন্যে কোন সিগন্যাল

পাঠানো হয় না বা হবে না এই রকম একটা সময় আন্দাজ করে নিয়ে নিজের রেডিও অন করবে হিলারী।

ওয়াশিংটনের সাথে যোগাযোগ হতে সিগন্যাল পাঠাল সে, 'চেকিং সেকেন্ডারি ট্র্যান্সমিটার।'

নিজের পরিচয় জানিয়ে ওয়াশিংটন সিগন্যাল পাঠাল, 'স্ট্যান্ড বাই ফর সিগন্যাল ফ্রম রিচি।' সি.আই.এ-র স্ট্যান্ডার্ড কোড ব্যবহার করা হচ্ছে।

তারপর রিচির কাছ থেকে মেসেজ এল, 'কিছু না ঘটা পর্যন্ত ঘাপটি মেরে পড়ে থাকো। রিচি।'

জবাবে হিলারী বলল, 'ও-কে। ওভার অ্যান্ড আউট।' ওয়াশিংটন যোগাযোগ কেটে দেবার আগেই তার খুলে জাহাজের কেব্‌ল্ যেমন ছিল তেমন অবস্থায় রেখে দিল সে।

কাজ শেষ করে সন্তোষ বোধ করল হিলারী। নিরাপদ জায়গায় রেডিওর জন্যে নীড় তৈরি করেছে সে, যোগাযোগ ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে, কারও চোখে ধরাও পড়েনি। এখন হাত গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকা।

ট্র্যান্সমিটারটা একটা কার্ডবোর্ড বাক্সের ওপর বসানো রয়েছে, আরও একটা বাক্স টেনে নিয়ে এসে সেটার সামনে রাখল হিলারী, সেটটা চোখের আড়ালে পড়ে গেল। এখন যদি কেউ এই ঘরে ঢোকে, সহজে ওটাকে দেখতে পাবে না। দরজা খুলে মেইন স্টোরে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল সে। অমনি ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক।

মেইন স্টোরে লোক।

মাথার ওপর আলোটা জ্বলছে, চারদিকে হলুদ আভা আর ঘন ছায়া। একটা গ্রিজ ড্রামের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে ডেকের ওপর বসে আছে একজন যুবক, পা দুটো সামনে লম্বা করা। মুখ তুলে তাকাল যুবক, হিলারীর মতই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে সে। চিবুক ঝুলে পড়েছে তার, চেহারায় অপরাধী অপরাধী ভাব।

চিনতে পারল হিলারী। ওর নাম পাবলো, মাথা ভর্তি সোনালি চুল, বছর উনিশ বয়স হবে। কারডিফের পাবে একে কখনও মদ খেতে দেখেনি সে, অথচ লক্ষ্য করেছে সারাক্ষণ কেমন যেন নেশার ঘোরে থাকে। সম্ভবত অসুস্থ, তা না হলে চোখের নিচে কালি কেন?

'তুমি এখানে কি করছ?' কঠিন সুরে জানতে চাইল হিলারী, কিন্তু উত্তর পাবার আগে নিজেই ব্যাপারটা দেখতে পেল। শার্টের আস্তিন প্রায় কাঁধ পর্যন্ত গুটিয়ে নিয়েছে পাবলো, দুই পায়ের মাঝখানে ডেকের ওপর পড়ে রয়েছে একটা শিশি, একটা ওয়াচ-গ্লাস আর একটা ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগ। পাবলোর ডান হাতে ধরা রয়েছে একটা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ। ইঞ্জেকশন নিতে যাচ্ছিল সে।

'তুমি ডায়াবেটিসের রুগী নাকি?' আবার প্রশ্ন করল হিলারী।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর জোর করে একটু হাসল পাবলো। কথা বলল না।

'বুঝেছি!' সবজান্তার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল হিলারী। 'অ্যাডিক্ট! তুমি ড্রাগ নাও।' ড্রাগ সম্পর্কে বিশেষ কিছু না বুঝলেও ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে পাবলোকে যে পরবর্তী বন্দরে জাহাজ থেকে নামিয়ে দেয়া হবে এটুকু ভালই বোঝে

সে। পেশীতে একটু ঢিল পড়ল। বিপদটা কাটিয়ে ওঠা যাবে।

হিলারীকে ছাড়িয়ে তার পিছনে চলে গেল পাবলোর দৃষ্টি। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল হিলারী। ছোট ঘরের ভেতর কার্ডবোর্ডের বাক্সের আড়াল থেকে বেরিয়ে রয়েছে রেডিওর একটা কোণ।

দু'জন আবার দু'জনের দিকে তাকাল। দু'জনেই বুঝতে পারছে, গোপন করার মত একটা করে ব্যাপার রয়েছে ওদের।

'আমার কথা তুমি কাউকে বলবে না, তোমার কথা আমি কাউকে বলব না,' বলল হিলারী। 'রাজি?'

পাবলোর চেহারা থেকে মেঘ কেটে গেল, রাজি হবার ভঙ্গিতে মাথা কাত করল সে। হিলারীর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘ্যাঁচ করে সূচ ঢোকাল হাতে।

ইমপেরিয়াল আর ওয়াশিংটনের মধ্যে যে সিগন্যাল বিনিময় হলো সেটা সোভিয়েত রাশিয়ার একটা ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্স লিসনিং স্টেশনে ধরা পড়ল এবং রেকর্ড হয়ে গেল। বিনিময়টা সি.আই.এ. স্ট্যান্ডার্ড কোডের সাহায্যে করা হয়েছে, কাজেই সেটা ডিসাইফার করে পড়তে পারল ওরা। কিন্তু এই বিনিময় থেকে তারা শুধু জানতে পারল, কোন একটা জাহাজ থেকে কেউ একজন তার সেকেন্ডারি ট্র্যান্সমিটার চেক করছে—জাহাজটার নাম ইত্যাদি জানতে পারল না। আরও জানল, রিচি নামে একজন লোক কাউকে ঘাপটি মেরে বসে থাকার পরামর্শ দিল। রিচি নামটা তাদের ফাইলে নেই। এই ভাব বিনিময়ের হাতা-মাথা কিছুই তারা বুঝতে পারল না। তাই রিচি নামে তারা একটা ফাইল খুলল, সেই ফাইলে রেখে দেয়া হলো রেকর্ড করা সিগন্যাল। তারপর যা হয়, ব্যাপারটা ভুলে গেল তারা।

চার

রাজ্যের উদ্বেগ আর প্রত্যাশা নিয়ে তেল আবিবে ফিরে এল ন্যাট কোহেন। রিচিকে মিথ্যে কথা বলেছিল সে, মনে মনে তখনই জানত তেল আবিবে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হবে তাকে, গ্রামের বাড়িতে যাবার সময়ই পাওয়া যাবে না। হলোও তাই। মিশর ইউরেনিয়াম চুরি করবে, আর তার ওপর বাটপারি করবে ইসরায়েল—মনে মনে এই বুদ্ধি এঁটেছে সে। কাজটা করতে হলে ইসরায়েলী নেভির সাহায্য লাগবে। কিন্তু লাগবে বললেই তো আর পাওয়া সহজ নয়। সমস্ত ঘটনা জানিয়ে কর্তৃপক্ষকে রাজি করাতে হবে। কোহেন তেমন গুরুত্বপূর্ণ কেউ নয়, কাজেই রাজি করানোও কঠিন হবে।

জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সে ডাবল এজেন্ট আছে, এই ব্যাপারটা আরও চিন্তিত করে তুলল কোহেনকে। মনে মনে ঠিক করল, একমাত্র চীফকে ছাড়া আর কারও কাছে রিপোর্ট করবে না সে। কিন্তু সমস্যা হলো, চীফের সাথে দেখা করার উপায় কি? এর আগে তাঁকে মাত্র একবার দেখেছে কোহেন, তাও ট্রেনিং শেষ করার পর

আরও অনেকের সাথে দূর থেকে। অনেক ভেবেচিন্তে ইমিডিয়েট বসের সাথে দেখা করল সে। তাকে সরাসরি বলল, চীফের সাথে দেখা করতে চাই, আপনি একটা ব্যবস্থা করে দিন। উত্তর এল, ও, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে চাও?

অপমান বোধ করল কোহেন, কিন্তু নিরাশ হলো না। নিজের প্ল্যান সম্পর্কে তার আস্থা গগনচুম্বি, জানে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কানে কথাটা একবার তুলতে পারলেই তারা এর গুরুত্ব এবং তাৎপর্য বুঝতে পারবে। মাসুদ রানার হাইজ্যাক করা ইউরেনিয়ামের ওপর ইসরায়েলকে ছোঁ মারতে হবে, এর কোন বিকল্প নেই। যা থাকে কপালে, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবার সিদ্ধান্ত নিল কোহেন। শেষ এবং একমাত্র অস্ত্র ব্যবহার করল সে। ইমিডিয়েট বসকে কিছু না জানিয়ে নিজেই ইসরায়েলী ইন্টেলিজেন্স চীফকে উদ্দেশ্য করে একটা চিঠি লিখল। বেশি কিছু লিখল না, মিশর ইউরেনিয়াম যোগাড় করছে এই কথাটা জানিয়ে চীফের সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করতে চাইল সে।

যাদুমন্ত্রের মত কাজ হলো। পরদিনই ডাক পড়ল কোহেনের। জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স চীফের খাস কামরায় নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। চীফ তীক্ষ্ণ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেন সারাক্ষণ, আর, যা জানে সব ধীরে ধীরে বলে গেল কোহেন। এরপর প্রশ্নবাণ শুরু করলেন চীফ। কোহেনের ইনফরমেশন কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য, ঘটনাটা ঘটতে যাচ্ছে তার প্রমাণ কি, কেউ ধোঁকা দেবার জন্যে মিথ্যে কথা বলছে কিনা, কোথাও কোন ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে কিনা ইত্যাদি ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাইলেন তিনি। তাঁর প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিল কোহেন, কিন্তু চীফের ভাবলেশহীন চেহারা দেখে কিছুই বুঝল না। তিনি ওর কথা বিশ্বাস করছেন? নাকি ধমক দিয়ে বের করে দেবেন ঘর থেকে? গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন চীফ, আর আশায়-নিরাশায় দুলতে থাকল কোহেনের মন।

তারপর চীফ জানতে চাইলেন, 'তুমি আর সি.আই.এ-র লোকটা ঠিক কি করার কথা ভেবেছ?'

'সি.আই.এ-র প্ল্যান হলো, মাসুদ রানাকে বাধা দেয়া, আর গোটা ব্যাপারটা প্রকাশ করে দিয়ে দুনিয়ার সবার চোখে মিশরকে ছোট করা। যদিও, কিভাবে কি করা হবে তা এখনও ঠিক হয়নি। কিন্তু সি.আই.এ-র এই প্ল্যানের সাথে আমার প্ল্যানের কোন সম্পর্ক নেই। আমি মনে করি, ইমপেরিয়ালে রানা পৌঁছবার আগেই ইসরায়েলের উচিত হবে সেটাকে হাইজ্যাক করা।'

'ভেরি গুড।'

সরাসরি জানতে চাইল কোহেন, 'আমি তাহলে নেভির সাহায্য পাব, স্যার?'

'না, তা সম্ভব নয়। ইসরায়েলী নেভি সরাসরি জড়িয়ে পড়ল, তারপর দেখা গেল ব্যাপারটা কেঁচে গেছে, কিংবা গোটা ব্যাপারটাই ছিল ফলস, তাহলে আর কোথাও মুখ দেখানো যাবে না।'

'তাহলে?' মুখ চুন করে জানতে চাইল কোহেন।

'তোমার প্ল্যানটা যাতে সফল হয় তার জন্যে তোমাকে সাহায্য করা হবে,' বললেন চীফ। 'কিন্তু যারা তোমাকে সাহায্য করবে তারা ইসরায়েলের লোক, এটা প্রকাশ পাওয়া চলবে না। শেষ পর্যন্ত খারাপ কিছু যদি ঘটে যায়, কেউ যেন

ইসরায়েলকে দুষতে না পারে।'

'ও, আচ্ছা।'

'ইসরায়েলী কমান্ডো বাহিনীর আওতায় কাজ করে এমন কিছু ভাড়াটে গেরিলা আছে আমাদের,' বলল চীফ। 'দরকারের সময় ডাকলে তাদেরকে পাওয়া যায়। তাদের একটা গ্রুপকে সতর্ক রাখা হবে, তুমি বললেই সাহায্য করার জন্যে একপায়ে খাড়া হয়ে যাবে তারা। ঠিক যখন সাহায্য দরকার হবে তোমার, আমার সাথে যোগাযোগ কোরো।'

খুশি হতে পারল না কোহেন, কিন্তু তারপর ভাবল, এ-ও মন্দের ভাল। একেবারে যে নিরাশ হতে হয়নি তাকে সেটাই বা কম কিসে। বলল, 'সাহায্য আমার হয়তো এখুনি দরকার নেই, কিন্তু গেরিলা গ্রুপের লীডারের সাথে প্রাথমিক আলাপটা আমি এখুনি সেরে ফেলতে চাই।'

দেশে ফিরে ক'টা দিন আনন্দে কাটাবে ভেবেছিল জ্যাক রিচি, কিন্তু ঘটল উল্টোটা। এতদিন পর স্বামীকে কাছে পেয়ে খুশি হবার কথা লিজার, তা না, রিচির হঠাৎ আগমনে সে যেন একটু বেজারই হলো। মুখে কিছু বলল না বটে, কিন্তু কাজে-কর্মে সেটা পরিষ্কার টের পাওয়া গেল। বাড়িতে বসে রিপোর্ট তৈরি করতে হলো রিচিকে, পুরো একটা দিন লেগে গেল তাতে, এর মধ্যে তার স্টাডি রুমে একবার উঁকিও দিল না লিজা। রাত বারোটার দিকে কাজ শেষ করে হাউস-মেইডকে ডেকে লিজার খবর জানতে চাইলে তাকে বলা হলো, মিসেস তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের সাথে পার্টিতে গেছেন, কখন ফিরবেন বলে যাননি। গম্ভীর হয়ে গেল রিচি, ভাবল, বন্ধুদের খপ্পর থেকে লিজাকে তাহলে আর সরিয়ে নিয়ে আসা গেল না। এই ব্যাপারটা ওদের দাম্পত্য জীবনে বিষম একটা অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বন্ধুর সংখ্যা এত বেশি লিজার, স্বামীর দিকে তাকাবার সময়ই পায় না সে।

মনে মনে স্বীকার করল রিচি, এর জন্যে সে নিজেও কম দায়ী নয়। পেশাটাকে এত সিরিয়াসলি নিয়েছে সে, বলতে গেলে লিজাকে সে কোন সময়ই দিতে পারে না। ঠিক করল, বিয়েটা টিকিয়ে রাখার খাতিরে এখন থেকে লিজার জন্যে কিছুটা সময় আলাদা করে রাখবে সে। রাত দুটোয় লিজা বাড়ি ফিরলে তাকে একটা সুখবর দিতে গেল রিচি—কালই তারা মিয়ামীতে বেড়াতে যাচ্ছে। কিন্তু বেডরুমে ঢুকে দেখল, কাপড়চোপড় না পাল্টেই বিছানায় শুয়ে পড়েছে লিজা, মুখ থেকে ভুর ভুর করে গন্ধ বেরোচ্ছে জিনের।

রাতটা সোফায় বসে কাটিয়ে দিল রিচি। পরদিন সকালে সি.আই.এ. হেডকোয়ার্টারে গিয়ে রিপোর্ট দাখিল করল সে। বাড়ি ফিরল দু'খানা মিয়ামী ফ্লাইটের টিকেট নিয়ে। বেড়াতে যাবার কথা শুনে খুশি হবার কথা লিজার, কিন্তু উল্টে জবাবদিহি চাওয়ার সুরে জিজ্ঞেস করল সে, 'আমাকে না জানিয়ে কে তোমাকে মাতব্বরি করতে বলেছে?'

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর রাজি করা গেল লিজাকে। সেদিন বিকেলের প্লেনে রওনা হয়ে গেল ওরা।

কিন্তু কথায় বলে, ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে, কথাটা লিজার বেলায় হুবহু

ফলে গেল। মিয়ামীতেও তার গুণ আর রূপমুগ্ধ বন্ধুর অভাব হলো না। দু'দিন যেতে না যেতে অবস্থা এমন দাঁড়াল, লিজার সাথে দেখা করতে হলে রিচিকে তার বন্ধুদের কাছে প্রমাণ দিতে হয় যে সে-ই লিজার স্বামী। ঠিক এইসময় ওয়াশিংটন থেকে খবর পৌছল, রটারডাম থেকে নিক কুয়েল ফিরেছে। মিয়ামী থেকে পালাবার একটা অজুহাত পেয়ে গেল রিচি।

ওয়াশিংটনে ফিরে এসে কুয়েলের কাছ থেকে রিপোর্ট নিল রিচি। বুলডগ মার্কা চেহারায় আত্মতৃপ্তির নগ্ন হাসি ফুটিয়ে কুয়েল জানাল, অরিয়ন জাহাজে আড়িপাতা যন্ত্র রোপণ করতে তাকে কোন বেগ পেতে হয়নি।

বুভাইল শিপিঙের কাছে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে অরিয়ন, তাই পরীক্ষা করার জন্যে ড্রাই ডকে পাঠানো হয়েছে তাকে। কিছু ছোটখাট ক্রটি ধরা পড়ায় মেরামতের কাজ শুরু করা হয়েছে। এই সুযোগে একজন ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে অরিয়নে চড়তে কোন অসুবিধে হয়নি কুয়েলের। জাহাজে প্রাউ-তে অত্যন্ত শক্তিশালী একটা রেডিও বীকন রোপণ করেছে সে। জাহাজ থেকে নেমে আসার সময় ডক ফোরম্যানের সামনে পড়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু জেরার উত্তরে তাকে নয়-ছয় বুঝিয়ে পার পেয়ে গেছে।

সেই মুহূর্ত থেকে, জাহাজের পাওয়ার যখনই অন থাকবে—সাগরে থাকার সময় সারাক্ষণ আর ডকে থাকার সময় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় আঠারো ঘণ্টা—জাহাজ ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত বা ভেঙে টুকরো না করা পর্যন্ত রেডিও বীকন প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর সিগন্যাল পাঠাবে। পৃথিবীর যেখানেই থাকুক সে, বয়স তার যতই বাড়ুক, এর কোন ব্যতিক্রম হবে না। ইচ্ছে করলেই এক ঘণ্টার মধ্যে ওয়াশিংটন তার হদিস বের করে ফেলবে।

মিশরীয় ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সে আব্বাস হোবায়দা নামে অল্প বয়েসী এক ক্যাপ্টেন আছে, জাহাজের এঞ্জিনিয়ার হিসেবে ট্রেনিং পেয়েছে সে। অ্যান্টোয়ার্প থেকে ইয়েলোকেক কার্গো নিয়ে ইমপেরিয়াল যাত্রা শুরু করার সময় তাকে ওই জাহাজে তুলে দিতে হবে।

কাজটা কিভাবে সম্ভব সে-সম্পর্কে ঝাপসা একটা ধারণা নিয়ে অ্যান্টোয়ার্প পৌছল রানা। যে কোম্পানীর জাহাজ ইমপেরিয়াল, তার স্থানীয় প্রতিনিধিকে নিজের হোটেল কামরা থেকে ফোন করল ও।

'আমি যখন মারা যাব,' ডায়াল করার সময় ভাবল রানা, 'হোটেলের একটা কামরা থেকে ওরা আমার লাশ বের করে নিয়ে যাবে।'

একটা মেয়ের গলা পেল রানা। গম্ভীর সুরে বলল ও, 'আমি পিয়ের বর্গ। ডিরেক্টরকে চাই।'

'এক সেকেন্ড, প্লীজ।'

তারপর একটা পুরুষ কণ্ঠ, 'ইয়েস?'

'গুড মর্নিং। বর্গ ক্রু এজেন্সী থেকে আমি পিয়ের বর্গ কথা বলছি,' যা বলা দরকার এই মুহূর্তে বানিয়ে নিয়ে বলে যাচ্ছে রানা।

'এই নামে কোন প্রতিষ্ঠান আছে বলে তো শুনিনি।'

'সেজন্যেই আপনার সাথে কথা বলছি। দেখুন, অ্যান্টোয়ার্পে আমরা একটা অফিস খোলার সমস্ত আয়োজন শেষ করে ফেলেছি। আপনার কাছ থেকে যেটা জানতে চাই, আপনাদের কোন সাহায্যে আমরা লাগব কিনা।'

'আমার সন্দেহ আছে, তবে আমাকে আপনি লিখতে পারেন. আর…'

'এই মুহূর্তে যে ক্রু এজেন্সীর সাহায্য নিচ্ছেন, তাদের কাজে আপনি সন্তুষ্ট?'

'হ্যাঁ…মানে, না…দেখুন…'

'আর মাত্র একটা প্রশ্ন, তারপর আমি আর আপনাকে বিরক্ত করব না। কোন্ এজেন্সী সাহায্য করছে আপনাকে, জানতে পারি?'

'মাহমুদ'স। শুনুন, আপনি বরং সময় করে আমার এখানে চলে আসুন একদিন…'

'ভেরি গুড। আগামী হপ্তায়।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে। এখন তাহলে…

'গুডবাই।'

মাহমুদ'স! রিসিভার নামিয়ে রেখে চিন্তা করল রানা। এখানে মুসলমান আছে, তারা আবার শিপিং ব্যবসার সাথে জড়িত? আসলে, এতে তেমন আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সারা দুনিয়ায় এমন কোন জায়গা নেই যেখানে মুসলমানদের দেখা পাওয়া যায় না। এই লোকের কাছ থেকে সাহায্য আশা করা যেতে পারে। হয়তো নিষ্ঠুর হবার দরকার হবে না ওর।

ফোন বুক ঘেঁটে মাহমুদ'স ক্রু এজেন্সীর ঠিকানা দেখে নিল রানা। গায়ে কোট চাপাল। হোটেল থেকে বেরিয়ে হাতছানি দিয়ে একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে বসল তাতে।

অভিজাত একটা এলাকায় দোতলা বাড়ি মাহমুদের, নিচের তলায় অফিস। মাঝ বয়েসী এক মহিলা, সম্ভবত সেক্রেটারি, রিসেপশনে রানাকে বসতে বলে জানতে চাইল, 'বলুন?'

'মি. মাহমুদের সাথে দেখা করতে চাই।'

রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে দেখল সেক্রেটারি, 'আপনি নিশ্চয়ই জাহাজে চাকরি চান না?'

'না,' বলল রানা। 'মি. মাহমুদকে গিয়ে বলুন মিশর থেকে এক ভদ্রলোক এসেছেন, ব্যক্তিগত ব্যাপারে দেখা করতে চান।'

'তাই নাকি? আপনি মিশর থেকে এসেছেন?' অবাক হয়ে জানতে চাইল সেক্রেটারি। রানা আর কিছু বলছে না দেখে অনেকটা অনিচ্ছার ভাব নিয়ে ভেতরে চলে গেল সে। ফিরল মিনিট খানেক পর। 'আসুন।'

চেম্বারটা ছিমছাম এবং অত্যন্ত রুচিসম্মতভাবে সাজানো। ধূসর রঙা দেয়ালে প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকা ছবি, এক কোণে একটা গোলাপের ঝাড়। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করল মাহমুদ, এবং কোন রকম বিনয় প্রকাশের ধার দিয়ে না গিয়ে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিল, 'ফি বছর মিশরের প্রতিরক্ষা ফাণ্ডে টাকা দিই আমি। গত যুদ্ধে আমি ষাট হাজার গিল্ডার দিয়েছি। চেকবইটা দেখতে চান? এটা কি নতুন কোন আবেদন? ইসরায়েলের সাথে আবার যুদ্ধ বাধতে যাচ্ছে মিশরের?'

'আমি আপনার কাছ থেকে চাঁদা আদায় করতে আসিনি, মি. মাহমুদ,' মৃদু হেসে বলল রানা। সেক্রেটারি দরজা খুলে রেখে বেরিয়ে গেছে, সেটা ভিড়িয়ে দিল ও। 'বসতে পারি?'

'টাকার জন্যে এসে না থাকলে বসুন, কফি খান, সারাদিন থেকে যান,' বলে হেসে উঠল মাহমুদ।

একটা চেয়ার টেনে বসল রানা। চশমা পরা আধা বয়সী লোক মাহমুদ. মাথার সামনে চকচকে টাক, নিখুঁতভাবে কামানো গাল, গায়ে মেদ জমতে শুরু করেছে। পরনে ব্রাউন রঙের চেক স্যুট। রানা আন্দাজ করল, চালু একটা ব্যবসার মালিক সে, কিন্তু কোটিপতি নয়।

'কিছু যদি মনে না করেন, আপনি কি এখানের আদি বাসিন্দা?'

'না,' বলল মাহমুদ। 'আমরা আসলে আরবের লোক। আমার বাপের প্রপিতামহ দেড়শো বছর আগে ধর্ম প্রচারের জন্যে এখানে এসেছিলেন। সৌদী আরব আর ঈজিপ্টে এখনও আমাদের আত্মীয়-স্বজন আছে, কিন্তু তাদের সাথে কোন যোগাযোগ নেই।'

'বলতে গেলে ভাগ্য গুণেই আপনার নামটা জানতে পেরেছি আমি,' বলল রানা। 'মিশর সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আপনার কাছে এসেছি আমি। আপনাকে মিশরের একটা উপকার করতে হবে।'

'কি রকম?' সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল মাহমুদ।

'হপ্তা কয়েকের মধ্যে আপনার এক মক্কেল জরুরী একটা অনুরোধ নিয়ে আপনার কাছে আসবে। ইমপেরিয়াল নামে একটা জাহাজের জন্যে একজন এঞ্জিনিয়ার অফিসার দরকার হবে ওদের। মিশর সরকার চায়, আমাদের নির্বাচিত একজন লোককে ইমপেরিয়ালে ঢুকিয়ে দেবেন আপনি। লোকটার নাম আব্বাস হোবায়দা, সে-ও একজন মিশরীয়, তবে অন্য নাম আর জাল কাগজপত্র থাকবে তার। কিন্তু আসলে সে একজন এঞ্জিনিয়ারই, আপনার মক্কেল অসন্তুষ্ট হবে না বা কোন অভিযোগও করবে না।'

মাহমুদ কিছু বলবে এই আশায় অপেক্ষা করে থাকল রানা। মনে মনে বলল, চেহারাই বলছে তুমি বাপু নেহাত ভাল মানুষ। মিশরের ওপর তোমার যথেষ্ট দরদ আছে, তা না হলে ফি বছর চাঁদা দিতে না। তাহলে এই সামান্য কাজটা করে দিতে বাধা কোথায়? তুমি রাজি না হলে আমাকে জোর খাটাতে হবে, কিন্তু তা আমি চাই না।

'কেন?' হঠাৎ জানতে চাইল মাহমুদ। 'ইমপেরিয়ালে এই আব্বাস হোবায়দাকে কেন তুলতে চায় মিশর সরকার? নাকি গোপন ব্যাপার, বলা যাবে না?'

'না, বলা যাবে না,' জানাল রানা। 'তবে সেটা আপনারই স্বার্থে। যত কম জানবেন আপনার জন্যে ততই ভাল।'

চেম্বারের ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল।

তারপর জানতে চাইল মাহমুদ, 'নিজের যে পরিচয় দিলেন, সেটা প্রমাণ করার মত কাগজ-পত্র দেখাতে পারবেন আপনি?'

'না।

দরজায় নক না করেই কফি নিয়ে ভেতরে ঢুকল সেক্রেটারি। তার চোখের দৃষ্টি দেখে রানা বুঝল, ওকে তেমন পছন্দ করছে না মহিলা। আলাপে বাধা পড়ায় চিন্তা-ভাবনা করার সময় পেল মাহমুদ। সেক্রেটারি বেরিয়ে যাবার পর বলল, 'এই ধরনের একটা অনুরোধ রক্ষা করা আমার জন্যে বোকামি হয়ে যাবে।'

'কেন?'

'রাস্তা থেকে উঠে এসে আপনি দাবি করছেন, আপনাকে মিশর সরকার পাঠিয়েছে, অথচ আপনি আমাকে কোন কাগজ-পত্র দেখাতে পারছেন না, এমন কি নিজের নামটা পর্যন্ত এখনও জানাননি। তারপর আপনি আমাকে এমন একটা কাজ করতে বলছেন যেটা অবশ্যই অন্যায় এবং সম্ভবত ক্রাইম। কাজটা কেন করা দরকার, আপনি তাও আমাকে জানাতে চান না। সবচেয়ে বড় কথা, যে কাজটা আমাকে করতে বলা হচ্ছে তাতে মিশর সরকারের অনুমোদন আছে কিনা তাও জানার কোন সুযোগ নেই আমার। এরপরও আপনি আশা করেন কাজটা আমি করে দেব?'

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বিকল্প কি উপায় আছে ভাবতে শুরু করল রানা। ব্ল্যাকমেইল? ওর স্ত্রীকে কিডন্যাপ? বলল, 'আপনাকে বিশ্বাস করাবার জন্যে কিছু যদি করার থাকে আমার, বলুন।'

'মিশরের প্রেসিডেন্ট ব্যক্তিগত ভাবে অনুরোধ করবেন আমাকে? যদি করেন, শুধু তখনই আমি কাজটা করে দেব।'

ফেরার জন্যে উঠে দাঁড়াল রানা। মাহমুদের দিকে পিছন ফিরতে যাবে, এই সময় ভাবল, নয় কেন? কেন নয়? উদ্ভট একটা ধারণা বটে, সবাই ওকে পাগল ঠাওরাবে··· কিন্তু এটা সম্ভব হলে কাজটা আদায় হয়। নিঃশব্দে হাসল রানা। লে. জেনারেল আলি কারাম প্রথমে হতভম্ব, তারপর ফুলে ব্যাঙ হয়ে উঠবেন—রাগে।

চোখ তুলে মাহমুদের দিকে তাকাল রানা, বলল, 'ঠিক আছে।'

'ঠিক আছে মানে?'

'কোটটা চড়িয়ে নিন গায়ে। আমরা কায়রোয় যাব।'

'এখন?'

'আপনি ব্যস্ত?'

'আপনি সিরিয়াস?'

'ব্যাপারটা জরুরী সে তো আপনাকে আমি আগেই বলেছি,' ডেস্কের টেলিফোনটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে বলল রানা, 'আপনার স্ত্রীকে ডাকুন।'

'দরজার বাইরেই রয়েছে ও।'

দরজার কাছে গিয়ে সেটা খুলল রানা। 'মিসেস মাহমুদ?'

'ইয়েস?'

'এখানে একটু আসবেন, প্লীজ?'

চেহারায় উদ্বেগ নিয়ে মাঝ বয়েসী সেক্রেটারি ভেতরে ঢুকল। এই মহিলাই মিসেস মাহমুদ বুঝতে পেরে মন একটু দমে গেল রানার। প্রথম দর্শনেই ওকে পছন্দ করতে পারেনি।

'কি ব্যাপার, মাহমুদ?' দ্রুত জানতে চাইল মিসেস মাহমুদ।

'এই ভদ্রলোক চাইছেন আমি ওর সাথে কায়রোয় যাই।'

'কখন?'

'এখন।'

'মানে, এই হপ্তাতেই?'

'না,' বলল রানা। 'আজ সকালে, মিসেস মাহমুদ। তার আগে আপনার জানা দরকার, এটা একটা কনফিডেনশিয়াল ব্যাপার। মি. মাহমুদকে মিশর সরকারের একটা কাজ করে দেবার অনুরোধ জানানো হয়েছে। কাজটা যে সত্যি মিশর সরকারের, এর মধ্যে কোন ক্রাইম বা অন্যায় কিছু নেই, সেটা নিশ্চিতভাবে জানতে চান তিনি। আর কোন উপায় দেখছি না, তাই সাথে করে কায়রোয় নিয়ে যেতে চাইছি, ওখানে গেলে আমি বিশ্বাস করাতে পারব।'

'এসব ঝামেলায় নিজেকে জড়িয়ো না, মাহমুদ…'

রানার চোখে চোখ রেখে মাহমুদ বলল, 'আমি একজন মুসলমান। মিশরে আমাদের হারিয়ে যাওয়া ভাই-বেরাদার রয়েছে। জড়িয়ে পড়ব না মানে? আমি তো জড়িয়েই আছি। দু'একদিন তুমিই অফিস চালিয়ে নিতে পারবে…'

'কিন্তু এই ভদ্রলোক সম্পর্কে কিছুই তুমি জানো না!'

'জানতে চাই বলেই তো যাব।'

'ব্যাপারটা আমার ভাল ঠেকছে না।'

'ভয় পাবার আছেটা কি?' জানতে চাইল মাহমুদ। 'একটা সিডিউলড ফ্লাইট ধরে যাব আমরা। কায়রোয় আমি আরও গেছি, হারিয়ে যাব সে-ভয় নেই। প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা হবে, এই সুযোগ ছাড়ি কিভাবে?'

'প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করবে?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল মিসেস মাহমুদ। 'তার মানে?'

মিশরের প্রেসিডেন্টের সাথে স্বামী দেখা করলে এই মহিলার গর্ব কোথায় গিয়ে ঠেকবে কল্পনা করতে গিয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠল রানা। বলল, 'তার মানে, মি. মাহমুদ মিশরের প্রেসিডেন্ট ছাড়া আর কারও কথা বিশ্বাস করবেন না।'

রানার দিকে বোকার মত কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর মিসেস মাহমুদ বলল, 'আপনি পারবেন?'

'দেখা করাতে? পারব বলে মনে করি বলেই তো সাথে করে নিয়ে যেতে চাইছি। কিন্তু, তার আগে একটা কথা। ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে, মিসেস মাহমুদ। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবেন, আপনার স্বামী ব্যবসার কাজে রটারডামে গেছেন। কালই ফিরে আসবেন উনি।'

বারবার দু'জনের দিকে তাকাল মিসেস মাহমুদ। তারপর চেহারায় রাজ্যের কৃত্রিম হতাশা ফুটিয়ে বলল, 'আমার মাহমুদ প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করবে আর আমি কথাটা জানালা দরজা বা দেয়ালকেও শোনাতে পারব না?'

রানা বুঝল, এই মহিলার জিভকে ভয় পাবার কোন কারণ নেই।

উঠে দাঁড়াল মাহমুদ, একটা হুক থেকে নামিয়ে কোটটা গায়ে চড়াল। এগিয়ে এসে স্বামীর সামনে দাঁড়াল মিসেস মাহমুদ। পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে একটু

উঁচু হলো সে, আলতোভাবে চুমু খেল মাহমুদের গালে। তারপর স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরল দু'হাত দিয়ে।

'এর মধ্যে কোন ঘাপলা নেই,' স্ত্রীকে বলল মাহমুদ। 'ব্যাপারটা হঠাৎ করে ঘটছে বটে, অদ্ভুতও, কিন্তু এর মধ্যে কোন ঘাপলা নেই।'

বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে মাথা ঝাঁকাল মিসেস মাহমুদ, তারপর স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল একপাশে।

ট্যাক্সি নিয়ে এয়ারপোর্টে এল ওরা। আনন্দের একটা অনুভূতি রানার সমস্ত অস্তিত্বে ছড়িয়ে রয়েছে। গোটা ব্যাপারটার মধ্যে দুঃসাহসের সাথে অনিষ্ট করার একটা প্রবণতা রয়েছে, সেটাই উপভোগ্য লাগছে ওর। যেন স্কুল লাইফে ফিরে গেছে ও, হেড স্যারের কাছে যেতে বুক কাঁপে, কিন্তু ডাঁট আর জাঁকের সাথে তাঁর কাছেই যাচ্ছে ও—বুক ফুলিয়ে। নিঃশব্দ হাসিটা কোনমতে থামতে চায় না, মাহমুদের চোখে ধরা পড়ে যাবে বলে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে হলো ওকে।

এমন একটা লাফ দেবেন লে. জেনারেল আলি কারাম, ছাদ ফুঁড়ে বেরিয়ে গেলেও আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না।

কায়রো ফ্লাইটের একজোড়া রিটার্ন টিকেট কাটল রানা, ক্রেডিট কার্ড ভাঙিয়ে দাম দিল। প্যারিসে যাত্রা বিরতি আছে, ঘণ্টা দুয়েক থাকতে হবে ওখানে। প্লেনে চড়ার আগে টেলিফোনে প্যারিস দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করল ও। ওদেরকে জানাল, ট্রানজিট লাউঞ্জে কেউ যেন ওর জন্যে অপেক্ষা করে।

প্যারিসে পৌঁছে মিশরীয় দূতাবাসের লোকটাকে একটা মেসেজ দিল রানা, লে. জেনারেল আলি কারামকে পৌঁছে দিতে হবে। কি চাই, মেসেজে শুধু সেইটুকু জানাল রানা। ডিপ্লোম্যাট লোকটা মিশরীয় ইন্টেলিজেন্সের একজন অফিসার, রানার সাথে অত্যন্ত শ্রদ্ধা আর সমীহের সাথে কথা বলল সে। ওদের কথাবার্তা শুনল মাহমুদ, তারপর লোকটা দূতাবাসে ফিরে যেতে রানাকে বলল সে, 'আমরা ফিরে যেতে পারি। এরই মধ্যে আপনার ওপর বিশ্বাস এসে গেছে আমার।'

'না,' বলল রানা। 'এখন আর তা হয় না। আমি চাই আপনার মনে এতটুকু সন্দেহ যেন না থাকে।'

প্লেনে ওঠার পর মাহমুদ বলল, 'মিশরে আপনি নিশ্চয়ই একজন কেউকেটা···মানে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানুষ।'

'না। তবে আমি যে কাজটা করছি সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

এরপর মাহমুদ জানতে চাইল, কি রকম ব্যবহার করতে হবে, প্রেসিডেন্টকে কি বলে সম্বোধন করা দরকার ইত্যাদি। রানা তাকে বলল, 'কি জানি। এর আগে আমার সাথে তাঁর দেখা হয়নি। হ্যান্ডশেক করবেন, মিস্টার প্রেসিডেন্ট বলে সম্বোধন করবেন।'

নিচের ঠোঁট কামড়ে হাসল মাহমুদ। বিরাট কোন ব্যক্তিত্বকে বিরক্ত করার আনন্দটা রানার মত সে-ও উপভোগ করতে শুরু করেছে।

কায়রো এয়ারপোর্টে একটা গাড়ি নিয়ে ওদের সাথে দেখা করলেন লে. জেনারেল আলি কারাম। এই গাড়িই ওদেরকে শহরে নিয়ে যাবে। মুখে অমায়িক

হাসি নিয়ে মাহমুদের সাথে করমর্দন করলেন তিনি, কিন্তু রানা ঠিকই টের পেল, ওর ওপর ভদ্রলোক খেপে একেবারে আগুন হয়ে আছেন। গাড়ির দিকে এগোল সবাই, গলা খাদে নামিয়ে রানাকে তিনি বললেন, 'এসবের পিছনে উপযুক্ত কারণ থাকা চাই।'

'আছে।'

সারাক্ষণ সাথে থাকল মাহমুদ, কাজেই রানাকে জেরা করার কোন সুযোগই পেলেন না আলি কারাম। কায়রো শহরে পৌঁছে ওদেরকে নিয়ে সরাসরি প্রেসিডেন্ট ভবনে চলে এল গাড়ি। রানা আর মাহমুদ একটা কামরায় বসল, ওদিকে প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করা কেন দরকার ইত্যাদি বোঝাবার জন্যে ভেতরে চলে গেলেন আলি কারাম।

দু'মিনিট পর ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো ওদেরকে। আলি কারাম বললেন, 'ও মাসুদ রানা, স্যার।'

হ্যান্ডশেক করল ওরা। প্রেসিডেন্ট বললেন, 'আগে আমাদের দেখা হয়নি, কিন্তু আপনার কথা আমি শুনেছি, মি. রানা।'

আলি কারাম বললেন, 'আর অ্যান্টোয়ার্প থেকে এসেছেন, ইনি মি. মাহমুদ জুবের।'

'মি. মাহমুদ,' প্রেসিডেন্ট মৃদু হাসলেন, 'আপনি অত্যন্ত সাবধানী মানুষ। আপনার রাজনীতিক হওয়া উচিত। এখন তাহলে...প্লীজ, আমাদের এই কাজটা একটু করে দিন। এই কাজের গুরুত্ব অনেক, করলে আপনার কোন ক্ষতি হবে না।'

বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে ছিল মাহমুদ, হঠাৎ তার মধ্যে প্রাণ ফিরে এল। 'ইয়েস, স্যার! অবশ্যই করব আমি। আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে আমি দুঃখিত...'

'মোটেও দুঃখিত হবেন না। আপনি ঠিক কাজই করেছেন।' আবার তিনি মাহমুদের সাথে হ্যান্ডশেক করলেন। 'আসার জন্যে ধন্যবাদ। গুডবাই।'

এয়ারপোর্টে ফেরার সময় চেহারা দেখে মনে হলো আগের চেয়ে উত্তপ্ত হয়ে আছেন আলি কারাম। সামনের সীটে গম্ভীর হয়ে বসে আছেন তিনি, সিগার টানছেন, হাত দুটো নিশপিশ করছে। এয়ারপোর্টে পৌঁছে মিনিট খানেকের জন্যে রানাকে একা পেলেন তিনি। 'আবার যদি তুমি এ-ধরনের...' শব্দ খুঁজে না পেয়ে চুপ করে গেলেন তিনি।

'এর দরকার ছিল,' বলল রানা। 'লাগল তো মাত্র আধ মিনিটের মত, কি আর এমন ক্ষতি হয়েছে?'

'ও, তোমার বুঝি তাই ধারণা? কোন ক্ষতি হয়নি? জানো, তোমার ওই আধ মিনিট সময় বের করার জন্যে আমার ডিপার্টমেন্টের অর্ধেক লোক সারাটা দিন গাধার খাটনি খেটেছে?' এক সেকেন্ড বিরতি নিয়ে ঝাঁঝের সাথে আবার বললেন, 'মাথায় রিভলভার ঠেকিয়ে বা অন্য কোনভাবে লোকটাকে রাজি করানো যেত না?'

'তা হয়তো যেত,' বলল রানা। 'কিন্তু আপনারা বা আমরা, বর্বর তো আর

নই।'

রাতের ফ্লাইটে ইউরোপে ফেরার সময় প্লেনে খানিকটা জিন খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল মাহমুদ। কাজে হাত দেবার পর থেকে কি কি করেছে সে, তার একটা হিসেব করতে বসল রানা। সেই মে মাসে শুরু করেছে ও, তখন কোন ধারণাই ছিল না কিভাবে মিশরকে ইউরেনিয়াম চুরি করে নিয়ে এসে দেয়া যায়। একেকবারে একটা করে সমস্যা এসেছে, সেটার সমাধান বের করেছে ও। সেইসাথে নিজের নিয়মিত দায়িত্ব পালন তো রয়েছেই। কাজ কামাই দেয়নি সে একটা দিনও। এটা বাড়তি কাজ। প্রথম সমস্যা ছিল, কোথায় ইউরেনিয়াম আছে সেটা জানা। তারপর মিছিল করে একের পর এক সমস্যা এসেছে, কোন্ ইউরেনিয়াম চুরি করা যায়, কিভাবে একটা জাহাজ হাইজ্যাক করা সম্ভব, চুরির সাথে মিশরের সম্পর্ক কিভাবে কিভাবে ঢাকা যায়, ইউরেনিয়াম হারিয়ে গেছে এই খবর কর্তৃপক্ষকে জানাবার রাস্তা কি করে বন্ধ করা যায়, ইউরেনিয়ামের মালিককে কিভাবে প্রবোধ দেয়া সম্ভব। শুরুতে যদি গোটা প্ল্যানটা কল্পনা করতে বসত ও, এত সব জটিলতা দেখতেই পেত না।

ভাগ্য ওকে সহায়তা করেছে, আবার শত্রুতা করতেও ছাড়েনি। ইমপেরিয়ালের মালিক অ্যান্টোয়ার্পের একজন মুসলমানের ক্রু এজেন্সী থেকে লোক সংগ্রহ করে, সোনার মেডেল পাওয়ার মতই ভাগ্য এটা। নন-নিউক্লিয়ার খাতে এক কনসাইনমেন্ট ইউরেনিয়ামের অস্তিত্ব আছে, সেটা আবার সাগর পথে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে, এ-ও কম ভাগ্যের কথা নয়। রানার দুর্ভাগ্য বলতে গেলে একটাই, এবং সমস্ত জটিলতা তা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে—লুক্সেমবার্গে ন্যাট কোহেনের সাথে দেখা হয়ে যাওয়া।

মলমের ভেতর একটা পোকা, এই কোহেন। প্লেন ধরে নিউ ইয়র্কে যাবার আগে প্রতিপক্ষের চোখে ধুলো দিতে পেরেছে, এ ব্যাপারে মনে কোন সন্দেহ নেই রানার। ওখানে আলবার্তো ফেলিনির সাথে দেখা করেছে ও, সে-খবর কেউ জানে না। তারপর আর নতুন করে ওঁদের চোখে ধরা পড়েনি ও। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ওরা চুপ করে বসে আছে। তাকে হারিয়ে ফেলার আগে ওরা কি কি জানতে পেরেছে না পেরেছে বুঝতে পারলে একটা কাজ হত।

গোটা ব্যাপারটা চুকে না গেলে এষার সাথে দেখা করতে পারছে না রানা, এর জন্যেও ওই ব্যাটা কোহেনই দায়ী। রানা এখন যদি আবার অক্সফোর্ডে যায়, যেভাবেই হোক কোহেন ওর গন্ধ পেয়ে যাবে।

নামতে শুরু করল প্লেন। সীট বেল্ট বেঁধে নিল রানা। সমস্ত কিছু করা হয়েছে, আঁটঘাট বাঁধা শেষ। বেঁটে দেয়া হয়ে গেছে তাস। নিজের হাতে কি আছে জানে রানা, প্রতিপক্ষের হাতে দু'একটা তাস কি পড়েছে তাও জানে ও, তারাও ওর দু'একটা তাসের কথা জানে। এখন শুধু বাকি আছে শুরু করে খেলাটা শেষ করা, কিন্তু শেষটায় কে জিতবে কে হারবে কেউ তা বলতে পারে না।

ভবিষ্যৎটা আরও পরিষ্কার দেখতে পেলে ভাল হত, ভাল হত প্ল্যানটা আরও কম জটিল হলে। জানে, প্রাণের ঝুঁকি নিতে হবে ওকে, কিন্তু সেজন্যে ভয় পায় না ও। এখন শুধু খেলা শুরু হওয়ার অপেক্ষা। সেটা যত তাড়াতাড়ি শুরু হয় ততই

ভাল।

ঘুম থেকে জাগল মাহমুদ। 'আমি স্বপ্ন দেখিনি তো?' চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকাল সে।

'না,' বলল রানা। অপ্রীতিকর আরও একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে। মাহমুদকে ভয় দেখিয়ে আধ-মরা করতে হবে। 'মনে আছে, আপনাকে আমি বলেছিলাম, ব্যাপারটা কনফিডেনশিয়াল, গোপন করে রাখতে হবে?'

'খুব মনে আছে,' বলল মাহমুদ। 'চিন্তার কিছু নেই, কোথাও আমি মুখ খুলব না। ব্যাপারটার গুরুত্ব আমি বুঝেছি।'

'বোঝেননি। স্ত্রী ছাড়া আর কাউকে যদি ঘটনাটা জানান, আমরা কিন্তু ভয়ঙ্কর অ্যাকশন নেব।'

'কি বলছেন আপনি? আপনি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, ভয় পেলে সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। মুখে যদি তালা না লাগান, কোন সন্দেহ নেই, আপনার স্ত্রীকে আমরা খুন করব।'

বিমূঢ় চেহারা নিয়ে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল মাহমুদ। রানার চোখে পলক নেই, দৃষ্টিতে এমন কিছু রয়েছে, বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল মাহমুদের। ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে। নামছে প্লেন।

পাঁচ

গভীর রাত। ওয়াশিংটনের হোটেল গোল্ডেন ব্রিজের একটা কামরায় শুয়ে আছে ন্যাট কোহেন। শত চেষ্টা করেও ঘুমাতে পারছে না।

ইমপেরিয়ালে রানা পৌঁছবার আগেই ইসরায়েলের উচিত হবে সেটা হাইজ্যাক করা। কথাটা বলা সহজ, কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে যতই চিন্তা করছে সে ততই আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে। ইসরায়েলী নেভি বা কমান্ডো বাহিনীকে এর সাথে জড়ানো চলবে না, জানিয়ে দেয়া হয়েছে। বিকল্প হিসেবে একটা ভাড়াটে গেরিলা গ্রুপের সাহায্য চাওয়া হয়েছে—ইউরোপে নাকি এদের চমৎকার সেটআপ আছে। ইমিডিয়েট বসের কাছ থেকে হদিশ নিয়ে গেরিলা কমান্ডারের সাথে দেখা করার জন্যে রোমে গিয়েছিল কোহেন।

লোকটার নাম কাওয়াশ, একজন ইহুদি। চেহারা দেখে স্রেফ গুণ্ডা বলে মনে হয়। হামবড়া একটা ভাব থাকলেও, লোকটাকে বোকা বলে মনে হয় না। আলোচনার প্রথম দিকেই কোহেনের এক প্রশ্নের উত্তরে কাওয়াশ জানিয়ে দিয়েছে, বাইরের আর কারও সাহায্য লাগবে না তার, এই সামান্য কাজ তার দল একাই করতে পারবে।

কাওয়াশ এখন বেনগাজীতে, জাহাজ ভাড়া করতে গেছে। দলের লোকদের কাছে খবর পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, দুনিয়ার নানা জায়গা থেকে কোথাও জড় হবার জন্যে আসছে তারা।

কিন্তু সবচেয়ে কঠিন কাজটা চেপেছে কোহেনের ঘাড়ে। রানার আগে

ইসরায়েলীরা যদি ইমপেরিয়াল দখল করতে চায়, তাকে আগে থেকে জানতে হবে ঠিক কোথায় আর কখন ইমপেরিয়ালকে হাইজ্যাক করবে বলে ঠিক করেছে রানা। সেজন্যেই সি.আই.এ-র সাহায্য দরকার কোহেনের।

কিন্তু রিচির কাছে আবার ফিরে এসে অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেছে কোহেন। গেরিলা দলের নেতা কাওয়াশের সাথে কথা বলার আগে পর্যন্ত নিজেকে সে বলতে পারত, দুটো প্রতিষ্ঠানের হয়ে একটাই উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে সে। কিন্তু এখন যে সে একজন ডাবল এজেন্ট তাতে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই—সি.আই.এ-র সাথে একই উদ্দেশ্যে কাজ করার ভান করছে বটে, আসলে ওদের প্ল্যান ভণ্ডুল করে দেয়াই তার কাজ।

সি.আই.এ-কে বোকা বানাতে যাচ্ছে সে, এই চিন্তাটাই সাংঘাতিক উত্তেজিত আর নার্ভাস করে তুলছে তাকে। সেই সাথে ভয় লাগছে, তার ভেতর এই যে পরিবর্তন ঘটে গেছে, এটা বোধহয় রিচির চোখে ধরা পড়ে যাবে।

ভোর রাতের দিকে ঘুম এল বটে, কিন্তু একের পর এক দুঃস্বপ্ন ঘুমটাকে গভীর হতে দিল না।

সকাল দশটায় সি.আই.এ. হেডকোয়ার্টারে রিচির সাথে দেখা করল কোহেন। রিচির ইমিডিয়েট বস্ হেনরি মিলারের অফিসে ছিল রিচি, সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। হেনরির সাথে গতকালই পরিচয় হয়েছে তার। কোন একটা ব্যাপার নিয়ে দু'জনে তুমুল তর্ক হচ্ছিল, ওকে দেখে দু'জনেই চুপ করে গেল। ভাল করে কিছুই শুনতে পায়নি কোহেন, কিন্তু বুঝতে পারল, রিচির সাথে তার বসের সম্পর্ক সুবিধের নয়। একটু পর ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হয়ে গেল; বুঝতে পারল, একজন আরেকজনকে দু'চোখে দেখতে পারে না।

রিচির পাশে একটা চেয়ার টেনে বসল কোহেন। জানতে চাইল, 'ইতিমধ্যে আর কতদূর কি এগিয়েছে?'

রিচি আর হেনরি পরস্পরের দিকে তাকাল একবার। কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে থাকল রিচি। কোহেনের প্রশ্নের জবাব এল হেনরির কাছ থেকে।

অরিয়নে অত্যন্ত শক্তিশালী একটা রেডিও বীকন রোপণ করা হয়েছে। ড্রাই ডক থেকে নেমে এসেছে সে, এই মুহূর্তে বে অভ বিসকে ধরে দক্ষিণ দিকে এগোচ্ছে। অনুমান করা হচ্ছে, পোর্ট সাঈদে নোঙর ফেলবে জাহাজটা, ওখান থেকে ক্রু হিসেবে তুলে নেবে মিশরীয় ইন্টেলিজেন্স এজেন্টদের। সবশেষে হেনরি বলল, 'আমাদের ইন্টেলিজেন্স বেশ ভালই করছে। এখন আমাদেরকে অ্যাকশনে নামতে হবে।'

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সিগারেট ধরাল রিচি।

'অ্যাকশন?' জানতে চাইল কোহেন।

'ইস্তাম্বুলে যাচ্ছে রিচি, ব্রিটিশ মার্চেন্ট শিপ সি. ভি. হোয়াইট রোজে চড়বে,' বলল হেনরি। 'বাইরে থেকে দেখে ওটাকে সাধারণ কার্গো ভেসেল বলে মনে হলেও, অতিরিক্ত কিছু ইকুইপমেন্ট থাকায় স্পীড খুব বেশি। প্রায়ই আমরা ওটাকে ব্যবহার করি।'

সিলিঙের দিকে তাকিয়ে আছে রিচি, চেহারায় অসন্তোষের ছায়া। কোহেন

আন্দাজ করল, এত কথা তাকে জানতে দিতে চায় না রিচি। কে জানে, হয়তো এই নিয়েই বসের সাথে তর্ক হচ্ছিল ওর।

হেনরি বলে চলল, 'তোমার কাজ হবে একটা ইসরায়েলী ভেসেল ম্যানেজ করা, সেটা নিয়ে মেডিটেরেনিয়ানে চলে যাবে তুমি, তারপর হোয়াইট রোজের সাথে যোগাযোগ করবে।'

'তারপর?'

'ইমপেরিয়ালে হিলারী আছে, তোমাদের সাথে যোগাযোগ করবে ও। মাসুদ রানা কখন হাইজ্যাক করবে, ওর কাছ থেকে জানতে পারবে সেটা। ইমপেরিয়াল থেকে অরিয়নে ইউরেনিয়াম সরানো হতে পারে, কিংবা হয়তো ইউরেনিয়াম সহ ইমপেরিয়ালকেই পোর্ট সাঈদে নিয়ে যাবার প্ল্যান করবে ওরা। সব খবরই জানাবে তোমাদের হিলারী।'

'তারপর?' জানার কৌতূহল চেপে রাখতে রাজি নয় কোহেন।

হেনরি আবার বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে বাধা দিল রিচি। কোহেনের দিকে ফিরল সে, বলল, 'আমি চাই তেল আবিবকে তুমি একটা কাভার স্টোরি শোনাবে। আমি চাই তোমার লোকেরা যেন মনে করে ইমপেরিয়াল সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না, জানার মধ্যে শুধু জানি, মিশরীয়রা মেডিটেরেনিয়ানে কিছু একটা ঘটাবার প্ল্যান করছে, সেটা কি আমরা আবিষ্কারের চেষ্টা করছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হলো কোহেন, চেহারায় নিরীহ একটা ভাব ফুটিয়ে রাখল। বুঝল, প্ল্যানটা কি সেটা ওর জানা দরকার, কিন্তু রিচি ওকে জানতে দিতে চায় না। মনে মনে বলল, রাখো শালা, বোঝাচ্ছি তোমাকে! গোবেচারা ভাবটা চেহারায় ধরে রেখেই বলল সে, 'ঠিক আছে, তেল আবিবকে তাই বলব আমি, কিন্তু তুমি যদি আসল প্ল্যানটা আমাকে জানাও, তবেই।'

হেনরির দিকে ফিরে কাঁধ ঝাঁকাল রিচি। হেনরি বলল, 'হাইজ্যাকের পর হোয়াইট রোজ মাসুদ রানার পিছু নেবে, মানে রানার জাহাজের পিছু নেবে—যেটায় ইউরেনিয়াম থাকবে। ওই জাহাজের সাথে ধাক্কা খাবে হোয়াইট রোজ।'

'কি! ধাক্কা খাবে মানে?'

'সংঘর্ষটা চাক্ষুষ করবে তোমার জাহাজ,' বলে চলল হেনরি। 'রিপোর্ট করবে। দেখবে, রানার জাহাজের ক্রুরা সবাই মিশরীয় আর তাদের কার্গো হলো ইউরেনিয়াম। এসবও রিপোর্ট করবে তুমি। সংঘর্ষের কারণ অনুসন্ধানের জন্যে আন্তর্জাতিক তদন্ত হবে। জাহাজে মিশরীয় ক্রু আর চুরি করা ইউরেনিয়াম আছে, এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হবে। ইমপেরিয়ালকে আমরা নিজেদের পছন্দ মত কোন বন্দরে নিয়ে যাব, সেখানে অ্যারেস্ট হবে রানা, যদি সে তখনও বেঁচে থাকে। ইউরেনিয়ামটা তার মালিককে অর্ধেক দামে ফিরিয়ে দেয়া হবে। ইতিমধ্যে সারা দুনিয়ায় ঢি ঢি পড়ে যাবে, চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যাওয়ায় মুখ দেখানো ভার হয়ে উঠবে মিশরের। জাতিসংঘে এবং অন্যান্য ওয়ার্ল্ড ফোরামে তার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব উঠবে। বাংলাদেশকেও কেউ ছেড়ে কথা বলবে না। চোরের মাসতুতো ভাই হিসেবে তার মাথাতেও ঢালা হবে কিছুটা ঘোল।'

'কিন্তু মিশরীয়রা মোমের পুতুল নয়, তারা লড়বে।'

রিচি বলল, 'তাহলে তো আরও ভাল হয়। ওরা আমাদের ওপর হামলা চালালে তুমিও তো সেটা দেখতে পাবে, তোমার সাহায্য পেলে এমন ধোলাই দেব ওদের, শালারা বাপের নাম পর্যন্ত ভুলে যাবে।'

'প্ল্যানটা খুবই ভাল,' বলল হেনরি। 'একেবারে পানির মত সহজ। শুধু একটা ধাক্কা লাগানোর ব্যাপার, বাকি সব আপনাআপনি ঘটবে।'

'হ্যাঁ, প্ল্যানটা ভালই,' বিড়বিড় করে বলল কোহেন। গেরিলা গ্রুপের প্ল্যানের সাথে এর কোন বিরোধ দেখল না সে। রানা জানে না, কিন্তু কোহেন জানে, ইমপেরিয়ালে হিলারী রয়েছে। কাওয়াশ তার দল নিয়ে ইমপেরিয়াল হাইজ্যাক করার পর রানা আর মিশরীয়দের জন্যে অ্যামবুশ পাতবে, তারপর হিলারীকে তার রেডিওসহ সাগরে ফেলে দিলেই হবে, ইমপেরিয়ালের সন্ধান পাবার আর কোন উপায় থাকবে না রিচির।

কিন্তু সমস্যাটা এখনও রয়ে যাচ্ছে। ইমপেরিয়ালকে কখন আর কোথায় হাইজ্যাক করবে বলে ঠিক করেছে রানা, সেটা জানতে না পারলে ওখানে কাওয়াশ আগেভাগে পৌঁছবে কিভাবে?

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে হেনরির দিকে বাড়িয়ে দিল কোহেন। চেহারা দেখে বোঝা গেল, খুশি হয়েছে লোকটা। লাইটার জ্বেলে তার সিগারেট ধরিয়েও দিল কোহেন। ব্যাপারটা নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে দেখল রিচি, কিন্তু ওর অন্তরটা যে জ্বলে যাচ্ছে সেটা বুঝতে অসুবিধে হলো না কোহেনের। হেনরিকে বলল সে, 'রানা ঠিক কখন আর কোথায় হাইজ্যাক করবে ইমপেরিয়াল, সেটা আমাদের জানা দরকার।'

'কেন?' কর্কশ সুরে জানতে চাইল রিচি। 'ইমপেরিয়ালে হিলারী রয়েছে, অরিয়নে রেডিও বীকন রয়েছে—জাহাজ দুটো কখন কোথায় থাকবে সবসময় জানতে পারছি আমরা। ওগুলোর কাছাকাছি থাকলেই চলবে আমাদের, সময় হলে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসব।'

'ঠিক সময়টাতে আমার জাহাজকেও কাছাকাছি কোথাও থাকতে হবে,' বলল কোহেন।

'অসুবিধেটা কোথায়?' ধৈর্য হারাবার সুরে জিজ্ঞেস করল রিচি। 'অরিয়নকে ফলো করলেই হবে, ঠিক দিগন্তরেখার নিচে থাকলে ওরা তোমাকে দেখতেও পাবে না, রেডিও সিগন্যালও পাবে তুমি। কিংবা হোয়াইট রোজে আমি থাকছি, আমার সাথেও যোগাযোগ রাখতে পারো।'

'কিন্তু ধরো, বীকন যদি অকেজো হয়ে যায়, আর হিলারী যদি ধরা পড়ে?'

'সে-ধরনের কিছু ঘটবে বলে আমি মনে করি না,' বলল রিচি। 'ঘটতে পারে এই ভয়ে আবার আমরা রানার পিছু নিতে পারি না। সেটা ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে। রানাকে যদি খুঁজে পাই, সাথে সাথে সে-ও টের পাবে, আমরা আবার তাকে খুঁজে পেয়েছি। কাজেই হয় আবার সে গা ঢাকা দেবে, নয়তো প্ল্যান বদল করবে। কোনটাই আমাদের জন্য সুখবর হবে না।'

'তবে কোহেনের কথার মধ্যেও কিছুটা যুক্তি আছে,' ফোড়ন কাটল হেনরি।

ইমিডিয়েট বসের দিকে চোখ গরম করে তাকাল রিচি, কিন্তু কোন কথা বলল

না।

'আর একবার চিন্তা করে দেখতে বলি আমি,' বলল কোহেন। 'এর মধ্যে আমার ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ নেই। আমি চাই, শত্রুরা যেন আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে যেতে না পারে।'

'অনেক চিন্তা করেছি,' বলল রিচি। 'এই প্ল্যানের মধ্যে কোথাও কোন খুঁত নেই। এর মধ্যে নতুন কিছু যোগ করতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। যা বলছি, করো। তেল আবিবে ফিরে গিয়ে একটা জাহাজ দেখো। শুধু হোয়াইট রোজের সাথে যোগাযোগ রাখতে ভুলো না। বাকি সব আমার হাতে ছেড়ে দাও।'

ধীরে ধীরে, কিন্তু অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হেনরির দিকে তাকাল কোহেন। 'আপনি বোধহয় আমার সমস্যাটা বুঝবেন। এই প্ল্যানে অনেকগুলো অনিশ্চিত পয়েন্ট রয়েছে, সেগুলো এখানে বসে আমরা যদি মীমাংসা না করতে পারি, তেল আবিবে ফিরে গিয়ে কিভাবে বলব আমি যে প্ল্যানটা নিখুঁত, সে ব্যাপারে আমি সন্তুষ্ট?'

'ঠিকই তো,' বলল হেনরি।

চেহারা থেকে হঠাৎ করেই সমস্ত রাগের ভাব কেটে গেল, ঠোঁট বাঁকা করে নিঃশব্দে হাসল রিচি। 'ঠিক-বেঠিক বুঝি না। এই প্ল্যান আমি খোদ চীফের কাছ থেকে পাস করিয়ে এনেছি, এর আর কোন নড়চড় হবে না।'

হেনরি দলে আছে, কাজেই রিচিকে কোণঠাসা করা কঠিন হবে না, খানিক আগে পর্যন্ত তাই ভাবছিল কোহেন। কিন্তু সি.আই.এ. চীফ নিজে এই প্ল্যান অনুমোদন করেছেন শুনে সমস্ত আশা ধুলোয় মিশে গেল তার। হেনরির চেহারা দেখে বোঝা গেল, রিচির এই কথার ওপর কথা বলার সাহস পাচ্ছে না সে। কোহেন আন্দাজ করল, কোন কারণে হেনরির চেয়ে রিচিই সি.আই.এ. চীফের কাছে বেশি প্রিয়।

হেনরি মিন মিন করে বলল, 'প্রয়োজন দেখা দিলে প্ল্যান বদল করা যাবে না এমনও তো নয়।'

'যাবে,' বলল রিচি। বাঁকা হাসিটা তার ঠোঁটে লেগেই আছে। 'কিন্তু সেজন্যে চীফের অনুমোদন লাগবে। আমি কিন্তু নিজের ছাড়া আর কারও পক্ষ নিয়ে সুপারিশ করব না।'

হেনরির ঠোঁট জোড়া পরস্পরের সাথে শক্তভাবে চেপে থাকল। অনেকক্ষণ পর বিড় বিড় করে বলল সে, 'ঠিক আছে, যেভাবে আছে সেভাবেই থাক সব।'

মন খারাপ করে সি. আই. এ. হেড কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এল কোহেন। আশাটা পূরণ হবার নয়, রিচি তাকে কোন সাহায্য করবে না। অথচ রানা কোথায় এবং কখন হাইজ্যাক করবে ইমপেরিয়াল, এটা জানার ওপর নির্ভর করছে কাওয়াশের সাফল্য।

রানাকে খুঁজে বের করতে হবে। কথাটা মনে হতেই নিজেকে অসহায় লাগল কোহেনের। রানার বুদ্ধির কাছে তার বুদ্ধি অবোধ শিশু মাত্র, এটা সে অন্তর থেকে উপলব্ধি করে। কিভাবে কি করবে বলে ভেবে রেখেছে রানা, আন্দাজ করার সাধ্য নেই তার। তাছাড়া, এটা অনুমান করার ব্যাপার নয়, নিশ্চিতভাবে জানতে হবে।

ইমপেরিয়াল হাইজ্যাকের প্ল্যানটা রানার একটা গোপন প্ল্যান, একার চেষ্টায় সেই রহস্য ভেদ করতে হবে কোহেনকে। ব্যাপারটা গোটা একটা পাহাড় গিলে হজম করার মতই কঠিন লাগল তার কাছে।

কয়েকটা দিন আতঙ্কের মধ্যে কাটল কোহেনের। তেল আবিবে ফিরে রিচির কথা বলল বসকে, জাহাজেরও একটা ব্যবস্থা হলো। যে সমস্যা নিয়ে এত মাথাব্যথা তার, সেটার কথা বসকে বা আর কাউকে কিছু বলল না সে। জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সে একজন ডাবল এজেন্ট আছে, কথাটা সে-ও বিশ্বাস করে।

তারপর সমস্যার কথা ভুলে গিয়ে নিজের আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবার চেষ্টা করল কোহেন। প্রথমেই নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল সে, এজেন্ট হিসেবে তার অভিজ্ঞতা খুব বেশি নয়। কাজেই যোগ্য এজেন্টদের পদ্ধতি থেকে শিখতে হবে তাকে। চেষ্টা করলে কি না হয়, কথাটা মনে রেখে রিচির পদ্ধতি রোমন্থন করতে শুরু করল সে।

রিচি স্বাধীনচেতা, আত্মবিশ্বাসী, যোগ্য, মেধাবী। যখন কোন সূত্র নেই, গন্ধ নেই, অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে, তখনও হাল ছেড়ে দেয়া স্বভাব নয় তার। তখনও কিভাবে যেন রানার খোঁজ বের করে ফেলে সে। একবার নয়, দু'দু'বার এই জাদু দেখিয়েছে সে। কিভাবে?

নির্দিষ্ট একটা ঘটনার সব কথা মনে পড়ে গেল কোহেনের।

—কি আছে লুক্সেমবার্গে? কিসের জন্যে বিখ্যাত লুক্সেমবার্গ? তোমার ব্যাংকই বা এখানে কেন?

—এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ইউরোপিয়ান রাজধানী। আমার ব্যাংক এখানে কারণ ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক এখানে। তাছাড়া, এখানে বেশ কয়েকটা কমন ইন্সটিটিউশনও রয়েছে।

—যেমন?

—সেক্রেটারিয়েট অভ দ্য ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট, দ্য কাউন্সিল অভ মিনিস্টারস, এবং কোর্ট অভ জাস্টিস। ও, হ্যাঁ, ইউরাটমও আছে।

—ইউরাটম?

আরও একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল কোহেনের। কোথায় পাওয়া যাবে রানাকে, কোথায় পাওয়া যাবে, কোথায় পাওয়া যাবে···ভাবতে ভাবতে একটা বুদ্ধি এসে গেল রিচির মাথায়। কোহেন, অক্সফোর্ডে যাও তুমি। প্রফেসর ফিলমনটনকে তুমিও চেনো, রানাও চেনে। তোমার সম্পর্কে কিছু জানতে হলে ওই প্রফেসরের কাছে যেতে হবে রানাকে।

রিচির পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো, ছোটখাট খবরগুলোকে কাজে লাগানো, সমস্ত তাৎপর্যহীন তথ্যকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা। লক্ষ্যে পৌছনোর জন্যে একচুল একচুল করে এগোনো।

কিন্তু ছোটখাট তথ্য যেখানে যত ছিল সবই ব্যবহার করা হয়ে গেছে। তাহলে উপায়? রানা সম্পর্কে কি কি জানে, কি কি মনে আছে সব স্মরণ করার চেষ্টা করল কোহেন। ভাল দাবা খেলত রানা, নিয়মিত ব্যায়াম করত, কথা বলত খুব কম, পড়াশোনা নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকত তা নয়, কারণ মাথাটা চিরকালই ভাল ছিল। আরও অনেক কথা মনে পড়ল কোহেনের। চুপি চুপি মানুষের উপকার করত রানা।

মনটা ছিল নরম, কিন্তু কেউ কোন অন্যায় করলে তাকে নিষ্ঠুর হয়ে উঠতেও দেখেছে সে। আদর্শ, সৎ চরিত্র। ধেত্তেরী ছাই, শালাকে আমি দেখছি দেবতা বানিয়ে ছাড়ব! নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠল কোহেন।

রানার আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। ওর কোন দুর্বলতার কথা আমি জানি না। তবে একজন ওর সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশি জানতে পারেন। প্রফেসর ফিলমনটন।

আরে, তাই তো! বিদ্যুৎ চমকের মত বুদ্ধিটা এসে গেল মাথায়। প্রফেসর ফিলমনটনের কাছে গেলেই তো হয়! তিনি হয়তো রানা সম্পর্কে অনেক তথ্যই দিতে পারবেন তাকে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কোহেন। অক্সফোর্ডে যাবে সে।

তেল আবিব থেকে লন্ডন, প্লেনে করে। এয়ারপোর্ট থেকে প্যাডিংটন স্টেশন, ট্যাক্সি নিয়ে। স্টেশন থেকে অক্সফোর্ড, ট্রেনে করে। নদীর ধারে সবুজ আর সাদা রঙ করা বাড়ির সামনে, ট্যাক্সিতে। সারাটা পথ প্রফেসর ফিলমনটনের কথা ভাবল কোহেন।

সত্যি কথা বলতে কি, মানুষ হিসেবে প্রফেসর ফিলমনটনকে তার তেমন পছন্দ নয়। যুবা বয়সে হয়তো তার মধ্যে প্রাণ-চাঞ্চল্য ছিল, কিন্তু কোহেন তাকে অথর্ব একজন কথার রাজা হিসেবেই চেনে। রাজনীতি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন, কিন্তু সেটা শুধু মুখেই। ইসরায়েলের ঘোর সমর্থক হলে কি হবে, এক চাঁদা তোলা কমিটির চেয়ারম্যান হওয়া ছাড়া ইসরায়েলের জন্যে কিছুই করেনি। এমন একজন মেরুদণ্ডহীন লোক, যে নিজের স্ত্রীকেও সামলে রাখতে পারে না; এই রকম একজন অকর্মা বুড়োকে কিভাবে শ্রদ্ধা করা যায়?

হ্যাঁ, কোহেনকে তিনি একটু সুনজরে দেখতেন বটে। কিন্তু রানার প্রতি তাঁর অন্য ধরনের দুর্বলতা ছিল। রানার সামনে না হলেও, ওর পিছনে দারুণ প্রশংসা করতেন তিনি। একটা ব্রেন বটে, একটা ব্যক্তিত্ব বটে—এই ধরনের উক্তি প্রায়ই বেরিয়ে আসত তাঁর মুখ থেকে। রানা সম্পর্কে যিনি এই রকম প্রশংসায় পঞ্চমুখ, রানার বিরুদ্ধে তাঁকে কাজে লাগানো যায় কিভাবে?

রানা বাংলাদেশী, কাজেই ইসরায়েলের শত্রু, এসব কথা বলে কি প্রফেসরকে দলে টানা যাবে? নাকি সমস্ত ঘটনা খুলে বলতে হবে? অনেক চিন্তা-ভাবনা করে ঠিক করল কোহেন, লুকোছাপা করে লাভ হবে না। প্রফেসরের সাহায্য পেতে হলে সব কথা তাঁকে খুলে বলাই দরকার।

কুশল ইত্যাদি বিনিময়ের পর দু'গ্লাস শেরি নিয়ে ছায়া-ঘেরা বাগানে বসল ওরা। প্রফেসর ফিলমনটন জানতে চাইলেন, 'এত তাড়াতাড়ি আবার লন্ডনে কি মনে করে?'

সত্যি কথাই বলল কোহেন, 'আমি রানাকে ধাওয়া করছি।'

সামনে নদী নিয়ে বাগানের এক কোণে দুটো বেতের চেয়ারে বসে আছে ওরা, ঘন ঝোপে তিন দিক ঘেরা জায়গাটা। কোহেনের স্পষ্ট মনে আছে, প্রথমবার এখানেই রাজিয়া ফিলমনটনকে ধরাশায়ী করতে পেরেছিল সে। সমস্ত অর্থেই সেটা

ছিল একটা ধর্ষণের ঘটনা।

হঠাৎ করে কিছু না বললেও, প্রফেসরের চেহারায় সতর্ক একটা ভাব ফুটে উঠল। একটু যেন উদ্বিগ্নও দেখাল তাঁকে। খানিক পর শান্ত গলায় জানতে চাইলেন, 'সব খুলে বলো আমাকে।'

কোহেন লক্ষ্য করল, বয়স বাড়ার সাথে সাথে একটু যেন সৌখিন হয়ে উঠেছেন প্রফেসর। জুলফি জোড়া আগের চেয়ে লম্বা আর চওড়া করে রেখেছেন, মাথায় অল্প যে ক'টা চুল আছে সব সাদা হয়ে গেলেও বেশ লম্বা হতে দিয়েছেন। পরনে ডেনিম জীন্‌স, জ্যাকেট, কোমরের বেল্টটা সাংঘাতিক চওড়া।

'বলব বলেই তো এসেছি।' ঢোক গিলল কোহেন। নিজের ওপর আস্থা রাখতে পারছে না। রিচি বোধহয় এই পরিস্থিতিতে আরও ভালভাবে উতরে যেতে পারত। 'কিন্তু তার আগে আপনাকে কথা দিতে হবে, আমি যা বলব তা আর কারও কানে যাবে না।'

'বেশ।'

'রানা একজন বাংলাদেশী স্পাই। একটা কাজের জন্যে মিশর ভাড়া করেছে তাকে। মানে, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কাজ করছে মাসুদ রানা।'

বৃদ্ধ ফিলমনটনের চোখ-জোড়া কুঁচকে ছোট হয়ে গেল, কিন্তু কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকলেন তিনি।

বলে চলেছে কোহেন, 'মিশর অ্যাটম বোমা বানাতে চাইছে, কিন্তু ওদের হাতে প্লুটোনিয়াম নেই। গোপনে ইউরেনিয়াম যোগাড় করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে ওরা, রিয়্যাক্টরে ফেলে তা থেকে প্লুটোনিয়াম বের করবে। রানার কাজ হলো, যেখান থেকে হোক, যেভাবে হোক ইউরেনিয়ামের একটা চালান ওদেরকে যোগাড় করে দেয়া। আর আমার কাজ হলো, রানাকে খুঁজে বের করা, তারপর তাকে এই কাজ থেকে বিরত করা। আমি আপনার কাছ থেকে সাহায্য চাইতে এসেছি।'

গ্লাসের ভেতর তাকিয়ে থাকলেন প্রফেসর, তারপর এক চুমুকে শেরিটুকু নিঃশেষ করে বললেন, 'দুটো প্রশ্ন উঠছে এখানে।' সাথে সাথে কোহেন বুঝল, প্রফেসর ব্যাপারটাকে একটা ইন্টেলেকচুয়াল সমস্যা হিসেবে দেখতে চাইছেন। কাপুরুষ অ্যাকাডেমিশিয়ানের চিরাচরিত আচরণ, ঝামেলার মধ্যে নিজেকে জড়াতে রাজি নয়। 'প্রথমটা হলো, আমি সাহায্য করতে পারি কিনা। দ্বিতীয়টা, আমি সাহায্য করব কিনা। শেষেরটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ, অন্তত আমি তাই মনে করি। নৈতিক বিচারে।'

কোহেন ভাবল, শালা বুড়ো, আমি তোমার মাথায় পাথর বসিয়ে হাতুড়ি দিয়ে ঠুকব। মুখে বলল, 'করবেন না কেন? আপনি ইসরায়েলের ভাল চান না? চোখের সামনে তার এত বড় একটা সর্বনাশ হতে দেখেও চুপ করে থাকতে পারবেন?'

'ব্যাপারটা অত সহজ হলে তো কথাই ছিল না। বয়সে অনেক ছোট হলেও, যাদেরকে আমি বন্ধু বলে মনে করে এসেছি, তাদের দু'জনের প্রতিযোগিতার মধ্যে আমাকে নাক গলাতে বলা হচ্ছে।'

'কিন্তু দু'জনের মধ্যে মাত্র একজন ন্যায় পথে রয়েছে।'

'কাজেই যে ন্যায় পথে রয়েছে তাকে আমি সাহায্য করব, আর যে অন্যায় পথে রয়েছে তার সাথে আমি বেঈমানী করব?'

'নিশ্চয়ই।'

'এর মধ্যে অত জোর দিয়ে নিশ্চয়ই বলার কিছু নেই···রানাকে যখন পাবে, যদি পাও, কি করবে তুমি?'

'আমি জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসে আছি, প্রফেসর।'

এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন প্রফেসর, বুঝিয়ে দিলেন প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেলে চলবে না। বললেন, 'বলে যাও।'

'কখন আর কোথায় এই ইউরেনিয়াম চুরি করার প্ল্যান করেছে রানা, সেটা আমাকে জানতে হবে,' বলে খানিক ইতস্তত করল কোহেন, তারপর বাকিটাও শেষ করল, 'আমাদের একটা গেরিলা ইউনিটকে ওখানে রানার চেয়ে আগে পৌঁছুতে হবে। ইউরেনিয়াম দখল করব আমরা, তারপর রানা সেটাকে হাইজ্যাক করতে এলে মেরেধরে ওকে আমরা তাড়িয়ে দেব।'

প্রফেসরের ঘোলা চোখ জোড়া উত্তেজনায় চিকচিক করে উঠল। 'তাহলে ইসরায়েলের হাতে কিছু ইউরেনিয়াম আসছে? চমৎকার।'

প্রথমে নিজের কানকে বিশ্বাসই করতে পারল না কোহেন। কিন্তু প্রফেসরের চেহারায় আনন্দের হাসি ফুটে উঠতে দেখে বুঝল, শুনতে ভুল হয়নি তার। কাজ হবে! কাজ হবে! খুশিতে লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছে করল তার। প্রফেসরকে আরও কিছু বলা দরকার, অনুভব করল সে, বুড়োকে জানানো উচিত এটা তাঁর জন্যে একটা বিরাট পরীক্ষা।

'ইসরায়েলকে মৌখিক সমর্থন দেয়া সহজ,' বলল সে। 'কিন্তু আমরা যারা দেশটার অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা করছি তারা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি, কি রকম কঠিন একটা কাজ এটা। আপনার সমালোচনা করছি না, প্রফেসর, কিন্তু বাস্তব সত্য হলো এই যে নিরাপদ অক্সফোর্ডে বসে সারাটা জীবন ইসরায়েলের সমর্থনে বক্তৃতা দিয়েই গেলেন, শক্ত নিরেট কাজের কাজ কিছুই করলেন না। সেজন্যেই আমার বারবার সন্দেহ হয়েছে, ইসরায়েলকে সমর্থন করার এই ব্যাপারটা আপনার কাছে একটা রোমান্টিক ফ্যাশান কিনা। সে যাই হোক, আপনার জীবনে এই প্রথম আপনি একটা সুযোগ পেয়েছেন, ইসরায়েলের জন্যে কিছু যদি সত্যিই করতে চান, এই-ই সময়। আপনার জন্যে এটা একটা কঠিন পরীক্ষা, প্রফেসর।'

ম্লান চেহারা নিয়ে চুপচাপ বসে থাকলেন প্রফেসর ফিলমনটন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, বোধহয় তোমার কথাই ঠিক।'

কোহেন ভাবল, গেঁথে ফেলেছি, শালা বুড়ো যাবে কোথায়!

আশা নিরাশায় দুলতে দুলতে ডিউটি সেরে বাড়ি ফিরছে এষা। শেষ দেখা হবার পর কতগুলো দিন কেটে গেছে, রানার আর কোন খবর পায়নি ও। অথচ একটা মুহূর্তও যদি তার কথা ভুলে থাকতে পারত! এ এক অদ্ভুত পুলক, আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। শয়নে-স্বপনে-জাগরণে নিজের ভেতর শুধু রানারই অস্তিত্ব অনুভব করেছে ও। রানার কথা বলার ভঙ্গি, হাঁটার ধরন, তার হাসি, ঘামের গন্ধ, গরম নিঃশ্বাস, দৃষ্টি,

মেজাজ, রুচি, ঝোঁক, সব যেন তাকে জাদু করেছে। চোখ বুজলেই সামনে দেখতে পায় তাকে। এ কী হলো ওর! এভাবে সে বাঁচবে কিভাবে? ভালবাসা এক কথা, তাকে পাওয়ার ভাগ্য তো আরেক কথা। কিন্তু এসব যুক্তির ধার দিয়েও যেতে রাজি নয় মনটা। ভাল লাগে সেটাই আসল। তাকে ভাল দেখতে চাই, সুস্থ দেখতে চাই, হাসতে দেখতে চাই। তার সঙ্গ চাই, তার স্পর্শ চাই, তার গন্ধ চাই। আর চাই মন। তার মন চাই।

বাড়িতে ঢোকার মুহূর্তে নিজেকে সাবধান করে দিল এষা, এত আশা করা উচিত হচ্ছে না, রানা হয়তো তার খোঁজে এখানে আসেনি বা কোন খবরও দেয়নি।

'বাবা, এলাম!' আদুরে গলায় চেঁচিয়ে বলল এষা। নিজের ঘরে ঢুকে কোট খুলল, হুকের সাথে ঝুলিয়ে রাখল ব্যাগটা। বাবা কোন সাড়া দিল না দেখে একটু অবাক হলো ও। কিন্তু হলঘরে ব্রিফকেস রয়েছে, তার মানে বাড়িতেই আছে বাবা। বোধহয় বাগানে বসে রোদ পোহাচ্ছে। কিচেনে ঢুকে হিটারে কফির পানি চড়াল ও, তারপর বেরিয়ে এসে বাগানের পথ ধরল। নদীর কিনারা ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে গুন গুন করে উঠল এষা। ঝোপগুলোর কাছে চলে এসেছে, এই সময় গলার আওয়াজ পেল ও। কারও সাথে কথা বলছে বাবা। কার সাথে? হঠাৎ সারা শরীরে একটা পুলকের ঢেউ অনুভব করল ও। রানা আসেনি তো?

আরও ক'পা এগোতে পরিষ্কার বাবার গলা পেল এষা।

'কিন্তু তার আগে বলো, ওকে নিয়ে কি করবে তুমি?'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল এষা, ওদের আলাপের মধ্যে তার কি বাধা দেয়া উচিত হবে? গোপন কিছু হতে পারে।

'আপাতত আমি শুধু ওকে ফলো করব,' কণ্ঠস্বরটা চেনা চেনা লাগল, কিন্তু ঠিক করে চিনতে পারল না এষা। 'সমস্ত ব্যাপার চুকে না গেলে মাসুদ রানাকে খুন করা উচিত হবে না।'

আঁতকে ওঠার শব্দটা বেরিয়ে আসার আগেই নিজের মুখে হাতচাপা দিল এষা। আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ জোড়া। ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল সে। ইচ্ছে হলো ছুটতে শুরু করে, কিন্তু পা টিপে টিপে এগোল। খানিক দূর এসে নিজেকে আর সামলে রাখতে পারল না, উন্মাদিনীর মত ছুটে ফিরে এল বাড়িতে।

ঘন্টাখানেক পর বুঝতে পারল কোহেন, প্রফেসরকে দলে টেনে তার কোন লাভ হয়নি। রানার খোঁজ পাওয়াটা আসল কথা, কিন্তু সে-ব্যাপারে প্রফেসর কোন সাহায্য করতে পারছেন না। রানা সম্পর্কে যা কিছু জানেন তিনি, খুব কমই জানেন, ছাড়া ছাড়া ভাবে সব স্মরণ করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তা থেকে এমন কোন সূত্র বেরিয়ে এল না যেটা ধরে রানার খোঁজে বেরিয়ে পড়া চলে।

তেল আবিব থেকে চলে আসার আগে একটা কাজ করলে পারত কোহেন, কিন্তু তাতে অনেক সময় লাগবে আর বেশ কয়েক জনকে কারণ দর্শাতে হবে বলে সেদিকে আর পা বাড়ায়নি সে। গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ট না হলে এই এক জ্বালা, কারও ফাইল দেখতে চাইলেও সহজে তা সম্ভব নয়। রানার ফাইলে একবার চোখ বুলাতে পারলে এক-আধটা সূত্র হয়তো বেরিয়ে যেত। তবে অসুবিধে আরও

একটা ছিল, রানা সম্পর্কে জানতে চাইছে ও. এই খবরটা ডাবল এজেন্টের গোচরেও আসত, হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনা তাতে বাড়ত বৈ কমত না।

'সেই সিসিলিয়ান লোকটা সম্পর্কে আর কি মনে আছে আপনার?' হঠাৎ আবার প্রশ্ন করল কোহেন।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন প্রফেসর ফিলমনটন, মুখ তুলে কোহেনের দিকে তাকালেন তিনি। 'কিছু বললে?'

প্রশ্নটা আবার করল কোহেন।

'সিসিলিতে জন্ম বটে, কিন্তু আমেরিকায় গিয়ে বসতি করে ওরা,' প্রফেসর বললেন। 'যতদূর জানি, আলবার্তো ফেলিনির বাবা ডাকসাইটে মাফিয়া চীফ ছিল। খবরের কাগজে যে-সব খবর বেরোয়, তা থেকে বোঝা যায়, বেশ ক'বছর থেকে ফেলিনিও নিউইয়র্কের একজন মাফিয়া চীফ বনে গেছে।'

'তাই?' একটু উত্তেজিত হয়ে উঠল কোহেন। 'ফেলিনি নিজেও তাহলে একজন ডন?'

'আমার তাই মনে হয়।'

'আচ্ছা, রানার সাথে তার সম্পর্কটা কি রকম ছিল, আর একটু বলবেন?'

'সম্পর্ক ওইটুকুই—গুণ্ডারা রাস্তায় ধরেছিল ফেলিনিকে, মেরেই ফেলত, কিন্তু মিথ্যে কথা বলে রানা তাদেরকে অন্য দিকে সরিয়ে দেয়। ফলে বেঁচে যায় ফেলিনি। বোধহয় বছরখানেক হাসপাতালে ছিল সে, তারপর হঠাৎ একদিন কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যে এখানে রানার সাথে দেখা করতে আসে। যতদূর মনে পড়ে, রানা তাকে খুব একটা পাত্তা দেয়নি, আমিও রানাকে সেই পরামর্শই দিয়েছিলাম। কিন্তু এষার মা চাইত লোকটার সাথে রানা যেন ভাল ব্যবহার করে। মেয়েলোকের বুদ্ধি তো! এই নিয়ে ওর সাথে আমার কথা কাটাকাটিও হয়েছে দু'একবার।'

'তারপর? এখানেই শেষ?'

'বেশ কয়েকবারই ফেলিনি এ-বাড়িতে রানার সাথে দেখা করতে এসেছে,' বললেন প্রফেসর। 'বোধহয় রানা এড়িয়ে যেত বলেই আসা-যাওয়া কমিয়ে দেয় সে। তারপর একেবারে বন্ধ করে দেয়। রানা এখান থেকে চলে যাবার ক'বছর পর আর একবার এসেছিল।'

'এবার যখন রানা আপনার সাথে দেখা করল, ফেলিনির কথা ওঠেনি।'

মাথা নাড়লেন প্রফেসর। 'না।' তারপর ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ফেলিনিকে নিয়ে শুধু শুধু মাথা ঘামাচ্ছ, কোহেন। তার কাছে রানার কোন খোঁজ পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।'

'এই কাজে সম্ভাব্য সব জায়গা থেকে সাহায্য দরকার হবে রানার,' চিন্তিত দেখাল কোহেনকে। 'নিউ ইয়র্কে রানা গিয়েছিল, এ-খবর আমার জানা আছে।'

'রানা নিউ ইয়র্ক গিয়েছিল?' প্রফেসর হঠাৎ পিঠ খাড়া করায় বেতের চেয়ার থেকে আরেকটু হলে পড়ে যাচ্ছিলেন। 'কেন, নিউ ইয়র্কে গিয়েছিল কেন?'

'খবরটা সেন্ট পার্সেন্ট কারেক্ট নয়,' বলল কোহেন। 'তবে রিচির ধারণা এড রোজারস নাম নিয়ে একটা জাহাজ কোম্পানী রেজিস্টার করার জন্যেই গিয়েছিল

রানা নিউ ইয়র্কে।'

'তাহলে তো ওখানে ফেলিনির সাথে রানার দেখা হওয়া বিচিত্র কিছু নয়, কোহেন!'

'নিউ ইয়র্কে গেছে, অথচ ফেলিনির সাথে দেখা করেনি রানা, এমন হতে পারে?' ভুরু কুঁচকে প্রশ্নটা যেন নিজেকেই করল কোহেন।

'তোমার মুখ থেকে এসব শোনার পর আমার কিন্তু মনে হচ্ছে মাফিয়া চীফের সাথে রানা নিশ্চয়ই দেখা করেছে,' প্রফেসর ফিলমনটন জোর দিয়ে বললেন।

'কিন্তু ব্যাপারটা আকাশকুসুম কল্পনা হয়ে যাচ্ছে না কি?'

'তা হয়তো একটু হচ্ছে,' বললেন প্রফেসর। 'কিন্তু তোমার সি.আই.এ. এজেন্ট রিচির পদ্ধতিটা স্মরণ করো—ছোটখাট তথ্য পেলেও সেটাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করে সে, সুফলও পায়।'

তাই তো! এই পরিস্থিতিতে রিচি হলে নিশ্চয়ই ফেলিনির কাছে যেত। চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল কোহেনের। বলল, 'হ্যাঁ, একটা খবর নিয়ে দেখা যেতে পারে।'

'ঠাণ্ডা লাগছে, চলো, বাড়ির ভেতর গিয়ে বসি,' বলে উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর।

বাগানের পথ ধরে বাড়ি ফেরার সময় প্রফেসর বললেন, 'মুশকিল হলো, ফেলিনি রানা সম্পর্কে কিছু যদি জানেও, তোমাকে বলবে বলে মনে হয় না।'

'আপনাকে?'

'কেন বলবে? আমার কথা বোধহয় তার মনেও নেই। রাজিয়া বেঁচে থাকলে একটা কথা ছিল, সে যদি একটা গল্প বানিয়ে…'

'ঠিক আছে,' বলল কোহেন। মিসেস ফিলমনটনকে এসবের মধ্যে টেনে আনতে মন চাইল না তার। 'আমার নিজেকেই চেষ্টা করতে হবে।'

'নিজের এলাকায় বাঘ সে, ওখানে তুমি তার সাথে সুবিধে করতে পারবে না।'

'চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? এছাড়া আর যখন কোন উপায় নেই।'

'উপায় একটা বের করতে হবে,' প্রফেসর বললেন।

বাড়ির ভেতর ঢুকল ওরা। কিচেনের দরজা খোলা, ভেতরে এষাকে একটা টুলের ওপর বসে থাকতে দেখা গেল। ঝট করে পরস্পরের দিকে তাকাল দু'জন। দু'জনেই বুঝল, উপায় একটা বেরিয়ে গেছে।

ছয়

বাড়িতে ফিরে এসে প্রথম কয়েক মিনিট কিছুই ভাবতে পারল না এষা। মাথাটা কাজ করছে না বুঝতে পেরে ভয় পেয়ে গেল সে। খাটের স্ট্যান্ড ধরে ঘন ঘন হাঁফাচ্ছিল, ধীরে ধীরে বসে পড়ল বিছানায়। নিজেকে বোঝাল, বোকার মত ঘাবড়ে যাওয়া কোন কাজের কাজ নয়, ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা ভাল করে বোঝা দরকার। দু'মিনিট যেতে না যেতে তার মনে হলো, ভুল শুনেছে সে, বাগানে বসে তার বাবা রানাকে খুন করার কথা আলোচনা করছিলেন, এ হতেই পারে না। বাগানে কত

ফুল, নদীর কুলকুল ধ্বনি, ফুরফুরে বাতাস, বসন্তের রোদ, একজন বয়োবৃদ্ধ প্রফেসর আর তাঁর মেহমান…এসবের মধ্যে খুন-খারাবির কোন প্রসঙ্গ উঠতেই পারে না। গোটা ব্যাপারটাই উদ্ভট, সাহারা মরুভূমিতে শ্বেতভল্লুক দেখার মত। এষার আরও মনে হলো, এর পিছনে একটা সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার আছে। ফ্রয়েডের একটা সূত্র অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাচ্ছে এখানে। রানাকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে ভালবাসে সে, এই সময় তার অবচেতন মনে এই ধারণার সৃষ্টি হতে পারে, রানার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তার বাবা রানাকে খুন করার পরিকল্পনা আঁটছেন। আসলে অন্য কিছু শুনেছে সে, কিন্তু অবচেতন মনের প্ররোচনায় ভুল বুঝেছে, ভেবেছে রানাকে খুন করার বুদ্ধি আঁটছে ওরা।

ওরা দু'জন বাড়িতে ফিরে আসার আগেই এই ব্যাখ্যা দিয়ে নিজেকে সন্তুষ্ট করে ফেলল এষা, তাই ওদেরকে কিচেনের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে হাসতে পারল সে। 'কফি চাই কারও? এইমাত্র বানিয়েছি।'

'আরে, আরে,' আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে আছে প্রফেসরের চেহারা। 'আমার মা দেখি ফিরে এসেছে! কখন এলে, মা?'

'এই তো।' মিথ্যে কথা বলল এষা। 'তোমাকে না দেখে ভাবলাম বাগানে রোদ পোহাচ্ছ, কফি নিয়ে যাব ভাবছিলাম।'

'ন্যাট কোহেনকে তুমি চেনো না…অনেকদিন আগে আমাদের বাড়িতে পেয়িংগেস্ট ছিল ও,' বলে হেসে উঠলেন প্রফেসর। 'তোমার তখন জন্ম হয়নি।'

সবাই যেমন হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, কোহেনও তেমনি এষার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর সংবিৎ ফিরতে একটা হাত বাড়িয়ে দিল সে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিজের হাতটা বাড়াল এষা। ধরল কোহেন, কিন্তু সাথে সাথে ছাড়ল না। বলল, 'তুমি তোমার মায়ের সবটুকু তো পেয়েছই, বিধাতা তোমাকে আরও কিছু বেশি দিয়েছেন।'

প্রশংসা কার না ভাল লাগে, এষারও লাগল। তাছাড়া, কোহেনের বলার ভঙ্গিতে এমন আন্তরিকতার ছোঁয়া ছিল, সে যে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বা এষাকে খুশি করার জন্যে কথাটা বলেনি, সেটুকু পরিষ্কার বুঝতে পারল ও।

প্রফেসর বললেন, 'মাস কয়েক আগে কোহেন আরও একবার এখানে এসেছিল, রানা ঘুরে যাবার ক'দিন পরই। রানার সাথে তোমার বোধহয় দেখা হয়েছে, কিন্তু কোহেন যখন আসে, তুমি বাড়ি ছিলে না।'

'ওরা দু'জন পরস্পরকে চেনে…মানে, কোন সম্পর্ক আছে?' শেষের দিকে গলাটা বেসুরো হয়ে উঠল বলে নিজেকে অভিশাপ দিল এষা।

কোহেন আর প্রফেসর দৃষ্টি বিনিময় করল। তারপর খানিক ইতস্তত করে প্রফেসর বললেন, 'হ্যাঁ, সম্পর্ক একটা আছে বটে।'

তখনি বুঝল এষা, সব সত্যি। ভুল শোনেনি সে। জীবনে একমাত্র যে মানুষটাকে ভালবেসেছে সে, তাকে সত্যিই ওরা খুন করতে চায়। চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসতে চাইছে বুঝতে পেরে ভয় পেল এষা, টুল থেকে তাড়াতাড়ি নেমে কাপে কফি ঢালার জন্যে ওদের দিকে পিছন ফিরে বসল।

'তোমাকে মা আমি একটা কাজ করতে বলব,' নরম সুরে শুরু করলেন

প্রফেসর। 'খুব ভারী একটা কাজ, কিন্তু তুমি পারবে। কাজটা করলে তোমার বুড়ো বাপের একটা মস্ত উপকার করা হবে।'

বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগল এষার। বাবা আজ হঠাৎ আমার সাথে ভণিতা করে কথা বলছে কেন? কি করতে হবে আমাকে? কি বলতে চায় বাবা? গভীর একটা শ্বাস টেনে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল সে। ওদের দু'জনের হাতে কাপ দুটো ধরিয়ে দিয়ে টুলের ওপর বসল আবার।

'আমাদের কোহেন,' প্রফেসর মেয়েকে বললেন, 'মাসুদ রানাকে খুঁজছে। আমি চাই তুমি ওকে সাহায্য করো।'

সেই মুহূর্ত থেকে বাপকে ঘৃণা করতে শিখল এষা। হঠাৎ করে আবিষ্কার করল, মেয়ের ওপর তার যে ভালবাসা রয়েছে সেটা কপটতায় ভরা, মেয়েকে একজন মানুষ হিসেবে দেখেনি কখনও, ওর মাকে যেভাবে ব্যবহার করেছে ওকেও ঠিক সেই ভাবে ব্যবহার করছে লোকটা। এখন থেকে এই লোককে বাপের মর্যাদা আর সে দিতে পারবে না, আগের মত ভক্তি করা তার দ্বারা আর হয়ে উঠবে না। তার নিঃসঙ্গতা, একাকীত্ব নিয়ে আর কখনও মাথা ঘামাতে পারবে না সে। সেইসাথে অন্তরের অন্তস্তল থেকে উপলব্ধি করল, এখন তার মনে যে ঘৃণা আর অশ্রদ্ধার ভাব জন্মেছে তার মায়ের মনেও নিশ্চয়ই এই ঘৃণার ভাব জন্মেছিল। এই লোকের সাথে মায়ের নিরুত্তাপ, নির্লিপ্ত আচরণের কারণ এতদিনে পরিষ্কার হয়ে গেল। মনে মনে ঠিক করল, মা যা করত, সে-ও তাই করবে, এই লোককে শত্রু বলে জ্ঞান করবে সে।

প্রফেসর বলে চলেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্রে একজন লোক আছে, রানার খবর তার কাছে পাওয়া যেতে পারে। আমি চাই, কোহেনের সাথে তার কাছে যাও তুমি, তাকে রানার কথা জিজ্ঞেস করো।'

কিছু বলার প্রবৃত্তি হলো না এষার। তার মৌনতাকে সম্মতি ধরে নিয়ে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করতে শুরু করল কোহেন। 'সব কথা জানা দরকার তোমার। আসলে, রানা একজন বাংলাদেশী স্পাই। মিশরের ভাড়াটে হিসেবে আমাদের, মানে ইসরায়েলের, ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। যেভাবেই হোক, ওকে থামাতে হবে। আলবার্তো ফেলিনি—নিউ ইয়র্কের মাফিয়া চীফ, সম্ভবত সাহায্য করছে রানাকে। তা যদি হয়, আমরা তার কাছ থেকে কিছু আশা করতে পারি না। কিন্তু এই ফেলিনি লোকটা তোমার মাকে চিনত, তোমার মা-ও তাকে পছন্দ করতেন। তোমার মায়ের কথা নিশ্চয়ই তার মনে আছে, তোমাকে দেখে আরও ভাল করে মনে পড়ে যাবে। সেজন্যেই আমরা ভাবছি, তোমার কথা শুনতে পারে সে। তুমি তাকে বলতে পারো, রানাকে তুমি ভালবাস, তোমাদের বিয়ে হবে।'

হেসে উঠল এষা। নিজের কানেই হাসির আওয়াজটা বিচ্ছিরি, বেসুরো শোনাল। নিজেকে সামলে নিল সে। একটু চেষ্টা করতেই বোধগুলোকে ভোঁতা, চেহারাটাকে ভাবলেশহীন করে তুলতে পারল। ইতোমধ্যে আবার কথা বলতে শুরু করেছে ওরা, পালা করে বলে চলেছে ইউরেনিয়াম, ইমপেরিয়াল, হিলারী, রেডিও বীকন, গেরিলা কমান্ডার কাওয়াশ আর তার হাইজ্যাক প্ল্যান এবং,

ইসরায়েলের জন্যে এসবের কি অর্থ, মিশরের মুখে কতটা চুনকালি পড়বে ইত্যাদি। শেষ দিকে আর চেষ্টা করতে হলো না, এমনিতেই এষার অনুভূতি আর বোধগুলো ভোঁতা হয়ে গেল।

তারপর প্রফেসর ফিলমনটন আসল কথায় এলেন, 'এবার বলো মা, সাহায্য করবে তুমি? যাবে কোহেনের সাথে?'

প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির জোরে নিজেকে সম্পূর্ণ শান্ত রাখল এষা, এয়ার-হোস্টেস সুলভ উজ্জ্বল এক টুকরো হাসি উপহার দিয়ে টুল থেকে উঠে দাঁড়াল সে, বলল, 'এক ঢোকে এত কিছু গিলতে পারা কঠিন। গোসল করতে যাচ্ছি, সেই ফাঁকে চিন্তা করে দেখি, কেমন?'

বলে আর দাঁড়াল না সে।

ঘৃণ্য একজোড়া কীট আর আমার মাঝখানে বন্ধ একটা দরজা, বাথটাবের গরম পানিতে শুয়ে ভাবল এষা, এখন আমাকে ধীরস্থির ভাবে গোটা ব্যাপারটা ভেবে দেখতে হবে। নিজেকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিল ও, দিশেহারা হবার সময় নয় এটা। রানার জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে, তাকে বাঁচাতে হলে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে তার।

আবার কবে দেখা হবে জানি না বলে সেই যে বিদায় নিল রানা। তার মানে একটা জাহাজ হাইজ্যাক করতে গেছে ও। রানা বাংলাদেশী স্পাই, সেটা একটা খবর বটে, কিন্তু এই মুহূর্তে এর কোন গুরুত্ব নেই। রানা ইসরায়েলের ক্ষতি করতে চাইছে, সে-ব্যাপারেও মাথা ঘামাতে রাজি নয় সে। এরা যেভাবে ওর পিছনে লেগেছে, রানার সফল হবার কোন সম্ভাবনা নেই, কিন্তু তাতেও এষার কিছু আসে যায় না। রানার বিপদ, সেটাই আসল কথা। এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে হবে ওকে। কিন্তু কিভাবে? সি.আই.এ. প্ল্যান করেছে রানার জাহাজকে ধাক্কা দেবে, আর কোহেন প্ল্যান করেছে প্রথমে জাহাজটা দখল করবে তারপর অ্যামবুশ পাতবে রানার জন্যে। যে-কোন দিক থেকেই রানার বিপদ। দু'পক্ষই রানাকে ধ্বংস করতে চায়। এটা বন্ধ করার উপায় কি? রানাকে কিভাবে সাবধান করতে পারে সে?

শুধু যদি জানত কোথায় আছে রানা!

ওই ঘৃণ্য নর্দমার কীট দুটো তার সম্পর্কে কত কম জানে! বেজন্মা ইহুদিটা ধরেই নিয়েছে, তাকে যা করতে বলা হবে তাই করবে সে। আর তার বক-ধার্মিক জন্মদাতা বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করেছে, মেয়ে তার ইসরায়েলের পক্ষ নেবে। আমার শরীরে লেবানীজ আরব রক্ত রয়েছে, এটা বেমালুম ভুলে গেছে ব্যাটা। মেয়ে তার বড় হয়েছে, তার নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা আছে, এসব মনে রাখার কোন প্রয়োজনই বোধ করছে না।

কি করতে হবে সেটা যখন বুঝতে পারল এষা, আবার নতুন করে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল সে। রানাকে খুঁজে পাবার এবং সাবধান করার একটাই রাস্তা খোলা দেখতে পাচ্ছে। ওরাও খুঁজছে রানাকে, ওদের দেখিয়ে দেয়া পথ ধরে এগোলে

রানাকে পাবে সে। ওদেরকে বোকা বানানো কঠিন হবে না, এরই মধ্যে তাকে ওরা নিজেদের দলের একজন বলে মনে করতে শুরু করেছে।

তাই করবে এষা, ওদের কথাই শুনবে। তারপরই মনে হলো, কিন্তু তাতে কি রানার জন্যে পরিস্থিতিটা আরও বিপজ্জনক করে তোলা হবে? সে যদি রানাকে পায়, ওরাও রানাকে পাবে। সে-ই রানার কাছে নিয়ে যাবে ওদেরকে।

কিন্তু কোহেন যদি রানাকে নাও পায়, সি.আই.এ-র তরফ থেকে রানার বিপদ কাটছে না।

আর রানাকে যদি আগেভাগে সাবধান করে দেয়া যায়, দুটো বিপদ থেকেই পালাতে পারবে ও। হ্যাঁ, ওদের কথামত চলাই ভাল। শেষ পর্যন্ত হয়তো পথে কোথাও কোহেনকে খসিয়ে দিতে পারবে সে, রানার সাথে তার দেখা হবার ঠিক আগে।

এর কোন বিকল্প আছে? অপেক্ষা করতে পারে এষা, রানার একটা ফোন পাবার আশায়···যেটা হয়তো কোনদিনই আসবে না। উঁহুঁ, এত বড় ঝুঁকি নিতে পারবে না সে। রানাকে সাবধান করার এই সুযোগ স্বয়ং বিধাতা দিয়েছেন তাকে, এটাকে কাজে লাগাতে না পারলে রানা হয়তো মারা যাবে। আর তাই যদি ঘটে, নিজেকে কখনও ক্ষমা করতে পারবে না এষা। রানার বিপদ শুধু যদি কোহেনের তরফ থেকে হত, কোন না কোন ভাবে তাকে দেরি করিয়ে দিত সে, যাই যাচ্ছি করে অযথা সময় নষ্ট করত। কিন্তু বিপদ তো কোহেন একা নয়, সি.আই.এ-ও লেগেছে রানার পিছনে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল এষা। কোহেনের সাথে সহযোগিতার ভান করবে সে, যাতে রানার খোঁজ পাওয়া যায়। মনটা আশ্চর্য খুশি হয়ে উঠল। ফাঁদে ফেলা হয়েছে তাকে, কিন্তু স্বাধীন লাগছে নিজেকে। বাবার কথা মানছে বটে, কিন্তু পরিষ্কার জানে, কাজ করছে তার বিরুদ্ধে। ভাল হোক আর খারাপ, রানার দলে যোগ দিয়েছে সে।

কিন্তু খুশির সাথে ভয় ভয় ভাবটাও রয়েছে। সময় মত রানাকে পাবে তো সে? দেরি হয়ে যাবে না তো?

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল এষা। আয়নার সামনে দু'সেকেন্ডের জন্যে দাঁড়াল একবার। পারবে তো? নিজের প্রতিবিম্বকে প্রশ্ন করল। মাথা কাত করে জানাল, পারবে। ঘুরে দাঁড়িয়ে সুখবরটা ওদের জানাবার জন্যে পাশের কামরার দিকে এগোল এষা।

ষোলোই নভেম্বর, উনিশশো আশি, ভোর চারটে। ডাচ উপকূল বরাবর এগিয়ে ভ্লিসিনজেনে মিনিট কয়েকের জন্যে থামল ইমপেরিয়াল। একজন পোর্ট পাইলটকে তোলা হলো জাহাজে, ওয়েস্টারশেল্ড চ্যানেলের ভেতর দিয়ে জাহাজকে অ্যান্টোয়ার্পে নিয়ে যাবে সে। চার ঘণ্টা পর, বন্দরের প্রবেশ মুখে, ডকের ভিতর দিয়ে গাইড করে এগিয়ে নেবার জন্যে আরও একজন পাইলটকে তোলা হলো। রয়ার্স লকের ভেতর দিয়ে, সাইবেরিয়া ব্রিজ গলে ক্যাটেনডিক ডকে বেরিয়ে এল

ইমপেরিয়াল, এখানেই নোঙর ফেলবে সে।

জেটির মুখে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে রানা।

জাহাজটাকে ধীর, মন্থর গতিতে এগিয়ে আসতে দেখল ও। গায়ে নাম লেখা রয়েছে ইমপেরিয়াল। কল্পনায় ইয়েলোকেকের ড্রামগুলো দেখতে পেল ও, জাহাজের পেট ভরা হবে ওগুলো দিয়ে। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো ওর, প্রথমবার এষার নগ্ন শরীর দেখার সময় এই রকম অনুভূতি হয়েছিল—উত্তাল লালসা।

বিয়াল্লিশ নম্বর বার্থ থেকে চোখ সরিয়ে রেল লাইনের দিকে তাকাল রানা, জেটির একেবারে কিনারা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। এগারোটা কার আর একটা এঞ্জিন নিয়ে লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা ট্রেন। এক একটা দুশো লিটারের ড্রাম, প্রতিটি কারে একান্নটা করে, দশটা করে জায়গা করে নিয়েছে পাচশো দশটা ড্রাম। প্রতিটি ড্রামের ঢাকনি সীল করা। শুধু এগারো নম্বর কারে পঞ্চাশটা ড্রাম রয়েছে। এত কাছে রয়েছে রানা, ঘুরঘুর করার ভঙ্গিতে একটু এগিয়ে গেলেই হাত দিয়ে ছুঁতে পারে কারগুলো। ছুঁয়েছে ও একবার—খুব ভোরের দিকে। সাংঘাতিক রোমাঞ্চকর একটা ব্যাপার হয়, একদল বাংলাদেশী কমান্ডো যদি গোটা কয়েক বিশাল হেলিকপ্টার নিয়ে চলে আসে এখানে, চিলের মত ছোঁ দিয়ে নিয়ে যায় কারগুলোকে!

বন্দর থেকে খুব তাড়াতাড়ি আবার ফেরত পাঠানো হবে ইমপেরিয়ালকে। বন্দর কর্তৃপক্ষকে বোঝানো সম্ভব হয়েছে বটে যে ইয়েলোকেক নাড়াচাড়া করার মধ্যে কোন ঝুঁকি বা বিপদ নেই, তবু জিনিসটাকে তারা প্রয়োজনের চেয়ে এক মিনিট বেশি নিজেদের এলাকায় রাখতে চায় না। বিশাল একটা ক্রেনকে তৈরি রাখা হয়েছে, অনুমতি পেলেই ড্রামগুলোকে জাহাজে তোলার কাজ শুরু হবে।

তবে লোডিং শুরু করার আগে কিছু আনুষ্ঠানিকতা সারার ব্যাপার আছে।

প্রথম যে লোকটাকে রানা ইমপেরিয়ালে উঠতে দেখল, সংশ্লিষ্ট শিপিং কোম্পানীর একজন অফিসার সে। তার কাজ পাইলটদের সম্মানী দেয়া আর হারবার পুলিসের জন্যে ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে ক্রুদের তালিকা চেয়ে নেয়া।

এরপর ইমপেরিয়ালে উঠল মাহমুদ জুবের। সে তার নিজের খদ্দেরদের স্বার্থ দেখতে এসেছে। ক্যাপ্টেনকে এক বোতল হুইস্কি উপহার দেবে সে, তারপর তাকে নিয়ে শিপিং কোম্পানীর অফিসারের সাথে গলা ভেজাতে বসবে। শহরের সেরা নাইটক্লাবের এক গাদা টিকেট আছে তার পকেটে, এই টিকেট নিয়ে যে-কেউ ওই নাইটক্লাবে গিয়ে বিনা পয়সায় একটা করে ড্রিঙ্ক পেতে পারে। টিকেটগুলো ক্যাপ্টেনের হাতে বুঝিয়ে দেবে সে, ক্যাপ্টেন ওগুলো বিলি করবে তার অফিসারদের মধ্যে। এইভাবে জাহাজের এঞ্জিনিয়ারের নামটা জেনে নেবে মাহমুদ। রানা পরামর্শ দিয়েছে, এই উদ্দেশ্যে ক্রুদের তালিকা দেখতে চাইবে সে, কারণ হিসেবে বলবে, অফিসারের সংখ্যা দেখে নাইটক্লাবের টিকেট দেয়া হবে।

যেভাবেই করুক কাজটা, মাহমুদ যে সফল হয়েছে একটু পরই তা জানা গেল। জাহাজ থেকে নেমে জেটির দিকে এগোল সে, হাঁটার গতি না কমিয়ে রানার পাশ কাটিয়ে নিজের অফিসে ফিরে যাবার সময় নিচু গলায় বলল, 'এঞ্জিনিয়ারের

নাম টোবি।'

ক্রেন চালু হতে বিকেল হয়ে গেল। ডক শ্রমিকরা ইমপেরিয়ালের তিনটে হোল্ডে ড্রাম লোড করতে শুরু করল। প্রতিবার একটা করে ড্রাম নামাতে হয়, ভেতরে নামিয়ে কাঠের ঠেক দিয়ে স্থির রাখার ব্যবস্থা করতে হয়, ফলে সময় লাগল বেশি। রানার ধারণাই ঠিক, কাজটা আজকের মধ্যে শেষ হবার নয়।

সন্ধের সময় শহরের সেরা নাইটক্লাবে এল রানা। বারে বিশ-বাইশ বছরের একটা মেয়ে বসে আছে, টেলিফোনের কাছাকাছি। আগুনের মত রূপ, একবার চোখ পড়লে দৃষ্টি ফেরানো কঠিন। কিন্তু তার এই রূপ শুধু মুখটাকে ঘিরে। শরীরের নিচের অংশ বেশ স্থূল। বিশাল দুই উরু, কোমরে মেদ জমেছে। তবে কাপড়-চোপড়ে ভারি সৌখিন। সোনালি জরির কাজ করা কালো রঙের একটা ড্রেস পরেছে। মুখ একটু লম্বাটে, তাতে করে অভিজাত একটা ভাব এসেছে চেহারায়। চোখে মদির কটাক্ষ। কেউ দেখলেও ধরতে পারবে না, চোখাচোখি হতে এতই সামান্য মাথা ঝাঁকাল রানা। গা ঘেঁষেই এগোল, কিন্তু মেয়েটার সাথে কথা বলল না।

বারের এক কোণে গিয়ে বসল রানা, বিয়ারের গ্লাস দু'হাতে ধরে নাবিকদের আসার অপেক্ষায় রয়েছে। ওরা যে আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিনা পয়সায় মদ খাবার সুযোগ কোন নাবিক কখনও হাতছাড়া করেছে?

হ্যাঁ।

লোকজনে ভরে উঠতে শুরু করল ক্লাব। দু'বার প্রস্তাব দেয়া হলো মেয়েটাকে, কিন্তু দু'জন লোককেই এড়িয়ে গেল সে। উপস্থিত সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা—এই মেয়ে সস্তা নয়, খদ্দের ধরার জন্যে এখানে ওত পেতে বসে নেই। রাত ন'টায় লবিতে বেরিয়ে এসে মাহমুদকে টেলিফোন করল রানা।

কোন এক ছুতো ধরে ইমপেরিয়ালের ক্যাপ্টেনের সাথে দেখা করেছে মাহমুদ, তার কাছ থেকে কি জানতে পেরেছে রানাকে এখন বলল সে। দু'জন অফিসার বাদে বাকি সবাই ফ্রী টিকেট ব্যবহার করছে। দু'জনের মধ্যে ক্যাপ্টেন নিজে একজন, কাগজ-পত্রের গাদায় নাক ডুবিয়ে থাকতে হবে তাকে। আরেকজন রেডিও অপারেটর—নতুন লোক। জাহাজ কারডিফে থাকার সময় রোড অ্যাক্সিডেন্টে পা ভেঙেছে জকি, তার বদলে নেয়া হয়েছে একে। নাইটক্লাবে যাবে না, সর্দি লেগেছে।

এরপর এই ক্লাবেরই নাম্বারে ডায়াল করল রানা। ক্লার্ককে জানাল, মি. টোবিকে চাই তার, সম্ভবত বারে আছে সে।

অপেক্ষা করতে বলা হলো। অপরপ্রান্ত থেকে একজন বারম্যানের অস্পষ্ট গলা ভেসে এল, টোবির নাম ধরে হাঁক ছাড়ছে। আওয়াজটা দু'দিক থেকে এল রানার কানে। একটা সরাসরি বার থেকে, আরেকটা কয়েক মাইল লম্বা টেলিফোন কেবলের ভেতর দিয়ে। অপর প্রান্ত থেকে স্পষ্ট গলা পেল রানা, 'ইয়েস? হ্যালো? টোবি বলছি। কে কথা বলতে চান আপনি? কেউ আছেন? হ্যালো?'

রিসিভার রেখে দিয়ে দ্রুত বারে ফিরে এল রানা। বারের ফোনে কেউ নেই. তবে মেয়েটার সাথে সুদর্শন এক যুবককে কথা বলতে দেখল ও এই লোককে জেটিতে আজ সকালেও দেখেছে ও। তার মানে এ-ই টোবি।

কি যেন বলল সে. উত্তরে ভুবন ভোলানো হাসি ফুটে উঠল মেয়েটার মুখে টোবিও হাসল. সেটাও কম গেল না। হাসিটার মধ্যে দুষ্টামি ভরা এক ধরনের ছেলেমানুষি আছে. চোখের পলকে দশ বছর বয়স কমে গেল যেন আবার কি যেন বলল সে. মেয়েটা ভুরু নাচাল টোবিকে ইতস্তত করতে দেখা গেল. যেন অনেক কথাই বলতে চায় সে. কিন্তু বলার মত এই মুহূর্তে কিছু খুঁজে পাচ্ছে না তারপর. রানাকে আতঙ্কিত করে দিয়ে মেয়েটার কাছ থেকে চলে যাবার জন্যে পা বাড়াল সে

কিন্তু মেয়েটা এত সহজে হার মানার পাত্রী নয় টোবির ব্লেজারের আস্তিন ছুঁলো সে, সাথে সাথে ফিরল টোবি। জাদুমন্ত্রের মত একটা সিগারেট বেরিয়ে এল মেয়েটার হাতে। লাইটারের জন্যে নিজের পকেট হাতড়াল টোবি, তারপর অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সে—নেই। আতঙ্কের ভাবটা আবার ফিরে এল রানার মধ্যে বার কাউন্টার থেকে হ্যান্ডব্যাগ তুলে নিল মেয়েটা. লাইটার বের করে গুঁজে দিল টোবির হাতে। টোবি ঝুঁকে পড়ে সিগারেটটা ধরিয়ে দিল।

চলে যেতে হলে বা এইভাবে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে হলে নির্ঘাত নার্ভাস ব্রেকডাউনের শিকার হবে রানা। ওদের কথা শোনার জন্যে বেপরোয়া হয়ে উঠল ও। ধীর পায়ে এগিয়ে টোবির একেবারে পিছনে চলে এল. মেয়েটার দিকে মুখ করে আছে সে। আরেকটা বিয়ার অর্ডার দিল রানা।

মেয়েটার কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত একটা সুরেলা ঝঙ্কার আছে. জানা ছিল রানার. এখন সেটাকে সত্যিই ব্যবহার করছে সে। কোন কোন মেয়ের চোখে থাকে শোবার ঘরে ঢোকার [illegible] সেই আমন্ত্রণ রয়েছে এই মেয়ের কণ্ঠস্বরে।

টোবি তার চওড়া কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'কি যে ভাগ্য, এই ঘটনা আমার জীবনে একনাগাড়ে ঘটেই চলেছে।'

'ফোনে?' জানতে চাইল মেয়েটা।

মাথা নাড়ল টোবি। 'নারী-ঘটিত ব্যাপারস্যাপার। ওদেরকে আমি ঘৃণা করি। জীবনভর এই মেয়েমানুষেরা আমাকে আঘাত আর ব্যথাই শুধু দিল। শালার আমি যদি হোমো হতাম, বেঁচে যেতাম।'

বিমূঢ় হয়ে পড়ল রানা। ব্যাটা বলে কি! অপমান করে ভাগাতে চাইছে মেয়েটাকে?

'তা হলো না কেন?' জানতে চাইল মেয়েটা।

'পুরুষমানুষ, ছি, তার চেয়ে ঘেন্না আর কি হতে পারে!'

'তাহলে সন্ন্যাসী হও।'

'আরে, আসল সমস্যার কথাই তো বলা হয়নি। ইউ সী, আমার ভেতর আশ্চর্য একটা রাক্ষুসে ক্ষুধা রয়েছে। রোজ রাতে নিজেকে খালাস করতে না পারলে আমার মাথায় রক্ত উঠে আসে, মনে হয় আমি পাগল হয়ে যাব। এটা আমার একটা

।।এক। বিকট, বিকট সমস্যা এই মেয়ে, কোন্ ড্রিঙ্ক পছন্দ তোমার?'

ও, এসব তাহলে আলাপ জমাবার একটা ধরন মাত্র আশ্চর্য, ব্যাটার মাথায় এই কৌশল ঢুকল কিভাবে? রানা ধারণা করল, এসব নিয়ে এত বেশি চর্চা করেছে ...কেরা, বিষয়টাকে ফাইন আর্টের পর্যায়ে তুলে নিয়ে এসেছে একেবারে

এইভাবেই এগোতে থাকল ব্যাপারটা মনে মনে মেয়েটারও প্রশংসা না করে পারল না রানা। এরই মধ্যে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে শুরু করেছে টোবিকে, কিন্তু টোবিকে বুঝতে দিচ্ছে সেই আসলে ঘোরাবার কাজটা করছে। মেয়েটা বলল, শুধু আজকের রাতটা অ্যান্টোয়ার্পে কাটাচ্ছে সে, সেই সাথে জানাল ভাল একটা হোটেলে একার জন্যে একটা কামরা ভাড়া করে রেখেছে এর একটু পরই টোবি ...ল, ওদের শ্যাম্পেন খাওয়া উচিত, কিন্তু এই ক্লাবে যে শ্যাম্পেন পাওয়া যাবে ...টা জিনিস ভাল নয় উত্তরে মেয়েটা কিছু বলতে যাচ্ছিল তাকে থামিয়ে দিয়ে টোবি বলল, 'চলো, অন্য কোথাও ভাল শ্যাম্পেন পাওয়া যায় কিনা দেখি, কোন হোটেলে—হোটেলের কথাই যখন উঠল, তোমার হোটেল হলেই বা ক্ষতি কি?'

ফ্লোর শো শুরু হতে যাচ্ছে, এই সময় ক্লাব ছেড়ে বেরিয়ে গেল ওরা। রানা খুশি, এখন পর্যন্ত সব ভালই। এক লাইনে দাঁড়িয়ে একদল মেয়ে পা ছুঁড়ছে, দৃশ্যটা মিনিট দশেক দেখে সে-ও বেরিয়ে পড়ল ক্লাব থেকে।

ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে এল রানা, এলিভেটরে চড়ে নিজের কামরায় ঢুকল দুই কামরার মাঝখানে একটা দরজা, কবাটে কান ঠেকাতেই সুরেলা ঝঙ্কার শুনতে পেল, খুব হাসছে মেয়েটা। আর নিচু গলায় কথা বলছে টোবি, বলেই চলেছে

বিছানায় বসে গ্যাস সিলিন্ডারটা পরীক্ষা করল রানা। ট্যাপটা অন করেই অফ করল, দ্রুত। ফেস মাস্ক থেকে বেরিয়ে এসে তীক্ষ্ণ, মিষ্টি সংক্ষিপ্ত বাতাসের ধাক্কা লাগল নাকে। কিছুই হলো না ওর। একটু চিন্তায় পড়ে গেল ও, কতটা শ্বাস টানলে কাজ করবে গ্যাস? এর চেয়ে ভাল কিছু যোগাড় হয়নি, এটাকেও ঠিকমত চেক করার অবসর মেলেনি।

পাশের ঘর থেকে আওয়াজগুলো এখন আগের চেয়ে জোরেশোরে আসছে। অপ্রতিভ, আড়ষ্ট লাগছে রানার। এক ধরনের লোক আছে ধরি-করি-উড়ি টাইপের, টোবি কি সে-ধরনের লোক? মেয়েটার সাথে তার কাজ শেষ হয়ে গেলেই কি সে জাহাজে ফিরে যেতে চাইবে? তাহলে অসুবিধে আছে করিডরে ধস্তাধস্তি করতে হবে —ঝুঁকির ব্যাপার।

অপেক্ষা করছে রানা। উদ্বিগ্ন।

নিজের পেশায় দক্ষতা আছে মেয়েটার জানে, রানা চায় কাজ শেষ হলে টোবি যেন ঘুমায়, তাই তাকে ক্লান্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অস্বাভাবিক বেশি সময় নিচ্ছে ওরা, কাজ শেষ হবার নাম নেই

রা... দুটোয় মাঝখানের দরজায় টোকা পড়ল তিনটে মৃদু টোকা পড়লে বুঝ... হবে টোবি ঘুমিয়েছে। ছয়টা টোকা পড়লে বুঝতে হবে টোবি চলে যাচ্ছে।

তিনটে মৃদু টোকা পড়ল দরজায়

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল রানা, এক হাতে গ্যাস সিলিন্ডার, আরেক হাতে

ফেস মাস্ক। নিঃশব্দ পায়ে বিছানার সামনে এসে দাঁড়াল ও।

চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টোবি। কাপড় বা চাদর কিছুই নেই গায়ে। চোখ বন্ধ, মুখ খোলা, বিবস্ত্র রয়েছে বলে আরও ভাল দেখাল স্বাস্থ্যটা। তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল রানা, শ্বাস টানা আর ফেলাটা কান পেতে শুনল।

শ্বাস টানল টোবি, ফেলল। যেই আবার শ্বাস টানতে শুরু করেছে, ট্যাপ অন করে তার মুখে ফেস মাস্কটা চেপে ধরল রানা।

মেলার পরপরই বিস্ফারিত হয়ে উঠল টোবির চোখ। ফেস মাস্কটা আরও জোরে চেপে ধরল রানা। একবার শ্বাস টেনে যতটা বাতাস ফুসফুসে নেবার কথা তার অর্ধেক নিয়েছে, টোবির চোখে দিশেহারার দৃষ্টি ফুটে উঠল। ফোঁস ফোঁস করে আওয়াজ বেরিয়ে এল নাক দিয়ে, সেই সাথে মাথা ঝাড়া দিতে শুরু করল সে। রানার হাত থেকে মাথাটাকে ছাড়াতে না পেরে পা ছুঁড়বে বলে হাঁটু ভাঁজ করল। তার বুকে একটা কনুই রেখে সামনের দিকে আরও ঝুঁকে পড়ল রানা, ভাবল, এত দেরি হলে চলে কি করে!

নিঃশ্বাস ফেলল টোবি। দিশেহারা ভাব কেটে গিয়ে তার চোখে ছায়া ফেলল ভয় আর আতঙ্ক। থেমে থেমে শ্বাস টানল সে, এলোপাতাড়ি ছুঁড়তে শুরু করল পা দুটো। মেয়েটার সাহায্য চাইবে কিনা ভাবল রানা। কিন্তু তার আর দরকার হলো না। দ্বিতীয়বার শ্বাস টেনে রানার কাজ সহজ করে দিয়েছে টোবি। বিস্ফারিত চোখ জোড়া ছোট ছোট হয়ে এল, ঘুম ঘুম ভাব। দ্বিতীয়বার নিঃশ্বাস ফেলার পরপরই ঘুমিয়ে পড়ল সে।

শুরু হয়ে শেষ হতে পাঁচ সেকেন্ড লেগেছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। টোবি সম্ভবত ঘটনার কিছুই মনে করতে পারবে না। নিশ্চিত হবার জন্যে আরও খানিকটা গ্যাস দিল তাকে, তারপর সিধে হলো রানা।

ঘরে ঢোকার পর এই প্রথম মেয়েটার দিকে তাকাল রানা। পরনে শুধু জুতো আর মোজা, আর কিছু নেই। রানা তাকাতেই ওর দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিল সে। নিঃশব্দে মাথা নেড়ে একটা চেয়ার টেনে বিছানার কাছাকাছি বসল রানা। চেহারা কালো করে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকার পর কাপড়চোপড় পরতে শুরু করল মেয়েটা। তারপর রানার সামনে এসে দাঁড়াল। রানা তাকে পঁচিশ হাজার ডাচ গিল্ডার দিল। ব্যাংক-নোটগুলোয় চপ করে চুমো খেলো মেয়েটা, তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

চেয়ার ছেড়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। কয়েক মিনিট পর মেয়েটার স্পোর্টস কারের হেডলাইট জ্বলে উঠতে দেখল ও। হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে গেল গাড়ি। যেখান থেকে এসেছে, সেই আমস্টারডামে ফিরে যাচ্ছে।

ফিরে এসে আবার চেয়ারে বসল রানা। একটু পরই ঘুম ঘুম ভাব এল চোখে। উঠে গিয়ে পাশের কামরা থেকে রুম সার্ভিসকে কফি দিতে বলল।

সকাল বেলা টেলিফোন করে মাহমুদ জানাল, ইমপেরিয়ালের ফার্স্ট অফিসার তার এঞ্জিনিয়ারের খোঁজে শহরের বোথেল, বার আর নাইটক্লাবগুলো তন্ন তন্ন করে বেড়াচ্ছে।

বেলা সাড়ে বারোটায় আবার ফোন করল মাহমুদ। ইমপেরিয়ালের ক্যাপ্টেন তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল, দেখা হতে বলেছে, কার্গো লোড করার কাজ শেষ, কিন্তু শালার ব্যাটা শালা এঞ্জিনিয়ারের দেখা নেই। কথাটা শুনে মাহমুদ মন্তব্য করেছে, 'ক্যাপ্টেন, আপনার ভাগ্যটা আজ ভাল।'

বেলা আড়াইটার সময় মাহমুদ জানাল, কাঁধে কিটব্যাগ নিয়ে আব্বাস হোবায়দা ইমপেরিয়ালে উঠে পড়েছে।

যতবার জেগে ওঠার লক্ষণ দেখল, ততবার টোবিকে একটু করে গ্যাস দিল রানা। শেষ ডোজটা দিল পরদিন সকাল ছ'টায়, তারপর দুটো কামরার বিল মিটিয়ে দিয়ে হোটেল ছাড়ল।

অবশেষে ঘুম ভাঙল টোবির, দেখল, যে মেয়েটাকে নিয়ে শুয়েছিল ও, বিদায় না নিয়েই চলে গেছে সে। তারপর অনুভব করল রাক্ষসের মত খিদে পেয়েছে তার।

সকাল গড়িয়ে দুপুর হবার আগেই আবিষ্কার করল সে, তার ধারণা ভুল, এক রাত নয়, দুই রাত আর মাঝখানের একটা দিন অঘোরে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে সে। ব্যাপারটা আবিষ্কার করে বোকা বোকা লাগল নিজেকে।

মাথার ভেতর নাছোড় একটা ধারণা পেয়ে বসল তাকে, তার ঘুমিয়ে পড়ার আগে বা পরে গুরুত্বপূর্ণ কি যেন একটা ঘটেছে, কিন্তু সেটা যে কি তা কোনদিনই মনে করতে পারেনি সে।

ইতোমধ্যে, উনিশশো আশির সতেরোই নভেম্বর, রোববারে, ইউরেনিয়াম নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে ইমপেরিয়াল।

সাত

যে-কোন একটা মিশরীয় দূতাবাসে ফোন করে রানার জন্যে ওদেরকে একটা মেসেজ দিলেই তো পারে সে।

কোহেনকে সাহায্য করব, বাপকে কথাটা জানাবার এক ঘণ্টা পর চিন্তাটা মাথায় এল এষার। ছোট একটা ব্যাগে নিজের জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিচ্ছিল ও, সেটা বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ত্রস্ত পায়ে পাশের কামরায় চলে এল ও। রিসিভার তুলে অনুসন্ধানে ডায়াল করতে যাবে, ঘরে ঢুকলেন প্রফেসর ফিলমনটন। কাকে ফোন করছে এষা? ধরা পড়ে গেলে কি উত্তর দেবে আগেই ভেবে রেখেছিল সে, বলল, এয়ারপোর্টে। দরকার নেই, প্রফেসর জানালেন, ওসব তিনিই সামলাবেন।

সেই থেকে সারাক্ষণ সতর্ক ছিল এষা, কিন্তু গোপনে ফোন করার কোন সুযোগ পেল না সে। প্রতিটি মুহূর্ত ওর পাশে রইল কোহেন। ট্যাক্সি নিয়ে এয়ারপোর্টে এল ওরা, প্লেন ধরল, তারপর কেনেডি এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা আলবার্তো ফেলিনির বাড়িতে পৌঁছল।

পথে এমন সব কথাবার্তা বলল কোহেন, যেন বোঝাতে চায়, এষাকে নিয়ে তার মনে এরই মধ্যে অনেক আশা দানা বেঁধে উঠেছে। এষা বুঝল, একে বেশি বাড়তে দেয়া উচিত নয়, প্রথম রাতেই বিড়াল মারা দরকার। যেহেতু প্রসঙ্গ রাজনীতি নয়, নেহাতই ব্যক্তিগত, বৈরী মনোভাব প্রকাশ করতে কোন বাধা দেখল না সে। নিজের ক্যারিয়ার, দেশকে সে কতটুকু ভালবাসে, ইহুদি জাতির ধৈর্য আর সংগ্রাম, ইসরায়েলের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি বিষয়ে বকর বকর করার পর হঠাৎ করেই এষার হাঁটুর ওপর একটা হাত রাখল কোহেন, তারপর ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইল, তার মা রাজিয়া ফিলমনটনের সাথে সাধারণ বন্ধুত্বের চেয়ে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল তার, এবং এষার সাথেও সাধারণ বন্ধুত্বের চেয়ে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠতা করতে চায় সে। ইসরায়েলের নাম মুখে না এনে এষা বলল, গায়ের জোরে চিরকাল টিকে থাকা যায় না, অন্যায়কে পরাজয়ের মুখ একদিন না একদিন দেখতে হবেই, এবং, পুরুষ জাতের মধ্যে এমন গবেটও আছে যারা পৌরুষদীপ্ত হওয়া আর ভাদ্রমাসের কুকুর হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য দেখে না। এতেই কাজ হলো, মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকল কোহেন।

ফেলিনির ঠিকানা পেতে একটু ঝামেলা হলো ওদের। কয়েকজন ট্যাক্সি ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করা হতে নিঃশব্দে মাথা নাড়ল তারা। একসময় প্রায় ধরেই নিল এষা, নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হবে ওদেরকে। কোহেন বলল, 'ফেলিনির ঠিকানা সবাই জানে এরা, কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক, বলতে চাইছে না। সম্ভবত ভয়ে। তুমি তো জানো না, এই ইতালীয় পরিবারগুলোর কি রকম দাপট এখানে।'

শেষ পর্যন্ত একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারই সাহায্য করল ওদেরকে। মাফিয়া চীফ আলবার্তো ফেলিনির বাড়ি ছাড়িয়ে আরও দুশো গজ এগোল ট্যাক্সি, তারপর থামল। একাই নামল এষা। ট্যাক্সি চলে গেল। সামনের মোড়ে অপেক্ষা করবে কোহেন।

বাড়ি তো নয়, যেন একটা সুরক্ষিত দুর্গ। দুই মানুষ উঁচু পাঁচিল দেখে মনে একটু ভয়ই ধরে গেল এষার। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগল ও। গার্ডরুম থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল দু'জন লোক, চোখে সতর্ক দৃষ্টি। শার্টের ভেতর হোলস্টারে রিভলভার আছে, সেটা ওদের দিকে একবার তাকিয়েই বুঝতে পারল এষা।

'কি চাই?'

একটু চিন্তা করে উত্তর দিল এষা, 'মি. ফেলিনির সাথে দেখা করতে এসেছি আমি, তাঁকে বলতে হবে আমি মাসুদ রানার বন্ধু।'

গার্ডরুমের ভেতর নিয়ে গিয়ে বসানো হলো এষাকে। ভেতরে আরও দু'জন লোক ছিল, তাদের একজন খবর দেবার জন্যে ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করতে শুরু করল। চারজনই তাকিয়ে আছে ওর দিকে, কিন্তু কেউ কোন কথা বলল না।

সামনে একটা সমস্যা রয়েছে, সেটার কথা ভাবতে শুরু করায় ভয় ভয় ভাবটা কেটে গেল এষার। মাফিয়া চীফকে কি বলবে ও? সবটা, নাকি কিছুটা? আচ্ছা,

ধরে নেয়া গেল, রানা কোথায় আছে জানে ফেলিনি, কিংবা চেষ্টা করলে জানতে পারবে—কিন্তু জিজ্ঞেস করলেই এষাকে বলবে তার কি মানে আছে? ও বলবে, রানার খুব বিপদ, খুঁজে বের করে তাকে সাবধান করতে চায় ও। ওর কথা বিশ্বাস করার কি কারণ আছে ফেলিনির? হ্যাঁ, মেয়েলি অস্ত্র দিয়ে লোকটাকেও কাবু করার চেষ্টা করতে পারে, নিজের ওপর সে-বিশ্বাস আছে ওর, কিন্তু তবু সন্দেহের ভাবটা ফেলিনির মনে থেকেই যাবে।

না, এভাবে কাজ হবে না। ফেলিনি এমন এক জগতের মানুষ, তাকে মিথ্যে বলে পার পাওয়া সম্ভব নয়। এষা তাকে সত্যি কথাই বলবে, কিছুই বাদ দেবে না। বলবে রানার সাথে দেখা করে তাকে সাবধান করে দিতে চায় ও। এ-ও বলবে, রানার শত্রুরা তাকে নিজেদের ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করছে, তাদের কথায় রাজি হয়ে তাদের একজনকে সাথে নিয়েই ফেলিনির সাথে দেখা করতে এসেছে ও। বলবে, এই বাড়ি থেকে আধ মাইল দূরে ওর জন্যে একটা ট্যাক্সি নিয়ে অপেক্ষা করছে ন্যাট কোহেন। কিন্তু অসুবিধে হলো, এত সব কথা বললে হয়তো মাফিয়া চীফ রানার কোন কথাই ওকে বলতে রাজি হবে না।

মনস্থির করতে পারল না এষা। শুধু অনুভব করল, রানার সামনে দাঁড়িয়ে তার সাথে ওর নিজেকে কথা বলতে হবে।

একজন গার্ড যখন ওকে সাথে করে কংক্রিটের উঠান ধরে বাড়ির দিকে এগিয়ে দিচ্ছে, তখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি এষা। বাড়ির ভেতরটা খুব সুন্দর, কিন্তু কোথাও কোথাও সৌন্দর্য বাড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে উল্টোটা ঘটানো হয়েছে। ব্যাপারটা বোধহয় এই ঘটেছে—একজন ডেকোরেটর তার চমৎকার রুচি অনুযায়ী বাড়িটাকে সাজিয়ে দিয়ে চলে গেছে, আর তারপর বাড়ির মালিক নিজের রুচি চাপাবার জন্যে দামী দামী জিনিসের গাদা নিয়ে এসে ফেলেছে যেখানে খুশি। অনেক চাকর-বাকর দেখল এষা। তাদেরই একজন পথ দেখিয়ে দোতলায় নিয়ে এল ওকে। বলল, মি. ফেলিনি তাঁর বেডরূমে দেরি করে ব্রেকফাস্ট খেতে বসেছেন।

ভেতরে ঢুকে এষা দেখল, সামনে ছোট একটা টেবিল নিয়ে ডিমের কুসুমে চামচ ঢোকাচ্ছে আধ-বুড়ো, ভীষণ মোটা, টেকো এক লোক। রওনা হবার আগে বাবা ওকে জানিয়েছেন, ওদের বাড়ি থেকে রানা চলে যাবার কয়েক বছর পরও ওর খোঁজে ফেলিনি একবার অক্সফোর্ডে গিয়েছিল, সেবার এষাকে দেখে এসেছিল সে। এষা তখন তিন বছরের শিশু। এই মোটা লোকটা ফেলিনি, বুঝতে পারলেও, একে আগে কখনও দেখেছে বলে মনে করতে পারল না এষা।

আলবার্তো ফেলিনি এক চামচ পোচ করা ডিম মুখে দিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। চোখের পলকে আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার চোখ, লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল সে। 'আপনি নাকি মারা... আপনাকে...' বলেই বিষম খেলো সে। বুকে হাত দিয়ে প্রচণ্ড একনাগাড় কাশিতে বাঁকা হয়ে গেল দশাসই শরীরটা।

একজন চাকর ছুটে এসে পিছন থেকে ধরে ফেলল এষাকে, ওর একটা হাত মুচড়ে পিঠের ওপর নিয়ে গেল। ব্যথায় ককিয়ে উঠল এষা। 'কি করেছ তুমি!'

আর্তনাদ করে উঠল চাকর লোকটা। 'যীশুর কিরে, কি করেছ বলো!'

ব্যথা পেলেও, কেন যেন ভয় পায়নি এষা, বরং যে ভয় ভয় ভাবটা নিয়ে ভেতরে ঢুকেছিল সেটা কেটে গেল।

মাফিয়া চীফ আলবার্তো ফেলিনি সুপারম্যান নয়, যত বড় গুণ্ডাই সে হোক, আসলে রক্ত মাংসেরই মানুষ, সে-ও আতঙ্কিত হয়, বিষম খায়—এই উপলব্ধি সাহস এবং স্বস্তি ফিরিয়ে দিল এষাকে।

মালিক শুধু বিষম খেয়েছেন, আর কিছু না, এটা বুঝতে পেরে এষাকে ছেড়ে দিল লোকটা। চেহারা একটু গম্ভীর করে তুলে তাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে ইঙ্গিত করল এষা। তারপর ছোট টেবিলের সামনে একটা চেয়ার টেনে বসল, কারও সাধার অপেক্ষায় না থেকে নিজেই একটা কাপে কফি ঢেলে নিল। ফেলিনির কাশির প্রকোপ একটু কমতে মৃদু কণ্ঠে বলল এষা, 'তিনি আমার মা ছিলেন।'

'মাই গড!' বলল ফেলিনি। শেষ একটা কাশি দিয়ে তাকাল চাকরের দিকে, এষার কথায় ঘর ছেড়ে বেরোয়নি সে। হাত-ইশারায় তাকে বিদায় করে দিল মাফিয়া চীফ। তারপর বসল। 'চেহারার এই রকম মিল…তুমি তো আমাকে আর একটু হলে মেরেই ফেলেছিলে!' মনে করার চেষ্টায় চোখ দুটো ছোট ছোট হয়ে এল তার। 'বোধহয় পনেরো ষোলো বছর আগের কথা, তুমি তখন আড়াই-তিন বছরের বাচ্চা মেয়ে…'

'হ্যাঁ, বাবার মুখে শুনেছি, রানার খোঁজে আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন আপনি।'

'তোমার একটা পুতুল ছিল, কিন্তু তার সাথে বিয়ে দেবার জন্যে একটা বর ছিল না তোমার,' মুচকে মুচকে হাসছে ফেলিনি। 'কেঁদে-কেটে অস্থির করে তুলছিলে তোমার মাকে…এখন আর সে দুঃখ থাকার কথা নয় তোমার।' ফেলিনির হাসিটা রহস্যময় হয়ে উঠল। 'বর তো পেয়েই যাচ্ছ, তাই না? তোমার পছন্দ আছে বলতে হবে। রানার মত সোনার টুকরো ছেলে হয় না।'

'তার মানে রানা এখানে এসেছিল,' বলল এষা। শরীর আর মনে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল।

'হয়তো,' বলল ফেলিনি। তার চেহারা থেকে এক নিমেষে বন্ধুত্বের ভাবটা মিলিয়ে গেল। মন খারাপ হয়ে গেল এষার, বুঝল, এই লোককে সহজে রাজি করানো যাবে না।

'রানা কোথায় জানতে চাই আমি,' বলল এষা।

'আর আমি জানতে চাই কে তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে?'

'কেউ না, আমি নিজেই এসেছি।' মনের উত্তেজনা চেপে রাখতে হিমশিম খেতে হলো এষাকে। 'যে কাজে রয়েছে ও…এই প্রজেক্ট সফল করতে হলে আপনার সাহায্য লাগতে পারে ওর, এই ভেবে আপনার কাছে এসেছি আমি। আমাকে আপনি বিশ্বাস করুন, তাতে রানার উপকার হবে। সব কথা বলা দরকার আপনাকে…রানার এই প্রজেক্ট সম্পর্কে ইসরায়েলীরা জানে, তারা ওকে খুন

করবে⋯রানাকে সাবধান করতে হবে আমার⋯প্লীজ, কোথায় আছে ও তা যদি আপনি জানেন, আমাকে বলুন⋯প্লীজ, আমাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেবেন না। আমি আপনার সাহায্য চাই।'

কথাগুলো শেষ করার আগেই এষার চোখে পানি দেখা গেল। কিন্তু মাফিয়া চীফকে সেটা স্পর্শ করল না।

'তোমাকে সাহায্য করা সহজ,' বলল ফেলিনি। 'কঠিন হলো তোমাকে বিশ্বাস করা।' মোড়ক খুলে একটা সিগার বের করল সে প্রচুর সময় নিয়ে। ধৈর্য ধরে থাকার অসীম যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে তাকিয়ে থাকল এষা। ওর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল ফেলিনি, তারপর অনেকটা স্বগতোক্তির মত করে বলল, 'জানো, একটা সময় ছিল, আমার দরকার লাগবে এই রকম কোন জিনিস দেখতে পেলেই ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিতাম। ব্যাপারটা এখন আর অত সহজ নেই। রাজ্যের জটিলতা এসে গেছে। আমাকে এখন বাছ-বিচার করতে হয়, কিন্তু যেগুলো বেছে নিতে হয় সেগুলো আসলে আমি চাই না বা আমার দরকার হয় না। এই-ই এখনকার বাস্তবতা, নাকি আমিই বদলে গেছি, বুঝি না।'

মুখ ফিরিয়ে আবার এষার দিকে তাকাল ফেলিনি। 'লোকে টাকা ধার নিয়ে ঋণী হয়, আমি রানার কাছ থেকে জীবন ধার নিয়ে ঋণী হয়ে আছি। ওর প্রাণ বাঁচিয়ে সেই ঋণ শোধ করার একটা সুযোগ এসেছে, তোমার কথা যদি সত্যি হয়। এ আমার ব্যক্তিগত ঋণ, আমার নিজেকেই এটা শোধ করতে হবে, লোক দিয়ে নয়। এখন তাহলে কি করতে পারি আমি?' মলিন চেহারা নিয়ে এষার দিকে তাকিয়ে থাকল মাফিয়া চীফ।

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে এষা।

'মেডিটেরেনিয়ানের তীরে কোথাও একটা পোড়োবাড়িতে আছে রানা। সেখানে কোন লোকজন থাকে না, অনেক বছর থেকে খালি পড়ে ছিল, তাই টেলিফোন নেই। আমি হয়তো একটা খবর পাঠাতে পারি, কিন্তু খবরটা যে রানার কাছে পৌঁছবে, তার নিশ্চয়তা কি? তাছাড়া, বললামই তো, এটা আমার ব্যক্তিগত ঋণ, আমার নিজেকেই শোধ করতে হবে।'

সিগার ধরিয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাল ডন ফেলিনি। 'কোথায় গেলে তাকে পাবে, তোমাকে আমি বলতে পারি। কিন্তু ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ঠিকানাটা তুমি রানার শত্রুদের জানিয়ে দিতে পারো। সে-ঝুঁকি আমি নিতে পারি না।'

'তাহলে? তাহলে উপায় কি?' এত জোরে কথা বলছে এষা, নিজেই চমকে উঠল, 'যেভাবেই হোক তাকে আমাদের সাহায্য করতে হবে।'

'জানি, জানি,' অন্যমনস্ক দেখাল মাফিয়া চীফকে। বিড়বিড় করে কথা বলছে সে। 'আমি নিজেই যাব⋯হ্যাঁ, আমার নিজেকেই যেতে হবে তার কাছে।'

'সে কি!' নিজেকে সাবধান করার আগেই এষার মুখ ফস্কে বেরিয়ে এল শব্দটা। এই সম্ভাবনার কথা ওর বিবেচনার মধ্যে কখনোই ছিল না।

'কিন্তু তোমাকে নিয়ে কি করা যায়?' বিড় বিড় করে বলে চলল ফেলিনি।

'কোথায় যাচ্ছি সে-কথা তোমাকে আমি জানাচ্ছি না। কিন্তু তবু তোমার হাতে এমন লোক থাকতে পারে যারা আমার পিছু নেবে। তোমাকে একেবারে আমার পাশে রাখার দরকার হবে এখন থেকে। ব্যাপারটা মেনে নাও। তোমাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি না, তুমি ওদের লোক নও তার কোন প্রমাণ আমার হাতে নেই। রানা বলেছে বটে, তুমি ওকে ভালবাস, কিন্তু রানা তো ভুলও করতে পারে, না, তোমাকে বিশ্বাস করা আমার সাজে না। কাজেই তোমাকে আমি সাথে করে নিয়ে যাচ্ছি।'

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল এষা। বন্যার ফিরতি পানির মত হুড়হুড় করে উত্তেজনার ভাবটা নেমে গেল শরীর থেকে, ভীষণ ক্লান্ত আর হালকা লাগল নিজেকে। চেয়ারের পিঠে এলিয়ে পড়ল সে। তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করছে ওরা। বরাবর তাই করে ফেলিনি। খাওয়াদাওয়ার পর টয়লেটে যাবার নাম করে উঠে পড়ল এষা। মনে দুরাশা, কোহেন বোধহয় প্লেনে নেই। পর্দা সরিয়ে ইকনমিতে উঁকি দিল সে। হতাশায় ছেয়ে গেল মন। সারি সারি হেডরেস্টের ওপর দিয়ে ওর দিকেই জুলজুল করে তাকিয়ে আছে কোহেন।

টয়লেট থেকে বেরিয়ে গ্যালিতে চলে এল এষা। চেহারায় অপ্রস্তুত আর লজ্জিত ভাব নিয়ে কথা বলল চীফ স্টুয়ার্ডের সাথে। তার একটা সমস্যা হয়েছে, বলল সে। প্রেমিকের সাথে যোগাযোগ করা দরকার, কিন্তু ইটালিয়ান বাবার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে ফোন করা সম্ভব নয়, একুশে না পড়া পর্যন্ত বাবা হাত-পায়ে বেড়ি পরিয়ে রাখতে চান। আপনি কি দয়া করে আমার এই উপকারটা করে দেবেন? রোমে মিশরীয় দূতাবাসে একটা ফোন করতে হবে, আর কিছু না। ওদেরকে একটা মেসেজ দিতে হবে, সেটা যেন মাসুদ রানা পায়। মেসেজটা সহজ, এক কথায় সারা যায়—কোহেন আমাকে সব বলেছে, তাকে নিয়ে তোমার সাথে দেখা করতে আসছি আমি। ফোন করতে যা লাগবে তারচেয়ে অনেক বেশি টাকা দিল এষা, আসলে লোকটাকে খুশি করতে চাইল। তার অনুরোধে মেসেজটা লিখেও দিল সে। তারপর আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল গ্যালি থেকে।

মাফিয়া চীফের পাশে ফিরে এল এষা। 'খবর ভাল নয়,' বলল সে। 'ইসরায়েলীদের একজন ইকনমিতে বসে আছে। লোকটা নিশ্চয়ই আমাদেরই পিছু নিয়েছে।'

অশ্রাব্য একটা গালি দিল ফেলিনি, তারপর ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলল, 'ভুলে যাও, সময় হলে ওর ব্যবস্থা ঠিকই করা হবে।'

তার মানে কি কোহেনের বিপদ হবে? কি ধরনের বিপদ? এর বেশি কিছু ভাবতে পারল না এষা। মনে মনে জিজ্ঞেস করল, খোদা, কি অন্যায় করেছি আমি!

পাহাড় প্রাচীরের মাথায় মস্ত ভিলা, আলবার্তো ফেলিনির ভাষায় পোড়োবাড়ি। পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে কয়েক প্রস্থ আঁকাবাঁকা সিঁড়ি। তিনশোর ওপর ধাপ বেয়ে সৈকতে নেমে এল রানা। অল্প পানিতে নেমে পায়ের ছপছপ শব্দ তুলে মোটর

বোটের দিকে এগোল ও. তারপর লাফ দিয়ে উঠে পড়ে হুইলে বসা লোকটার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল।

গর্জে উঠল এঞ্জিন. ঢেউ ভেঙে সাগরের দিকে ছুটল বোট। দিগন্তরেখার নিচে এইমাত্র নেমে গেছে সূর্য. দিনের শেষ আলো মিলিয়ে যাবার আগেই থরে থরে মেঘ জমতে শুরু করেছে আকাশে. জ্বলে ওঠার সাথে সাথে ঢেকে দিচ্ছে তারাগুলোকে। গভীর চিন্তায় ডুবে আছে রানা. আতিপাতি করে খুঁজছে কোন্ কাজটা করা হয়নি. কোন্ দিকে আরও বেশি সাবধানতা অবলম্বনের দরকার আছে. কোথাও কোন ফাঁক-ফোকর আছে কিনা যেগুলো বন্ধ করার সময় এখনও পেরিয়ে যায়নি। নিজের গড়া প্ল্যান আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত বারবার স্মরণ করল ও. আশা কোথাও যদি কোন ত্রুটি ধরা পড়ে।

পাহাড়ের মত সাগরে ভাসছে ইমপেরিয়ালের যমজবোন অরিয়ন. তার পাশে ভেড়ার জন্যে ফেনাময় একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করল বোটম্যান বোট ভাল করে থামার আগেই ঝুলন্ত রশির মইটা ধরে ফেলল রানা, প্রায় তরতর করে উঠে এল ডেকে।

জাহাজের মাস্টার হ্যান্ডশেক করে নিজের পরিচয় দিল। অরিয়নে আর যে-সব অফিসার রয়েছে তাদের মত একেও মিশরীয় নেভি থেকে ধার করেছে রানা।

রানার সাথে সাথে ডেকের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত হাঁটল জাহাজের মাস্টার। 'কোন সমস্যা, ক্যাপ্টেন?' জানতে চাইল রানা।

'একে ভাল জাহাজ বলে না,' বলল ক্যাপ্টেন। 'পুরানো, অলস। তবে চেহারা-সুরৎ মন্দ নয়।'

টোয়াইলাইটের আলোয় যতটুকু দেখতে পেল রানা. যমজবোন ইমপেরিয়ালের চেয়ে অরিয়নকে ভালই মনে হলো তার। অন্তত ডেকটা পরিষ্কার, রঙের কাজ এখনও অম্লান।

ব্রিজে উঠে এল ওরা। রেডিও রূমে ঢুকে শক্তিশালী ইকুইপমেন্টের ওপর চোখ বুলাল রানা। তারপর নেমে এল মেসে। ডিনার থেকে ওঠার সময় হয়েছে ক্রুদের, মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল সবাই। অফিসার বাদে, সাধারণ সী-মেন যারা রয়েছে তারা সবাই মিশরীয় ইন্টেলিজেন্সের লোক, এদের প্রায় সবারই সমুদ্র-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বেশি নয়। কারও কারও সাথে আগের পরিচয় আছে রানার, দু'একজনের সাথে কাজও করেছে। রানা লক্ষ্য করল, বয়সে প্রায় সবাই ওর চেয়ে কিছু বড় হবে। ওদের সতর্ক চোখে বুদ্ধির দীপ্তি, স্বাস্থ্য ভাল, পরনে ডেনিম আর ঘরে বোনা সোয়েটার। সবাই এরা কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, হাসিখুশি, ট্রেনিং পাওয়া লোক। এক কাপ কফি নিল রানা, চারজনের সাথে বসল একটা টেবিলে। এক এক করে সবাই হাত মেলাল ওর সাথে। আলকাতরার মত চকচকে কালো লোকটার নাম জহির, মণি জোড়া বাদ দিয়ে দুধের মত সাদা চোখ। বলল, 'আবহাওয়া বদলাচ্ছে।'

'ও কথা বোলো না। এই আনন্দ ভ্রমণে বেরিয়েছি আমি রোদে পুড়ে গায়ের রঙটা একটু গাঢ় করে নেব বলে।' কথাগুলো বলল মোবারক। তার এ-কথা বলার

অধিকার আছে, গায়ের রঙটা ধবধবে ফর্সা।

এই অ্যাসাইনমেন্টকে ঠাট্টা করে আনন্দ ভ্রমণ বলা এরই মধ্যে একটা রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেছে। দিনের প্রথম দিকে ব্রিফিং করার সময় ওদেরকে জানিয়েছে রানা, ওরা যখন হাইজ্যাক করবে ইমপেরিয়ালে তখন কেউ থাকবে না বললেই চলে। 'জিব্রালটার প্রণালী পেরিয়ে আসার একটু পরই,' ওদেরকে বলেছে ও, 'ইমপেরিয়ালের এঞ্জিন নষ্ট হয়ে যাবে। এমনভাবে নষ্ট হবে, সাগরে বসে সেটা মেরামত করা সম্ভব নয়। এই খবর জানিয়ে জাহাজের মালিককে মেসেজ পাঠাবে ক্যাপ্টেন, তারমানে আমাদেরকে, কারণ আমরাই এখন ইমপেরিয়ালের নতুন মালিক। আপাতদৃষ্টিতে ভাগ্যই বলতে হবে, আমাদের অন্য একটা জাহাজ ওই সময় ওই এলাকায় থাকবে। তার নাম ওয়াটারহেন, এখন ওখানকার বে-তে নোঙর ফেলে রয়েছে। ইমপেরিয়ালের পাশে গিয়ে এক এঞ্জিনিয়ার বাদে বাকি সবাইকে উদ্ধার করবে সে। তারপর তার আর কোন ভূমিকা থাকবে না। কোন একটা বন্দরে গিয়ে ভিড়বে সে, বাড়ি ফেরার গাড়ি ভাড়া দিয়ে ইমপেরিয়ালের ক্রুদের নামিয়ে দেবে।'

ব্রিফিঙে যা বলা হয়েছে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে সারাটা দিন সময় পেয়েছে ওরা, ওদের কাছ থেকে কিছু প্রশ্ন আসবে বলে ধারণা করছে রানা। ইয়াকুব, যার বর্ণনা দিতে গিয়ে মোবারক সব সময় এই শব্দগুলো ব্যবহার করে, 'প্যাটন ট্যাংকের মত গড়ন, দেখতেও সেই রকম সুন্দর'—রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি বলেছ, ইমপেরিয়ালের এঞ্জিন নষ্ট হবে, ঠিক তুমি যখন চাও—কিন্তু বলোনি, এতটা নিশ্চিত হচ্ছ কিভাবে।'

কফির কাপে চুমুক দিয়ে রানা জানতে চাইল, 'আব্বাস হোবায়দার নাম শুনেছ, ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের?'

মোবারক তাকে চেনে, বলল, 'পরিচয় আছে।'

'সে-ই এখন ইমপেরিয়ালের এঞ্জিনিয়ার।'

সবজান্তার মত মাথা নাড়ল ইয়াকুব। বলল, 'এরই সাথে জানা হয়ে গেল, ইমপেরিয়ালকে আমরা মেরামতও করতে পারব। এঞ্জিনের কোথায় কি নষ্ট হবে আমরা জানি।'

'রাইট।'

বিরতি না নিয়ে বলে চলেছে ইয়াকুব, 'ইমপেরিয়ালের নাম আমরা মুছে ফেলব, সেই জায়গায় লিখব অরিয়ন, লগ বুক বদল করব, পানি ঢোকার ছিপি খুলে দিয়ে ডুবে যাবার সুযোগ করে দেব অরিয়নকে, তারপর ইমপেরিয়ালকে নিয়ে রওনা দেব—তখন ওর নাম অরিয়ন—সবশেষে পোর্ট সাঈদে পৌঁছুব, ইউরেনিয়ামসহ। কিন্তু আমাদের ক্রেন আছে, এক জাহাজ থেকে আরেক জাহাজে কার্গো তুলে নিতে অসুবিধে কি?'

'প্রথমে আমি এই প্ল্যানই করেছিলাম,' বলল রানা। 'কিন্তু বড় বেশি ঝুঁকি আছে বলে বাদ দিয়েছি। এটা সম্ভব বলে সেন্ট পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিতে পারি না, বিশেষ করে খারাপ আবহাওয়ায়।'

'এই আবহাওয়া বহাল থাকলে এখনও আমরা এই প্ল্যান ধরে এগোতে পারি…'

'তা পারি,' বলল রানা, 'কিন্তু এখন যখন একই চেহারার সিসটার শিপ রয়েছে আমাদের হাতে, কার্গো বদলের চেয়ে নাম বদল করা অনেক বেশি সহজ হবে।'

জহির বলল, 'তাছাড়া, এই যে ভাল আবহাওয়া দেখছি, এটা টিকবে বলে মনে হয় না।'

টেবিলে চার নম্বর লোকটার নাম রাহমান, ইয়াকুবের দুলাভাই, নিষ্ঠুর চেহারা কিন্তু কারও সাথে চোখাচোখি হলেই হাসে, তাতে করে হাসিটাকে বানোয়াট বলে মনে হয়। বলল, 'গোটা ব্যাপারটা যদি এইরকম পানির মত সহজই হয়, আমাদের মত একদল দুর্ধর্ষ বদমাশ তাহলে কি করতে এসেছি এখানে?'

কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বলল রানা, 'প্ল্যানটা তৈরি করার জন্যে ছ'মাস ধরে গোটা দুনিয়া চষে বেড়াতে হয়েছে আমাকে। দু'একবার শত্রুদের সাথে দেখা হয়ে গেছে আমার, কিছু করার ছিল না। আমরা কি করতে যাচ্ছি তা ওরা জানে বলে আমি মনে করি না… কিন্তু যদি জানে, তাহলে হয়তো একটা পরীক্ষা হয়ে যাবে, আসলে কতটা দুর্ধর্ষ আমরা।'

একজন অফিসার ঢুকল মেসে, হাতে একটা কাগজ নিয়ে এগিয়ে এল রানার দিকে। 'মেসেজ, স্যার। কায়রো থেকে। ইমপেরিয়াল এইমাত্র জিব্রালটার পেরিয়েছে।'

'দ্যাট'স ইট,' বলল রানা, উঠে দাঁড়াল। 'সকালে রওনা হব আমরা।'

রোমে প্লেন বদল করে খুব সকালে সিসিলিতে পৌঁছল ওরা। দু'জন লোক, সম্পর্কে ওর ভাই হয়, এয়ারপোর্টে দেখা করল ফেলিনির সাথে। ওদের সাথে দীর্ঘ তর্ক হলো তার, মারমুখো কোন ভঙ্গি না থাকলেও উত্তেজনার কোন অভাব দেখা গেল না। খাস স্থানীয় বুলি; অর্থ করতে পারল না এষা, কিন্তু ভাব-ভঙ্গি থেকে বুঝল, ভায়েরা ফেলিনির সঙ্গী হতে চায়, কিন্তু ফেলিনির যুক্তি হলো, এটা আমার একটা ব্যক্তিগত ঋণ, একা আমাকেই শোধ দিতে হবে।

মনে হলো বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ফেলিনিই জিতল। সাথে কাউকে না নিয়ে এষা আর মাফিয়া চীফ প্রকাণ্ড একটা সাদা ফিয়াটে চড়ে বেরিয়ে এল এয়ারপোর্ট থেকে। গাড়ি চালাচ্ছে এষা, তাকে পথ-নির্দেশ দিয়ে কোস্ট রোডে তুলে নিয়ে এল ফেলিনি।

রানার সাথে আবার দেখা হবার মুহূর্তটি কেমন হবে আন্দাজ করতে গিয়ে দুটো দৃশ্য কল্পনা করল এষা। তার মধ্যে প্রথম দৃশ্যটা কম করেও একশোবার চাক্ষুষ করল সে।—নির্জন সমুদ্র-সৈকত, একজোড়া নারকেল গাছের নিচে আনমনে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা, পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ছে ভাঙা ঢেউ আর সাদা ফেনা, পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যাচ্ছে টকটকে লাল সূর্য, তীব্র বাতাসে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে রানার চুল, আকাশের কমলা রঙ মেখেছে তার চোখ, পায়ের শব্দে চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল সে, এষাকে দেখে এক সেকেন্ড চিনতে পারল না, তারপরই পরম

আনন্দে উদ্ভাসিত হলো চেহারা. দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে ছুটে এল তার দিকে. তার বুকে গিয়ে আছাড় খেলো এষা। এত জোরে জড়িয়ে ধরল রানা. ব্যথা লাগল তার. কিন্তু চোখে আনন্দের পানি।

আরেকটা কল্পনা—পাথুরে চোখে কঠিন দৃষ্টি. এষার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে কর্কশ সুরে জানতে চাইল রানা. এখানে তুমি কি করতে এসেছ? এই দৃশ্যটা একবার. বড়জোর দু'বার দেখেছে এষা

আড়চোখে মাফিয়া চীফের দিকে তাকাল এষা ট্রান্সআটলান্টিক জার্নি ক্লান্ত আর দুর্বল করে তুলেছে লোকটাকে একে বয়স হয়েছে. তার ওপর শরীরটাকে ইচ্ছেমত ফুলতে দিয়েছে। ব্যায়াম নেই. ঘন ঘন ধূমপান করে. খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে কোন সংযমের ধার ধারে না। ক'দিনই বা বাঁচবে এই লোক। ওর কথায় এত ধকল সহ্য করছে. নিজেকে একটু অপরাধী অপরাধী লাগল এষার

সূর্য ওঠার পর সুন্দর দেখাল দ্বীপটাকে রানার বিপদ. এই কথাটা ভুলে থাকার জন্যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে মন দিল সে একপাশে সাগর. আরেক পাশে পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে সবুজ বন। রাস্তাটা আঁকাবাঁকা. খানিক পরপরই একটা করে শহরের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেছে।

চোখ বুজে দম নিচ্ছিল মাফিয়া চীফ. নড়েচড়ে বসল সে. একটা সিগারেট ধরাল।

'একটু কম খেতে পারেন না?' তিরস্কারের সুরে বলল এষা।

'এই ধরনের শাসন রানার জন্যে তুলে রাখো,' মুচকি হেসে বলল ফেলিনি।

'এসব ব্যাপারে তাকে শাসন করার দরকার নেই।'

প্রসঙ্গ বদলে নিজের কথা শুরু করল ডন। 'বয়স যখন কম ছিল. এর চেয়ে বেশি ধকল গেছে. টের পাইনি। সেদিন আর নেই। অনেক টাকা হয়েছে আমার. কিন্তু আরও টাকা বানাবার জন্যে ব্যবসাটা আমাকে দেখতেই হয়। ফলে নিউ ইয়র্ক ছেড়ে বেরনো হয় না, জীবনটাকে দেখা হয় না, দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগের হাত থেকে রেহাই মেলার উপায় হয় না—আমি একটা অন্ধকারে বন্দী হয়ে আছি, সে-অন্ধকার আমার নিজেরই তৈরি। একদিক থেকে বিচার করতে গেলে. এ আমার ব্যর্থ জীবন। শুধু টাকা আর কাজ নিয়ে থাকলাম। জীবনটা যে শুধু টাকা আর কাজ নয়, দুনিয়াটাকে দু'চোখ মেলে দেখাও, সেটা আমি ভুলেই গেছি।'

'সেজন্যে আপনিই দায়ী,' বলল এষা।

'হ্যাঁ. আমিই দায়ী,' বলল ফেলিনি। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল সে. তারপর আবার বলল, 'আজকালকার ছেলেমেয়েদের মনে দয়া মায়া নেই

রিয়ার ভিউ মিররে এইবার নিয়ে নীল গাড়িটাকে তিনবার দেখল এষা 'আমাদের পেছনে ফেউ লেগেছে,' বলল সে। গলার আওয়াজটাকে যথাসম্ভব শান্ত আর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল।

'ইহুদি?'

'তাছাড়া আর কে হতে পারে?' উইন্ডশীল্ডের পিছনে ওটা কার মুখ দেখতে পাচ্ছে না এষা 'কি করব আমরা? আপনি বলেছেন. ব্যবস্থা করবেন।'

'করা হবে।'

বলেই চুপ করে গেল ফেলিনি। আরও কিছু বলবে আশা করে তার দিকে তাকাল এষা একটা পিস্তলে কালচে-খয়েরী রঙের বুলেট ভরছে মাফিয়া চীফ আঁতকে উঠল এষা, সত্যিকার পিস্তল এর আগে দেখেইনি সে

মুখ তুলে এষা, তারপর সামনের রাস্তার দিকে তাকাল ফেলিনি 'আরে, মারবে নাকি? রাস্তার দিকে ফিরে গাড়ি চালাও!'

ঝট্ করে সামনে তাকাল এষা, তীক্ষ্ণ একটা বাঁক দেখে দ্রুত ব্রেক করল 'এই জিনিস আপনি পেলেন কোথায়?' জানতে চাইল সে।

হেসে উঠল ফেলিনি 'এক ভাই উপহার দিয়েছে।'

আবার মনে হলো এষার, এসব সত্যি নয়, দুঃস্বপ্ন দেখছে সে গত চারদিন বিছানার চেহারা দেখেনি। রানা খুন হবে, বাপের মুখে এই কথা শোনার পর থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে সে। বাবা আর কোহেনের কাছ থেকে পালিয়ে রানার নিরাপদ বুকে মুখ লুকাতে চায়। কিন্তু দুঃস্বপ্নে ঠিক যেমনটি হয়, তাই ঘটছে—যত জোরে ছুটছে সে তত জোরেই পিছিয়ে যাচ্ছে গন্তব্য।

'কোথায় যাচ্ছি সেটা আমাকে বলতে বাধা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল এষা

'এখন হয়তো বলা যেতে পারে। রানা আমার কাছে ধার হিসেবে একটা বাড়ি চেয়েছিল, যেখানে বোট ভেড়ার ব্যবস্থা থাকবে, আবার পুলিসও বিরক্ত করবে না সেখানেই যাচ্ছি।'

হার্টবিট বেড়ে গেল এষার। 'আর কত দূর?'

'দু'মাইল।'

এক মিনিট পর ফেলিনি বলল, 'এই মেয়ে, ওখানে পৌঁছবার আগেই মরতে চাও নাকি? গাড়ি আস্তে চালালে কি হয়?'

গাড়ির গতি কমাতে পারল এষা, কিন্তু চিন্তার গতি নয়। এখন থেকে যে-কোন মুহূর্তে রানাকে দেখতে পাবে সে, তাকে ছুঁতে পারবে, তার গায়ের গন্ধ নিতে পারবে, তাকে চুমো খেতে পারবে।

'বাঁ দিকে ঘোরো।'

খোলা একটা গেটের ভেতরে ঢুকল সাদা ফিয়াট। দু'পাশে ঘন ঝোপ-ঝাড়, মাঝখানে কাঁকর আর নুড়ি পাথর ছড়ানো রাস্তা। সামনে বিশাল একটা ভিলা, পুরোটাই সাদা পাথরে তৈরি, কিন্তু কালের আঁচড় লেগে কোথাও কালচে কোথাও কালচে-সবুজ হয়ে গেছে। পাথরের পিলার দিয়ে ঘেরা পোর্টিকোর সামনে গাড়ি থামিয়ে এষা আশা করল, ভেতর থেকে এখুনি ছুটে বেরিয়ে আসবে রানা। কিন্তু এল না।

বাড়ির এদিকটায় প্রাণের কোন সাড়া নেই।

গাড়ি থেকে নামল ওরা, পাথরের ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ফ্রন্ট এন্ট্রান্সে। বারবার পিছিয়ে পড়ল ফেলিনি, শরীরে কুলাচ্ছে না। কাঠের বিশাল দরজাটা বন্ধ, কিন্তু তালা দেয়া নয়। সেটা খুলে ফেলিনির জন্যে দাঁড়িয়ে থাকল এষা। দু'মিনিট পর ফেলিনি এল, তাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল সে। প্রকাণ্ড হলঘর, মার্বেল পাথরের

মেঝে ভেঙেচুরে গেছে। একদিকের সিলিং ঝুলে পড়েছে, যে-কোন মুহূর্তে মাথার ওপর ধসে পড়তে পারে। ভিজে দেয়ালে শ্যাওলা জমেছে। হলঘরের মাঝখানে পড়ে আছে রঙিন একটা কাঁচের ঝাড়-বাতি, ঈগলের কঙ্কালের মত লাগছে ওটাকে।

'হ্যালো, কেউ এখানে আছেন নাকি?' ভারী গলায় জিজ্ঞেস করল ফেলিনি।

কারও কোন সাড়া নেই।

এষা ভাবল, বাড়িটা খুব বড় তো, এখানেই কোথাও আছে রানা, কিন্তু ওদের কথা শুনতে পাচ্ছে না। হয়তো বাগানে আছে সে।

ঝাড়-বাতিটাকে পাশ কাটিয়ে সামনে এগোল ওরা। লম্বা গুহার মত একটা ড্রইংরুমে ঢুকল, ওদের পায়ের আওয়াজ প্রতিধ্বনি তুলে কয়েকগুণ জোরাল হয়ে ফিরে আসছে।

একটা ফ্রেঞ্চডোর, কাঁচ লাগানো নেই। সেটা পেরিয়ে বাড়ির পিছন দিকে বেরিয়ে এল ওরা। ছোট একটা বাগান, পাহাড়ের কিনারা পর্যন্ত চলে গেছে। সেখানে এসে দাঁড়াল ওরা। দেখল, কয়েক প্রস্থ আঁকাবাঁকা সিঁড়ি নিচে একেবারে সাগরের কিনারা পর্যন্ত নেমে গেছে।

কোথাও কেউ নেই।

এষা ভাবল, এখন কি হবে?

'দেখো,' মাংসল একটা হাত বাড়িয়ে সাগরের দিকটা দেখাল ফেলিনি। সেদিকে তাকাতেই একটা জাহাজ আর একটা মোটরবোট দেখতে পেল এষা। গলুই দিয়ে পানি কেটে দ্রুত ওদের দিকেই ছুটে আসছে মোটরবোটটা। হুইল ধরে মাত্র একজন লোক রয়েছে তাতে। আর জাহাজটা বে পেরিয়ে খোলা সাগরে বেরিয়ে যাচ্ছে, পিছনে রেখে যাচ্ছে ইস্ত্রি করা কাপড়ের মত নিভাঁজ চওড়া পানি।

'একটুর জন্যে ছুটে গেল,' বলল ফেলিনি।

'না!' বলেই পাহাড়ের কিনারা দিয়ে নেমে গেল এষা। চিৎকার করে ডাকতে লাগল, 'রানা! রানা! রানা-আ-আ।' একসাথে দুটো করে সিঁড়ির ধাপ টপকে নেমে যাচ্ছে, হাত নেড়ে জাহাজের লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে, আর রানার নাম ধরে ডাকছে। জানে, এখন জাহাজটাকে কোনমতেই ফিরিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব নয়, অনেক দূরে চলে গেছে ওরা।

দেড়শোর মত সিঁড়ির ধাপ টপকে কেঁদে ফেলল এষা, ধপ করে বসে পড়ল একটা ধাপের ওপর, দু'হাতে মুখ ঢাকল।

মেদবহুল শরীর নিয়ে ধীরে ধীরে নামছে মাফিয়া চীফ। এষার কাছে পৌঁছতে প্রচুর সময় নিল সে। ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে। তারই মধ্যে এষার একটা হাত ধরে তাকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করল। 'মাথা খারাপ কোরো না, ওঠো।'

মুখ থেকে হাত নামিয়ে আবার সাগরের দিকে তাকাল এষা। 'মোটরবোট! ওটা নিয়ে আমরা যদি পিছু ধাওয়া করি...'

'কোন লাভ নেই। মোটরবোট এখানে পৌঁছতে পৌঁছতে জাহাজটা অনেক দূরে চলে যাবে। তাছাড়া, একটা বোট ওই জাহাজের সাথে পারবে কেন!'

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল ওরা। অনেকটা নেমে এসেছে এষা, আবার ওপরে উঠে আসতে নিদারুণ মাসুল দিতে হচ্ছে ফেলিনিকে। কিন্তু সেদিকে কোন খেয়াল নেই এষার, নিজের দুঃখে কাতর হয়ে আছে সে।

ঢালু বাগান পেরিয়ে বাড়ির ভেতর ঢোকার সময় মাথাটা ফাঁকা লাগল এষার, কিছুই চিন্তা করতে পারছে না।

'আমাকে বসতে হবে,' ড্রইংরূম পেরোবার সময় হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মাফিয়া চীফ।

এতক্ষণে ফেলিনির দিকে তাকাল এষা। ঘামে ভিজে গেছে মুখ। জ্যান্ত মানুষ, কিন্তু চেহারা হয়েছে মড়ার মত ফ্যাকাসে। খারাপ লাগল এষার, তার জন্যেই প্রৌঢ় লোকটার এই দুর্দশা। মুহূর্তের জন্যে নিজের দুঃখ ভুলে গেল সে। বলল, 'সিঁড়ির ধাপে।'

বিধ্বস্ত হয়ে ফিরে এল ওরা। ফেলিনির হাত ধরে চওড়া সিঁড়ির দিকে এগোল সে। দ্বিতীয় ধাপটায় তাকে বসিয়ে দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকল চুপ করে।

সিঁড়ির পাশের দেয়ালে মাথা ঠেকাল ফেলিনি। চোখ দুটো যেন আপনা থেকেই বুজে গেল। এখন আরও ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে।

'শোনো,' বলল সে। 'জাহাজকে ডাকা যায়···কিংবা টেলিগ্রাম পাঠাতে পারো···এখনও রানার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব···'

'একটু পর···এখন চুপ করে থাকুন।'

'আমার ভাইকে জিজ্ঞেস করবে··· কে ওখানে?'

ঝট করে ঘুরল এষা। ঝাড়-বাতি নড়ে ওঠায় কাঁচের আওয়াজ হয়েছে। তাকাতেই কারণটা দেখতে পেল এষা।

হলঘর পেরিয়ে ওদের দিকে হেঁটে আসছে ন্যাট কোহেন।

হঠাৎ, প্রাণপণ চেষ্টা করে, উঠে দাঁড়াল ডন ফেলিনি।

দাঁড়িয়ে পড়ল কোহেন।

ফুসফুসে বাতাসের তীব্র অভাব বোধ করল ফেলিনি, নাক মুখ দিয়ে বাতাস টানছে সে। সেই সাথে একটা হাত দিয়ে পকেট হাতড়াচ্ছে।

লম্বা পাতের একটা ছুরি বেরিয়ে এল কোহেনের হাতে।

ফেলিনির পকেটের দিকে চোখ পড়তেই আঁতকে উঠল এষা, 'না!'

পকেট থেকে পিস্তল বের করে আনল মাফিয়া চীফ।

হাতে ছুরি নিয়ে এগোতে যাচ্ছিল কোহেন, পিস্তল দেখে পাথর হয়ে গেল।

আর্তনাদ বেরিয়ে এল এষার গলা থেকে। টলতে শুরু করেছে মাফিয়া চীফ। হাতে ধরা পিস্তলটা শূন্যে ঝুলছে।

ট্রিগার টিপে দিল ফেলিনি। দু'বার গর্জে উঠল পিস্তল, বিস্ফোরণের আওয়াজটা হলো প্রচণ্ড। মেঝেতে শুয়ে পড়ল কোহেন। আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে চেহারা।

দুটো বুলেটই সিলিঙে গিয়ে লেগেছে। দেয়াল ধরে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করল ফেলিনি, কিন্তু পারল না। হাতটা মরা সাপের মত ঝুলে পড়ল। এষা হাত বাড়াবার আগেই সিঁড়ির ধাপ থেকে ফাটল ধরা মেঝের ওপর দড়াম করে পড়ে গেল

ভারী শরীরটা।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কোহেন।

মাফিয়া চীফের পাশে হাঁটু মুড়ে বসল এষা। চোখ মেলল ফেলিনি। 'শোনো,' কর্কশ, ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরিয়ে এল তার গলা থেকে।

এষার পিছনে এসে দাঁড়াল কোহেন। 'ছাড়ো ওকে, চলো কেটে পড়ি।'

কোহেনের দিকে তাকাবার জন্যে ঘাড় ফেরাল এষা। গলার সমস্ত জোর একসাথে করে বলল, 'আপনি যাবেন এখান থেকে?' তারপর আবার সে ফিরল ফেলিনির দিকে।

'কম মানুষ খুন করিনি আমি,' বলল মাফিয়া চীফ শুনতে পাবার জন্যে তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল এষা। 'তেরোজনকে আমি শুধু নিজের হাতেই মেরেছি···আর মেয়েমানুষ, তাদের নিয়েও আমি কম নষ্টামি করিনি···' ধীরে ধীরে আরও নিস্তেজ হয়ে এল তার কণ্ঠস্বর, চোখ পুরোপুরি বুজে গেল। কিন্তু আবারও কথা বলার চেষ্টা করল সে। 'সারাটা জীবন আমি একটা চোর ছিলাম, লোকেরটা কেড়ে খেয়েছি। কিন্তু মরছি আমি বন্ধুর জন্যে, ঠিক? এটাকে হিসেবের মধ্যে ধরা উচিত, ধরতেই হবে—কি? তুমি কি বলো?'

'হ্যাঁ,' বলল এষা। 'অবশ্যই। হিসেবের মধ্যে ধরতেই হবে।'

'ঠিক আছে,' বলল মাফিয়া চীফ।

তারপর মারা গেল সে।

এর আগে কোন মানুষকে মরতে দেখেনি এষা। ব্যাপারটা নির্মম। হঠাৎ করে আর কিছু রইল না, শুধু দেহটা ছাড়া—লোকটা চলে গেছে। এষা ভাবল, মৃত্যু আমাদের কাঁদায় এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অনুভব করল, তার নিজের দু'গাল চোখের পানিতে ভিজে গেছে। এই লোককে আমি এমন কি পছন্দও করতে পারিনি, ভাবল সে, এই খানিক আগে পর্যন্ত।

'খুব ভাল কাজ দেখিয়েছ তুমি, এখন চলো, এখান থেকে চলে যাই,' বলল কোহেন।

বুঝল না এষা। আমি ভাল করেছি? তারপর বুঝল। কোহেন জানে না, ফেলিনিকে সে বলেছিল একজন ইহুদি ওদেরকে ফলো করছে। কোহেন জানে, তার কথামতই কাজ করছে এষা। ফেলিনির সাথে এখানে এসে কোহেনকেই রানার কাছে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছে সে। এর চেয়ে ভাল পরিস্থিতি আর আশা করতে পারে এষা? এখন শুধু ভান করলেই চলবে, কোহেনের দলেই আছে সে। রানার সাথে যোগাযোগ করার একটা উপায় না পাওয়া পর্যন্ত।

কিন্তু তারপরই আবার ভাবল এষা, এসব আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আমি আর মিথ্যে কথা বলতে পারব না। আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। পরমুহূর্তে ফেলিনির কথা মনে পড়ে গেল—জাহাজে ফোন করা যায়, টেলিগ্রাম পাঠানো যায়।

রানাকে সাবধান করার উপায় এখনও আছে। হায় খোদা, আমি ঘুমাব কখন? উঠে দাঁড়াল সে, বলল, 'বোকার মত দাঁড়িয়ে আছি কি করতে? চলুন।'

নিচে, পোর্টিকোয় নেমে এল ওরা। 'আমার গাড়িতে উঠব আমরা,' বলল

কোহেন।

এষার ইচ্ছে হলো, কোহেনের কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে যায়। কিন্তু নিজেকে বোঝাল, সেটা বোকামি হয়ে যাবে। বেশি দেরি নেই, কোহেন তাকে ছেড়ে দেবে। যা করতে বলেছিল করেছে সে, করেনি? অভিযোগ করার কিছু নেই লোকটার। এখন সে আমাকে বাড়ি ফিরতে দেবে।

গাড়িতে চড়ল এষা।

'দাঁড়াও,' বলল কোহেন। ছুটে ফেলিনির গাড়ির কাছে চলে গেল সে। গাড়ির চাবি নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল সেটা ঘন ঝোপের ওপর। ফিরে এসে নিজের গাড়িতে উঠে বসল, 'মোটরবোটের লোকটা এখন আর আমাদের পিছু নিতে পারবে না।'

হ্যান্ডব্যাগ খুলে রুমাল বের করল এষা, মুখ মুছল। ওর দিকে একবার তাকাল কোহেন। 'তোমার আচরণ আমাকে নিরাশ করেছে, এষা। ওই ব্যাটা মাফিয়া চীফ আমাদের শত্রুকে সাহায্য করেছিল। একজন শত্রু মারা গেলে কান্নাকাটি নয়, আমাদের খুশি হবার কথা।'

রুমাল দিয়ে চোখ ঢাকল এষা। 'লোকটা তো তার বন্ধুকে সাহায্য করছিল।'

এষার হাঁটু চাপড়ে দিল কোহেন। 'খুব ভাল দেখিয়েছ তুমি, তোমার সমালোচনা করা আমার উচিত নয়। যে তথ্যটা দরকার ছিল আমার সেটা তুমি আমাকে পাইয়ে দিয়েছ।'

চোখ থেকে রুমাল সরিয়ে কোহেনের দিকে তাকাল এষা। 'সত্যি?'

'বে ছেড়ে বড় জাহাজটাকে চলে যেতে দেখলে না, ওটা অরিয়ন। রওনা হবার সময় আর ম্যাক্সিমাম স্পীড জানা আছে আমার, কাজেই হিসেব করে বের করতে পারব সম্ভাব্য কত কম সময়ের মধ্যে ইমপেরিয়ালের সাথে দেখা হবে ওর। আমার লোকদের একদিন আগে ওখানে পাঠিয়ে দিতে পারব।' আবার এষার হাঁটু চাপড়ে দিল কোহেন, এবার হাতটা ফিরিয়ে না নিয়ে উরুর ওপর ফেলে রাখল।

'আমাকে ছোঁবেন না!'

হাত সরিয়ে নিল কোহেন।

চোখ বুজে চিন্তায় ডুবে গেল এষা। রানার ভাল করতে গিয়ে তার বিপদ আরও বাড়িয়ে তুলেছে সে। কোহেনকে পথ দেখিয়ে সিসিলিতে নিয়ে এসেছে, অথচ রানাকে সাবধান করতে পারেনি। কিভাবে রানার ক্ষতি করতে হবে, কোহেন এখন তা আগের চেয়ে ভাল করে জানে।

জাহাজে টেলিগ্রাম করার নিয়মটা কি জানতে হবে তাকে, কোহেনের মুঠো থেকে বেরিয়ে সেটাই হবে তার প্রথম কাজ। রানাকে সাবধান করার একটা চেষ্টা আগেই নিয়েছে সে, কিন্তু সেটা সফল হবে কিনা বলা মুশকিল। এয়ারপ্লেন স্টুয়ার্ড কথা দিয়েছে রোমের মিশরীয় দূতাবাসে ফোন করবে, কিন্তু করবেই তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কিংবা ফোন করলেও, সময়মত মেসেজটা হয়তো রানার কাছে পৌঁছবে না।

'এখন আমি অক্সফোর্ডে ফিরতে পারলে বাঁচি,' বলল এষা।

'অক্সফোর্ডে?' হেসে উঠল কোহেন। 'এত তাড়াতাড়ি? অপারেশন শেষ না

হওয়া পর্যন্ত আমার সাথেই থাকতে হবে তোমাকে।'

হায় খোদা, আর কি সইতে বলো তুমি? 'কিন্তু আমি যে ভীষণ ক্লান্ত,' বলল এষা।

'বেশ তো, খানিক পরই বিশ্রাম নেবার ব্যবস্থা করা যাবে। কিছু মনে কোরো না, তোমাকে আমি যেতে দিতে পারি না, এষা। সিকিউরিটি, বোঝই তো। তাছাড়া, মাসুদ রানার লাশ দেখার এই সুযোগ তোমার ছেড়ে দেয়া উচিত হবে না।'

আট

সিসিলি এয়ারপোর্ট। আলিটালিয়া ডেস্ক।

তিনজন লোক ন্যাট কোহেনের দিকে এগিয়ে এল। তাদের মধ্যে দু'জনের বয়স কম, ভাব-ভঙ্গি বুনো ষাঁড়ের মত। অপর লোকটা লম্বা, মুখের চেহারা তীক্ষ্ণ। দু'পাশে সঙ্গীদের নিয়ে সে-ই কোহেনের পিছনে এসে দাঁড়াল। 'ইউ, ড্যাম ফুল! তোমাকে গুলি করে মারা উচিত!'

দ্রুত ফিরল কোহেন, তার চোখে নগ্ন ভয় দেখতে পেল এষা। 'রিচি!' আঁতকে উঠল কোহেন।

এষা ভাবল, এখন কি হবে?

কোহেনের একটা হাত ধরল রিচি। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, কোহেন বোধহয় বাধা দেবে, ঝাঁকি দিয়ে ছাড়িয়ে নেবে হাত। বুনো ষাঁড় দুটো এক পা করে এগোল, কোহেন আর এষাকে ঘিরে ফেলল দলটা। টিকেট ডেস্কের কাছ থেকে কোহেনকে নিয়ে রওনা হলো রিচি। তার সঙ্গীদের একজন এষার কনুই চেপে ধরে ওদের পিছু নিল।

নির্জন একটা কোণে এল ওরা। রাগে, উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে রিচি, কিন্তু গলার আওয়াজ চড়াল না সে। 'ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে চাও, না? ভাগ্যিস পৌঁছতে ক'মিনিট দেরি হয়েছে তোমার, তা না হলে তো সমস্তটাই ভণ্ডুল করে দিতে—ননসেন্স!'

'কি বলছ কিছুই বুঝি না—' অবাক হবার ভান করল কোহেন।

'মনে করেছ আমি জানি না, রানার খোঁজে গোটা দুনিয়া চষে বেড়াচ্ছ তুমি? মনে করেছ তোমার মত গর্দভকে আমি চোখে চোখে রাখতে পারি না? তেল আবিব ছাড়ার পর থেকে তুমি কোথায় গেছ, কি করেছ সব রিপোর্ট করা হয়েছে আমার কাছে। আর,' ইঙ্গিতে এষাকে দেখাল রিচি। 'একে বিশ্বাস করার মত কুবুদ্ধি তোমার হলো কোত্থেকে?'

'ওই তো এখানে নিয়ে এসেছে আমাকে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু তখন তো তুমি সেটা জানতে না!'

অনড় দাঁড়িয়ে আছে এষা, নিশ্চুপ আর সন্ত্রস্ত। মাথাটা কাজ করছে না, সবকিছু কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে তার। রানাকে খুন করার প্ল্যান, এখানে এসে রানাকে পেতে পেতেও না পাওয়া, ফেলিনির মৃত্যু, এখন আবার আরেক বিপদ···এতগুলো আঘাত ওর চিন্তাশক্তিকে নির্জীব করে ফেলেছে।

জানতে চাইল কোহেন, 'তুমি এখানে কিভাবে···'

'কিভাবে আবার, হোয়াইট রোজে করে এসেছি। সিসিলি থেকে চল্লিশ কি পঞ্চাশ মাইল দূরে ছিলাম, এই সময় রিপোর্ট পেলাম এখানে তুমি ল্যান্ড করেছ। ডাঙায় উঠে প্রথমে আমি তেল আবিবের সাথে যোগাযোগ করলাম···'

বাধা দিল কোহেন, 'কেন?'

'একটা অনুমতির জন্যে, যার বলে তোমাকে ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে তেল আবিবে ফেরত পাঠাতে পারি। সে অনুমতি আমি পেয়েছি—এখান থেকে সোজা তেল আবিবে ফিরে যাচ্ছ তুমি, এখুনি।'

'আমি এখনও মনে করি যা করেছি, ভাল করেছি,' বলল কোহেন।

'দূর হও আমার চোখের সামনে থেকে!'

কোনদিকে তাকাল না কোহেন, মাথা নিচু করে হাঁটতে শুরু করল। এষা তার পিছু নিতে যাবে, খপ করে ওর একটা হাত ধরে ফেলে রিচি বলল, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ? ওদিক নয়, এদিকে—আমার সাথে এসো।' বলে হাঁটতে শুরু করল সে।

রিচির সাথে হাঁটতে হাঁটতে এষা ভাবল, এখন আমি কি করি?

'আমি জানি, মিস ফিলমনটন, তুমি নিজের বিশ্বস্ততা প্রমাণ করেছ। ভবিষ্যতে আমাদের কাজে লাগবে তুমি। কিন্তু এটা অত্যন্ত সিরিয়াস একটা প্রজেক্ট, প্রজেক্টের এই পর্যায়ে নতুন একজন রিক্রুটকে আমি বাড়ি ফিরতে দিতে পারি না।'

কিছু বলার মত খুঁজে পেল না এষা। ভাবল, রানার তাহলে কি উপায় হবে এখন?

'সাথে বেশি লোক থাকলে তোমাকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিতাম,' আবার বলল রিচি। 'কিন্তু তা নেই। যারা আছে তাদেরকে আমার জাহাজে লাগবে। কাজেই, তোমাকে আমার সাথে হোয়াইট রোজেই থাকতে হবে, যতক্ষণ না ব্যাপারটা চুকে যায়। ভাল কথা, তুমি জানো, তুমি ঠিক তোমার মায়ের মত দেখতে হয়েছ?'

এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সির পাশে এসে দাঁড়াল ওরা। এই ট্যাক্সি করেই এখানে এসেছে রিচি আর তার লোকেরা। ট্যাক্সির দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল রিচি, এষা যাতে উঠতে পারে। যদি পালাতে হয়, এই-ই সময়, ভাবল এষা। এরপর আর হয়তো সুযোগ পাওয়া যাবে না। কিন্তু কিভাবে পালাবে সে? চেষ্টা করলে কতদূর যেতে পারবে? ইতস্তত ভাবটা কোনমতে কাটিয়ে উঠতে পারছে না সে। পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে রিচির একজন সঙ্গী। তার জ্যাকেটের সামনেটা সামান্য একটু ফাঁক হলো। ভেতরে পিস্তলের বাঁট দেখতে পেল এষা। পোড়ো ভিলায় মাফিয়া চীফের পিস্তল থেকে পর পর যে আওয়াজ দুটো

বেরিয়েছিল, এখন আবার যেন নতুন করে সেই শব্দ শুনতে পেল সে। আর সেই সাথে মৃত্যুভয় ঝাপটে ধরল তাকে।

কেঁপে উঠল এষা।

'কি হলো?' জানতে চাইল রিচি।

'আলবার্তো ফেলিনি মারা গেছে!'

'আমরা জানি,' বলল রিচি। 'ওঠো, গাড়িতে ওঠো।'

গাড়িতে উঠল এষা।

গাড়ি নিয়ে এথেন্স শহর থেকে বেরিয়ে এলেন মিশরীয় ইন্টেলিজেন্স চীফ লে. জেনারেল আলি কারাম। সাগর-সৈকতে পৌঁছে একজোড়া পাম গাছের নিচে গাড়ি থামালেন তিনি। জুতো মোজা খুলে গাড়ি থেকে নামলেন, তারপর বালির ওপর দিয়ে অলস পায়ে হাঁটা ধরলেন। ভাঙা ঢেউ আর সাদা ফেনা তাঁর পায়ের ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছে। থালার মত চাঁদ উঠেছে আকাশে, অনেকটা দূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। লোকজন বেশি না থাকলেও; জায়গাটা নির্জন নয়। নির্জনতা প্রিয় প্রেমিক-প্রেমিকারা এখানে হাঁটাহাঁটি করতে আসে।

হাঁটতে হাঁটতে শ'খানেক গজ এগিয়েছেন, এই সময় অ্যাভরাম অ্যামবুসি ওরফে সামী ওয়ালিদকে আসতে দেখলেন তিনি; আরও একটু কাছাকাছি হতে তার চেহারা পরিষ্কার দেখতে পেলেন আলি কারাম। দুঃসংবাদ শোনার জন্যে মনে মনে নিজেকে তৈরি করলেন তিনি। অ্যামবুসির নিরানন্দ চেহারাই এর কারণ।

পাশাপাশি দাঁড়ালেন ওঁরা। তাকিয়ে আছেন সাগরের দিকে।

'এসেছ বলে ধন্যবাদ,' বলল অ্যাভরাম অ্যামবুসি।

এই ধন্যবাদটা যে কেন তাকে দেয়া হয়, বুঝে উঠতে পারেন না আলি কারাম। ধন্যবাদ যদি কাউকে পেতেই হয়, সেটা অ্যামবুসিরই প্রাপ্য। এই সময় হঠাৎ তিনি উপলব্ধি করলেন, অ্যামবুসি আসলে ঠিক সেটাই মনে করিয়ে দেবার জন্যে ফি বার তাঁকে ধন্যবাদ জানায়। এই লোকের সমস্ত কিছুর মধ্যে আশ্চর্য সূক্ষ্মতা থাকে, এমন কি অপমান করার মধ্যেও।

'মার্কিনীরা সন্দেহ করছে, তেল আবিবে মস্ত একটা ফুটো আছে,' বলল অ্যামবুসি। 'হাতের তাস বুকের সাথে চেপে রেখে খেলছে তারা।' এটুকু বলে একটু বিরতি নিল সে, হাসল, কিন্তু এর মধ্যে রসিকতা কোথায় দেখতে পেলেন না আলি কারাম। 'এমন কি ডিব্রিফিঙের জন্যে ন্যাট কোহেন তেল আবিবে ফিরে এলেও, বেশি কিছু জানতে পারিনি আমরা, কোহেন যে-সব তথ্য দিয়েছে, তার বেশিরভাগই জানতে পারিনি আমি। ইমিডিয়েট বসকে ডিঙিয়ে সরাসরি চীফকে রিপোর্ট করেছে সে।'

মস্ত একটা ঢেকুর তুললেন আলি কারাম। এই খানিক আগে ভরপেট গ্রীক ডিনার খেয়েছেন। 'অজুহাত দেখিয়ে সময় নষ্ট কোরো না, প্লীজ। তুমি কি জানো সেটাই শুধু বলো।'

'ঠিক আছে,' মৃদু কণ্ঠে বলল অ্যামবুসি। 'তেল আবিবে ওরা জানে রানা কিছু

ইউরেনিয়াম চুরি করবে।'

'তোমার এই কথা তো গতবারেই শুনেছি।'

'সমস্ত ডিটেলস ওরা জানে বলে আমি মনে করি না। ওদের প্ল্যান হলো, ঘটনাটা ঘটতে দেয়া, তারপর দুনিয়ার সামনে সব ফাঁস করা। মেডিটেরেনিয়ানে একজোড়া জাহাজ রেখেছে ওরা। তার মধ্যে একটায় মার্কিনীরা আছে। কিন্তু জাহাজগুলোকে কোথায় পাঠাতে হবে তা ওদের জানা নেই।

ঢেউয়ের সাথে ভাসতে ভাসতে আলি কারামের পায়ের কাছে চলে এল একটা প্লাস্টিকের বোতল, সেটাকে লাথি দিয়ে আবার দূরে সরিয়ে দিলেন তিনি। 'এম্মা ফিলমনটন সম্পর্কে কিছু জানতে পেরেছ?'

'অবশ্যই ইহুদিদের সাথে কাজ করছে। শোনো, কোহেন আর রিচির সাথে একটা তর্ক হয়ে গেছে। রানা ঠিক কোথায় আছে সেটা নিশ্চিতভাবে জানতে চেয়েছিল কোহেন, কিন্তু রিচির কথা হলো সেটা জানার কোন প্রয়োজন নেই।'

'দুঃসংবাদ,' বললেন আলি কারাম। 'বলে যাও।'

'এরপর বেপরোয়া হয়ে ওঠে কোহেন। রানাকে খুঁজে বের করার জন্যে এম্মা ফিলমনটনের সাহায্য নেয় সে। যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে একজন মাফিয়া চীফ, আলবার্তো ফেলিনির সাথে দেখা করে ওরা, ফেলিনি ওদেরকে সিসিলিতে নিয়ে আসে। রানাকে ওরা পায়নি, কিন্তু একটুর জন্যে। বে ছেড়ে চলে যাচ্ছে অরিয়ন, এই সময় ওখানে পৌঁছয় ওরা। এই ব্যাপারটা নিয়ে রিচির তরফ থেকে খুব বিপদে পড়তে হয় কোহেনকে। তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তেল আবিবে ফেরত আসার জন্যে। কিন্তু এখনও এসে পৌঁছয়নি সে।'

'কিন্তু রানা যেখানে ছিল সেখানে ওদেরকে ওই মেয়েটাই নিয়ে যায়?'

'ঠিক তাই।'

'দিস ইজ রিয়েল ব্যাড,' বললেন আলি কারাম। মেসেজটার কথা চিন্তা করলেন তিনি, রানার গার্ল ফ্রেন্ডের ওই মেসেজ রোমে, মিশরীয় দূতাবাসে পাঠানো হয়। অ্যামবুসিকে কথাটা জানালেন তিনি। 'কোহেন আমাকে সব কথা বলেছে, তাকে নিয়ে তোমার সাথে দেখা করতে আসছি আমি—এর মানেটা কি? রানাকে সাবধান করা, দেরি করিয়ে দেয়া, নাকি হতভম্ব করা? কিংবা একটা ডাবল-ব্লাফ—কোহেনের প্যাঁচে পড়ে তাকে রানার কাছ থেকে নিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে সে, এই মিথ্যে ধারণা দিতে চায় রানাকে?'

'ডাবল-ব্লাফ—অন্তত আমার তাই ধারণা,' বলল অ্যামবুসি। 'মেয়েটা জানে, শেষ পর্যন্ত তার আসল ভূমিকা ফাঁস হয়ে যাবে, সে-কথা ভেবে এখন থেকে সাবধান হতে চাইছে সে, যাতে আরও কিছুদিন রানার চোখে বিশ্বস্ত থাকতে পারে। মেসেজটা কিন্তু রানার কাছে পৌঁছে দেয়া উচিত হবে না।'

'জানি।' প্রসঙ্গ বদল করলেন আলি কারাম। 'ওরা যদি সিসিলিতে গিয়ে থাকে, তাহলে অরিয়নের কথা জানে। তা থেকে কি ধরে নেবে ওরা?'

'ধরে নেবে ইউরেনিয়াম হাইজ্যাকের কাজে ব্যবহার করা হবে অরিয়নকে।'

'ঠিক তাই। এখন, আমি যদি রিচি হতাম, অবশ্যই অরিয়নকে অনুসরণ

করতাম, ঘটতে দিতাম হাইজ্যাক, তারপর হামলা চালাতাম। তার মানে রানার কোন আশা নেই। তার মানে মিশরের কপালে ইউরেনিয়াম নেই। তার মানে অ্যাসাইনমেন্ট বাতিল করতে হবে আমাকে।' নরম বালিতে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল ডুবিয়ে দিলেন তিনি। 'ওদের নেগেভের অবস্থা কি?'

'সবচেয়ে খারাপ খবরটা সবশেষে বলব বলে আলাদা করে রেখেছি। সমস্ত টেস্ট সাকসেসফুল। ইউরেনিয়ামের কোন অভাব নেই ওদের, মার্কিনীরা সাপ্লাই দিচ্ছে। আজ থেকে একুশ দিনের মাথায় রিয়্যাক্টর চালু করা হবে।'

করুণ চোখে সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন আলি কারাম। তাঁর চেহারা দেখে অ্যামবুসি বুঝল, এই অ্যাসাইনমেন্ট ব্যর্থ বা বাতিল হতে যাচ্ছে দেখে ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে দুষছে ইন্টেলিজেন্স চীফ। আলি কারাম নিজেও উপলব্ধি করলেন জীবনের কোন ঘটনাই আজকের মত অসুখী করে তোলেনি তাঁকে। 'এর মানে তুমি বুঝতে পারছ? এর মানে, আমরা এটাকে বাতিল করতে পারি না। এর মানে রানাকে আমরা থামতে বলতে পারি না। এর মানে, রানাই মিশরের শেষ ভরসা।'

অ্যামবুসি কোন কথা বলল না। একমুহূর্ত পর তার দিকে তাকালেন আলি কারাম। চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছে অ্যামবুসি। 'কি করছ তুমি?' জানতে চাইলেন তিনি।

অ্যামবুসি জবাব দিল না, চোখও মেলল না। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। তারপর এক সময় চোখ খুলল অ্যামবুসি। আলি কারামের দিকে তাকাল। সবিনয় ক্ষীণ হাসি দেখা গেল তার ঠোঁটে।

'রানার জন্যে দোয়া চাইছিলাম।'

কায়রো টু এমভি অরিয়ন
পারসোনাল কারাম টু রানা'জ আইজ ওনলি
মাস্ট বি ডিকোডেড বাই দি অ্যাড্রেসি
বিগিনস এষা ফিলমনটন কনফার্মড জিওনিস্ট
ইন্টেলিজেন্স
এজেন্ট স্টপ শী পারসোয়েডেড ফেলিনি টু টেক
হার অ্যান্ড কোহেন টু সিসিলি স্টপ দে অ্যারা-
ইভড় আফটার ইউ লেফট স্টপ ফেলিনি নাউ
ডেড স্টপ দিস অ্যান্ড আদার ডাটা ইন্ডিকেটস
স্ট্রং পসিবিলিটি ইউ উইল বি অ্যাটাকড় অ্যাট
সী স্টপ
উই ক্যান টেক নো ফারদার অ্যাকশন অ্যাট
দিস অ্যান্ড স্টপ।

ক'দিন ধরে পশ্চিম মেডিটেরেনিয়ানের আকাশে যে মেঘ জমে উঠেছে, আজ রাতে হঠাৎ করে সেটা বিস্ফোরিত হলো, তীব্র বাতাস আর বৃষ্টি হামলা চালাল

অরিয়নের ওপর।

কিন্তু সেদিকে কোন খেয়াল নেই রানার।

নিজের ছোট্ট কেবিনে বসে আছে ও, এক হাত দিয়ে খামচে ধরেছে মাথার চুল, আরেক হাতে পেন্সিল—টেবিলের ওপর ফেলে আলি কারামের মেসেজটার কোড ভাঙছে ও।

কোড ভাঙা শেষ হতে উঠে দাঁড়াল রানা, অস্থির ভাবে পায়চারি শুরু করল কেবিনের ভেতর। টেবিলের সামনে থামল একবার, মেসেজটার ওপর চোখ বুলাল। একবার, দু'বার। তারপর আবার পায়চারি শুরু করল। এইভাবে কম করেও দশ বারো বার পড়ল মেসেজটা। তারপর চেয়ারে বসে ফাঁকা, নিঃস্ব ইস্পাতের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকল।

এই রকম একটা কাজ কেন করতে গেল এষা, এখন আর তার কারণ বিশ্লেষণ করতে যাওয়ার কোন মানে হয় না। লে. জেনারেল আলি কারাম বলছেন, সে ইসরায়েলের একজন স্পাই, এর পর আর চিন্তা-ভাবনা করার মানে হয় না। আলি কারাম যদি এই তথ্য না দিতেন, রানা ধরে নিত এষাকে ব্ল্যাকমেইল করেছে কোহেন, কিংবা ভুল বুঝিয়ে দলে টেনে নিয়েছে তাকে।

এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, একেবারে সেই প্রথম থেকেই স্পাই ছিল এষা। এখন পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, সেজন্যেই ওর সাথে ভালবাসার অভিনয় করেছে সে। তিক্ত একটু হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে, এসপিওনাজের কারবারে এ মেয়ে ভাল করবে।

হাত তুলল রানা, আঙুলের ডগা দিয়ে বন্ধ চোখ দুটো রগড়াল। কিন্তু তবু এষাকে দেখতে পেল ও—হাই হিল জুতো ছাড়া পরনে আর কিছু নেই, সেই ছোট ফ্ল্যাটের কিচেনের টুলের ওপর বসে পা দোলাচ্ছে, সোফায় উপুড় হয়ে খবরের কাগজ পড়ছে।

এর কঠিন দিক হলো, এখনও তাকে ভালবাসে রানা। নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করল, এটা একধরনের বিনিময়—এষা ওকে ভালবেসেছে তাই তাকে ওর ভালবাসতে ইচ্ছে হয়েছে, কিন্তু এখন যেহেতু জানতে পেরেছে ও, এষা ওকে ভালবাসত না, সবটাই ছিল তার অভিনয়, কাজেই তার ওপর ওর ভালবাসা থাকা এখন আর উচিত নয়।

যদিও এসব যুক্তি কোন প্রভাবই ফেলতে পারল না রানার মনে। নিজেকে সাফ সাফ জানিয়ে দিল, ভাল লাগছে তো আমি কি করব। নিজের কাছে অস্বীকার করে পার পাব কিভাবে?

লে. জেনারেল আলি কারামকে কথা দিয়েছে, এষা এজেন্ট হলে তাকে নিজের হাতে খুন করবে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে, মিথ্যে কথা বলেছিল ও। যত বড় অন্যায়ই করুক এষা, তার কোন ক্ষতি করা ওর দ্বারা সম্ভব নয়।

রাত অনেক হলো। পাহারাদার দু'চারজন ছাড়া বাকি সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কেবিন থেকে বেরিয়ে ডেকে উঠে এল রানা, কারও সাথে দেখা হলো না। হ্যাচ থেকে গানেল পর্যন্ত যেতে ভিজে একেবারে গোসল হয়ে গেল। রেইল ধরে দাঁড়াল

একবার, অন্ধকার সাগরে চোখ। কালো সাগর কোথায় শেষ হয়েছে কিংবা কালো আকাশ কোথায় শুরু হয়েছে, কিছু দেখতে পেল না। ওপর দিকে চোখ তুলে বৃষ্টির ফোঁটাগুলোকে মুখে নিল। যেন আকাশের এই কান্নার সাথে অন্তরের কান্নাটাকে এক করে দিয়ে শোকটাকে ধুয়ে কমিয়ে আনতে চাইছে।

না, এষাকে ওর পক্ষে খুন করা সম্ভব নয়, কিন্তু ন্যাট কোহেন সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।

কোন মানুষের যদি কোন শত্রু থাকে, তার আছে—কোহেন। রাজিয়া ফিলমনটনকে শ্রদ্ধা করত রানা, তার ওপর হামলা করেছিল এই কোহেন। এষাকে ভালবেসেছে রানা, কিন্তু দেখা যাচ্ছে ওর আগেই তাকে নিজের মুঠোয় ভরে নিয়েছে সেই কোহেনই।

হ্যাঁ, অবশ্যই, ন্যাট কোহেনকে খুন করবে ও। নিজের হাতে। প্রতিজ্ঞা।

ঘৃণায় আর রাগে উন্মাদের মত হয়ে উঠল রানা। হাড় ভাঙার শব্দ শোনার জন্যে কাঙাল হয়ে উঠল ওর কান দুটো। গুলির আওয়াজ আর বারুদের গন্ধ চাই। চারদিকে মৃত্যু চাই।

আলি কারাম ভাবছেন, ওদের ওপর সাগরে হামলা করা হবে। রেইল আঁকড়ে ধরে জাহাজের সাথে দোল খাচ্ছে রানা। বাতাসের গোঁ গোঁ আওয়াজ, যেন সর্বনাশের ডাক দিয়ে যাচ্ছে। বেশ, তাই হোক তবে।

মুখ খুলে গলা থেকে বেরিয়ে আসা আওয়াজটাকে বাতাসে ছেড়ে দিল রানা, 'আসতে দাও ওদের···আসুক বেজন্মারা!'

নয়

তেল আবিবে আর কোনদিনই ফিরে যায়নি ন্যাট কোহেন।

পালার্মো থেকে তার প্লেন টেক অফ করার সময় দেহ-মনে অদ্ভুত একটা উল্লাস অনুভব করল সে। আরেকটু হলে সমস্ত ব্যাপারটাই কেঁচে গিয়েছিল, কিন্তু ভাগ্য সহায়তা করায় আবার রিচিকে বোকা বানানো গেছে। রিচি যখন বলল, 'দূর হও আমার চোখের সামনে থেকে,' নিজের এতবড় ভাগ্যকে প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেনি সে। ধরেই নিয়েছিল, রিচি তাকে জোর করে হোয়াইট রোজে নিয়ে গিয়ে তুলবে, অর্থাৎ গেরিলা গ্রুপের হাইজ্যাক অপারেশনে তার আর যোগ দেবার আশা নেই। কিন্তু রিচি বুঝেছে, কোহেন যা করেছে বুদ্ধির দোষে করেছে, অনভিজ্ঞতার কারণে করেছে। কোহেন যে বেঈমানী করতে পারে এ সন্দেহ তার মাথায় একবারও ঢোকেনি।

উল্লাসের লাগাম একটু টেনে ধরল কোহেন। রিচিকে হার মানানো বড় কথা নয়, তার আসল শত্রু তো আর সে নয়। শত্রু হলো মিশরীয়রা, আর রানা। ওদের প্ল্যান ব্যর্থ করতে হলে গেরিলা গ্রুপকে সাথে নিয়ে যুদ্ধে নামতে হবে তাকে।

জিততে হবে।

পালার্মো ফ্লাইট রোম পর্যন্ত নিয়ে এল তাকে। এখান থেকে আনাবা, তা না হলে কন্সট্যানটাইন যাবার প্লেন দরকার ওর, দুটোই আলজিরিয়ান কোস্টের কাছে। কিন্তু যে প্লেনটা পাওয়া গেল সেটা আলজিয়ার্স বা তিউনিসে যাবে। অগত্যা তিউনিসেই এল কোহেন।

এখানে এসে একজন যুবক ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বেছে নিল সে, ঝকঝকে একটা রেনোয়া আছে তার। সারা বছরে যা কামায় তার চেয়ে কিছু বেশি মার্কিন ডলার পেল ড্রাইভার, কোহেনকে নিয়ে তিউনিসের একশো মাইল প্রস্থটুকু পেরিয়ে এল সে, সীমান্ত টপকে পৌঁছে গেল আলজিরিয়ায়, আরোহীকে নামিয়ে দিল জেলেদের একটা গ্রামে, যেখানে চমৎকার একটা প্রাকৃতিক বন্দর রয়েছে।

জেলের ছদ্মবেশ নিয়ে গেরিলাদের একজন অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে। তাকে সৈকতে পেল কোহেন, একটা ডিঙি নৌকার ছইয়ের নিচে বসে গ্রামেরই একজন মাতবরের সাথে ষোলোঘুঁটি জাতীয় কিছু খেলছে। ডিঙিতে মোটর লাগানো আছে, কাজেই সেটাকে মোটরবোট বলা যেতে পারে। কোহেন তাতে উঠে বসতেই খেলা ভেঙে দিয়ে এঞ্জিন চালু করল গেরিলা। জেলে লোকটা কোহেনের কাছে সরে এসে তার সাথে করমর্দন করল। মনে মনে তৃপ্তি অনুভব করল কোহেন, ভাবল, আফ্রিকা আর মধ্যপ্রাচ্যে এই হলো মুসলমানদের পরিচয়—টাকা পেলে সবাইকে সাহায্য করবে, শত্রু-মিত্র বাছ-বিচার নেই, জানতেও চাইল না ও কে।

খোলা সাগর রুদ্রমূর্তি ধরে আছে। বৃষ্টি আর ঝড়ো হাওয়ার তীব্রতা এখানে আরও বেশি। কোহেনের চেহারা দেখে বোঝা গেল, সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে সে। গ্রাম্য জেলে সবিনয়ে জানতে চাইল, 'আপনি সাঁতার জানেন?' মাথা নাড়ল কোহেন। জেলে লোকটা হেসে উঠে বলল, 'তাতে কিছু এসে যায় না, এই ডিঙি এমনভাবে তৈরি, খুব জোরাল ঝড়েও ডুববে না।' লোকটার হাসির মধ্যে এমন একটা আত্মবিশ্বাস ছিল, রীতিমত ঈর্ষা হলো কোহেনের। তারপর ভাবল, লোকটা অসভ্য, অশিক্ষিত, দুনিয়া সম্পর্কে কিছুই জানে না, কিন্তু সাঁতার জানে বলে এই মুহূর্তে তার জীবনটা ষোলো আনাই খাঁটি। আর শহরের বাবু কোহেন সে, তার জীবন ষোলো আনাই মিছে।

আধ ঘণ্টা পর এসব ভুলে গিয়ে আবার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল কোহেন। সামনে দেখা গেল একটা জাহাজের কাঠামো।

জাহাজের পাশে গিয়ে থামল বোট। জেলেকে টাকা দিচ্ছে গেরিলা লোকটা, মই বেয়ে ডেকে উঠে এল কোহেন। ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল গেরিলা নেতা কাওয়াশ। হ্যান্ডশেক করল ওরা। কোহেন বলল, 'এখুনি নোঙর তুলতে হবে, প্রতিটি মুহূর্ত এখন হীরের টুকরো।'

'আমার সাথে ব্রিজে আসুন।'

কাওয়াশের পিছু পিছু সামনের দিকে এগোল কোহেন। প্রায় হাজার টনের একটা কোস্টার এই জাহাজ, নতুনই বলা যায়। ডেক থেকে যা কিছু দেখা যায় সব ঝকঝক করছে, অ্যাকোমডেশনের ব্যবস্থা বেশির ভাগই ডেকের নিচে। খুব

তাড়াতাড়ি কার্গো লোড করার সরঞ্জাম আছে এটার।

ফোরডেকে একটু থামল ওরা, চারদিকে তাকাল। 'ঠিক এই রকমই একটা জাহাজ দরকার ছিল আমাদের,' খুশি হয়ে বলল কোহেন।

'আমি এর নতুন নামকরণ করেছি সি-উইচ,' সগর্বে বলল কাওয়াশ।

'এটা শেষ পর্যন্ত ইসরায়েলী নেভিতে নাম লেখাবে, এই অ্যাসাইনমেন্টের পর,' বলল কোহেন। 'ওরা হয়তো নামটা আবার বদলাতেও পারে। তবে আমি চেষ্টা করব, জাহাজটা যেন ইন্টেলিজেন্সের হাতেই থাকে, আমাদের টাকায় কেনা হয়েছে যখন।'

ব্রিজে উঠে এল ওরা। ইকুইপমেন্টের মধ্যে সবই আছে, সবগুলো আধুনিক, কিন্তু নেই শুধু রাডার। এই ধরনের ছোট কোস্টাল ভেসেল আজও রাডার ছাড়া কাজ চালিয়ে নেয়। একটা রাডার কিনে ফিট করে নেয়া যেতে পারত, কিন্তু সময় পাওয়া যায়নি।

ক্যাপ্টেনের সাথে কোহেনের পরিচয় করিয়ে দিল কাওয়াশ। এ-ও একজন ইহুদি, তবে ইসরায়েলী নয়। ক্রুরা সবাই তাই, কাওয়াশের বাছাই করা লোক। নোঙর তুলে এঞ্জিন চালু করার নির্দেশ দিল ক্যাপ্টেন।

ওরা তিনজন একটা চার্টের ওপর ঝুঁকে পড়ল। সিসিলিতে যা জানা গেছে, ওদেরকে বলতে শুরু করল কোহেন। 'আজ দুপুর বেলা সিসিলির সাউথ কোস্ট থেকে রওনা হয়েছে অরিয়ন। গত রাতের শেষের দিকে জিব্রালটার প্রণালী পেরোবার কথা ইমপেরিয়ালের, জেনোয়ার দিকে যাচ্ছে সেটা। যমজ বোন ওরা, টপ স্পীড দু'জনেরই সমান। এখন বলো, কোথায় মিলবে ওরা?'

খানিক অঙ্ক কষে আবার চার্টের দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন, বলল, 'সিসিলি আর জিব্রালটারের মাঝখানে, মিনোরকা দ্বীপের দক্ষিণ-পুব দিকে দেখা হবে ওদের।'

'হ্যাঁ,' বলল কোহেন, নিজের আন্দাজ মিলে গেল দেখে খুশি লাগল তার। 'কিন্তু ওদের দেখা হবার কম করে আট ঘণ্টা আগে ইমপেরিয়ালকে বাধা দিতে চাই আমি।'

ট্রেড রুটের ওপর দিয়ে আঙুলটাকে পিছিয়ে নিয়ে এল ক্যাপ্টেন। 'তার মানে কাল সন্ধের সময়। ইবিজা দ্বীপের ঠিক দক্ষিণে থাকবে তখন ইমপেরিয়াল।'

'আমরা ম্যানেজ করতে পারব?'

'হ্যাঁ, হাতে আরও কিছু সময় থাকবে, অবশ্য যদি ঝড় না ওঠে।'

'উঠবে?'

'দু'একদিন পর উঠতে পারে, কাল উঠবে বলে মনে করি না।'

'গুড। রেডিও অপারেটর কোথায়?'

'এই যে, এর নাম জাহুর।'

হাসিখুশি চেহারা জাহুরের, দাঁতগুলো হলুদ, একটু রোগাটে। তাকে বলল কোহেন, 'ইমপেরিয়ালে একজন মার্কিন স্পাই আছে, হিলারী। ব্রিটিশ জাহাজ হোয়াইট রোজে সিগন্যাল পাঠাবে সে। এই ওয়েভলেংথে কান সজাগ রাখতে হবে তোমার।' কয়েকটা অক্ষর লিখে দিল কোহেন। 'আর অরিয়নে আছে একটা

রেডিও বীকন, প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর একটা করে টোন পাঠাচ্ছে। ওটা যদি প্রতিবার শুনতে পারি, তাহলে জানতে পারব দৌড় প্রতিযোগিতায় অরিয়ন আমাদেরকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে না।'

কোর্স জানিয়ে দিচ্ছে ক্যাপ্টেন। ডেকে দাঁড়িয়ে ফার্স্ট অফিসার তার সহকারীদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছে। কাওয়াশ তার একজন লোককে বলল, আর্মস অ্যামুনিশন আরেকবার চেক করা দরকার। অরিয়নের বীকন সম্পর্কে আরও কিছু জানার জন্যে প্রশ্ন করল রেডিও অপারেটর, কিন্তু তার কথায় তেমন কান দিতে পারল না কোহেন। সে তখন ভাবছে, এই কাজে আমি যদি সফল হতে পারি, তেল আবিব আমাকে মাথায় তুলে নাচবে। ইসরায়েলের একজন হিরো হব আমি।

জাহাজের এঞ্জিন গর্জে উঠল, পায়ের নিচে কাঁপুনি অনুভব করল কোহেন, ঢেউ কেটে সামনে এগোল প্রাউ—শুরু হলো সি-উইচের অভিযান।

ইমপেরিয়ালের নতুন এঞ্জিনিয়ার অফিসার আব্বাস হোবায়দা রাত জেগে শুয়ে আছে নিজের বাঙ্কে। ভাবছে, কিন্তু কেউ যদি দেখে ফেলে কি বলব আমি?

কাজটা সহজই। বাঙ্ক থেকে উঠতে হবে তাকে, পিছনের এঞ্জিনিয়ারিং স্টোরে যেতে হবে, স্পেয়ার অয়েল-পাম্পটা বের করে নিয়ে এসে ফেলে দিতে হবে সাগরে। প্রায় নিশ্চিতভাবে জানে, কারও চোখে ধরা না পড়েই কাজটা করতে পারবে সে। তার এই কেবিন স্টোরের একেবারে কাছে, মাঝরাতে এখন আর ক'জন ক্রুই বা জেগে আছে, ব্রিজ বা এঞ্জিনরূমে যারা আছে তারা বাইরে বেরোবে বলে মনে হয় না। কিন্তু এইরকম গুরুত্বপূর্ণ একটা অপারেশনে 'প্রায় নিশ্চিত' বোধ করা যথেষ্ট নয়। কেউ যদি কিছু সন্দেহ করে এখন বা পরে, তাহলে সর্বনাশের কিছু আর বাকি থাকবে না।

বাঙ্ক থেকে নেমে এল আব্বাস। সোয়েটার, ট্রাউজার, সী-বুটস আর একটা অয়েলস্কিন পরল সে। যখন খুশি নয়, এখুনি করতে হবে কাজটা। স্টোরের চাবি পকেটে ফেলে কেবিনের দরজা খুলল সে। বেরিয়ে এল বাইরে। গ্যাংওয়ে ধরে এগোবার সময় ভাবল, কেউ জিজ্ঞেস করলে বলব ঘুম আসছে না তাই স্টোর চেক করছি।

স্টোরের দরজা খুলে আলো জ্বালল আব্বাস। ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করল। চারদিকে র‍্যাক আর শেলফ, সবগুলো এঞ্জিনিয়ারিং স্পেয়ার পার্টসে ঠাসা। গ্যাসকিট, ভালভ, প্লাগ, কেব্‌ল্‌, বোল্ট, ফিল্টার...একটা সিলিন্ডার পেলে এই স্পেয়ার পার্টস দিয়েই গোটা একটা এঞ্জিন তৈরি করে ফেলা যায়।

উঁচু একটা শেলফে বাক্সের ভেতর স্পেয়ার অয়েল পাম্পটা পেল আব্বাস। শেলফ থেকে নামাল সেটা। আকারে বড় নয়, কিন্তু সাংঘাতিক ভারী। একবার নয়, দু'বার চেক করল সে, পাঁচটা মিনিট বেরিয়ে গেল তাতে, কিন্তু খুঁতখুঁতে ভাবটা থেকে রেহাই পেল সে—না, স্টোরে আর কোন স্পেয়ার অয়েল-পাম্প নেই।

এইবার কঠিন কাজটা।...ঘুমাতে পারছিলাম না, স্যার, তাই স্পেয়ার চেক

করছিলাম। ভেরি গুড, সব ঠিকঠাক আছে তো? ইয়েস, স্যার। কিন্তু ওটা কি, তোমার বগলের নিচে দেখা যাচ্ছে? হুইস্কির বোতল, স্যার।...না না, থুড়ি, মা পাঠিয়েছে, ঘরে তৈরি হালুয়া। নাহ্, মিলছে না...আসলে এটা একটা স্পেয়ার অয়েল-পাম্প, স্যার। এটাকে আমি জাহাজ থেকে পানিতে ফেলে দেব বলে নিয়ে যাচ্ছি...

স্টোররুমের দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিল আব্বাস।

কেউ না।

আলোটা নেভাল। বেরিয়ে এল বাইরে। পিছনে হাত নিয়ে গিয়ে বন্ধ করল দরজা। ভাল করে আরও একবার তাকাল সামনে, দু'পাশে।

কেউ না।

দরজায় তালা দিল আব্বাস। গ্যাংওয়ে ধরে এগোল, বেরিয়ে এল ডেকে।

কেউ না।

বৃষ্টি হচ্ছে এখনও। সামনে মাত্র কয়েক গজ দেখতে পেল সে। বরং ভালই বলতে হবে, আর কেউও এর বেশি দেখতে পাবে না। ডেক পেরিয়ে গানেলে চলে এল সে। রেইলের ওপর ঝুঁকে পড়ল। সাগরের দিকে ছেড়ে দিল হাতের অয়েল পাম্প। তারপর ঘুরল। সেই সাথে ধাক্কা খেলো একজনের সাথে।

মা আমার জন্যে হালুয়া পাঠিয়েছিল, কিন্তু এতই শুকনো...

'কে!' বেসুরো ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'আমি এঞ্জিনিয়ার। তুমি?' আব্বাসের কথা শেষ হবার আগেই ঘুরল লোকটা, ফলে ডেডের আলোয় চেহারাটা আবছাভাবে দেখা গেল। চিনতে পারল আব্বাস, নতুন রেডিও অপারেটর।

'ঘুম আসছিল না,' বলল রেডিও অপারেটর। 'আমি...একটু বাতাস খেতে বেরিয়েছিলাম...'

আমার মতই অপ্রস্তুত বোধ করছে লোকটা, ভাবল আব্বাস। ব্যাপারটা কি? 'জঘন্য একটা রাত,' বলল সে। 'আমি যাচ্ছি...'

'গুডনাইট।'

নিজের কেবিনে ফিরে এল আব্বাস। আশ্চর্য লোক, এই রেডিও অপারেটর। নতুন, রেগুলার ক্রুদের একজন নয়। রেগুলার রেডিওম্যানের পা ভেঙে যাওয়ায় কারডিফ থেকে একে তুলে নেয়া হয় জাহাজে। তার মতই, এই লোকটাও একজন বহিরাগত। আর কারও সাথে ধাক্কা না খেয়ে এর সাথে খাওয়ায় ভালই হয়েছে।

ভিজে কাপড়চোপড় ছেড়ে বাঙ্কে উঠল আব্বাস। নিজেকে বলে রাখল, ঠিক দু'ঘণ্টা পর ঘুম থেকে জাগতে হবে।

ঠিক দু'ঘণ্টা পরই ঘুম থেকে উঠল আব্বাস। গ্যালিতে গিয়ে দেখল কুক নেই, তার সহকারী আছে। কয়েক ইঞ্চি পানির মধ্যে দাঁড়িয়ে ক্রুদের জন্যে আলু-পটল ভাজছে লোকটা।

'জঘন্য আবহাওয়া,' বলল আব্বাস।

'আরও খারাপ হবে।'

এক কাপ কফি খেলো আব্বাস, তারপর আরও দু'কাপ হাতে নিয়ে উঠে এল ব্রিজে। ফার্স্ট অফিসার রয়েছে এখানে। 'গুড মর্নিং,' বলল আব্বাস।

'বরং উল্টোটা,' বৃষ্টির চাদরে চোখ রেখে বলল ফার্স্ট অফিসার।

'কফি?'

'ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ।'

ফার্স্ট অফিসারের হাতে একটা কাপ ধরিয়ে দিল আব্বাস। 'কোথায় আমরা?'

'এখানে।' চার্টে আঙুল রেখে নিজেদের পজিশন দেখাল অফিসার, 'খারাপ আবহাওয়া সত্ত্বেও শিডিউলের একচুল এদিক ওদিক হয়নি।'

আপনমনে মাথা ঝাঁকাল আব্বাস। তার মানে, পনেরো মিনিটের মধ্যে জাহাজ থামাতে হবে তাকে। 'পরে দেখা হবে,' বলল সে। তারপর ব্রিজ থেকে নেমে এসে ঢুকল এঞ্জিনরুমে।

তার দু'নম্বর সহকারী রয়েছে এখানে, তাজা ঝরঝরে চেহারা দেখে বোঝা গেল, নাইট ডিউটির মধ্যেই লম্বা একটা ঘুম দিয়েছে সে। 'অয়েল প্রেশার কি রকম?'

'স্টেডি।'

'কাল একটু ওঠানামা করছিল।'

'কিন্তু রাতে কোন গোলমালের লক্ষণ দেখা যায়নি,' বলল দু'নম্বর। একটু জোর দিয়েই বলল, প্রমাণ করতে চাইছে, রাতে সে ঘুমায়নি।

'গুড,' বলল আব্বাস। 'সম্ভবত নিজেই মেরামত হয়ে গেছে।' সমতল একটা কাউলিঙে হাতের কাপটা নামিয়ে রাখল সে, কিন্তু জাহাজ কাত হতে শুরু করতেই তাড়াতাড়ি তুলে নিল আবার। 'শুতে যাবার সময় এক নম্বরকে ডেকে দিয়ো।'

'ঠিক আছে।'

'যাও।'

দু'নম্বর চলে যেতেই কফিটুকু তাড়াতাড়ি শেষ করল আব্বাস, তারপর হাত দিল কাজে।

এঞ্জিনের পিছনে কয়েকটা ডায়াল নিয়ে একটা কেসিং, এই ডায়ালেরই একটা অয়েল প্রেশার গজ। ধাতুর তৈরি কেসিংটা কালো রঙের, একটা শেলফের সাথে চারটে স্ক্রু দিয়ে আটকানো। বড় একটা স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে চারটেই খুলে ফেলল আব্বাস, তারপর কেসিংটা তুলে ফেলল। এর পিছনে নানা রঙের তার দেখা গেল, বিভিন্ন গজে গিয়ে ঢুকেছে। বড় স্ক্রু-ড্রাইভার রেখে ছোট ইলেকট্রনিকেরটা তুলে নিল আব্বাস, ইনসুলেটেড হাতল রয়েছে এর। অয়েল প্রেশার গজে যে তারগুলো গেছে, কয়েকটা প্যাঁচ দিয়ে সেগুলোর একটা বিচ্ছিন্ন করল ও। তারের নগ্ন প্রান্তটা কয়েক ইঞ্চি ইনসুলেটিং টেপ দিয়ে মুড়ে দিল, তারপর ডায়ালের পিছনে আটকে রাখল সেটা, এখন শুধু মনে সন্দেহ নিয়ে কেউ যদি খুঁটিয়ে চেক করে তাহলেই দেখতে পাবে যে টার্মিনালের সাথে জোড়া লাগানো নেই ওটা। কেসিংটা জায়গা মত বসিয়ে স্ক্রু চারটে এঁটে দিল ও।

এঞ্জিন রুমে ঢুকে এক নম্বর সহকারী দেখল, ঠোঁটে সিগারেট নিয়ে গুন গুন করছে এঞ্জিনিয়ার অফিসার।

'কি হে, ভাল ঘুম হয়েছে তো?'

'ইয়েস, স্যার।' চোখ রগড়ে একটা সিগারেট ধরাল এক নম্বর। ডায়াল চেক করল, দুর্বোধ্য আওয়াজ বেরিয়ে এল গলা থেকে, তারপর আবার চেক করল ডায়াল। 'স্যার!' ভূত দেখার মত আঁতকে উঠল সে। 'স্যার, অয়েল প্রেশার জিরো!'

'জিরো?'

'ইয়েস!'

'স্টপ এঞ্জিনস।'

'ইয়েস, স্যার!'

তেল না থাকলে এঞ্জিনের মেটাল পার্টস পরস্পরের সাথে ঘষা খেয়ে দ্রুত গরম হয়ে উঠবে, মেটাল গলে সমস্ত পার্টস অকেজো হয়ে গেলে জাহাজ আর কোনদিনই চালু হবে না। অকস্মাৎ অয়েল প্রেশারের অনুপস্থিতি এমনই গুরুতর ধরনের বিপদ যে এঞ্জিনিয়ারের অনুমতি ছাড়াই এঞ্জিন বন্ধ করে দিতে পারত এক নম্বর, কারও কাছে জবাবদিহি করতে হত না।

জাহাজের সবাই জানতে পারল ইমপেরিয়ালের এঞ্জিন থেমে গেছে, ধীরে ধীরে মন্থর হয়ে আসছে তার গতি। যারা ঘুমিয়ে ছিল তারাও স্বপ্নের মধ্যে টের পেল ব্যাপারটা, এবং জেগে উঠল। এঞ্জিন পুরোপুরি স্থির হবার আগেই ভয়েস পাইপের ভেতর দিয়ে ফার্স্ট অফিসারের গলা নেমে এল, 'ব্রিজ। নিচে হচ্ছে কি?'

ভয়েস পাইপে মুখ রেখে কথা বলল আব্বাস, 'হঠাৎ অয়েল প্রেশারের অভাব দেখা দিয়েছে।'

'কারণ?'

'এখুনি বলা যাচ্ছে না।'

'আমি অপেক্ষা করছি।'

'ইয়েস, স্যার।'

এক নম্বরের দিকে ফিরল আব্বাস। 'চলো, সাম্প নামাতে যাব আমরা।' টুলবক্স তুলে নিয়ে আব্বাসের পিছু পিছু একটা হাফ ডেকে নেমে এল এক নম্বর, এখান থেকে এঞ্জিনের তলায় যেতে পারবে ওরা। আব্বাস বলল, 'মেইন বেয়ারিং বা পিছনের বড় বেয়ারিং যদি ক্ষয়ে গিয়ে থাকে, তেলের চাপ কমবে ধীরে ধীরে, হঠাৎ করে কিছু ঘটবে না। হঠাৎ এই চাপের অভাব, তার মানে সাপ্লাইয়ে বাধা পড়েছে। আগেই চেক করেছি, সিস্টেমে তেলের কোন অভাব নেই। কোথাও লিকও করছে না। তার মানে তেল আসতে বাধা পাচ্ছে কোথাও।'

একটা পাওয়ার স্প্যানার দিয়ে সাম্প রিলিজ করল আব্বাস, তারপর দু'জন ধরাধরি করে ডেকে নামাল সেটাকে। সাম্পের স্ট্রেনার, ফুল ফ্লো ফিলটার, ফিলটার রিলিভ ভালভ এবং সবশেষে মেইন রিলিভ ভালভ পরীক্ষা করল আব্বাস, কিন্তু কোথাও কোন ত্রুটি চোখে পড়ল না।

'কোথাও যদি ব্লকেজ না থাকে,' বলল আব্বাস, 'গোলমাল তাহলে পাম্পেই। যাও, স্পেয়ার অয়েল-পাম্পটা নিয়ে এসো।'

'ওটা বোধহয় মেইন ডেক স্টোরে আছে,' বলল এক নম্বর।

তাকে চাবি দিতেই চলে গেল সে।

এবার দ্রুত কাজ সারতে হবে আব্বাসকে। অয়েল-পাম্প থেকে কেসিংটা খুলে ফেলতেই চওড়া দাঁতের একজোড়া মেশিং গিয়্যার হুইল বেরিয়ে পড়ল। পাওয়ার ড্রিল থেকে স্প্যানার খুলে নিয়ে সে-জায়গায় ফিট করল একটা বিট, তারপর ড্রিল দিয়ে হামলা চালাল গিয়্যার হুইলের দাঁতগুলোয়।

এরপর ড্রিল রেখে দিয়ে একটা ক্রোবার আর একটা হ্যামার তুলে নিল আব্বাস, বারটাকে দুই হুইলের মাঝখানে জোর করে ঢোকাতে চেষ্টা করল ও। একসময় কিছু একটা ভেঙে যাবার ভোঁতা আওয়াজ হলো, সেই সাথে ক্ষান্ত হলো সে। সবশেষে কঠিন ইস্পাত দিয়ে তৈরি একটা নাট বের করল পকেট থেকে, তোবড়ানো আর চ্যাপ্টা—জাহাজে ওঠার সময় সাথে করে নিয়ে এসেছিল এটা। নাটটা সাম্পের ভেতর ফেলে দিল ও।

শেষ।

এক নম্বর ফিরে এল। ঠিক তখনই খেয়াল হলো আব্বাসের, পাওয়ার ড্রিল থেকে বিটটা খোলা হয়নি। অথচ এক নম্বর দেখে গেছে ড্রিলের সাথে স্প্যানার অ্যাটাচমেন্ট লাগানো ছিল। লক্ষ্মী ভাই আমার, ওদিকে তাকিয়ো না!

'স্টোরে কোন পাম্প নেই, স্যার।'

সাম্প থেকে নাটটা তুলে এক নম্বরকে দেখাল আব্বাস। 'এটা দেখো,' বলল আব্বাস। পাওয়ার ড্রিল থেকে তার চোখ সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছে সে। 'এটাই যত নষ্টের গোড়া।' অয়েল-পাম্পের নষ্ট হয়ে যাওয়া গিয়্যার হুইল দুটো তাকে দেখাল আব্বাস। 'নিশ্চয় শেষবার ফিলটার বদল করার সময় নাটটা পড়ে গিয়েছিল, পাম্পের ভেতর ঢুকে সেই থেকে ওই গিয়্যার হুইলের সাথে ঘুরছিল। আওয়াজটা কেন যে শুনতে পাইনি সেটাই আশ্চর্য, এঞ্জিনের শব্দ চাপা পড়ার তো কথা নয়। সে যাই হোক, অয়েল-পাম্প মেরামতের বাইরে চলে গেছে, কাজেই স্পেয়ারটা তোমাকে পেতেই হবে। সাথে কয়েকজনকে নিয়ে ভাল করে সার্চ করো।'

আবার বেরিয়ে গেল এক নম্বর। ড্রিল থেকে বিট খুলে স্প্যানারটা লাগাল আব্বাস। ছুটে মেইন এঞ্জিনরুমে উঠে এল ও। প্রমাণগুলো মুছে ফেলতে হবে। কেউ এসে পড়তে পারে, তাই দ্রুত হাত চালাল সে। গজগুলোর কেসিং সরিয়ে অয়েল প্রেশার গজটা আবার জোড়া লাগাল। এখন এটা নিজে থেকেই জিরো দেখাবে। কেসিংটা জায়গা মত বসিয়ে স্ক্রু এঁটে দিল ও, ফেলে দিল ইনসুলেটিং টেপ।

কাজ শেষ। এবার ধুলো দিতে হবে ক্যাপ্টেনের চোখে।

সার্চ পার্টি পরাজয় স্বীকার করার সাথে সাথে ব্রিজে উঠে এল আব্বাস। ক্যাপ্টেনকে বলল, 'এঞ্জিন সার্ভিসিঙের সময় নিশ্চয়ই কোন মেকানিক এই নাটটা অয়েল-পাম্পে ফেলেছিল, স্যার।' ওর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে নাটটা দেখল ক্যাপ্টেন। 'তারপর কোন একসময় অয়েল-পাম্পে ঢুকে পড়ে এটা। এরপর যা হবার তাই হয়েছে। এটার সাথে গিয়্যার হুইল ঘষা খেয়ে সে-দুটোর একেবারে

বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। জাহাজে বসে ওই গিয়্যার হুইল তৈরি করা সম্ভব নয়। স্পেয়ার থাকার কথা, কিন্তু নেই।'

রাগে কাঁপতে লাগল ক্যাপ্টেন। 'এর জন্যে যে-ই দায়ী হোক তার কপালে খারাবি আছে!'

'স্পেয়ার চেক করা এঞ্জিনিয়ারেরই কাজ, স্যার, কিন্তু আপনি তো জানেন আমি জাহাজে এসেছি শেষ মুহূর্তে।'

'তার মানে টোবি দায়ী।'

'নিশ্চয়ই এর কোন ব্যাখ্যা আছে...'

'তা থাকবে না! তার মধ্যে মেয়েমানুষের পিছু ধাওয়া করা একটা!' কঠোর চোখে আব্বাসের দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন। 'একটু একটু করেও এগোতে পারব না আমরা?'

'না, স্যার, কোন উপায়ই নেই।'

'কপালের ফের,' বলে কাঁধ ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন। 'রেডিও অপারেটর কোথায়?'

ফার্স্ট অফিসার বলল, 'আমি তাকে খুঁজে আনছি, স্যার।'

অফিসার চলে যেতে ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক জানো, জোড়াতালি দিয়েও একটা অয়েল-পাম্প খাড়া করা সম্ভব নয়?'

'স্পেয়ার পার্টস দিয়ে ওটা তৈরি করা সম্ভব নয়, স্যার। সেজন্যেই তো জাহাজে স্পেয়ার পাম্প রাখা হয়।'

রেডিও অপারেটরকে সাথে নিয়ে ব্রিজে ফিরে এল ফার্স্ট অফিসার। ক্যাপ্টেন রাগের সাথে জানতে চাইল, 'কোথায় থাকা হয় শুনি?'

রাতের বেলা এই রেডিও অপারেটরের সাথে ডেকে ধাক্কা খেয়েছিল আব্বাস। চেহারা দেখে মনে হলো, ক্যাপ্টেনের কথায় আহত হয়েছে সে। বলল, 'ফরওয়ার্ড স্টোরে অয়েল-পাম্প খুঁজছিল ওরা, আমি ওদেরকে সাহায্য করছিলাম, স্যার। ওখান থেকে আমি হাত ধুতে যাই।' আব্বাসের দিকে একবার তাকাল সে, কিন্তু তার চেহারায় সতর্ক বা সন্দেহের কোন ভাব ফুটল না। অন্ধকার ডেকে কতটুকু কি দেখেছে বলা কঠিন, কিন্তু সেই ঘটনার সাথে স্পেয়ার অয়েল-পাম্প খুঁজে না পাবার ঘটনা যদি মেলাতেও পেরে থাকে, এই লোক ক্যাপ্টেনকে নিজের সন্দেহের কথা জানাবে বলে মনে হয় না।

'ঠিক আছে,' বলল ক্যাপ্টেন। 'মালিকের কাছে সিগন্যাল পাঠাও—রিপোর্ট এঞ্জিন ব্রেকডাউন অ্যাট...আমাদের পজিশন, ফার্স্ট অফিসার?'

রেডিও অপারেটরকে পজিশন জানাল অফিসার।

আগের রেশ ধরে বলে গেল ক্যাপ্টেন, 'রিকোয়্যার নিউ অয়েল-পাম্প অর টো টু পোর্ট। প্লীজ ইনস্ট্রাক্ট।'

আব্বাসের কাঁধ দুটোয় একটু ঢিল পড়ল। উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে তার।

পুরানো মালিকের কাছ থেকে উত্তর আসতে দেরি হলো না।

ইমপেরিয়াল সোল্ড টু বুভাইল শিপিং অভ জুরিখ। ইওর মেসেজ পাসড্ টু নিউ

ওউনার্স। স্ট্যান্ড বাই ফর দেয়ার ইনস্ট্রাকশন।

এর প্রায় পরপরই বুভাইল শিপিং থেকে সিগন্যাল এল—

আওয়ার ভেসেল ওয়াটারহেন ইন ইওর ওয়াটারস। শি উইল কাম অ্যালংসাইড অ্যাট অ্যাপ্রকসিমেটলি নুন। প্রিপেয়ার টু ডিসএমবার্ক অল ক্রু একসেপ্ট এঞ্জিনিয়ার। ওয়াটারহেন উইল টেক ক্রু টু পোর্ট। এঞ্জিনিয়ার উইল অ্যাওয়েট নিউ অয়েল-পাম্প। ভিনসেন্ট গগল।

এই সিগন্যাল বিনিময় ষাট মাইল দূর থেকে শুনতে পেল মোহাম্মদ মাযহার, মিশরীয় নেভির একজন কমান্ডার এবং ওয়াটারহেনের ক্যাপ্টেন। বিড়বিড় করে বলল সে, 'চমৎকার, আব্বাস! সময়ের একচুল এদিক ওদিক হয়নি।' ইমপেরিয়ালের দিকে কোর্স স্থির করে অর্ডার দিল, 'ফুল স্পীড অ্যাহেড।'

দেড়শো মাইল দূরে সী-উইচের কোহেন আর কাওয়াশ এই সিগন্যাল বিনিময় শুনতে পেল না। ওই সময় ক্যাপ্টেনের কেবিনে ছিল ওরা, কোহেনের আঁকা ইমপেরিয়ালের নকশা সামনে নিয়ে আলোচনা করছিল কিভাবে ওরা জাহাজটায় চড়বে আর দখল করবে। এর আগেই কোহেন রেডিও অপারেটরকে নির্দেশ দিয়েছে, দুটো ওয়েভলেংথে রেডিও সেট করতে হবে তাকে। একটা অরিয়নের রেডিও বীকন শোনার জন্যে, আরেকটা ইমপেরিয়াল থেকে হোয়াইট রোজে পাঠানো হিলারীর সিগন্যাল ধরার জন্যে।

সিগন্যালটা পাঠানো হয়েছে ইমপেরিয়ালের রেগুলার ওয়েভলেংথে, সেজন্যেই সী-উইচ সেটা ধরতে পারল না। ইসরায়েলীরা যে প্রায় খালি একটা জাহাজ হাইজ্যাক করতে যাচ্ছে, এটা বুঝতে আরও দেরি হবে ওদের।

দুশো মাইল দূরে রয়েছে অরিয়ন, তার ব্রিজ থেকে শোনা গেল সিগন্যালটা। ভিনসেন্ট গগলের পাঠানো সিগন্যাল ইমপেরিয়াল পেয়েছি বলে আশ্বস্ত করতেই ব্রিজে উপস্থিত অফিসাররা সবাই একযোগে হাততালি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করল। হাতে এক মগ কালো কফি নিয়ে বাল্কহেডের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা, বৃষ্টি আর উথালপাতাল সাগরের দিকে চোখ, তাকে আর সবার সাথে আনন্দে শরিক হতে দেখা গেল না। শরীরের পেশী টান ধরে আছে, চেহারায় কাঠিন্য। একজন অফিসার এগিয়ে এসে সহাস্যে বলল, 'বড় ধরনের প্রথম বাধাটা কেটে গেছে, তবু আপনার চেহারা এমন মলিন কেন?' তার দিকে এমন কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানা, লোকটার মুখ থেকে এক নিমেষে মিলিয়ে গেল হাসি, পালাতে দিশে পেল না সে। পরে এই লোক মেসে ফিরে তার সহকারীদের বলল, 'মাসুদ রানা লোকটা আজব টাইপের মানুষ; কেউ যদি তার পা মাড়িয়ে দেয়, সাথে সাথে তার পেটে ছুরি সেঁধিয়ে দেবে সে।'

তিনশো মাইল দূরে রয়েছে হোয়াইট রোজ, সেখান থেকে এই সিগন্যাল বিনিময়

শুনতে পেল রিচি এবং এষা।

সিসিলিয়ান জেটি থেকে ব্রিটিশ ভেসেল হোয়াইট রোজে ওঠার সময় চিন্তাশক্তি একরকম লোপই পেয়েছিল এষার। কিছুই ভাল করে খেয়াল করতে পারছিল না, রিচি যা বলছিল তাই করে যাচ্ছিল শুধু। জাহাজে ওঠার পর রিচি তাকে একটা কেবিনে দিয়ে গেল, বলল, 'আরাম করো।' দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে বিছানায় বসল এষা। এক ঘণ্টা পর একজন সেইলর ওর খাবার নিয়ে এল, তখনও সেই একই ভঙ্গিতে বিছানায় বসে আছে সে। চারদিক অন্ধকার হয়ে আসতে ঠাণ্ডা লাগতে লাগল তার, শরীরটাও খুব ক্লান্ত মনে হলো, তাই পা তুলে শুয়ে পড়ল। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছে নিজেও জানে না।

ঘুমের মধ্যে অর্থহীন স্বপ্ন দেখল এষা। সকাল বেলা যখন ঘুম ভাঙল, কিছুই মনে করতে পারল না সে। এ কোথায় রয়েছে সে? মাথা তুলে কেবিনের চারদিকে তাকাল। তারপর হঠাৎ করেই মনে পড়ে গেল সব। হোয়াইট রোজে রয়েছে সে। রিচির হাতে বন্দী। মাসুদ রানাকে সাবধান করার জন্যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সে, কিন্তু সাবধান করা তো হয়ইনি, উল্টে তার বিপদ আরও বাড়িয়ে তুলেছে সে।

নিজেকে অপরাধী অপরাধী মনে হলো এষার। কিন্তু মনের এই ভাবটা কেটে গিয়ে সেখানে রাগ জমতে শুরু করল। বাবার কথা মনে পড়ল। এই লোক নিজের পলিটিক্যাল আইডিয়ার স্বার্থে মেয়েকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে। এর জন্যে আরও একজন দায়ী, কোহেন। সে-ই ওর বাবাকে এই কাজে প্ররোচিত করেছে। সবশেষে রিচির কথা ভাবল এষা। তীক্ষ্ণ চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, ঠাণ্ডা হাসি, এই রিচিই রানার জাহাজকে ধাক্কা দিতে চায়, খুন করতে চায় রানাকে।

রাগে কাঁপতে লাগল এষা। রানা আমার। তাকে ভালবাসি। আমি বেঁচে থাকতে তার কোন ক্ষতি এরা করতে পারবে না।

শত্রুদের হাতে রয়েছে সে। বন্দিনী। কিন্তু সেটা তার নিজের দৃষ্টিতে। ওরা ভাবছে, সে-ও ওদেরই দলের। তাকে বিশ্বাস করেছে ওরা। এই সুযোগটা নিয়ে সে হয়তো ওদের কাজে বাধা দিতে পারে। চোখ-কান খোলা রাখলে কিছু একটা উপায় বেরিয়ে যাবে। এভাবে নিজেকে কেবিনের ভেতর আটকে রাখার মানে হয় না। জাহাজের সব জায়গায় যেতে হবে তাকে, ক্ষতি করার সুযোগ খুঁজতে হবে। ভয় ভয় ভাবটা গোপন করে, ওদের উদ্বেগে উদ্বিগ্ন হতে হবে, ওদের হাসিতে হাসতে হবে। ওদের ক্ষতি আর রানাকে সাহায্য করতে হলে শত্রুদের বিশ্বাস অর্জন করা চাই।

কিন্তু এ বড় কঠিন পরীক্ষা। পারবে সে? ভয়টা আবার ফিরে এল মনে। তারপর নিজেকে যুক্তি দিয়ে বোঝাল সে, আমি যদি চুপ করে বসে থাকি, যদি ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিই সব, তাহলে রানাকে আমার হারাতে হবে। আর রানাকে হারালে আমার বেঁচে থাকার কোন অর্থ থাকবে না।

বিছানা থেকে নেমে পড়ল এষা। হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় ছাড়ল। নিজের সুটকেস খুলে নতুন সোয়েটার আর প্যান্ট পরল। রাতের বাসি খাবার এখনও পড়ে রয়েছে টেবিলে, তা থেকে খানিকটা তুলে মুখে দিল। চুলে চিরুনি চালিয়ে হালকা

একটু মেকআপ নিল। তারপর পরীক্ষা করল দরজা।

খোলাই।

কেবিন থেকে বেরিয়ে এল এষা। কাউকে দেখল না। ডেকে বেরিয়ে এসে গ্যালির দিকে এগোল। ওমলেটের গন্ধ ঢুকল নাকে। ভেতরে ঢুকে দ্রুত তাকাল চারদিকে।

একা বসে ব্রেকফাস্ট সারছে রিচি। মুখ তুলে তাকাল সে। কিন্তু হাসলও না, কথাও বলল না। মনটা সাংঘাতিক দমে গেল এষার। ইতস্তত করতে লাগল সে। তারপর গায়ের জোরে এগিয়ে নিয়ে এল নিজেকে। টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে ভর দিয়ে দাঁড়াল। পা কাঁপছে।

'বসো,' বলল রিচি।

দ্বিতীয়বার বলতে হলো না, সাথে সাথে বসে পড়ল এষা।

'কেমন ঘুমালে?'

ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে এষা, এইমাত্র যেন কোথাও থেকে ছুটে এল। 'ভাল।' নিজের কানেই কাঁপা কাঁপা শোনাল গলাটা।

তীক্ষ্ণ চোখে এষাকে দেখল রিচি। 'তোমাকে খুব নার্ভাস দেখাচ্ছে,' বলল সে। সহানুভূতি বা বৈরী মনোভাব, কিছুই প্রকাশ পেল না ওর চেহারায়।

'আমি…' গলার ভেতর আটকে যাচ্ছে শব্দ, কি বলবে ভেবে পেল না এষা। 'আমি…কাল খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম…এর আগে আমি কাউকে মরতে দেখিনি।'

'আচ্ছা,' মৃদু কণ্ঠে বলল রিচি। একটু যেন নরম মনে হলো তাকে। বোধহয় প্রথম লাশ দেখে তার নিজের কি অবস্থা হয়েছিল সেটা মনে পড়ে গেছে। 'মরতে তো সবাইকেই হবে, তা নিয়ে আর এত চিন্তা-ভাবনা করে লাভ কি?'

'না…মানে, নিজে মরব সে-কথা ভেবে ভয় পাইনি আমি,' বলল এষা। 'আসলে কোন কারণ নেই, তবু একজন মানুষের মৃত্যু এই প্রথম দেখলাম তো, কেমন যেন হকচকিয়ে গিয়েছিলাম, এই আর কি।'

কাঁটা চামচে ওমলেট গেঁথে মুখে পুরল রিচি। 'বাদ দাও এসব। তোমার খিদে পায়নি?'

'রাতের খাবার এইমাত্র খেয়ে এলাম।'

'তার মানে রাতে উপোস গেছ?' নির্লজ্জের মত সরাসরি এষার বুকের দিকে তাকিয়ে থাকল রিচি। 'ব্যাড। গোড়ায় পানি না দিলে গাছের ফল যে শুকিয়ে যাবে!'

গা শিরশির করে উঠল এষার। এর আগে তাকে নিয়ে যারা অশ্লীল রসিকতা করার চেষ্টা করেছে তাদের প্রত্যেককে এমন অপমান করেছে এষা, পরে আর তার সামনে দিয়ে হাঁটতেও সাহস পেত না কেউ। কড়া ভাষায় রিচিকেও কিছু কথা শোনাতে ইচ্ছে হলো তার, কিন্তু অনেক কষ্টে সামলে রাখল নিজেকে। ভাবল, রিচি বন্ধুত্ব পাতাতে চাইছে, এই সুযোগ হাতছাড়া করা চলে না। কিছু বলার জন্যে অস্থিরতা বোধ করল সে, কিন্তু কি বলা যায় ভেবে পেল না। কয়েক সেকেন্ড কেটে গেল। তার বুকের দিকে বারবার তাকাচ্ছে রিচি। তাকে এক রকম উৎসাহ

দেবার জন্যেই একটু হাসল এষা, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আমার মায়ের কথা পরিষ্কার মনে আছে আপনার?'

'ভয়ঙ্কর সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু তাঁকে আমি যমের মত ভয় পেতাম,' এষার চোখে চোখ রেখে বলল রিচি। মতলবি হাসি দেখা গেল তার ঠোঁটে। 'এখন বলো, তোমার সাথে আমার সম্পর্কটা কি হবে? তোমাকেও আমার ভয় পেতে হবে নাকি?'

লাজুক হাসি দেখা গেল এষার ঠোঁটে। 'না, তা কেন!'

'ধন্যবাদ,' এষার দিকে ঝুঁকে পড়ল রিচি। 'তোমার সাথে তাহলে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক। রাইট?'

উত্তর না দিয়ে ঠোঁট একটু ফাঁক করে হাসল এষা।

আলাপ যখন জমে উঠেছে, বাধা এল একজন অফিসারের কাছ থেকে। গ্যালিতে ঢুকে রিচির পাশে এসে দাঁড়াল সে, ঝুঁকে পড়ে নিচু গলায় কিছু বলল। উঠে দাঁড়াল রিচি, চেহারা দেখে মনে হলো এষাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে মেজাজ বিগড়ে গেছে তার। 'ব্রিজে কাজ আছে আমার।'

রিচির সাথে থাকতে হবে আমাকে, ভাবল এষা। অনেক কষ্টে গলাটাকে শান্ত রাখল সে, 'আমিও আসি?'

রিচির চেহারায় আবার সেই কাঠিন্য ফিরে এল। ঠাণ্ডা চোখে কয়েক সেকেন্ড এষার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। মনে হলো, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। তারপর হয়তো ভাবল, এষা যদি গোপন কিছু জানতেও পারে, ক্ষতি কি? সি. আই. এ-র জাহাজে, আমাদের হাতের মুঠোয় রয়েছে সে, গোপন তথ্য নিয়ে ধুয়ে খাবে? ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে উঠল সে, বলল, 'তোমার ইচ্ছে।'

ওর মন জয় করা গেছে তাহলে, ভাবতে ভাবতে রিচির পিছু পিছু গ্যালি থেকে বেরিয়ে এল এষা।

রেডিওরুমে উঠে এসে একটা মেসেজ পড়তে শুরু করল রিচি, এষাকে সেটা অনুবাদ করে শোনাবার সময় নিজের মনেই হাসল সে। রানার বুদ্ধি আর কৌশল তাকে যেন মুগ্ধ করে তুলেছে। বলল, 'শালার একটা মাথা বটে!'

'বুভাইল শিপিং ব্যাপারটা কি?' জানতে চাইল এষা।

'মিশরীয় ইন্টেলিজেন্সের একটা ফ্রন্ট। ইউরেনিয়ামের কি হলো, এটা যারা জানতে চাইবে তাদেরকে এক এক করে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দিচ্ছে রানা। ইমপেরিয়ালের আগের মালিক এখন আর ইন্টারেস্টেড নয়, কারণ জাহাজটা এখন আর তাদের নয়, কাজেই জাহাজের কার্গো সম্পর্কে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। এখন রানা ইমপেরিয়ালের ক্যাপ্টেন আর ক্রুদের সরিয়ে দিচ্ছে। সন্দেহ নেই, ইউরেনিয়ামের যারা আসল মালিক তাদের ওপর সাংঘাতিক প্রভাব আছে ওর। এটা একটা বিউটিফুল স্কীম।'

'এই যে অচল হয়ে গেছে ইমপেরিয়াল, নিশ্চয়ই এর পিছনেও তার হাত আছে?'

'অবশ্যই। একটা গুলি না চালিয়েও জাহাজটাকে এখন দখলে নিতে পারবে

রানা।'

দ্রুত চিন্তা করল এষা। কোহেন আর রিচি একসাথে একই উদ্দেশে কাজ করছিল। এখনকার পরিস্থিতি আলাদা। কোহেন রিচির সাথে বেঈমানী করছে, কিন্তু রিচি সেটা এখনও জানে না। রিচির আরও বিশ্বস্ত হবার এই একটা সুযোগ।

যতটা সম্ভব স্বাভাবিক স্বরে বলল, 'কোহেনও পারবে।'

'কি?'

'বলছিলাম, গুলি না চালিয়ে কোহেনও ইমপেরিয়াল দখল করতে পারবে।'

এষার দিকে তাকিয়ে থাকল রিচি, তার লম্বাটে মুখ থেকে সব রক্ত যেন নেমে যাচ্ছে। লোকটাকে এভাবে হঠাৎ করে আত্মবিশ্বাস আর উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলতে দেখে মনে মনে বিমূঢ় আর শঙ্কিত হয়ে উঠল এষা। রিচি প্রশ্ন করল, 'কি? ইমপেরিয়ালকে হাইজ্যাক করতে চায়···কোহেন?'

বিস্মিত হবার ভান করল এষা। 'মানে? আপনি জানেন না?'

'না! সব কথা খুলে বলো তো আমাকে!'

'কিন্তু কোহেন আমাকে বলল, এটা নাকি আপনারই প্ল্যান!'

'মাই গড!' বাল্কহেডে দুম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল রিচি। 'তার মানে, তার মানে···ইসরায়েলীরা আমাদেরকে ব্লাফ দিচ্ছে? ইউরেনিয়াম হাত করার তালে আছে ওরা?'

ইউরেনিয়াম ওদের দরকার নেই, যতটুকু দরকার ছিল তা তোমরাই যুগিয়েছ, এটা ওরা বিক্রি করে কিছু কামাবে, ভাবল এষা।

'তার মানে, কোহেন আমার সাথে বেঈমানী করেছে! শালা মিথ্যেবাদী!' রাগে ফুঁসছে রিচি।

এই-ই সুযোগ। মনে মনে কথাটা বলার জন্যে তৈরি হলো এষা। বলল, 'চেষ্টা করলে আমরা হয়তো তাকে বাধা দিতে পারি।'

ঝট করে এষার দিকে ফিরল রিচি। 'তার প্ল্যানটা কি জানো?'

'রানা ইমপেরিয়ালে পৌঁছবার আগেই জাহাজটা হাইজ্যাক করবে সে, তারপর রানা আর মিশরীয়দের জন্যে অ্যামবুশ পাতবে। ইউরেনিয়াম নিয়ে কি করবে না করবে আমাকে কিছু জানায়নি। আপনার প্ল্যানটা কি ছিল?'

'রানা ইউরেনিয়াম দখল করার পর তার জাহাজ ধাক্কা দেয়া···'

'সেটা তো এখনও আমরা করতে পারি।'

'না। এখন আমরা অনেক দূরে, পৌঁছতে অনেক বেশি সময় লাগবে।'

এষা বুঝল, বাকি অংশটুকু ঠিক মত সারতে না পারলে তার আর রানার বাঁচার কোন আশা নেই। কাঁপুনিটা লুকাবার জন্যে হাত দুটো পিছনে সরিয়ে ফেলল সে। বলল, 'তাহলে আর একটা মাত্র রাস্তা খোলা আছে আমাদের সামনে।'

তীক্ষ্ণ চোখে এষার দিকে তাকাল রিচি। 'আছে? কি?'

'রানাকে আমাদের সাবধান করতে হবে, যাতে ইসরায়েলীদের কাছ থেকে আবার সে ফিরিয়ে নিতে পারে ইমপেরিয়ালকে।'

যা আছে কপালে, বলে তো ফেলছি! রিচির মুখের দিকে গভীর মনোযোগের সাথে তাকিয়ে থাকল এষা। কি ভাবছে লোকটা? টোপ গিলবে? এর মধ্যে যুক্তি আছে, গিলবে না কেন?

গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে রিচি। বিড়বিড় করে আপনমনেই বলল, 'রানাকে ইসরায়েলীদের প্ল্যান জানানো, যাতে ওদের কাছ থেকে জাহাজটা কেড়ে নিতে পারে সে। তাহলে সে তার প্ল্যান ধরে এগোতে পারে, আমরাও আমাদের প্ল্যান ধরে এগোতে পারি।...মন্দ নয়!'

'এরচেয়ে ভাল কিছু হতে পারে না!' উত্তেজিতভাবে বলল এষা। 'এছাড়া আমাদের আর কোন উপায়ও নেই। তাই না?'

ফ্রম : বুভাইল শিপিং, জুরিখ

টু: আঞ্জেলুজি ই বিয়ানকো, জেনোয়া

ইওর ইয়েলোকেক কনসাইনমেন্ট ফ্রম এফ.এ. মুলার ইনডেফিনিটলি ডিলেড ডিউ টু এঞ্জিন ট্রাবল অ্যাট সী। উইল অ্যাডভাইজ সুনেস্ট অভ নিউ ডেলিভারি ডেটস। ভিনসেন্ট গগল।

দশ

দিগন্তরেখার কাছে ওয়াটারহেনকে দেখতে পেয়েই ড্রাগ অ্যাডিক্ট পাবলোকে খপ্ করে ধরল হিলারী, তারপর হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এল এক কোণে।

'কেন, ভাই,' মিন মিন করে বলল পাবলো, 'আমি তোমার কি ক্ষতি করেছি?'

'চোপ!' পাবলোর চেয়ে আকারে তিনগুণ বড় হিলারী, শক্তিতে কম করেও ছয় গুণ। ড্রাগ নিয়ে শরীরের একেবারে বারোটা বাজিয়ে ফেলেছে পাবলো। 'মন দিয়ে শোনো। আমার একটা কাজ করে দিতে হবে তোমাকে।'

'বলেছি করব না?'

ইতস্তত করল হিলারী। সাংঘাতিক ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাচ্ছে। তবু, আর কোন উপায়ও নেই। 'তোমরা সবাই ওয়াটারহেনে চলে যাচ্ছ, কিন্তু আমি এই ইমপেরিয়ালেই থাকতে চাই। কেন, জিজ্ঞেস কোরো না। আমাকে যদি খোঁজা হয়, তুমি বলবে আমি আগেই, প্রথম দলের সাথে, ওয়াটারহেনে গিয়ে উঠেছি। বলবে, নিজের চোখে দেখেছ তুমি।'

'ঠিক আছে, বলব, বেশ।'

'কিন্তু আমাকে যদি খুঁজে বের করা হয়, আমি যদি ওয়াটারহেনে চড়তে বাধ্য হই, তোমার কথা ক্যাপ্টেনকে বলে দেব—মনে থাকবে তো?'

'থাকবে।'

পাবলোকে ছেড়ে দিল হিলারী। 'যাও।'

তাড়াতাড়ি কেটে পড়ল পাবলো। কিন্তু আশ্বস্ত হতে পারল না হিলারী। এই ধরনের লোককে বিশ্বাস নেই। মনের জোর বলতে কিছুই নেই এদের, একটু চাপ পড়লে গড়গড় করে সব ফাঁস করে দেবে।

জাহাজ বদলের জন্যে সবাইকে জড় করা হলো ডেকে। সাগর ফুঁসছে, কাজেই ইমপেরিয়ালের পাশে আসতে পারবে না ওয়াটারহেন। একটা বোট পাঠাল তারা। মাঝখানের সাগরটুকু পেরোবার জন্যে সবাইকে লাইফবেল্ট পরতে হলো। একনাগাড় বৃষ্টির মধ্যে ইমপেরিয়ালের ক্রু আর অফিসাররা দাঁড়িয়ে থাকল, প্রত্যেকের নাম ধরে ডেকে, সাড়া নিয়ে সংখ্যা ঠিক আছে কিনা দেখা হলো। তারপর প্রথম লোকটা রেইল টপকে মই বেয়ে নামতে শুরু করল বোটে।

ক্রুদের সবাইকে একসাথে নিয়ে যাবে, বোটটা অত বড় নয়। দুই কি তিনবার আসা-যাওয়া করতে হবে তাকে। সবার মনোযোগ যখন প্রথম লোকটার বোটে নামার দিকে, পাবলোর কানের কাছে মুখ নিয়ে হিলারী বলল, 'শেষ দলের সাথে যাবে তুমি।'

'ঠিক আছে।'

ভিড়ের পিছনে চলে এল ওরা। জাহাজের কিনারা থেকে রেইলের ওপর ঝুঁকে বোটের দিকে তাকিয়ে আছে অফিসাররা। তাদের পিছনে, ওয়াটারহেনের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে ক্রুরা।

একটা বাল্কহেডের পিছনে গা ঢাকা দিল হিলারী। এখান থেকে প্রথম লাইফবোটের দূরত্ব মাত্র দু'গজ, কারও চোখে না পড়ে পৌঁছতে পারে ওখানে। লাইফবোটের কভার আগেই ঢিলে করে রেখেছে সে। কভার সরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। তারপর ভেতর থেকে ধরে তারপুলিনটা জায়গামত টেনে নিল।

এই অবস্থায় কেউ যদি দেখে ফেলে ওকে, তাহলেই হয়েছে!

এমনিতেই মোটাসোটা সে, তার ওপর লাইফ জ্যাকেট পরে আছে; নড়াচড়া করা কঠিন হয়ে উঠল লাইফবোটের ভেতর। অনেক কষ্টে বোটের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় চলে এল সে, তারপুলিনের একটা ফুটোয় চোখ রেখে দেখতে চেষ্টা করল কি হচ্ছে ডেকে।

প্রথম দলটাকে ওয়াটারহেনে তুলে দিয়ে আবার ফিরে এল বোট। দ্বিতীয় দলটা মই বেয়ে নামতে শুরু করল। এই সময় ফার্স্ট অফিসার জানতে চাইল, 'সেই লোকটা কোথায়···রেডিও অপারেটর?'

ভিড়ের মধ্যে পাবলোকে খুঁজল হিলারী। দেখতে পেল। জবান বের কর, শালা!

ইতস্তত করছে পাবলো। তারপর বলল, 'প্রথম বারই গেছে, স্যার।'

'তুমি দেখেছ?'

'ইয়েস, স্যার। দেখেছি।'

মাথা ঝাঁকাল অফিসার। বিড়বিড় করে কি বলল এত দূর থেকে পরিষ্কার শুনতে পেল না হিলারী। এই বৃষ্টির মধ্যে লোকজনকে চেনা কঠিন, এই ধরনের কিছু হবে।

এঞ্জিনিয়ার আব্বাস হোবায়দাকে নিয়ে বাল্কহেডের সামনে, সবার কাছ থেকে

দূরে সরে এল ক্যাপ্টেন। বলল, 'বুভাইল শিপিং-এর নামও কোনদিন শুনিনি। তুমি?'

'না, স্যার,' বলল আব্বাস।

'এ একেবারে নিয়ম-ছাড়া। মাঝ-সাগরে রয়েছে, বিক্রি হয়ে গেল জাহাজ, যত্তোসব! তার ওপর এঞ্জিনিয়ারকে জাহাজের দায়িত্ব দিয়ে ক্যাপ্টেনকে নেমে যেতে বলে—দূর, কারা এরা?'

'আদার ব্যাপারী, স্যার। জাহাজের নিয়ম-কানুন জানা নেই।' হাসি পেলেও হাসছে না আব্বাস।

'ঠিক বলেছ।' তারপর আবার বলল ক্যাপ্টেন, 'ইচ্ছে করলে জাহাজে একা থাকতে আপত্তি জানাতে পারো তুমি। তাহলে তোমার সাথে আমাকেও থেকে যেতে হবে। তারপর জবাবদিহি দেবার সময় আমি তোমাকে সমর্থন করব।'

'কিন্তু তাতে হয়তো স্যার আমাকে টিকেট হারাতে হবে।'

'হ্যাঁ।' অসহায় দেখাল ক্যাপ্টেনকে। 'এসব করে আসলে কোন ফায়দা নেই। ঠিক আছে···গুড লাক।'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

নাবিকদের তৃতীয় দলটাও বোটে চড়েছে. মইয়ের মাথায় ক্যাপ্টেনের জন্যে অপেক্ষা করছে ফার্স্ট অফিসার। ডেক পেরিয়ে মইয়ের দিকে এগোবার সময় বিড়বিড় করতে দেখা গেল ক্যাপ্টেনকে। আদার ব্যাপারীদের নিন্দা করছে সে।

মই বেয়ে নেমে গেল ক্যাপ্টেন। হিলারী এবার মনোযোগ দিল এঞ্জিনিয়ার অফিসার আব্বাসের দিকে। আব্বাসের ধারণা, ইমপেরিয়ালে একা রয়েছে সে। রেইল ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল, লঞ্চটা ওয়াটারহেনের পাশে পৌছতে মই বেয়ে ব্রিজে উঠে গেল। মনে মনে তাকে অভিশাপ দিল হিলারী। চেয়েছিল আব্বাস নিচে গেলে ফরওয়ার্ড স্টোরে নিজের রেডিওর কাছে ফিরে যেতে পারবে সে। হোয়াইট রোজের সাথে এখুনি তার যোগাযোগ করা দরকার।

ব্রিজের দিকে তাকিয়ে থাকল হিলারী। কাঁচের সামনে একটু পরপরই আব্বাসের মুখ দেখা গেল। ওখানেই যদি থাকে লোকটা, সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে হিলারীকে। মনে মনে রাগ হলো তার, কিন্তু বুঝল, এছাড়া কোন উপায় নেই। মতিগতি দেখে মনে হচ্ছে, আব্বাস এখন ব্রিজ ছেড়ে নড়বে না।

রিচিকে রিপোর্ট করা সম্ভব নয়। ব্যাপারটা মেনে নিল হিলারী। সন্ধের অপেক্ষায় বসে থাকল সে চুপচাপ।

ইবিজা দ্বীপের দক্ষিণে পৌছল সী-উইচ। কোহেনের হিসেব মত, এখানেই ইমপেরিয়ালের সাথে দেখা হবে তার। কিন্তু দৃষ্টিসীমার মধ্যে কোন জাহাজ দেখা গেল না।

ইমপেরিয়ালের খোঁজে বেলুন আকৃতির বিশাল বৃত্ত রচনা করতে শুরু করল সী-উইচ। বৃষ্টিতে ঝাপসা হয়ে থাকা দিগন্তরেখার ওপর নজর রাখছে কোহেন, চোখে বিনকিউলার।

'তুমি কোথাও ভুল করেছ,' পাশ থেকে বলল কাওয়াশ।

'মনে হয় না,' বলল কোহেন। নিজের কাছে হাজারবার প্রতিজ্ঞা করেছে সে, যাই ঘটুক, হতাশ বা আতঙ্কিত হবে না সে। 'এই পয়েন্টে সম্ভাব্য কম সময়ের মধ্যে দেখা হওয়ার কথা আমাদের। কিন্তু ইমপেরিয়াল হয়তো টপ স্পীডে আসছে না।'

'কেন? অযথা তার দেরি করার কি কারণ থাকতে পারে?'

কাঁধ ঝাঁকাল কোহেন, যেন বোঝাতে চাইল, ব্যাপারটা নিয়ে এখুনি দুশ্চিন্তা করার কিছু দেখছে না সে। 'হতে পারে, এঞ্জিন ঠিকমত সার্ভিস দিচ্ছে না। হয়তো আমাদের চেয়ে খারাপ আবহাওয়ার ভেতর দিয়ে আসতে হচ্ছে ওদেরকে। এই রকম অনেক কারণই থাকতে পারে।'

'এখন তাহলে কি করতে পারি আমরা?'

কাওয়াশের অস্বস্তি আর উদ্বেগের কারণ বুঝতে পারে কোহেন। এই জাহাজের কন্ট্রোল তার হাতে নেই, সমস্ত সিদ্ধান্ত একমাত্র কোহেনই নিতে পারে। 'আমরা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যাব, ওদিক থেকেই আসবে ইমপেরিয়াল। কিছু আগে বা পরে তাকে আমরা পাবই।'

'ক্যাপ্টেনকে তাহলে সেই নির্দেশ দাও,' বলে নিজের দলের কাছে ফিরে গেল কাওয়াশ।

উত্তেজনা আর রাগে পুড়ছে কাওয়াশ, তার গেরিলাদেরও একই অবস্থা। ব্যাপারটা আগেই লক্ষ করেছে কোহেন। দুপুরের কাছাকাছি সময়ে তুমুল একটা যুদ্ধ হবে বলে আশা করেছিল তারা, অথচ এখন বলা হচ্ছে, অপেক্ষা করতে হবে। কোয়ার্টার আর গ্যালিতে তৈরি হয়ে বসে আছে সবাই, শেষ মুহূর্ত ক'টা কাটাবার জন্যে আর্মস চেক করছে, তাস খেলছে, কিংবা পুরানো কোন যুদ্ধের কথা তুলে নিজেদের দুঃসাহসের স্মৃতি রোমন্থন করছে। কিন্তু এসবই বাইরের চেহারা, মনে মনে সাংঘাতিক টেনশনে ভুগছে সবাই। এরই মধ্যে ক্রুদের সাথে গেরিলাদের বার কয়েক হাতাহাতি হয়ে গেছে। অল্প জখম হয়েছে দু'একজন। ক্রুরা ওদের কাছ থেকে দূরে দূরে সরে আছে।

বিকেল সাড়ে চারটের দিকে আশার আলোটা দপ করে জ্বলে উঠে তখুনি আবার নিভে গেল। ফলস্ অ্যালার্ম। খবরটা ক্যাপ্টেনের মুখ থেকে শুনল কোহেন। 'একটা জাহাজ দেখা গেছে।'

বিনকিউলার দিয়ে দেখল কোহেন, চেহারা আর কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব শান্ত রেখে জানাল, ওটা ইমপেরিয়াল নয়। সী-উইচকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় জাহাজটার নাম পড়তে পারল ওরা, ওয়াটারহেন।

দিনের আলো শেষ হয়ে আসছে দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল কোহেন। আবহাওয়ার যা অবস্থা, নেভিগেশন লাইট থাকলেই বা কি, আধ মাইল তফাত দিয়ে দুটো জাহাজ পরস্পরকে পাশ কাটালেও কেউ কাউকে দেখতে পাবে না। আর, সেই বিকেল থেকে ইমপেরিয়ালের গোপন রেডিওর কোন সাড়া-শব্দ নেই। যদিও জাহুর রিপোর্ট করেছে, হিলারীর সাড়া পাবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে রিচি।

রাতের বেলা কি করা হবে তাই নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল কোহেন। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে ঠিক করল সে, রাত আর একটু বেশি হলে জাহাজ ঘুরিয়ে নেবে তারা, রওনা হবে জেনোয়ার দিকে, ইমপেরিয়ালের ফুল স্পীড ধরে ছুটবে সী-উইচ। রাতের অন্ধকারে ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ইমপেরিয়াল সী-উইচকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারে, এই সম্ভাবনার কথা মনে রেখেই সিদ্ধান্তটা নিল সে। তারপর দিনের আলো ফুটলে আবার সার্চ শুরু করবে সী-উইচ। কিন্তু ততক্ষণে কাছে চলে আসবে অরিয়ন, গেরিলারা রানাকে ফাঁদে ফেলার সুযোগটা হারিয়েও বসতে পারে।

ব্যাপারটা নিয়ে কাওয়াশের সাথে পরামর্শ করা দরকার। তাকে ডেকে পাঠাল কোহেন। ব্রিজে পা দিল কাওয়াশ, আর ঠিক এই সময় দূরে নিঃসঙ্গ একটা আলো দেখা গেল।

'জাহাজটা নোঙর ফেলে আছে,' বলল ক্যাপ্টেন

'কিভাবে বুঝলেন?' জানতে চাইল কাওয়াশ

'একটা মাত্র সাদা লাইটের তাই মানে।'

'ইবিজার দক্ষিণে আমরা ওটাকে পাইনি কেন, সেটা জানা গেল,' বলল কোহেন। 'ওটা যে ইমপেরিয়াল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কাওয়াশ, তোমার লোকদের রেডি হতে বলো।'

'গেলাম আমি,' বলে দ্রুত ব্রিজ থেকে নেমে গেল গেরিলা নেতা।

'আপনার নেভিগেশন লাইট অফ করুন,' ক্যাপ্টেনকে নির্দেশ দিল কোহেন।

নোঙর ফেলা জাহাজের কাছে সী-উইচ পৌঁছবার আগেই সন্ধে নামল।

'ওটা যদি ইমপেরিয়াল না হয়…' কথাটা শেষ করার সাহস হলো না কোহেনের।

চোখ থেকে বিনকিউলার নামাল ক্যাপ্টেন। 'জাহাজটার ডেকে তিনটে ক্রেন রয়েছে, আর, সমস্ত আপারওয়র্ক হ্যাচের পিছন দিকে।'

'আপনার চোখ আমার চেয়ে ভাল,' বলল কোহেন। 'আর কোন সন্দেহ নেই, ওটা ইমপেরিয়ালই।'

গ্যালিতে নেমে এল কোহেন। কাওয়াশ তার গ্রুপের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছে। কথা শেষ না করেই ঘাড় ফিরিয়ে কোহেনের দিকে তাকাল সে। মাথা ঝাঁকাল কোহেন, 'না, আমার ভুল হয়নি। দিস ইজ ইট।'

নিজের লোকদের দিকে ফিরল কাওয়াশ। 'খুব একটা বাধা আশা করি না আমরা। ক্রু হিসেবে সাধারণ নাবিকরা আছে ওতে, তাদের কারও কাছে আর্মস থাকার কথা নয়। দুটো বোটে করে যাব আমরা, একটা হামলা চালাবে পোর্ট সাইডে, আরেকটা স্টারবোর্ড সাইডে। জাহাজে ওঠার পর আমাদের প্রথম কাজ হবে ব্রিজটা দখল করা, আর ক্রুরা যেন রেডিও ব্যবহার করতে না পারে সেদিকে নজর দেয়া। এরপর ক্রুদেরকে আমরা ডেকে নিয়ে এসে ঘিরে ফেলব।' কোহেনের দিকে ফিরল সে। 'ইমপেরিয়ালের যতটা সম্ভব কাছে গিয়ে এঞ্জিন বন্ধ করতে বলো ক্যাপ্টেনকে।'

গ্যালি থেকে বেরিয়ে এল কোহেন। ব্রিজে উঠে মেসেজটা দিল ক্যাপ্টেনকে। তারপর আবার নেমে এল ডেকে। ইতোমধ্যে কালো হয়ে উঠেছে রাত। কিছুক্ষণ ইমপেরিয়ালের নিঃসঙ্গ আলোটাকে ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। তারপর জাহাজের কাঠামোটা আবছা ভাবে ধরা পড়ল চোখে।

গ্যালি থেকে বেরিয়ে এল গেরিলারা, কারও মুখে কথা নেই, ক্রুদের সাথে ডেকে দাঁড়াল তারা। সী-উইচের এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। সাগরে বোট নামাল ক্রুরা। গেরিলারা নামতে শুরু করল।

কাওয়াশের সাথে একই বোটে চড়ল কোহেন। ঢেউয়ের মাথায় নাচছে ছোট বোটটা। সামনে যুদ্ধ, কোহেনের মন দখল করে আছে সেটা, ডুবে মরার ভয় তাকে কাবু করতে পারল না। ইমপেরিয়ালের খাড়া দিকে পৌঁছল বোট। জাহাজে ক্রুদের কোন তৎপরতা চোখে পড়ল না। দুটো এঞ্জিনের আওয়াজ, ডিউটি অফিসারদের তো শুনতে না পাবার কোন কারণ নেই! তাহলে? ব্রিজ থেকে কেউ উঁকি দিচ্ছে না, ডেকের আলো জ্বলছে না, কারও কোন আওয়াজ নেই—ব্যাপারটা কি? মন খুঁত খুঁত করতে লাগল কোহেনের।

মই বেয়ে প্রথমে উঠে গেল কাওয়াশ। কোহেন ডেকে উঠে দেখল, স্টারবোর্ডের দিকে গানেল টপকে টপাটপ ডেকে নামতে শুরু করেছে গেরিলারা। একদল নেমে গেল কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে, আরেকদল উঠে গেল মই বেয়ে ওপর দিকে। অথচ এখনও দেখা নেই ক্রুদের। কোহেন বুঝল, কোথাও মারাত্মক কিছু একটা গোলমাল হয়েছে।

কাওয়াশকে অনুসরণ করে ব্রিজে উঠে এল কোহেন। দু'জন লোক আগেই পৌঁচেছে এখানে। কোহেন জানতে চাইল, 'ক্রুরা কেউ রেডিও ব্যবহার করার সময় পেয়েছে?'

'কোথায় তারা? কেউ আছে?'

আবার ডেকে নেমে এল ওরা। জাহাজের খোল থেকে একজন দু'জন করে উঠে এল লোকজন। চেহারায় বিমূঢ় ভাব, আগ্নেয়াস্ত্র ধরা হাত ঝুলে আছে শরীরের পাশে।

'এখন কি, কোহেন? আমরা কি তবে নিজেরাই মারামারি করব?'

কথাটা কোহেন শুনতেই পেল না। ডেকের ওপর দিয়ে দু'জন গেরিলা এগিয়ে আসছে, তাদের মাঝখানে একজন বন্দী। চেহারা দেখে মনে হলো, নাবিক।

'এখানে ঘটেছেটা কি?' জিজ্ঞেস করল কোহেন।

বন্দী নাবিক উত্তর একটা দিল বটে, কিন্তু কেউ সেটার অর্থ করতে পারল না—এই ভাষা ওদের কারও জানা নেই।

হঠাৎ একটা আতঙ্ক অনুভব করল কোহেন। 'চলো, হোল্ড চেক করতে হবে।'

কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে নিচে নেমে এসে হোল্ডে ঢোকার পথ পেয়ে গেল ওরা। বোতাম টিপে আলো জ্বালল কোহেন। ইউরাটমের কম্পিউটর প্রিন্ট আউটে পরিষ্কার বর্ণনা দেয়া ছিল, কিসের ভেতর থাকবে ইউরেনিয়াম, ড্রামগুলো কি রকম

দেখতে হবে, তার গায়ে কি লেখা থাকবে ইত্যাদি। দেখলেই চিনতে পারবে কোহেন।

বড় আকারের অয়েল ড্রামে হোল্ড ঠাসা। ঢাকনিগুলো সীল করা, কাঠের ঠেক দিয়ে স্থির রাখা হয়েছে। 'পেয়েছি!' উল্লাসে লাফিয়ে উঠল কোহেন। 'আমরা ইউরেনিয়াম পেয়েছি!'

পিছন থেকে তার কাঁধ চাপড়ে দিল কাওয়াশ।

সন্ধে হয়ে আসছে, এই সময় তারপুলিনের ফুটোয় চোখ রেখে হিলারী দেখল, ব্রিজ থেকে নেমে এসে ফরওয়ার্ডের দিকে গেল আব্বাস। বোতাম টিপে সাদা আলোটা জ্বেলে ব্রিজে আর ফিরল না, আরও একটু এগিয়ে গিয়ে ঢুকল গ্যালিতে। তার মানে কিছু খাবে। কথাটা মনে হতেই নিজের খিদেটাও চেগিয়ে উঠল হিলারীর। এখন একপ্লেট মাছ আর গোটা একটা ব্রাউন রুটির বিনিময়ে একটা হাত পর্যন্ত খোয়াতে রাজি আছে সে। কিন্তু না, খিদেটাকে এখন প্রশ্রয় দেয়া চলবে না। আগে রিপোর্ট করতে হবে রিচিকে।

আব্বাস চোখের আড়াল হতেই লাইফবোটের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল হিলারী। ব্যথায় টন টন করছে শরীর। শরীরের আর দোষ কি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেকায়দা অবস্থায় পড়ে থাকতে হলে আর কি আশা করা যায়। শরীরটা দুমড়েমুচড়ে আড়মোড়া ভেঙে, রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে নিতে চেষ্টা করল সে। তারপর এগোল ফরওয়ার্ড স্টোরের দিকে।

কাঠের বাক্স আর লোহা-লক্কড় দিয়ে ছোট ঘরে ঢোকার দরজাটা আড়াল করা আছে। মেইন স্টোর থেকে নিজের রেডিওরুমে ঢুকতে হলে খানিকটা কসরৎ করতে হবে হিলারীকে। মেঝের ওপর হামাগুড়ি দেবার ভঙ্গিতে নিচু হলো সে, একটা বাক্স সরিয়ে ফাঁক তৈরি করল, তারপর ক্রল করে পেরিয়ে এল সুড়ঙটা।

ছোট দু'অক্ষরের একটা সিগন্যাল রিপিট করছে সেটা। কোডবুক দেখে সিগন্যালের অর্থ বের করল হিলারী—সাড়া না দিয়ে আরেক ওয়েভলেংথে সুইচ অন করতে বলা হচ্ছে তাকে। ট্র্যান্সমিটের জন্যে রেডিও সেট করে নিয়ম পালন করল সে।

সাথে সাথে উত্তর দিল রিচি—চেঞ্জ অভ প্ল্যান। কোহেন উইল অ্যাটাক ইমপেরিয়াল।

হতভম্ব দেখাল হিলারীকে। কোহেন আক্রমণ করবে!—ব্যাপার কি?' সিগন্যাল পাঠাল—রিপিট প্লীজ।

উত্তর এল—কোহেন ইজ এ ট্রেটর। ইসরায়েলীস উইল অ্যাটাক ইমপেরিয়াল।

ফিসফিস করে উঠল হিলারী, 'জেসাস, এসব কি ঘটছে!' মাঝ-সাগরে অচল অবস্থায় ভাসছে ইমপেরিয়াল, সে রয়েছে এখানে··· কোহেনই বা কেন···ও, ইউরেনিয়ামের লোভে···শালা!

রিচি সিগন্যাল পাঠিয়ে চলেছে—কোহেন প্ল্যানস টু অ্যামবুশ রানা। ফর আওয়ার প্ল্যান টু প্রসিড উই মাস্ট ওয়ার্ন রানা অভ দি অ্যামবুশ। (রানাকে সাবধান

করতে হবে আমাদের।)

ডিকোড করার সময় ভুরু কুঁচকে উঠল হিলারীর, তবে এর অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পারার সাথে সাথে সমান হয়ে গেল ভুরু। ভাবল, কিন্তু আমার কি হবে?

তারপর জানতে চাইল—হাউ?

—ইউ উইল কল অরিয়ন অন ইমপেরিয়াল'স রেগুলার ওয়েভলেংথ অ্যান্ড সেন্ড ফলোয়িং মেসেজ প্রিসাইজলি রিপিট প্রিসাইজলি। কোট ইমপেরিয়াল টু অরিয়ন আই য়্যাম বোর্ডেড, ইসরায়েলী আই থিঙ্ক। ওয়াচ। আনকোট। (তুমি ওরিয়নকে ডেকে বলবে: 'আক্রান্ত হয়েছি—সম্ভবত ইসরায়েলী' সাবধান!)

মাথা ঝাঁকাল হিলারী। রানা ধরে নেবে, ইসরায়েলীরা খুন করার আগের মুহূর্তে তাড়াহুড়ো করে এই মেসেজটা পাঠাতে পেরেছে আব্বাস। আগে থেকে সাবধান হবার সুযোগ পেয়ে ইমপেরিয়ালকে দখল করতে পারবে রানা। তারপর রিচির হোয়াইট রোজ, আগের প্ল্যান মত, রানার জাহাজের সাথে ধাক্কা খেতে পারবে। হিলারী ভাবল, কিন্তু আমার কি হবে?

জানাল—আন্ডারস্টুড।

পরমুহূর্তে ভারী একটা আওয়াজ পেল হিলারী, মনে হলো, কি যেন ধাক্কা খেলো জাহাজের গায়ে। প্রথমে ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিল না সে, কিন্তু তারপরই মনে পড়ে গেল, জাহাজে ওরা মাত্র দু'জন। মেইন-স্টোরের দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিল সে।

পৌঁছে গেছে ইসরায়েলীরা।

দরজা বন্ধ করে ছুটে রেডিও সেটের কাছে ফেরত এল হিলারী। সিগন্যাল পাঠাল—কোহেন ইজ হিয়ার। (এসে গেছে কোহেন)

রিচি জানাল—সিগন্যাল রানা নাউ। (এখুনি সিগন্যাল দাও রানাকে।)

—হোয়াট ডু আই ডু দেন? (তারপর আমি কি করছি?)

—হাইড। (লুকাও।)

শালার ভাগ্য! বিড়বিড় করতে করতে কাজে হাত লাগাল হিলারী। রেগুলার ওয়েভলেংথে সেট অ্যাডজাস্ট করে অরিয়নকে সিগন্যাল পাঠাতে শুরু করল। মাছ আর রুটির কথা মন থেকে মুছে ফেলল সে। প্রাণ বাঁচে কিনা সেটাই সন্দেহ।

'আর্মসের ভারে কুঁজো হয়ে আছ, লড়বে কিভাবে?' বলল রানা। সবাই ওরা হেসে উঠল।

ইমপেরিয়ালের মেসেজ ওর মন-মেজাজ বদলে দিয়েছে। প্রথমে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল ও। শত্রুরা ওর প্ল্যানের এত কিছু জানল কিভাবে যে ওর আগেই ইমপেরিয়ালকে হাইজ্যাক করে বসল? এর একটাই অর্থ হতে পারে, নিজে কোথাও সে মারাত্মক ধরনের ভুল করেছে। এষা···? থাক, আবার এসব নিয়ে মন খারাপ করার কোন মানে হয় না। সামনে একটা লড়াই রয়েছে।

মনের বিষণ্ণ ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে রানা। টেনশনটা আছে, কিন্তু সেটাকে এখন কাজে লাগাতে পারে ও। মেস রুমের বারো জন লোক রানার এই পরিবর্তন

টের পেল, যুদ্ধের উন্মাদনা রানার কাছ থেকে তাদের ভেতরও সংক্রমিত হতে দেরি হলো না। যদিও জানে তারা, যুদ্ধ শেষে সংখ্যায় তারা কমে যাবে। কেউ বলতে পারে না কে থাকবে আর কে মরবে।

আর্মসের ভারে কুঁজো হয়ে আছে, কথাটা একটুও বাড়িয়ে বলেনি রানা। প্রত্যেকের কাছে একটা করে উজি নাইন এম এম সাবমেশিনগান রয়েছে, পঁচিশ রাউন্ড ম্যাগাজিন ভরা অবস্থায় এক একটার ওজন নয় পাউন্ড। বাড়ানো মেটাল স্টক ধরে দু'ফিট এক ইঞ্চি লম্বা। প্রত্যেককে তিনটে করে স্পেয়ার ম্যাগাজিন দেয়া হয়েছে। প্রত্যেকের বেল্ট হোলস্টারে রয়েছে একটা করে নাইন এম এম ল্যুগার, মেশিনগানের কার্ট্রিজ দিয়েই এর কাজ চলবে। বেল্টের আরেক দিকে ঝুলছে চারটে করে গ্রেনেড। এসব ছাড়াও যে-যার ব্যক্তিগত পছন্দমত ছুরি, বেয়োনেট, ব্ল্যাকজ্যাক, নাকল-ডাস্টার কিংবা আর কিছু সাথে রেখেছে। এগুলো কাজে লাগবে বলে রাখেনি, এর পিছনে শখটাই বড়। কারও কারও কাছে আবার এগুলো গুড লাকের প্রতীক। মোবারকের ছুরি যেমন, এই ছুরি সাথে থাকলে তার গায়ে নাকি আঁচড়টিও দিতে পারবে না কেউ।

ওদের মেজাজের এই অবস্থা উপলব্ধি করতে পারে রানা। জানে, ওর প্রভাব পড়েছে ওদের ওপর। কোন লড়াইয়ের ঠিক আগে অদ্ভুত এক উন্মাদনা সমস্ত অনুভূতি আর বোধকে তীক্ষ্ণ করে তোলে। সামান্য একটা কথায় অট্টহাসি বেরিয়ে আসে, যাকে দেখে চিরকাল ঈর্ষা হয়েছে তারই স্বার্থে আত্মত্যাগের জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে মন। আবার একই সাথে ভয়ও লাগে। আর এই ভয় থেকেই যুদ্ধ শুরু করার জন্যে ব্যগ্র হয়ে ওঠে মন।

হামলার প্ল্যান নিজেই তৈরি করেছে রানা, ওদেরকে বুঝিয়েও দিয়েছে ভাল করে। ইমপেরিয়ালের ডিজাইন মিনিয়েচার ট্যাংকারের মত। জাহাজের সামনে আর মাঝখানে হোল্ড, আফটারডেকে মেইন সুপারস্ট্রাকচার, আরও একটা সুপারস্ট্রাকচার পিছন দিকে। মেইন সুপারস্ট্রাকচারে রয়েছে ব্রিজ, অফিসার্স কোয়ার্টার, আর মেস। এর নিচে ক্রুদের কোয়ার্টার। পিছনের সুপারস্ট্রাকচারে রয়েছে গ্যালি, তার নিচে স্টোর, তার নিচে এঞ্জিন রুম। ওপর দিকে দুটো সুপারস্ট্রাকচারকে আলাদা করে রেখেছে ডেক, কিন্তু নিচে দুটোর মাঝখানে গ্যাংওয়ে আছে।

তিন দলে ভাগ হয়ে ইমপেরিয়ালে চড়বে ওরা। ইয়াকুব হামলা চালাবে বো-র দিক থেকে, বাকি দুটো দল নিয়ে স্টার্নের পোর্ট আর স্টারবোর্ডের দিকে থাকবে মুস্তাফা আর ওয়াকিল।

পিছনের টীম দুটোকে বলে দেয়া হয়েছে, জাহাজে চড়েই নিচে নেমে যাবে তারা, সেখান থেকে পথ করে এগোবে সামনের দিকে। আর জাহাজের প্রাউ থেকে এগোবে আব্বাস। জাহাজের মাঝখানে শত্রুদেরকে কোণঠাসা করার লক্ষ্যে এই প্ল্যান করা হয়েছে। এই প্ল্যানের অসুবিধে হলো, ব্রিজ থেকে ওদের ওপর হামলা চালানো হলে সেটাকে বাধা দেবার উপায় নেই। কাজেই ব্রিজের ওপর নজর রাখার দায়িত্ব নিয়েছে রানা।

হামলা চালানো হবে রাতের অন্ধকারে, তা না হলে ইমপেরিয়ালে চড়তেই পারবে না ওরা। রেইল টপকে জাহাজের ডেকে নামার আগেই ইসরায়েলীরা পাখি শিকারের মত মেরে সাফ করে দেবে সবাইকে। ডেকে অন্ধকার থাকতেও পারে, নাও পারে। তবু নিজেদের মধ্যে গোলাগুলি এড়াবার জন্যে একটা রিকগনিশন সিগন্যালের ব্যবস্থা করা হলো। আল্লাহু আকবার। যদিও, প্ল্যানটা এমনভাবে তৈরি করেছে রানা, একেবারে শেষ পর্যায়ে ছাড়া তিন দলের কারও সাথে কারও দেখা হওয়ার সম্ভাবনা কম।

এখন শুধু অপেক্ষার পালা।

অরিয়নের গ্যালিতে একটা বৃত্ত রচনা করে বসে আছে ওরা, ইমপেরিয়ালের গ্যালির সাথে এর কোন পার্থক্য নেই। এই গ্যালিতে দাঁড়িয়েই খানিক পর যুদ্ধ করবে ওরা, মারবে, মারা যাবে।

ইয়াকুবের সাথে কথা বলছে রানা, 'বো থেকে ফোরডেকটা কন্ট্রোল করবে তুমি। প্রথমে নিজের লোকদের আড়ালে নিয়ে যাবে, তারপর ছুঁড়বে প্রথম গুলি। ডেকের শত্রুরা নিজেদের পজিশন জানালে, এক এক করে মারবে ওদের। তোমাদের আসল সমস্যা হবে ব্রিজ থেকে ছুটে আসা বুলেট থেকে গা বাঁচানো।'

চেয়ারে বসে পা দুটো সামনে মেলে দিয়েছে ইয়াকুব, আসলেই নিরেট ট্যাংকের মত লাগছে ওকে দেখতে। 'প্রথমেই তাহলে গুলি করতে পারব না?'

'না,' বলল রানা। 'তা করলে বাকি আমরা যারা জাহাজে চড়তে তখনও পিছিয়ে থাকব, তাদের অসুবিধে হবে।'

'বুঝেছি,' বলল ইয়াকুব। 'আচ্ছা, রহমানকে আমার দলে দিলে কেন? তুমি জানো, ও আমার দুলাভাই।'

'হ্যাঁ। এ-ও জানি, সে-ই আমাদের মধ্যে একমাত্র বিবাহিত। ভাবলাম, তুমি হয়তো ওর ওপর নজর রাখতে চাইবে।'

'ধন্যবাদ।'

ছুরি পরিষ্কার করছিল মোবারক, মুখ তুলে তাকাল রানার দিকে। দেঁতো হাসি দেখা গেল তার মুখে। 'এই ব্যাটা ইহুদিদের সম্পর্কে কি ধারণা তোমার, রানা?'

'ইসরায়েল সেনাবাহিনীর লোক বলে মনে করি না,' মাথা নাড়ল রানা। 'ভাড়াটে সৈন্য হলেও আশ্চর্য হব না আমি।'

'ভাড়াটে? তাহলে তো আমাদের লড়তেই হবে না। আমরা মুখ-ভেঙচালেই সারেন্ডার করবে ওরা।'

বাজে একটা রসিকতা, কিন্তু তবু হাসল সবাই।

এদের মধ্যে জহির হলো সবচেয়ে আশাবাদী, বলল, 'রেইল টপকে জাহাজে নামা, এটাই সবচেয়ে খারাপ দিক। নিজেদের একেবারে ন্যাংটো লাগবে।'

রানা বলল, 'ওরা জানে, আমরা সম্পূর্ণ খালি একটা জাহাজে উঠব বলে আশা করছি। ওদের অ্যামবুশ দেখে হতভম্ব হয়ে পড়ার কথা আমাদের। ওরা আশা করছে, পানির মত সহজে জিতে যাবে—কিন্তু আমরা তৈরি হয়ে যাচ্ছি। তাছাড়া, তখন অন্ধকার থাকবে…'

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ক্যাপ্টেন। 'ইমপেরিয়ালকে দেখা গেছে।'

উঠে দাঁড়াল রানা। 'লেট'স গো। মনে রেখো, আমরা কাউকে বন্দী করব না। গুডলাক।'

এগারো

ভোরের আলো ফুটতে খুব বেশি দেরি নেই, অরিয়নকে ছেড়ে রওনা হলো তিনটে বোট।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ওদের পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল জাহাজটা। নেভিগেশন লাইট নিভিয়ে রাখা হয়েছে, ডেক আর কেবিন ল্যাম্পে শেড পরানো হয়েছে, আলো দেখে সাবধান হবে কোহেন তার উপায় রাখেনি ওরা।

মাঝরাত থেকে আরও খারাপ হয়েছে আবহাওয়া। অরিয়নের ক্যাপ্টেন জানিয়েছে, এখনও এতটা খারাপ নয় যে ঝড় বলা যাবে, কিন্তু আকাশ থেকে যেটা নেমে আসছে সেটাকে আর বৃষ্টি বলা চলে না, জলপ্রপাত বলাই ভাল। ঝড় নয়, তবে ডেকের ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছে ইস্পাতের বালতি। ঢেউগুলো দুই মানুষ সমান উঁচু, বোটের কিনারায় বসে থাকতে সাহস হলো না রানার, নিচে নেমে বেঞ্চের ওপর শক্ত হয়ে বসতে বাধ্য হলো।

মোটরবোটের ভেতর গাঢ় অন্ধকার, কেউ ওরা কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। যুক্তি দিয়ে নিজের কাজগুলোর বিচার করতে চেষ্টা করল রানা। এই অ্যাসাইনমেন্টে নিয়মের বাইরেও দু'একবার পা ফেলেছে সে। যেমন, এষার সাথে তার ওই ব্যাপারটা। জড়ানোই উচিত হয়নি তার। এই ভেবে ত্রুটিটাকে খাটো করে দেখার চেষ্টা করল, এষা বেঈমানী করবে তা তো সে আগে বোঝেনি। কিন্তু এই অজুহাত ধোপে টেকে না, তাও বুঝল। যুক্তিতে হেরে গেল ঠিক, কিন্তু মনটা তবু হার মানতে চায় না।

যা ঘটে গেছে, গেছে। ভুলে যাবার চেষ্টা করল সব। তিনটে জিনিস চায় এখন ও। সামনে এই যে লড়াই, এতে জিততে চায়। মিশরের হাতে ইউরেনিয়াম তুলে দিতে চায়। আর চায় কোহেনকে।

অয়েলস্কিনের নিচে মেশিনগানটা একহাত দিয়ে চেপে ধরল রানা।

একটা ঢেউয়ের মাথায় উঠল বোট, সামনে দেখা গেল আরও দুটো ঢেউ, ধীরে ধীরে মাথাচাড়া দিয়ে ফুলে ফেঁপে উঠছে—তারপরই ঘন কালো একটা কাঠামো, সেটার ওপর শুকতারার মত জ্বলজ্বল করছে সাদা নেভিগেশন লাইট।

যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে গেছে ওরা।

নেভিগেশন লাইটের চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল আলোয় বোট থেকে জাহাজের রেলিংটা ভাল দেখা গেল না। হুইলে রয়েছে রাহমান, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে

জাহাজের বো-র যতটা সম্ভব কাছে বোট নিয়ে এল সে। জাহাজের খোল বাইরের দিকে কাত হয়ে থাকায় এখন আর রেলিং থেকে উঁকি দিলেও কেউ ওদেরকে দেখতে পাবে না। অয়েলস্কিনের নিচে, কোমরে একটা রশি জড়াল ইয়াকুব, এক সেকেন্ড ইতস্তত করে খুলে ফেলল অয়েলস্কিন, বগলের নিচে থেকে মেশিনগান বের করে ঝুলিয়ে নিল গলায়। একটা পা রাখল বোটে, আরেকটা বোটের গানেলে, তারপর জাহাজের সিঁড়ি নাগালের মধ্যে চলে এসেছে মনে হতেই লাফ দিল।

চার হাত-পা দিয়ে লোহার সিঁড়ির ওপর পড়ল ইয়াকুব। কোমরের রশি খুলে সিঁড়ির সাথে শক্ত করে বাঁধল সেটা। তারপর সিঁড়ি বেয়ে জাহাজের প্রায় রেলিং পর্যন্ত উঠে এল, কিন্তু মাথা তুলে ডেকে উঁকি দিল না। ডেকে ওরা একসাথে নামার চেষ্টা করবে।

নিচে তাকাল ইয়াকুব। আলেফ আর হামজা এরই মধ্যে সিঁড়িতে চলে এসেছে। ওরা একটু ওপরে উঠতেই বোট থেকে লাফ দিল রাহমান, দুলাভাই। লাফ দেবার ভঙ্গিটাই ছিল আড়ষ্ট, সিঁড়িটাকে ধরতে গিয়েও পারল না। বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল ইয়াকুবের।

সিঁড়ি ধরতে পারেনি, কিন্তু হামজার একটা পা ঠিকই ধরেছে রাহমান। তীব্র একটা ঝাঁকি খেলো হামজা, কিন্তু গোল রড দিয়ে তৈরি ধাপ ছাড়ল না। ঠাণ্ডা ঘাম দেখা দিল ইয়াকুবের কপালে। একটুর জন্যে বেঁচে গেছে দুলাভাই।

আরও একটু অপেক্ষা করল ইয়াকুব। রাহমান হামজার পাশে চলে আসতে মাথা তুলল রেলিঙের ওপর। সেই সাথে লাফ দিয়ে সেটা টপকে পড়ল জাহাজের ডেকে। দুই হাঁটু আর দুই কনুই দিয়ে পড়ল সে, গানেলের পাশে ঘাপটি দিয়ে পড়ে থাকল। বাকি তিনজন টপ টপ করে নেমে এল ওর পাশে। ওদের ঠিক মাথার ওপর সাদা আলো। সাদা চাদরের ওপর চারটে মাছির মত লাগছে ওদেরকে।

চারদিকে তাকাল ইয়াকুব। ওদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষীণকায় আলেফ, সাপের মত নিঃশব্দে চলাফেরা করতে পারে সে। তার কাঁধ ছুঁয়ে ইঙ্গিতে ডেকের একটা দিক দেখাল সে। 'পোর্টসাইডে কাভার নাও।'

হামাগুড়ি দিয়ে দু'গজ খোলা ডেক পেরিয়ে এল আলেফ, ফরওয়ার্ড হ্যাচের উঁচু কিনারা খানিকটা আড়াল দিল ওকে। এখান থেকে ক্রল করে সামনের দিকে এগোল সে।

ডেকের দু'দিকে তাকাল ইয়াকুব। যে-কোন মুহূর্তে শত্রুদের চোখে পড়ে যেতে পারে ওরা। কিছুই জানতে পারবে না, তার আগেই ঝাঁঝরা হয়ে যাবে শরীর। জলদি, জলদি! জাহাজের গলুইয়ের কাছে নোঙর টেনে তোলার ওয়াইন্ডিং গিয়্যার, পাশেই চেইনের একটা পাহাড়! 'হামজা,' ইঙ্গিতে সেদিকটা দেখাল ইয়াকুব। ডেকের ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল হামজা।

'ক্রেনে উঠতে পারলে মন্দ হত না। তুমি কি বলো, শ্যালক?' পাশ থেকে ফিসফিস করে জানতে চাইল রাহমান।

ওদের মাথার ওপর টাওয়ারের মত উঁচু হয়ে আছে ডেরিক, ওখান থেকে গোটা ফোরডেকের ওপর নজর রাখা যায়। ডেক লেভেল থেকে কন্ট্রোল কেবিনটা ফুট

দশেক ওপরে। পজিশন হিসেবে জায়গাটা ডেঞ্জারাস, কিন্তু ওখান থেকে অনেক সুবিধেও পাওয়া যাবে।

'ঠিক আছে, যেতে পারো, বোন-জামাই।' বলল ইয়াকুব। 'কিন্তু মরতে পারবে না। বিধবা বোনের দেখ-ভাল্ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'বিয়ে দিয়ে দিয়ো, ল্যাঠা চুকে যাবে,' বলে ক্রল করতে শুরু করল রাহমান। তার নিষ্ঠুর চেহারায় লেগেই আছে হাসিটা।

লোহার সিঁড়ি বেয়ে কন্ট্রোল কেবিনের দিকে উঠতে শুরু করল রাহমান। দম আটকে তাকিয়ে আছে ইয়াকুব। এখন যদি কেউ দেখে ফেলে…! কিন্তু কিছুই ঘটল না, নিরাপদেই কেবিনে গিয়ে ঢুকল রাহমান।

ইয়াকুবের পিছনে, জাহাজের প্রাউতে একটা কম্প্যানিয়ন হেড দেখা গেল, তিন চারটে ধাপ নেমে এসে থেমেছে একটা দরজার সামনে। জায়গাটা এতই ছোট যে ওটাকে ফোকাসল বলা চলে না। ওদিকে যে অ্যাকোমডেশনের ব্যবস্থা নেই, দেখেই বোঝা যায়। দরজাটা বোধহয় ফরওয়ার্ডের একটা স্টোর। হামাগুড়ি দিয়ে সেদিকে এগোল সে। ধাপ ক'টা টপকে নেমে এল নিচে। দরজার গায়ে একটু চাপ দিতেই খুলে গেল কবাট। ভেতরে অন্ধকার। দরজা আবার বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল সে। সিঁড়ির মাথায় মেশিনগান ঠেকিয়ে তৈরি হলো।

অরিয়নে থাকতেই ব্যাপারটা ফয়সালা হয়ে গেছে। টীম লীডার ওয়াকিল, তার কথা হলো, টীম লীডারই সবার আগে থাকবে। তর্কে তার সাথে হেরে গেছে রানা।

ইমপেরিয়ালের পিছন দিকে আলো নেই, তার ওপর ঝম ঝম বৃষ্টি, স্লোট থেকে জাহাজের লোহার সিঁড়িতে ওঠার সময় খুব কষ্ট হলো ওদের। তবে কোন বিপদ ঘটল না। সিঁড়ির মাথার কাছে রয়েছে ওয়াকিল, সবার আগে। তার নিচে রানা, তারপর মোবারক, গাফফার আর সুলতান। জাহাজের কিনারা দিয়ে উঁকি দিল ওয়াকিল, এক সেকেন্ড ইতস্তত করল সে, তারপর রেইল টপকাবার জন্যে লাফ দিল।

কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা, দূর দিগন্তে ভোরের প্রথম আলোর আভাস দেখল ও।

আচমকা ভোরের নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান করে দিল মেশিনগানের প্রচণ্ড গর্জন। সেই সাথে শোনা গেল একটা আর্তচিৎকার। ঝট করে আবার ওপর দিকে তাকাল রানা। রেলিং থেকে পিছন দিকে পড়ে যাচ্ছে ওয়াকিল। মাথার চ্যাপ্টা ক্যাপটা ছিনিয়ে নিল বাতাস। চোখে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ায় এক সেকেন্ড কিছুই দেখতে পেল না রানা। তারপর আবার যখন দৃষ্টি ফিরে পেল, ওর পাশ দিয়ে নেমে যেতে দেখল ওয়াকিলকে। ঝপাৎ করে আওয়াজ হলো। নিচে তাকাল রানা, ওয়াকিল নেই।

এক এক করে মোবারক, গাফফার আর সুলতানের দিকে তাকাল রানা। ওদের উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে শত্রুরা। এই মুহূর্তে জাহাজের কিনারা টপকে ডেকে নামা মানে সোজা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা। কিন্তু এখানে অপেক্ষা করার

মানেও যে মৃত্যু, সবাই জানে তা ওরা।

আচমকা চিৎকার করে বলল রানা, 'চলো!' বেল্ট থেকে একটা গ্রেনেড আগেই তার হাতে চলে এসেছে। দাঁত দিয়ে পিন খুলে জাহাজের কিনারা দিয়ে ছুঁড়ে দিল ডেকে। সেই সাথে দ্রুত ক'টা ধাপ টপকে এসে লাফ দিল। রেলিং টপকে এল সে, ডেকে পড়ার আগেই সাব-মেশিনগান থেকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছে ও।

সিঁড়ি থেকে ওরা তিনজন গুলির আওয়াজ শুনে বুঝল, ওদের জন্যে কাভারিং ফায়ার চালিয়ে যাচ্ছে রানা। জাহাজের কিনারা থেকে গ্রেনেড ছুঁড়ে দিল মোবারক, ফুট ত্রিশেক দূরে, তারপর রেলিং টপকে গেল। তাকে অনুসরণ করল গাফফার আর সুলতান।

চারদিক থেকে অটোমেটিক কারবাইনের আওয়াজ আসছে। ওয়াকিল বাদে টীমের সবাই ডেকে নেমেছে। ওদের সবার হাতে ঝলসে উঠল সাব-মেশিনগান। চিৎকার করে জানতে চাইল মোবারক, 'কোথায় ওরা?'

উত্তর দেবার জন্যে এক সেকেন্ড গুলি চালানো বন্ধ রাখল রানা। 'গ্যালিতে।' হাত তুলে পাশের বাল্কহেডটা দেখিয়ে দিল সে। 'লাইফবোটে, আর অ্যামিডশিপে।'

'আমি যাই!'

'না!' বাধা দিল রানা। 'মুস্তাফা গ্রুপ ডেকে না আসা পর্যন্ত এখানেই থাকব আমরা। ওদের গুলি শুনলেই ছুটে যেয়ো। গাফফার আর সুলতান, গ্যালির দরজায় হামলা চালাও, তারপর নিচে নেমে যাও। মোবারক, ওদেরকে কাভার দাও, তারপর ডেকের এদিকের কিনারা ধরে সামনের দিকে এগোও। এক নম্বর লাইফবোটের দিকে যাব আমি। আর সুযোগ করে নিয়ে শালাদের এমন কিছু দাও, মুস্তাফা গ্রুপ আর পোর্ট সাইডের মই থেকে যেন চোখ ফিরিয়ে রাখে ওরা। ইচ্ছেমত গুলি চালাও।'

বন্দী নাবিকের ওপর টরচার করছিল ওরা, এই সময় গোলাগুলি শুরু হলো।

ব্রিজের পিছনে, চার্টরুমে রয়েছে ওরা, নাবিক জার্মান ভাষাও জানে, কোহেনও জানে এক-আধটু। নাবিকের গল্পটা এই রকম—ইমপেরিয়ালের এঞ্জিন নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মালিকের আরেক জাহাজ এসে সমস্ত ক্রু আর অফিসারদের নিয়ে গেছে, তাকে থাকতে হয়েছে স্পেয়ার পার্টস এসে পৌঁছলে সেটা ফিট করতে হবে বলে। ইউরেনিয়াম, হাইজ্যাক বা মাসুদ রানা—এসব বিষয়ে কিছুই সে জানে না। কোহেন তার একটা কথাও বিশ্বাস করল না। তার ধারণা, এঞ্জিন নষ্ট হবার পিছনে রানার হাত আছে, আর তাই যদি থাকে, জাহাজে অন্তত একজন লোককে রাখবে সে, সে-ই লোক এই নাবিক ছাড়া আর কেউ নয়। কাওয়াশকে তার ধারণার কথা জানাল কোহেন। নাবিকের কাছ থেকে আসল কথা বের করার জন্যে কাওয়াশ এক এক করে আঙুল কাটতে শুরু করল তার।

প্রথমবার মাত্র দু'তিনটে গুলি হলো, তারপরই শুরু হলো একনাগাড় বর্ষণ।

বেল্ট থেকে ছুরি বের করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল কাওয়াশ। সিঁড়িটা চার্টরুম থেকে অফিসার্স কোয়ার্টারের দিকে নেমে গেছে।

পরিস্থিতিটা বুঝতে চেষ্টা করল কোহেন। তিন জায়গায় পজিশন নিয়ে আছে গেরিলারা···লাইফবোট, গ্যালি আর মেইন অ্যামিডশিপস সুপারস্ট্রাকচারে। এখানে যেখানে রয়েছে ও, সেখান থেকে ডেকের পোর্ট আর স্টারবোর্ড সাইড দেখতে পাওয়া যায়। এখান থেকে সামনের দিকে, ব্রিজে গেলে, ফোরডেকটাও দেখা যাবে। মিশরীয়রা বেশিরভাগই জাহাজের পিছন দিক দিয়ে ওপরে উঠেছে, বোঝা গেল ওর ঠিক নিচে আর দু'দিকের লাইফবোট থেকে গেরিলারা পিছন দিকে গুলি করছে দেখে। গ্যালি থেকে একটা গুলিও করছে না কেউ, তার মানে, মিশরীয়রা এরই মধ্যে দখল করে নিয়েছে ওটা। মিশরীয়দের ওই দলটা নিচেও নেমেছে, কিন্তু সবাই নয়। ডেকে দু'জনকে রেখে গেছে তারা, পাহারা দেবার জন্যে। গুলির আওয়াজ আর আগুনের ফুলকি দেখে কোহেন বুঝল, ডেকের দু'দিকে পজিশন নিয়ে আছে তারা।

তার মানে, কাওয়াশের অ্যামবুশ ব্যর্থ হয়েছে। কথা ছিল, রেইল টপকাবার সাথে সাথে মিশরীয়দের খতম করা হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে ডেকে পৌঁছে আড়ালে সরে যেতে পেরেছে তারা, সেখান থেকে গেরিলাদের ওপর গুলি চালাচ্ছে। পরিস্থিতি গেরিলাদের অনুকূলে ছিল, কিন্তু এখন দু'দলের অবস্থাই সমান।

ডেকে দু'দলের অবস্থাই ভাল। নিরাপদ আড়াল থেকে এক দল আরেক দলকে লক্ষ্য করে গুলি করছে। কোহেন ধারণা করল এই উদ্দেশ্যই ছিল মিশরীয়দের—ডেকে গেরিলাদের ব্যস্ত রাখা, সেই সুযোগে নিজেদের আরেক গ্রুপকে নির্বিঘ্নে নিচে পৌঁছতে দেয়া। বোঝাই যায়, গেরিলাদের সবচেয়ে শক্ত ঘাঁটি, অ্যামিডশিপ সুপারস্ট্রাকচারে, নিচ থেকে হামলা চালাবে ওরা।

সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা তাহলে কোন্‌টা? এটাই, যেখানে রয়েছে সে। এখানে তার কাছে পৌঁছতে হলে বিটুইন-ডেকের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত যুদ্ধ করে এগোতে হবে মিশরীয়দের, তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হবে অফিসার্স কোয়ার্টারে, সেখান থেকে আবার সিঁড়ি ভেঙে উঠলে তবে ব্রিজ আর চার্টরুম। এই জায়গা দখল করা অত সহজ নয়।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সাথে কেঁপে উঠল চার্টরুম। ব্রিজের ভেতর কেউ গ্রেনেড ফেলেছে। উঁকি দিয়ে তাকাল কোহেন, তিনজন গেরিলার লাশ বাল্কহেডের গায়ে হেলান দিয়ে রয়েছে। ব্রিজের সমস্ত কাঁচ ভেঙে চুরমার। কোত্থেকে এল গ্রেনেড? আন্দাজ করতে অসুবিধে হলো না কোহেনের। নিশ্চয়ই ফোরডেক থেকে। তার মানে জাহাজের প্রাউয়ের দিকেও আরেকটা দল রয়েছে মিশরীয়দের। তার ধারণা যে মিথ্যে নয় সেটা প্রমাণ হয়ে গেল এক সেকেন্ড পরই—ফরওয়ার্ড ক্রেন থেকে গর্জে উঠল একটা গান।

মেঝে থেকে কারবাইন তুলে নিল কোহেন। ব্যারেলটা জানালার ফ্রেমে ঠেকিয়ে পাল্টা গুলি শুরু করল সে।

রাহমানের গ্রেনেডটাকে বাতাস কেটে উড়ে যেতে দেখল ইয়াকুব, কাঁচ ভেঙে ব্রিজের ভেতর গিয়ে ঢুকল সেটা। বাকি যে কাঁচ থাকল, বিস্ফোরণের আওয়াজে তাও ঝরে পড়ল নিচে। ওদিক থেকে একজোড়া কারবাইন গুলি চালাচ্ছিল, দুটোই স্তব্ধ হয়ে গেল। কিন্তু একটু পরই নতুন একটা কারবাইন থেকে আবার শুরু হলো গুলি। প্রথম এক মিনিট ইয়াকুব বুঝতেই পারল না, কাকে লক্ষ্য করে গুলি করা হচ্ছে। বুলেটগুলো ওর দিকে আসছে না। দু'দিকে তাকিয়ে আলেফ আর হামজাকে দেখল, দু'জনেই ব্রিজ লক্ষ্য করে গুলি করছে, কিন্তু ব্রিজ থেকে ছুটে আসা বুলেট ওদের দিকেও আসছে বলে মনে হলো না।

ক্রেনের দিকে তাকাল ইয়াকুব। হ্যাঁ, ব্রিজের লোকটা রাহমানকে লক্ষ্য করে গুলি করছে।

ব্রিজে যে-ই থাকুক, প্রফেশন্যাল যোদ্ধা নয় সে, আন্দাজের ওপর এলোপাতাড়ি গুলি চালাচ্ছে। কিন্তু তার পজিশনটা ভাল। অনেক উঁচুতে রয়েছে, ব্রিজের দেয়াল থেকে আড়াল দিচ্ছে। যতই আনাড়ী হোক, তার গুলিও কাউকে না কাউকে লাগবে। বেল্ট থেকে গ্রেনেড বের করে ছুঁড়ল ইয়াকুব, ব্রিজের কাছাকাছি গেল সেটা, কিন্তু ভেতরে ঢুকল না। ব্রিজের কাছে একমাত্র রাহমান রয়েছে, সেই পারে—কিন্তু চারবার চেষ্টা করে মাত্র একটা গ্রেনেড ব্রিজের ভেতর ফেলতে পেরেছে সে।

কয়েক রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে আবার ক্রেনের দিকে তাকাল ইয়াকুব। কন্ট্রোল কেবিন থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল রাহমান, একটা গড়ান দিল ছোট ল্যান্ডিঙে, দুই হাত দিয়ে বুক চেপে ধরেছে, তারপর কিনারা থেকে পড়তে শুরু করল নিচের ডেকে। আরও কয়েকটা বুলেট ঢুকল তার শরীরে।

মাথায় যেন আগুন ধরে গেল ইয়াকুবের। ফিরে গিয়ে বোনকে মুখ দেখাব কিভাবে?

ব্রিজ থেকে এখন আর গুলি হচ্ছে না। একটু পর আবার শুরু হলো। এবার আলেফকে লক্ষ্য করে। একমাত্র ওর আড়ালটা তেমন নিরাপদ নয়। একটা ক্যাপস্টোন আর গানেলের মাঝখানে ছোট একটু ফাঁক, তার ভেতর ঢুকে বসে আছে সে। ইয়াকুব আর হামজা, দু'জনেই ব্রিজের দিকে গুলি চালাতে শুরু করল। কিন্তু আলেফের চিৎকার শুনে দু'জনেই থেমে গিয়ে ঘাড় ফেরাল তার দিকে। মুখ থুবড়ে পড়ে আছে আলেফ, নড়ছে না।

পরিস্থিতি নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। কথা ছিল, ইয়াকুবের টীম ফোরডেক কন্ট্রোল করবে, কিন্তু কাজটা করছে ব্রিজের ওই লোকটা। সবার আগে ওর একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

আরেকটা গ্রেনেড ছুঁড়ল ইয়াকুব। পৌঁছল না। কিন্তু বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনতে পাবার আগেই ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে ক্রেনের গোড়ায় চলে এল সে, কানে বাজছে হামজার কাভারিং ফায়ারের আওয়াজ। ক্রেনের মই বেয়ে কয়েক ধাপ উঠল সে, তারপর ব্রিজের দিকে গুলি চালাতে শুরু করল। মইয়ের গায়ে একঝাঁক বুলেট এসে লাগল। তারই একটা ঢুকল ইয়াকুবের মাথায়। মই থেকে

খসে পড়ল সে। মারা গেছে আগেই।

ফরওয়ার্ড স্টোরের দরজা সামান্য একটু খুলে ফাঁকে চোখ রাখল হিলারী। আতঙ্কে বিকৃত হয়ে আছে তার চেহারা। ক্রেন থেকে একটা লাশকে ডেকের ওপর পড়তে দেখে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল সে। কেউ তার উপস্থিতি টের পেল না।

ফোরডেকের পরিস্থিতি বোঝার জন্যে একটা ফরওয়ার্ড কেবিনে ঢুকল রানা। চারটে কেবিনের প্রত্যেকটিতে একজন করে গেরিলা ছিল. গাফফার আর সুলতানের কাভারিং ফায়ারের সুযোগ নিয়ে কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে প্যাসেজে উঠে আসে ও। কয়েক পা ছুটে গিয়ে কাঁধের ধাক্কায় দরজা ভাঙতে হয়েছে ওকে। এক এক করে চারটে। ধাক্কা দেবার এক সেকেন্ড আগে গ্রেনেডের পিন খোলে ও, তারপর ভাঙা দরজার ভেতর সেটাকে গড়িয়ে দিয়ে ঝট করে সরে এসে দরজার পাশে, প্যাসেজের দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ায়। চারটে গ্রেনেড এভাবেই শেষ করেছে রানা।

ফোরডেকের অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গেল ও। ইয়াকুবের টীম ধ্বংস হয়ে গেছে, চারজনের মধ্যে মাত্র একজনকে গুলি করতে দেখা গেল। সামনে থেকে চোখ ফিরিয়ে পাশে তাকাল রানা, মোবারক এখনও জাহাজের পিছন দিকে আটকা পড়ে আছে, সামনে এগোবার সুযোগ পাচ্ছে না। যারা নিচে গেছে তাদেরও উঠে আসার কোন নাম নেই।

ফরওয়ার্ড কেবিনের নিচে মেস, সেখানে শক্ত একটা ঘাঁটি তৈরি করেছে ইসরায়েলীরা। ওখান থেকে ডেক আর বিটুইন-ডেকের মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে তারা। মেস দখল করতে হলে একই সময়ে সব দিক থেকে হামলা চালাতে হবে। কিন্তু তা করতে হলে ব্রিজ হাতে থাকা চাই।

একছুটে গ্যাংওয়ে ধরে ফিরে এল রানা, বেরিয়ে এল পিছনের দরজা দিয়ে। বৃষ্টির কোন বিরাম নেই, তবে মাথার ওপর আকাশে ক্ষীণ আলো ফুটেছে। একদিকে মোবারক, আরেক দিকে সুলতানকে অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল ও। কয়েকবার ওদের নাম ধরে ডাকল, কিন্তু দু'জনের কেউই শুনতে পেল না। দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে ওদের মাথার ওপর দিয়ে ফাঁকা গুলি চালাতে হলো। তাকাল ওরা, হাত-ইশারায় ওদেরকে গ্যালিতে যেতে বলল ও।

ওয়কওয়ে থেকে লাফ দিয়ে আফটারডেকে নামল রানা। একছুটে জায়গাটা পেরিয়ে চলে এল গ্যালিতে। এক মিনিট পর পৌঁছল ওরা।

'মেসটা দখল করতে হবে...'

বাধা দিল মোবারক, 'সম্ভব বলে মনে করি না!' চোখ জোড়া তার টকটকে লাল হয়ে আছে।

'ওপর থেকে আমি আসব,' বলল রানা। 'পোর্ট আর স্টারবোর্ড থেকে তোমরা দু'জন আসবে। নিচে যারা আছে তাদের মধ্যে থেকে কেউ উঠতে পারলে ভাল, তা না হলে এই তিনজনকেই কাজটা করতে হবে।'

'তুমি ওপর থেকে আসবে?' হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছে রানার দিকে ঝুঁকে পড়ল সুলতান। ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে সে। গলার আওয়াজ কর্কশ। 'কিন্তু ব্রিজে তুমি উঠবে কিভাবে?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'ওটাই আগে দখল করতে হবে। আমি যাচ্ছি। তোমরা ফগহর্ন শুনতে পাবে, ওটাই সিগন্যাল। যদি পারো নিচে গিয়ে ওদেরকেও কথাটা জানাও।'

'কিন্তু ব্রিজে তুমি উঠবে কিভাবে?' জানতে চাইল মোবারক।

'উঠব না,' বলল রানা, 'ছাদ থেকে নামব।'

দু'জন গেরিলাকে নিয়ে ব্রিজে উঠে এল কাওয়াশ। গেরিলারা পজিশন নিয়ে গুলি করায় মন দিল, আর মেঝেতে কোহেনের সাথে আলোচনায় বসল কাওয়াশ।

'জেতার কোন আশা নেই ওদের,' বলল সে। 'এখান থেকে ডেকের বেশির ভাগই আমরা কন্ট্রোল করছি।'

গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকাল কোহেন।

'নিচ থেকে মেসের ওপর হামলা চালাতে পারবে না ওরা,' আবার বলল কাওয়াশ। 'কারণ ওপর থেকে কম্প্যানিয়নওয়েতে নজর রাখছি আমরা। সামনে থেকে হামলা চালাবে, তাও সম্ভব নয়, কারণ এখান থেকে ওদেরকে আমরা আসতে দেখব। নিচে নামার কম্প্যানিয়নটা আমাদের দখলে রয়েছে, কাজেই ওপর থেকে ও হামলা চালাতে পারবে না। আমরা শুধু গুলি চালিয়ে যাব,' তাহলেই সারেন্ডার করতে বাধ্য হবে ওরা।'

'এই একটু আগে কম্প্যানিয়ন ধরে আসতে চেষ্টা করছিল একজন,' বলল কোহেন। 'আমি তাকে হটিয়ে দিয়েছি।'

'আমার ধারণা, আবার ওরা চেষ্টা করবে,' বলল কাওয়াশ। 'ওটাই ওদের একমাত্র ভরসা।'

'ঠিক আছে, চার্টরুম থেকে ওদিকে নজর রাখছি আমি।'

উঠে দাঁড়াল ওরা। ফোরডেক থেকে ছুটে এসে একঝাঁক বুলেট কাঁচ ভেঙে ঢুকে পড়ল ভেতরে। ঝাঁঝরা বুক নিয়ে মেঝের ওপর পড়ে গেল একজন গেরিলা।

ছাদের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে রানা। ছাদটা ঢালু, চকচকে আর মসৃণ, ধরার মত কিছুই নেই। এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে এগোল ও। তুমুল বৃষ্টিতে সামনেটা ঝাপসা, কোন্ দিক থেকে কোথায় যাচ্ছে বোঝা কঠিন। ছাদের সামনের দিকে নেভিগেশন লাইটের দু'ফিট উঁচু স্ট্যান্ড আছে, প্রথমে সেটার কাছে পৌঁছতে হবে ওকে। অলস ভঙ্গিতে একবার এপাশে, একবার ওপাশে কাত হচ্ছে জাহাজ, কিছু একটা ধরার মত না পেলে গড়িয়ে ত্রিশ ফিট নিচে পড়তে হবে ওকে।

স্ট্যান্ডটা নাগালের মধ্যে চলে আসছে, আর মাত্র এক ফিট দূরে, পোর্টের দিকে কাত হতে শুরু করল জাহাজ। পিছলে গেল শরীর, ছাদের একেবারে কিনারায় চলে এল রানা। কিনারায় কিছু নেই, শরীরের ডানপাশটা ঝুলে পড়ল

নিচের দিকে। ডান কাঁধ থেকে গলে বেরিয়ে গেল সাব-মেশিনগান, ডিগবাজি খেতে খেতে নেমে গিয়ে পড়ল একটা লাইফবোটের ওপর।

কয়েক সেকেন্ড স্থির হয়ে থাকল জাহাজ। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে রানা। আরেকটু কাত হলেই দফা সারা, কিনারা থেকে নিচে নেমে যাবে ও।

উল্টো দিকে কাত হতে শুরু করল জাহাজ। পিছলে আবার ছাদের সামনের দিকে চলে যাচ্ছে রানা। দ্রুত। এইবার নাগালের মধ্যে এসে গেল নেভিগেশন লাইটের স্ট্যান্ড। সেটাকে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরল রানা। স্ট্যান্ডের ঠিক নিচেই ব্রিজের কাঁচ ভাঙা জানালা, সেটা থেকে নাক বের করে আছে কারবাইনের একটা ব্যারেল।

স্ট্যান্ড আঁকড়ে ধরে শরীরটাকে স্থির করার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু পারল না। জাহাজ কাত হবার সাথে সাথে শরীরের নিচের অংশ কিনারার দিকে চলে আসছে। উঁকি দিয়ে আরেকবার নিচের দিকে তাকাল ও। কিনারার ঠিক নিচেই সরু একটা নর্দমা, ছাদ থেকে বৃষ্টির পানি ওতেই নামছে। কিনারা থেকে নেমে গেল পা, স্ট্যান্ড ছেড়ে দিয়ে নর্দমার কিনারা ধরে নিচের দিকে ঝুলে পড়ল ও। সেই সাথে জানালার ভেতর পা জোড়া ঢুকিয়ে শরীরটা গলিয়ে নিল ব্রিজের ভেতর।

একজন গেরিলার মাথার ওপর দিয়ে ব্রিজের মাঝখানে এসে নামল রানা। হাঁটু ভাঁজ করে পতনের ধাক্কাটা সামলে নিল ও, তারপর সিধে হলো। সাবমেশিনগান নেই, পিস্তল বা ছুরি বের করারও সময় পেল না। দু'জন লোক রয়েছে ব্রিজে, দুটো জানালা দিয়ে ডেকের ওপর গুলি করছে। রানা সিধে হচ্ছে, এই সময় ঘুরতে শুরু করল তারা।

পোর্ট সাইডের লোকটা কাছে, তাকে লক্ষ্য করে পা ছুঁড়ল রানা। কোমরে লাথি খেয়ে জানালার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল লোকটা। তার হাতের কারবাইন জানালা গলে বেরিয়ে গেল। জানালার কার্নিসে এক সেকেন্ড স্থির হয়ে থাকল লোকটা, ফ্রেমটা ধরার জন্যে হাত তুলল, কিন্তু ফ্রেম ছুঁয়ে পিছলে গেল হাত। নিচের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

এতকিছু দেখা হয়নি রানার। দ্বিতীয় লোকটা জানালার দিক থেকে ঘোরা শেষ করে কারবাইন তুলছে দেখে স্যাঁৎ করে এগিয়ে গেল রানা, বগল আর পাঁজরের মাঝখানে কারবাইনের ব্যারেল ঢুকিয়ে নিয়ে লোকটার বুকে বুক ঠেকাল, তারপর একহাতে পেঁচিয়ে ধরল তার গলা। এই রকম একটা কৌশলের জন্যে প্রস্তুত ছিল না লোকটা, মুহূর্তের জন্যে বিমূঢ় হয়ে পড়ল সে। সেই সুযোগটাই নিল রানা। কারবাইনের লম্বা ব্যারেল থেকে এখন যদি গুলি বেরিয়ে আসে, গায়ে লাগবে না। বাঁ হাত তুলে লোকটার তলপেটে দমাদম কয়েকটা ঘুসি বসাল ও। তারপর ভাঁজ করা ডান হাঁটু দিয়ে লোকটার দুই উরুর মাঝখানে লাগাল প্রচণ্ড এক গুঁতো।

নিস্তেজ হয়ে গেল লোকটা। তাকে শূন্যে তুলে নিয়ে জানালার কাছে চলে এল রানা।

চার্টরুমে আরও একজন লোক আছে, ব্রিজ থেকে নিচে নামার কম্প্যানিয়নওয়ের ওপর নজর রাখছে সে। রানা ব্রিজে নামার পর পাঁচ সেকেন্ড

কেটে গেছে, এতক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে ঘুরতে শুরু করল সে। নিস্তেজ লোকটাকে জানালা দিয়ে নিচে ফেলেই ঘুরে দাঁড়াল রানাও। দেখেই ন্যাট কোহেনকে চিনতে পারল ও।

ঝট্ করে কোমর থেকে ওপরের অংশ নিচু করে পেশাদার বক্সারের মত একটা ভঙ্গি করল রানা। কোহেন আর ওর মাঝখানে পড়ে আছে ভাঙা দরজার একটা কবাট, পায়ের এক ধাক্কায় সেটাকে সামনের দিকে ঠেলে দিল ও। ডেকের ওপর দিয়ে ছুটে গিয়ে কোহেনের পায়ে ধাক্কা খেল সেটা। তাল সামলাবার জন্যে শরীরের দু'পাশে হাত তুলছে কোহেন. ঠিক সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎ গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা।

কোহেনের কারবাইন ধরা হাতের কব্জি আর কাঁধ ধরল রানা, নিচের দিকে হ্যাঁচকা একটা টান দিয়ে ভাঁজ করা হাঁটুর ওপর ভাঙল সেটাকে। কোহেন চিৎকার করল, ভাঙা হাত থেকে খসে পড়ল কারবাইন। একটু ঘুরে কনুই চালাল রানা, কোহেনের ঠিক কানের নিচে লাগল সেটা। ঘুরে গেল কোহেন, পড়ে যাচ্ছে। পিছন থেকে তার চুল খামচে ধরল রানা, নিজের দিকে টেনে আনল মাথাটা। কোহেন ওর হাত থেকে নেমে যেতে শুরু করতেই একটা পা উঁচু করে ঝেড়ে লাথি চালাল ও। কোহেনের ঘাড়ের ওপর পা পড়তেই মাথাটা ঝাঁকি দিল রানা। মট করে ভেঙে গেল ঘাড়। তাকে ছেড়ে দিয়ে এক পা পিছিয়ে এল রানা। কোহেনের অসাড় দেহ পড়ে গেল ডেকের ওপর।

কোহেনের দিকে তাকিয়ে আছে রানা, রক্তের আলোড়ন শুনতে পাচ্ছে দু'কানে। এই সময় এঞ্জিনিয়ার আব্বাসের ওপর নজর পড়ল ওর।

একটা চেয়ারের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে আব্বাসকে। মড়ার মত ফ্যাকাসে চেহারা, কিন্তু জ্ঞান আছে। বেল্ট থেকে ছুরি টেনে নিয়ে বাঁধনগুলো কেটে দিল রানা। আব্বাসের আঙুল দেখে আঁতকে উঠল ও।

'মরব না,' বিড়বিড় করে বলল আব্বাস। চেয়ার ছেড়ে উঠল না সে।

কোহেনের কারবাইন তুলে নিয়ে ম্যাগাজিন চেক করল রানা। প্রায় ভর্তি। ব্রিজ থেকে ফগহর্নটা নিয়ে এল ও। 'আব্বাস, চেয়ার থেকে উঠতে পারবে তুমি?'

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল আব্বাস, কিন্তু তারপর টলতে শুরু করল। তাকে ধরে ধরে ব্রিজে নিয়ে এল রানা। 'এই বোতামটা দেখছ? সময় নিয়ে দশ পর্যন্ত গুনতে হবে তোমাকে, তারপর এর ওপর হেলান দিতে হবে। পারবে?'

'পারব।'

'তাহলে শুরু করো।'

'এক,' শুরু করল আব্বাস, 'দুই···'

কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে সেকেন্ড ডেকে নেমে এল রানা। খালি, কেউ কোথাও নেই। আরও খানিক নেমে একটা মইয়ের মাথায় থামল ও। এই মইটাই মেসে নেমে গেছে। শত্রুরা সবাই যে ওখানে জড় হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আন্দাজ করল, দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে তারা, দরজা আর পোর্টহোল দিয়ে গুলি চালাচ্ছে। এর ফাঁকে কম্প্যানিয়নওয়ের ওপরও চোখ

রেখেছে দু'একজন। এই রকম একটা পজিশন, দখল করার নিরাপদ কোন উপায় নেই।

কি হলো, আব্বাস!

কম্প্যানিয়নওয়েতে বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়. যে-কোন মুহূর্তে কেউ উঁকি দিয়ে দেখে ফেলতে পারে ওকে। আব্বাস যদি জ্ঞান হারিয়ে থাকে, আবার ওকে উঠতে হবে ব্রিজে।

ফগহর্নের আওয়াজ হলো।

মইয়ের মাথা থেকে লাফ দিল রানা। খোলা দরজার সামনে পড়ার আগেই গুলি ছুঁড়তে শুরু করল ও। দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছিল দু'জন লোক, ঝাঁঝরা হয়ে গেল তাদের বুক। মেসের ভেতর থেকে গুলির আওয়াজ আসছে না। হাঁটু জোড়া ভাঁজ করে চেয়ারে বসার ভঙ্গিতে রয়েছে রানা, কারবাইনটা একদিক থেকে আরেকদিকে ঘোরাল। একবার, দু'বার। স্লো-মোশন সিনেমার মত চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে ঘটনাটা। এই সময় আরও একটা নতুন মেশিনগানের আওয়াজ পেল রানা। মেসের নিচ থেকে মই বেয়ে উঠে এল জহির। একমুহূর্ত পর আরেক দরজা দিয়ে ঢুকল আহত মোবারক। বলতে গেলে, এক নিমেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল গেরিলারা। তারপর, যেন কোথাও থেকে একটা সিগন্যাল পেয়ে সবাই ওরা গুলি চালানো বন্ধ করল। নিস্তব্ধতাটাই হয়ে উঠল বিকট বিস্ফোরণের মত।

এখনও হাঁটু ভাঁজ করা অবস্থায় রয়েছে রানা, প্রচণ্ড ক্লান্তিতে মাথাটা নুয়ে পড়ল ওর। একমুহূর্ত পর সিধে হলো ও, নিজের লোকদের দিকে ফিরল। 'আর সবাই কোথায়?'

অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল মোবারক। 'ফোর ডেকে বোধহয় একজন আছে, সম্ভবত হামজা।'

'বাকি সবাই?'

'নেই,' বিড়বিড় করে বলল মোবারক। 'মারা গেছে।'

একটা বাল্কহেডের গায়ে হেলান দিয়ে হাতের কারবাইনটা ছেড়ে দিল রানা। 'কি মূল্যই না দিতে হলো,' শান্ত গলায় বলল ও। ভাঙা পোর্টহোল দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল, সকাল হয়ে গেছে।

বারো

এক বছর আগের কথা। একটা বি-ও এ-সি জেটে ডিনার পরিবেশন করছিল এষা। সেই মুহূর্তে আটলান্টিকের ওপর রয়েছে জেট। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, নিচের দিকে নেমে যেতে শুরু করল প্লেন। কন্ট্রোল কেবিন থেকে বোতাম টিপে সীট বেল্টের আলো জ্বেলে দিল ক্যাপ্টেন। ব্যস্ত হাতে আরোহীদের সীট-বেল্ট বাঁধতে সাহায্য করল এষা। বলল, 'কিছু না, এইরকম হয়েই থাকে।' কিন্তু শরীরের প্রতিটি

অণু-পরমাণু চিৎকার করে বলছিল, 'আমরা মরতে যাচ্ছি! আমরা মরতে যাচ্ছি!'

এষার এখনকার অবস্থাও ঠিক সেই রকম।

ছোট্ট একটা মেসেজ এসেছে হিলারীর, অনেকক্ষণ আগে—ঈজিপশিয়ানস অ্যাটাকিং। তারপর থেকে তার আর কোন সাড়া নেই। ঠিক হয়তো এই মুহূর্তে রানাকে লক্ষ্য করে গুলি করছে ওরা। হয়তো আহত হয়েছে ও, কিংবা ধরা পড়েছে। মারাও যেতে পারে। এইসব দুশ্চিন্তায় মন অস্থির হয়ে আছে এষার, এরই মধ্যে ঠোঁটে মধুর হাসি নিয়ে রেডিও অপারেটরের কাছে এসে বলল সে, 'বাহ্, তোমার সেটটা তো দারুণ!'

হোয়াইট রোজের রেডিও অপারেটর একটু বয়স্ক, মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে। একটু গর্বের সাথেই বলল, 'হবে না, দাম যে তিন লাখ ডলার!' এষার হাসি দেখে সে-ও হাসল। 'রেডিওর ব্যাপারে তুমি কিছু বোঝ?'

'এক-আধটু···এয়ারহোস্টেস ছিলাম কিনা!' বলেই ভাবল এষা, ছিলাম বললাম কেন? আমার কি বাঁচার আশা নেই, আগের জীবনে আর ফিরে যেতে পারব না? 'এয়ার ক্রুদের রেডিও ব্যবহার করতে দেখেছি। বেসিকগুলো জানা আছে আমার।'

'একটা নয়, একের ভেতর এটা আসলে চারটে রেডিও,' সমঝদার শ্রোতা পেয়ে উৎসাহের সাথে ব্যাখ্যা দিতে শুরু করল রেডিও অপারেটর। 'একটা অরিয়নের বীকন ধরে। একটা হিলারীর সিগন্যাল রিসিভ করে। আরেকটা ইমপেরিয়ালের রেগুলার ওয়েভলেংথে সেট করা আছে। আর শেষেরটা খুঁজে ফেরে। এই দেখো।'

এষাকে একটা ডায়াল দেখাল সে, কাঁটাটা মন্থর গতিতে ডায়ালের চারদিকে ঘুরছে। 'এর কাজ হলো ট্র্যান্সমিটারের খোঁজ করা। পেলেই থেমে যায়। শোনে।'

'আশ্চর্য তো!' বলল এষা। 'এটা বুঝি তোমার আবিষ্কার?'

হেসে ফেলল রেডিও অপারেটর। 'দূর, তা কেন হবে। আমি তো শুধু অপারেটর।'

'সেটগুলো কাজ করে কিভাবে? মানে, ট্র্যান্সমিটের বোতাম টিপেই যে-কোন সেট থেকে ব্রডকাস্ট করতে পারো তুমি?'

'হ্যাঁ। মোর্স কোড বা মুখের কথা ব্যবহার করা হয়। অবশ্য এই অপারেশনে শুধু মোর্স···'

'এই পেশার ওপর আমার সাংঘাতিক ঝোঁক,' বলল এষা। 'একশো, দুশো, পাঁচশো, হাজার মাইল দূরে রয়েছে লোক, শুধু একটা বোতাম টিপে দিলেই তাদের সাথে কথা বলা যায়। আচ্ছা, রেডিও অপারেটর হতে হলে লম্বা ট্রেনিং নিতে হয়?'

'খুব একটা লম্বা নয়। মোর্স শেখাটা সহজ। কিন্তু জাহাজের রেডিওম্যান হতে হলে সেট মেরামত করার বিদ্যাটাও শিখতেই হবে। কিন্তু তোমার কোন আশা আছে বলে মনে হয় না,' বলে হাসল রেডিও অপারেটর। 'কোন মেয়ে জাহাজের রেডিও অপারেটর হয়েছে, কই, আমার কানে তো আসেনি।'

এষাও হেসে উঠল। মনে মনে বলল, এসো, হিলারী! এসো, এসো!

কয়েক সেকেন্ড পরই আশাটা পূরণ হলো। দ্রুত লিখতে শুরু করল অপারেটর, সেই সাথে বলল, 'মি. রিচিকে খবর দাও।'

মন খারাপ করে রেডিও রূম থেকে নেমে এল এষা। মেসেজে কি বলা হয়েছে জানতে পারল না। মেসে পাওয়া যাবে মনে করে উঁকি দিয়ে ভেতরে তাকাল, রিচি নেই। আরেক ডেক নিচে নেমে রিচির কেবিনে এল ও; গোসল করার জন্যে তৈরি হচ্ছে রিচি।

'হিলারীর সিগন্যাল।'

সাথে সাথে এষাকে নিয়ে রেডিওরূমে চলে এল রিচি। হোয়াইট রোজের রেডিও রূম ব্রিজের ঠিক নিচেই, এটা আসলে ক্যাপ্টেনের কেবিন হবার কথা। এই রেডিওটার ইকুইপমেন্ট অনেক বেশি বলে ব্রিজের পাশে জায়গা দেয়া সম্ভব হয়নি।

অপারেটরের কাছ থেকে সিগন্যাল নিয়ে অনুবাদ করে এষাকে শোনাল রিচি—'ঈজিপশিয়ানস হ্যাভ টেকেন ইমপেরিয়াল। অরিয়ন অ্যালংসাইড। রানা অ্যালাইভ।'

পরম স্বস্তিতে শরীর অবশ হয়ে গেল এষার। দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, ধপ করে বসে পড়ল একটা চেয়ারে।

কেউ লক্ষ করল না ব্যাপারটা। সিগন্যালের উত্তর লিখতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে রিচি—'উই উইল হিট অ্যাট সিক্স এ.এম. টুমরো।'

ক্ষণিকের স্বস্তি কোথায় উবে গেল। দু'হাত মুঠো করে ভাবল এষা, এখন আমি কি করি?

অনড় দাঁড়িয়ে আছে রানা, মাথায় একজন নাবিকের কাছ থেকে ধার করা ক্যাপ। ক্যাপ্টেনের পিছনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে ওরা, নিহতদের জন্যে জানাজা পড়ছে ক্যাপ্টেন। বাতাস, বৃষ্টি আর সাগরের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল তার কণ্ঠস্বর। তারপর এক এক করে ক্যানভাস মোড়া লাশগুলো রেইল টপকে ফেলে দেয়া হলো অথৈ জলে। বারো জনের মধ্যে সাতজনই মারা গেছে। দুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু ইউরেনিয়াম, কিন্তু প্রাণের চেয়েও কি?

সাগরে লাশ ফেলার এটা দ্বিতীয় ঘটনা। চারজন ইহুদি বেঁচে গিয়েছিল, তিনজন আহত, বাকি একজন কাপুরুষের মত লুকিয়ে পড়েছিল—এদেরকে নিরস্ত্র করে স্বজাতি যোদ্ধাদের লাশ ফেলার কাজে লাগিয়েছিল রানা। বেশ খাটতে হয়েছে ওদেরকে, পঁচিশটা লাশ বয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলা কম কথা নয়।

ইতোমধ্যে অরিয়নের ক্যাপ্টেন তার জাহাজের সমস্ত কাগজ-পত্র নিয়ে এসেছে। অরিয়নে ফিটার আর জয়েনার ছিল বেশ কয়েকজন, অরিয়নের সাথে ইমপেরিয়ালের কোথাও কোন অমিল থাকলে সেটা দূর করার জন্যে এদেরকে সাথে করে নিয়ে আসা হয়েছিল, খণ্ড যুদ্ধের ফলে যেখানে যা ক্ষতি হয়েছে সেগুলো মেরামত করতে লেগে গেল তারা। ডেক থেকে যেগুলো দেখা যায় শুধু সেগুলো মেরামত করতে বলল রানা, বাকি সব বন্দরে পৌছে হবে। এই কাজে অরিয়ন থেকে অনেক জিনিস নিয়ে এসে ইমপেরিয়ালে ফিট করা হলো। একজন পেইন্টার

ইমপেরিয়ালের নাম মুছে ফেলে সে-জায়গায় বড় বড় অক্ষরে লিখল, অরিয়ন। ইমপেরিয়ালের সব ক'টা লাইফবোট নষ্ট হয়ে গেছে, সাগরে ফেলে দেয়া হলো সেগুলো। অরিয়নের লাইফবোট নিয়ে আসা হলো এই জাহাজে। আনকোরা নতুন অয়েল-পাম্প ছিল অরিয়নে, সেটা নিয়ে এসে ফিট করা হলো এঞ্জিনে।

জানাজার জন্যে ছেদ পড়েছিল কাজে। আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাই। শেষ বিকেলের দিকে আবার প্রাণ ফিরে পেল এঞ্জিন। ক্যাপ্টেনের সাথে ব্রিজে উঠল রানা, জাহাজের নোঙর তোলা হলো। কোর্স ঠিক করে ক্যাপ্টেন নির্দেশ দিলেন, 'ফুল স্পীড অ্যাহেড।'

কাজ শেষ। বুক ভরে বাতাস নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ছাড়ল রানা। ইমপেরিয়াল গায়েব হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে যেটা পোর্ট সাঈদের দিকে ছুটে চলেছে সেটাকে কোন মতেই আর ইমপেরিয়াল বলা যাবে না। এর নাম এখন অরিয়ন। আর অরিয়ন বুভাইল শিপিঙের আইনসঙ্গত জাহাজ। পিরামিডের দেশ মিশর তার ইউরেনিয়াম পেয়ে গেছে, কিন্তু কেউ জানে না কোথেকে এটা যোগাড় করল সে। এই অপারেশনের সাথে জড়িত সবার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, শুধু এফ. এ. মুলার বাদে। এই জার্মান ব্যবসায়ী আইনের দিক থেকে এখনও ইউরেনিয়ামের মালিক। একমাত্র এই লোক শত্রুতা করলে বা কৌতূহলী হয়ে উঠলে রানার এত বড় সাফল্য বানচাল হয়ে যেতে পারে। ঠিক এই মুহূর্তে তাকে সামলাচ্ছে গগল। মনে মনে তার সাফল্য কামনা করল রানা।

'নিরাপদ দূরত্বে সরে এসেছি আমরা,' ক্যাপ্টেন জানাল।

চার্টরুমে তার রেডিও ডিটোনেটর নিয়ে বসে আছে এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট, রানার কাছ থেকে অনুমতি পেয়ে লিভার ধরে টান দিল সে। এক মাইল দূরে রয়েছে ফাঁকা অরিয়ন, সবাই বিস্ফোরিত হতে দেখল সেটাকে।

বজ্রপাতের মত ভোঁতা একটা আওয়াজ হলো, সেই সাথে অরিয়নের মাঝখানটা দেবে গেল। একটু পরই লাল লকলকে শিখা দেখা গেল, তার ফুয়েল ট্যাংকে আগুন ধরে গেছে। ঝড়ো সন্ধেবেলা সাগরের একটা দিক আলোকিত হয়ে উঠল। প্রথম দিকে ধীরে ধীরে, তারপর দ্রুত ডুবতে শুরু করল অরিয়ন। স্টার্ন ডুবে যাবার পরপরই বো-ও ডুবল, পানির ওপর শুধু জেগে থাকল ফানেলটা, ডুবন্ত মানুষের একটা হাতের মত। তারপর তলিয়ে গেল সেটাও।

চেহারায় কোন ভাব নেই, ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল রানা। পরমুহূর্তে ভুরু জোড়া একটু কুঁচকে উঠল ওর। কিসের গোলমাল? শব্দটা ক্যাপ্টেনের কানেও গেছে। এগিয়ে এসে ব্রিজের জানালা দিয়ে তাকাল ওরা। এতক্ষণে বুঝল। ডেকে ওরা সবাই আনন্দ প্রকাশ করছে।

বিজবাদেনে নিজের অফিসে বসে ইউরেনিয়ামের কথাই ভাবছিল এফ. এ. মুলার। জেনোয়ার আঞ্জেলুজি ই বিয়ানকোর কাছ থেকে একটা টেলিগ্রাম পেয়েছে সে, ভাষাটা সহজ হলেও অর্থটা বোধগম্য হয়নি তার। বিয়ানকো জানতে চেয়েছে, ইয়েলোকেক কবে পৌঁছবে তার নতুন তারিখ জানান।

নতুন তারিখ? কেন, পুরানো তারিখ কি বদল হয়েছে? আজ থেকে দু'দিন পর জেনোয়ায় পৌঁছবার কথা ইমপেরিয়ালের, অন্তত সে তো তাই জানে। ব্যাপারটা কি জানার জন্যে শিপারকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে সে, জানতে চেয়েছে, ইয়েলোকেক পৌঁছতে কি দেরি হবে?

সেই টেলিগ্রামের উত্তর এখনও এসে পৌঁছয়নি, তবে মুলার আশা করছে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে এসে যাবে।

ইউরেনিয়ামের কথা ভুলে যাবার চেষ্টা করল সে। জিনিসটা যদি মাঝ-সাগরে ডুবেও যায়, কিছু আসে যায় না তার। বীমা কোম্পানী ক্ষতিপূরণ হিসেবে যা দেবে সেটাও কম নয়। ইউরেনিয়াম আর ক'পয়সার ব্যবসা দেবে তাকে, তারচেয়ে অনেক বড় ব্যবসা পেয়ে গেছে সে। এক রকম সোনার খনিই বলা যেতে পারে মিশরীয় আর্মির সাথে এই চুক্তিটাকে। চুক্তি সই হয়ে গেছে, তার কারখানায় পুরোদমে চলছে উৎপাদন। প্রথম চালান আগামী হপ্তার মাঝামাঝি সময়ে রওনা হবে। তার আগেই, আর দু'একদিন পর, পুরো এক বছরের টাকা অগ্রিম পাবে সে।

এই সময় সেক্রেটারি ঢুকল কামরায়। শিপারের কাছ থেকে টেলিগ্রাম এসেছে। তার হাত থেকে নিয়ে অনুবাদ করা টেলিগ্রামটা পড়ল মুলার। 'জুরিখের বুভাইল শিপিঙের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে ইমপেরিয়াল, আপনার কার্গোর সমস্ত দায়-দায়িত্ব এখন তাদের। ইমপেরিয়ালের নতুন মালিক সম্পর্কে আপনাকে আমরা গ্যারান্টি দিচ্ছি, আপনার কার্গোর কোন ক্ষতি এঁরা হতে দেবেন না।' এরপর বুভাইল শিপিঙের নাম লিখে নিচে টেলিফোন নাম্বার দেয়া হয়েছে, বলা হয়েছে ভিনসেন্ট গগলের সাথে কথা বলুন।

সেক্রেটারিকে ফোন করতে বলল মুলার। একটু পর সেক্রেটারি জানাল, 'মি. গগল একটু পরে আপনাকে ফোন করবেন।'

রিস্টওয়াচে চোখ বুলিয়ে মুলার বলল, 'আমি বরং ফোনের জন্যে অপেক্ষাই করি। এর সবটা জানা উচিত আমার।'

দশ মিনিট পর ফোন এল। গগলকে বলল মুলার, 'ইমপেরিয়ালে আমার যে কার্গো আছে, শুনলাম তার দায়িত্ব নাকি আপনি নিয়েছেন।'

'জী,' বিনয়ের সাথে জানাল গগল, 'আমি আপনাকে পূর্ণ নিশ্চয়তা দিচ্ছি...'

তাকে থামিয়ে দিয়ে মুলার জানতে চাইল, 'আমার কার্গো পৌঁছতে কি দেরি হবে?'

'সামান্য,' বলল গগল। 'আপনাকে আগেই খবর দেয়া হয়নি, সেজন্যে আমি আন্তরিক দুঃখিত।' মুলার লক্ষ করল, চমৎকার জার্মান বলে লোকটা, কিন্তু আসলে সে জার্মান নয়। আর, যতই বিনয়ের সাথে দুঃখ প্রকাশ করুক, আসলে লোকটা মোটেও দুঃখিত নয়। 'ইমপেরিয়ালের অয়েল-পাম্প নষ্ট হয়ে গেছে, সাগরে অচল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। নতুন অয়েল-পাম্প পাঠানো হচ্ছে, কাজেই নতুন ডেলিভারি ডেট খুব তাড়াতাড়ি আপনাকে জানাতে পারব বলে আশা করি।'

'কিন্তু আমার পার্টি আঞ্জেলুজি ই বিয়ানকোকে আমি কি বলব?'

'তাদের সাথে যোগাযোগ করে এরই মধ্যে আমি দুঃখ প্রকাশ করেছি,' বলল

গগল। 'তারা আমার অসুবিধের কথা বুঝেছে। কথা দিচ্ছি, আপনাদের দু'পক্ষের সাথেই আমি যোগাযোগ রাখব।'

'বেশ। গুডবাই।'

অদ্ভুত। মাঝ সাগরে জাহাজ বিক্রি হয়ে গেল, সেই জাহাজ আবার নষ্টও হয়ে গেল! বুভাইল শিপিং, কই, এ নাম তো আগে কখনও শোনেনি সে। তারপর ভাবল মুলার, দূর-ছাই! এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি। ইয়েলোকেক বীমা করা না থাকলে একটা কথা ছিল। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল মুলার। খিদে পেয়েছে।

সারারাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারল না এষা। আবার রানার জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। সে ছাড়া আর কেউ তাকে সাবধান করার নেই। কি করবে সে? কি করতে পারে?

যা করার একা করতে হবে। এখানে তাকে সাহায্য করার কেউ নেই।

কি আর এমন কঠিন কাজ এটা? ইচ্ছে করলেই তো সে রানাকে সাবধান করতে পারে। কেন, রেডিও অপারেটর কি বলেছে, মনে নেই? ট্র্যান্সমিট করার বোতাম টিপে কথা বললেই হলো, মেসেজ পৌঁছে যাবে। রেডিওরুমে গিয়ে সেই কাজটা করতে বাধা কোথায় তার?

মাথা খারাপ! এই কাজ আমি মরে গেলেও করতে পারব না। সি. আই. এ-র লোকজন গিজগিজ করছে জাহাজে। রেডিও অপারেটর শক্তসমর্থ লম্বা-চওড়া মানুষ। না, সম্ভব নয়। কিছু করতে পারব না। তারচেয়ে ঘুমিয়ে যাই, এই ঘুম যেন আর না ভাঙে।

মাসুদ, মাসুদ!

রাত চারটে বাজল। এরপর আর স্থির থাকতে পারল না এষা। বিছানা ছেড়ে জীনস, সোয়েটার, বুট আর অয়েলস্কিন পরল ও। মেস থেকে এক বোতল শ্যাম্পেন নিয়ে এসেছিল, যদি ঘুম না আসে কাজে লাগবে এই অজুহাত দেখিয়ে, অয়েলস্কিনের পকেটে ভরে নিল সেটা।

সবার আগে জানতে হবে হোয়াইট রোজের পজিশন ব্রিজে উঠে আসতেই ক্যাপ্টেনের সামনে পড়ল, 'কি, ঘুম আসছে না?'

এই রকম টেনশনের মধ্যে ঘুম আসে, আপনিই বলুন?' এয়ার হোস্টেসের উজ্জ্বল হাসি ফুটল এষার মুখে। 'কোথায় আমরা?'

ম্যাপে আঙুল রেখে হোয়াইট রোজের পজিশন দেখাল ক্যাপ্টেন। এষা তার গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়াল, এসব ব্যাপারে তার কৌতূহলের যেন শেষ নেই।

'স্পীড?'

বেশি নড়াচড়া করল না ক্যাপ্টেন, স্পর্শটা যদি হারাতে হয়। এষা একটা করে প্রশ্ন করছে, ধীরে সুস্থে উত্তর দিচ্ছে সে।

স্পীড, কোর্স, পজিশন সব জানা হয়ে গেল এষার। প্রতিটি সংখ্যা দু'বার করে মনে মনে আওড়াল সে, যাতে ভুলে না যায়। তারপর জানতে চাইল, 'আমরা ঠিক সময় ইমপেরিয়ালের কাছে পৌঁছতে পারব তো?'

'অবশ্যই,' বলল ক্যাপ্টেন। 'তারপরই···বুম!'

বাইরে তাকাল এষা। গভীর অন্ধকার। আকাশে একটা তারা নেই, সাগরে কোন নেভিগেশন লাইট নেই। আবহাওয়া আরও খারাপ হচ্ছে।

'আরে, তুমি কাঁপছ কেন?' জানতে চাইল ক্যাপ্টেন। 'ঠাণ্ডা লাগছে?'

'হ্যাঁ,' বলল এষা, কিন্তু জানে, তার এই শীত লাগার জন্যে আবহাওয়া দায়ী নয়। 'কর্নেল রিচির ঘুম ভাঙবে কখন জানেন?'

'পাঁচটার সময় ঘুম ভাঙাতে বলেছেন।'

'তাহলে আর এখানে থেকে লাভ কি আমার,' বলে ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে সরে এল এষা, 'যাই, ঘন্টাখানেক ঘুমিয়ে নিই।'

ব্রিজ থেকে নেমে এসে রেডিওরুমে ঢুকল এষা। ওকে দেখে হাসল রেডিও অপারেটর। উজ্জ্বল হাসিতে মুখ ভরিয়ে জানতে চাইল এষা, 'তোমারও বুঝি ঘুম আসছে না?'

'ঠিক তা নয়,' বলল অপারেটর। 'আমি আগেই একটু ঘুমিয়ে নিয়েছি।'

রেডিও ইকুইপমেন্টের দিকে তাকাল এষা। 'অরিয়নের বীকন শুনছ না কেন?'

'এলে তো!' বলল রেডিও অপারেটর। 'অনেকক্ষণ হয়ে গেল বন্ধ হয়ে গেছে। হয় বীকন দেখে ফেলেছে ওরা, নয়তো জাহাজটাকে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে। ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে বলেই মনে করছি আমরা।'

একটা চেয়ারে বসে অয়েলস্কিনের পকেট থেকে শ্যাম্পেনের বোতলটা বের করল এষা। ছিপি খুলে রেডিও অপারেটরের দিকে বাড়িয়ে দিল সেটা। 'দু'ঢোক চলবে নাকি?'

'তোমার শীত করছে?'

'একটু একটু।'

হেসে উঠল রেডিও অপারেটর, বলল, 'তোমার হাত কাঁপছে।' বোতল নিয়ে এক ঢোক শ্যাম্পেন খেলো সে। 'ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ।' বোতলটা এষাকে ফিরিয়ে দিল।

সাহস পাবার জন্যে নিজেও দু'ঢোক খেলো এষা। তারপর ছিপি এঁটে বোতলটা হাতেই রাখল। এখন অপেক্ষা। যতক্ষণ না রেডিও অপারেটর পিছন ফেরে।

কিন্তু তার কোন লক্ষণ দেখল না এষা। লোকটা ওর সম্পর্কে এটা সেটা জানতে চাইল, বেশির ভাগই ব্যক্তিগত প্রশ্ন। তার মধ্যে সবচেয়ে মজার হলো, এষা কি এখন থেকে মার্কিন মুল্লুকে থাকবে? কর্নেল রিচি তাকে এ-ধরনের কোন প্রস্তাব দিয়েছে কিনা।

একটু লজ্জিত হাসি হেসে এষা বলল, 'রিচি যা বলবে তাই হবে, আমি আর কি বলব।' লোকটাকে আবার বোতল দিল ও।

সময় বয়ে যাচ্ছে, আর দেরি করা চলে না। উঠে দাঁড়াল এষা। রেডিও অপারেটরের বাড়ানো হাত থেকে বোতলটা নেবার সময় তার একেবারে মুখের সামনে চলে এল ও। অয়েলস্কিনের বোতাম আগেই খুলে রেখেছে, বোতল থেকে

মুখে শ্যাম্পেন ঢালার সময় আড়চোখে লক্ষ্য করল, লোকটা ওর বুকের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। মুখ থেকে বোতল নামাবার সময় দু'হাত দিয়ে সেটাকে শক্ত করে ধরল এষা, তারপর বিদ্যুৎগতিতে নামিয়ে আনল রেডিও অপারেটরের চাঁদির ঠিক মাঝখানে।

আওয়াজটা শুনে চোখ-মুখ কুঁচকে শিউরে উঠল এষা। পরমুহূর্তে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। চোখ মেলে ওর দিকে তাকিয়ে আছে রেডিও অপারেটর! আরে, তোমার না জ্ঞান হারাবার কথা! এক সেকেন্ড, দু'সেকেন্ড অপেক্ষা করল এষা। উঁহুঁ, চোখ বন্ধ করছে না। আচ্ছা ত্যাঁদড় লোক তো! আবার মারব কিন্তু! হুমকি-ধমকিতে কাজ হলো না, অগত্যা বোতলটা তুলে আবার এক ঘা বসাতে হলো।

এবার চোখ বন্ধ করে চেয়ারে নেতিয়ে পড়ল রেডিও অপারেটর।

চট করে খোলা দরজার দিকে একবার তাকাল এষা। খোদা, এখন যদি কেউ এসে পড়ে! তারপর আবার ফিরল অজ্ঞান রেডিও অপারেটরের দিকে। তোমাকে এখন আমি কাবার্ড পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাই কিভাবে? চেয়ারের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল এষা। পিছন থেকে ঠেলা দিয়ে ফেলে দিল লোকটাকে। সেজদা দেবার ভঙ্গিতে মেঝেতে পড়ল অপারেটর। চেয়ার সরিয়ে লোকটার পা ধরল এষা। টানতে গিয়ে দেখল, অসম্ভব ভারী। খানিকটা নিয়ে যেতেই হাঁপিয়ে উঠল সে।

কাবার্ডের সামনে তো নিয়ে আসা গেল, কিন্তু ভেতরে ভরা যায় কিভাবে? তারপর মনে পড়ল, আরও কাজ বাকি আছে। পকেটে করে তুলো আর রশি নিয়ে এসেছে সে, সেগুলো কাজে লাগানো দরকার। লোকটার হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধল আগে, তারপর মুখের ভেতর খানিকটা তুলো গুঁজে দিল।

দরজার দিকে তাকাল, কেউ আসছে নাকি? ভিড়িয়ে দিল ওটা।

লোকটার মাথার কাছে দাঁড়াল এবার। দুই বগলের নিচে হাত দিয়ে উঁচু করার চেষ্টা করল তাকে। দু'বার তুলল, দু'বারই খসে গেল হাত থেকে। ডেকের সাথে লোকটার মাথা ঠোকার আওয়াজ শুনে চোখ-মুখ কুঁচকে উঠল, কিন্তু ভাবল, এর একটা ভাল দিকও আছে—সহজে জ্ঞান ফিরবে না।

তিনবারের চেষ্টায় লোকটাকে কিছুটা তুলতে পারল এষা। কিন্তু তাকে কাবার্ডে তোলার সময় আবিষ্কার করল, তার সাথে ওকেও ভেতরে ঢুকতে হবে।

কাবার্ডের ভেতর নিজে আগে ঢুকল এষা। তারপর লোকটাকে উঁচু করে ভেতরে ঢুকিয়ে নিতে চেষ্টা করল। সময় সম্পর্কে এই মুহূর্তে কোন ধারণা নেই ওর, লোকটা জ্ঞান হারাবার পর পনেরো মিনিট কেটে গেছে, জানে না। আরও পাঁচ মিনিট কসরৎ করার পর কাবার্ডের ভেতর লোকটাকে তুলতে পারল ও। তারপর লোকটার নিচে থেকে অনেক কষ্টে বেরিয়ে এল বাইরে। কিন্তু দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখল, বাইরের দিকে বেরিয়ে আছে অপারেটরের কনুই, কপাট বন্ধ করা যাচ্ছে না। শরীরটা বাইরের দিকে কাত হয়ে আছে, তাই হাতটা সরিয়ে দিয়েও লাভ হলো না, ছেড়ে দিলেই বাইরের দিকে বেরিয়ে আসছে সেটা। 'জ্বালাতন আর কি!' বলে আরেক টুকরো রশি বের করে হাতটাকে লোকটার গলার সাথে বাঁধল ও। এবার বন্ধ হলো কাবার্ডের দরজা।

মনে করল একটু জিরিয়ে নেবে, কিন্তু রিস্টওয়াচে চোখ পড়তেই আঁতকে উঠল এষা। পাঁচটা বাজতে আর মাত্র দশ মিনিট বাকি। সর্বনাশ! একটু পরই হোয়াইট রোজের রাডার স্ক্রীনে ধরা পড়ে যাবে ইমপেরিয়াল। একটু পরই এখানে এসে হাজির হবে রিচি। যে-কোন মুহূর্তে জ্ঞান ফিরে আসবে রেডিও অপারেটরের।

রেডিও ডেস্কে বসল এষা। ট্র্যান্সমিট লেখা সুইচটা এক ঝটকায় অন করল। ইমপেরিয়ালের ওয়েভলেংথে টিউন করা আছে একটা সেট, সেটাকেই বেছে নিয়েছে ও। মাইক্রোফোনের দিকে ঝুঁকে পড়ল ও।

'কলিং ইমপেরিয়াল, কাম ইন প্লীজ।'

অপেক্ষা করল এষা।

কোন সাড়া নেই।

'কলিং ইমপেরিয়াল, কাম ইন প্লীজ।'

কই, কিছু না।

'কি হলো তোমার, মাসুদ? কথা বলছ না কেন? মাসুদ, মাসুদ, তুমি কোথায়—আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? ইমপেরিয়াল? মাসুদ? ইমপেরিয়াল? অ্যাই মাসুদ!'

ইউরেনিয়াম চেক করে হোল্ড থেকে উঠে এল রানা, একজন নাবিক ছুটে এল ওর দিকে। 'স্যার।'

'কি ব্যাপার?'

'জাহাজের কোথাও খুঁজতে বাকি রাখিনি,' বলল নাবিক। 'রেডিও সিগন্যাল, স্যার। ঠিক কোড সিগন্যাল নয়…স্পীচ। ইমপেরিয়ালকে ডাকছে। আমরা উত্তর দেইনি, কারণ এটা তো এখন আর ঠিক ইমপেরিয়াল নয়! মেয়েটা…'

'মেয়ে?'

'হ্যাঁ, স্যার। মনে হচ্ছে খুব কাছাকাছি কোথাও থেকে ডাকছে। বলছে, মাসুদ, আমার সাথে কথা বলো!'

ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়েই যাচ্ছিল নাবিক, বাল্কহেড ধরে কোনমতে সামলে নিল নিজেকে। আবার যখন তাকাল, দেখতে পেল না রানাকে।

রেডিও থেকে পরিষ্কার বেরিয়ে এল রানার কণ্ঠস্বর, 'ইমপেরিয়ালকে কে ডাকছ?'

বোবা হয়ে গেল এষা। যার জন্যে এত কষ্ট করতে হয়েছে, সেই কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে হঠাৎ করেই দুর্বল আর অসহায় লাগল নিজেকে।

'কে ডাকছ ইমপেরিয়ালকে?'

এতক্ষণে ভাষা খুঁজে পেল এষা। 'আমি ডাকছি। তুমি কোথায়, মাসুদ?'

জবাব নেই।

'মাসুদ?'

'তুমি এষা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'কোত্থেকে?'

নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করল এষা। কথা যা বলার সংক্ষেপে গুছিয়ে বলতে হবে। 'কর্নেল রিচির হাতে বন্দী। আমি একটা ব্রিটিশ জাহাজ হোয়াইট রোজে রয়েছি। নোট করো, রানা।' হোয়াইট রোজের পজিশন, স্পীড আর কোর্স বলে গেল সে। 'এসব চারটে দশের হিসেব। রানা, আমাদের এই জাহাজ তোমার জাহাজকে ছ'টার সময় ধাক্কা দিতে যাচ্ছে…'

'কি? ধাক্কা…ও, হ্যাঁ, বুঝেছি…'

'রানা, যে-কোন মুহূর্তে আমি ধরা পড়ে যেতে পারি। রেডিও ব্যবহার করছি তা যদি দেখে ওরা, মেরেই ফেলবে। তোমার জন্যে কি করতে পারি বলে দাও আমাকে…তাড়াতাড়ি…'

এক সেকেন্ড চিন্তা করে জানতে চাইল রানা, 'সাড়ে পাঁচটার সময় এমন কিছু করতে পারবে, ওরা যাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে?'

'মানে? বুঝলাম না।'

'কোথাও আগুন ধরিয়ে দাও, চোর চোর করে হাঁক দিয়ে ওঠো…যা তোমার খুশি। পানিতে মানুষ পড়ে গেছে বলে চেঁচাতে পারো।'

'ঠিক আছে, বুঝেছি…পারব।'

'আমি চাই ওরা যেন দিশেহারা হয়ে পড়ে,' বলল রানা। 'ছুটোছুটি শুরু হয়ে যায়। ওরা সবাই কি সি.আই.এ-র লোক?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে, এখন শোনো…'

রেডিওরুমের দরজা খুলে গেল। ট্র্যান্সমিটের বোতামটা টিপে দিল এষা, দরজার আওয়াজে চাপা পড়ে গেল সুইচ অন করার শব্দ। ঘরে ঢুকল রিচি। 'অপারেটর কই?' কর্কশ সুরে জানতে চাইল সে।

জোর করে হাসতে চেষ্টা করল এষা। 'কফি খেতে গেছে। কি আর করা, আমিই দোকানদারি করছি।'

'কাজের সময় কখনও যদি পাই গর্দভটাকে!' যেমন এসেছিল তেমনি দ্রুত বেরিয়ে গেল রিচি, রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে।

আবার ডাকল এষা। 'মাসুদ…'

'শুনেছি,' বলল রানা। 'সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকো।'

'দাঁড়াও! তোমার কি হবে তাই বলো।'

'আমার আবার কি হবে? আমি আসছি তোমাকে নিতে।'

'কি? আমাকে…'

'যাও, এখন লুকাও…'

'আই লাভ ইউ, মাসুদ।'

'ইয়া, আই নো।'

সুইচ অফ করে দিল এষা, সেই সাথে লক্ষ্য করল, আরেক সেট থেকে মোর্স সিগন্যাল আসছে। প্রথমে তেমন কিছু ভাবল না সে, কিন্তু তারপরই বুঝল

ব্যাপারটা। হিলারী! রানা আর ওর সব কথা শুনেছে হিলারী! ইস্, রানাকে লোকটার কথা বলা হয়নি। কি হবে এখন? সন্দেহ নেই, রিচিকে সাবধান করার জন্যে সিগন্যাল পাঠাচ্ছে হিলারী।

রানার সাথে যোগাযোগ করবে আবার? সাংঘাতিক ঝুঁকি নেয়া হয়ে যায়। তাতে কোন লাভ নেই। হিলারীকে খুঁজে বের করতে সময় লাগবে রানার, ততক্ষণে রিচিকে সাবধান করে দেবে হিলারী। রিচি জানবে, রানা আসছে। রানার জন্যে ফাঁদ পেতে রাখবে সে।

যেভাবে হোক, হিলারীর এই মেসেজ আটকাতে হবে। কিন্তু কিভাবে? রেডিওর তার কোথায়? নিশ্চয়ই প্যানেলের পিছনে। স্ক্রু ড্রাইভার দরকার। জলদি! জলদি! অপারেটরকে খোঁজার জন্যে আবার আসবে রিচি। ওটা কি? রেডিও অপারেটরের টুলবক্স না?

ছোট একটা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে প্যানেলের দুটো কোণ খুলে ফেলল এষা। স্ক্রু ড্রাইভার পকেটে রেখে হাত দিয়ে ধরে টানাটানি শুরু করল প্যানেলটা। ভেঙে গেল সেটা।

ভেতরে এত তার, দেখে তাজ্জব বনে গেল এষা। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা ছিঁড়বে ভেবে পেল না। তারপর মুঠোর ভেতর যতগুলো আঁটে ধরে হ্যাঁচকা এক টান দিল। কয়েকটা ছিঁড়ল, কয়েকটা খুলে এল। কিন্তু কাজ হলো না কিছু। সেটটা থেকে আগের মতই বেরিয়ে আসছে সিগন্যাল। পাগলের মত হয়ে উঠল এষা। একসাথে বেশি নয়, দু'তিনটে করে তার ধরে, হ্যাঁচকা টান দেয়। কিন্তু অবস্থা যেকে সেই। মোর্স কোড বকর বকর করে চলেছে। বোতলে যেটুকু শ্যাম্পেন আছে, সব ঢালল রেডিওর ভেতর। সাথে সাথে মোর্স থেমে গেল, প্যানেলের সব ক'টা আলো নিভে গেল একসাথে।

গুঙিয়ে উঠল কে যেন। কে? তারপর রেডিও অপারেটরের কথা মনে পড়ল এষার। লোকটার জ্ঞান ফিরে আসছে। আসুক। রেডিওরুম থেকে বেরিয়ে পড়ল ও। মই বেয়ে সোজা ডেকে এসে নামল। চিন্তা করছে, কোথায় লুকাব আমি? কি করলে ওরা সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠবে? আচ্ছা, নোঙরটা নামিয়ে দিলে কেমন হয়? দূর!

তারপর ভয় লাগল। একটু পর ওর কীর্তির কথা জানাজানি হয়ে যাবে। ওকে খুঁজে বের,করার জন্যে সার্চ পার্টি পাঠাবে রিচি।

গা ঢাকা দিতে চাইলে একটা জাহাজের সবচেয়ে ভাল জায়গা কোনটা? নিচেটা? এঞ্জিন রুম? ডেক থেকে সরে এল ও। নিচের দিকে নামার জন্যে একটা কম্প্যানিয়নওয়ের দিকে এগোচ্ছে, সেটা ধরে উঠে এল রিচি। তার দিকে তাকালই না ও। পাশ ঘেঁষে যাচ্ছে সে, ও বলল, 'রেডিও অপারেটর ফিরেছে দেখে এলাম।'

গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকাল রিচি। হন হন করে রেডিওরুমের দিকে চলে গেল।

দ্রুত পায়ে এঞ্জিন রুমে চলে এল এষা। সেকেন্ড এঞ্জিনিয়ার ডিউটি দিচ্ছে। এষাকে আসতে দেখে চোখ রগড়াল সে। হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ নেড়ে বলল এষা, 'না, আমি পেত্নী নই।'

'কোথায় তোমাকে বসতে দিই বলো তো।' লোকটাকে অসহায় দেখল।
'বসতে আসিনি,' বলল এষা। 'জাহাজের মধ্যে এই জায়গাটাই শুধু গরম, আঁচ পেতে এসেছি আমি।' শরীরটা একটু কাঁপিয়ে আবার বলল ও, 'বাপরে, কি ঠাণ্ডা বাইরে। তোমার কোন আপত্তি নেই তো? আমি যদি কিছুক্ষণ থাকি এখানে?'
'সেকি! না-না! আপত্তি কিসের! যতক্ষণ খুশি থাকো না।'
'ধন্যবাদ।'
এষার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সেকেন্ড এঞ্জিনিয়ার। খানিক পর পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বের করে বলল, 'এখানে তোমাকে আমি আর কি দিয়ে আপ্যায়ন করব, বলো। সিগারেট চলবে?'
'খাই না,' বলল এষা। 'তবে তুমি যখন দিচ্ছ, ফিরিয়ে দিই কিভাবে—দাও।'
বেশ কিছুক্ষণ নানান গল্প করল, আরেকটা সিগারেট নিল লোকটার অনুরোধে।
লাইটার জ্বেলে সিগারেটটা ধরিয়ে দিল সেকেন্ড এঞ্জিনিয়ার। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হ্যাচের দিকে তাকাল এষা, মনে মনে আশঙ্কা করল, রিচিকে নেমে আসতে দেখবে। রিস্টওয়াচ দেখল ও। হায় খোদা, এরই মধ্যে পাঁচটা পঁচিশ হয়ে গেছে! চিন্তা করার আর সময় নেই। কিছু একটা করতে হবে, এখুনি। কিন্তু কি করবে সে? বাঁচাও, বাঁচাও বলে চিৎকার করবে? জাহাজ থেকে কাউকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে? নোঙর ফেলবে? আগুন ধরাবে?
হ্যাঁ!
কিন্তু কি দিয়ে? কিসে?
পেট্রল! এখানে, এই এঞ্জিনরুমে পেট্রল না থেকেই পারে না। কিংবা হয়তো ডিজেল আছে। তাতেও চলবে। এঞ্জিনের দিকে তাকাল ও। কোত্থেকে আসে পেট্রল? এত পাইপ, এত টিউব! এগুলোর কোন্টায় পেট্রল আছে বুঝবে কিভাবে? গাড়ি আর জাহাজের সাথে কি কোন মিল আছে? গাড়ির এঞ্জিন আর জাহাজের এঞ্জিনে কি মিল আছে? কেব্‌লগুলো কি স্পার্ক প্লাগের দিকে গেছে? নিজেদের গাড়ির স্পার্ক প্লাগ একবার বদলেছিল ও।
খুঁটিয়ে দেখল এষা। হ্যাঁ, অনেকটা গাড়িরই মত। ছয়টা প্লাগ দেখল ও। কেব্‌লগুলো বেরিয়ে এসে ঢুকেছে গোল একটা ক্যাপে, দেখতে অনেকটা ডিসট্রিবিউটরের মত। এখানে কোথাও একটা কারবুরেটর না থেকেই পারে না। কারবুরেটরের মধ্যে দিয়েই তো পেট্রল যায়...
ভয়েস পাইপে কর্কশ গলা পাওয়া গেল। রিচির। সেকেন্ড এঞ্জিনিয়ার হন হন করে এগোল সেদিকে।
এ-ই সময়! এরপর আর সুযোগ হবে না। লোকটা ওর দিকে পিছন ফিরে রয়েছে।
ওটা কি? কৌটোর মত দেখতে, ঢাকনির মাঝখানে একটা মাত্র নাট। আঙুল দিয়ে সেটার প্যাঁচ ঘোরাতে চেষ্টা করল এষা। একচুল নড়ে না। কিন্তু চেষ্টা চালিয়ে গেল। আঙুলের মাথা জ্বালা করছে, চামড়া উঠে যাচ্ছে। উঁহুঁ, এভাবে হবে না। মোটা-সোটা প্লাস্টিকের পাইপ বেরিয়ে এসেছে কৌটো থেকে। সেটা ধরে টানল ও। তারপর মনে পড়ল, রেডিও অপারেটরের স্ক্রু ড্রাইভারটা রয়েছে

পকেটে।

স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে মোটা পাইপে খোঁচা দিল এষা।

ভয়েস পাইপের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সেকেন্ড এঞ্জিনিয়ার। রিচির সাথে কথা বলছে সে। এঞ্জিনের আওয়াজে তার কথা শুনতে পেল না ও।

একবার, দু'বার, তিনবার, বারবার। একই জায়গায় খোঁচা দিচ্ছে এষা। ফুটো হয়ে গেল পাইপ। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল তরল পেট্রল। গন্ধটা নাকে যেতেই আনন্দে লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছে করল তার। স্ক্রু ড্রাইভার ফেলে মইয়ের দিকে ছুটল সে।

মইয়ের মাথায় উঠে থামল এষা। ঘুরল। দেখল, ভয়েস পাইপের কাছ থেকে তার দিকে বোকার মত তাকিয়ে আছে সেকেন্ড এঞ্জিনিয়ার। তারপর ছুটতে শুরু করল সে। বুঝতে অসুবিধে হলো না এষার, রিচির নির্দেশে ওকে ধরার জন্যে ছুটে আসছে লোকটা।

এঞ্জিনরুমের মেঝেতে এরই মধ্যে পেট্রলের ছোট পুকুর তৈরি হয়ে গেছে। এঞ্জিনিয়ারের দেয়া সিগারেটটা এখনও রয়েছে হাতে। আর কিছু না পেয়ে সেটাই পেট্রলের দিকে ছুঁড়ে দিল ও। কোথায় পড়ল দেখার জন্যে অপেক্ষা না করে ঘুরে দাঁড়াল, তারপর ছুটল।

হ্যাচ গলে ডেকে বেরিয়ে আসবে, এই সময় ভয়ঙ্কর একটা হুস শব্দ আর চোখ ধাঁধানো আলো। মইয়ের ওপর পড়ে গেল এষা। আগুন ধরে গেছে ওর ট্রাউজারে। আত্মরক্ষার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল সে। উঠে দাঁড়াল, কিন্তু আবার পড়ে গেল মইয়ের ওপর। এইভাবে কয়েকবার। তারপর চিৎকার করতে শুরু করল সে। ট্রাউজারের আগুন ওপর দিকে উঠে আসছে। মাংস পোড়ার তীব্র গন্ধ ঢুকল নাকে।

হ্যাচ গলে কিভাবে যে বেরিয়ে এল, বলতে পারবে না এষা। মইয়ের ওপর বারবার পড়ে যাওয়ায় প্রাণে বেঁচে গেছে ও। নিজের চেষ্টায় কাপড়ের ওই আগুন নেভাতে পারত না। টলতে টলতে গ্যাংওয়ে ধরে এগোল সে। গোটা জাহাজে ফায়ার অ্যালার্ম বাজছে। গ্যাংওয়ের শেষ মাথায় পৌঁছে মইয়ের গায়ে হেলান দিয়ে হাঁপাতে লাগল সে। ওপরে উঠতে হবে তাকে। এমন কোথাও থাকতে হবে যেখানে সহজেই দেখতে পাবে ওকে রানা। মাসুদ! মাসুদ!

মইয়ের ওপর পা তুলল একটা। তারপর আর একটা। কিন্তু মাঝখানে সময় লেগে গেল দশ সেকেন্ড। আরও তাড়াতাড়ি, এষা! তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি! সময় নেই!

তেরো

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এবার ধরে দু'বার ছোট একটা বোট নিয়ে উন্মত্ত সাগর পাড়ি দিচ্ছে রানা। শত্রুদের একটা জাহাজে চড়তে যাচ্ছে ও। আগের মত একই কাপড় পরে আছে—লাইফ জ্যাকেট, অয়েলস্কি, সী-বুট। সাথে রয়েছে সাব-মেশিনগান,

পিস্তল, গ্রেনেড। কিন্তু এবার রানা একা।

এষার রেডিও মেসেজের ব্যাপারে কি করা হবে তা নিয়ে জাহাজে ওদের সাথে একটা তর্ক হয়ে গেছে রানার। এষার সাথে ওর কথাবার্তা তিনজন শুনেছে—ক্যাপ্টেন, মোবারক আর জহির। রানার চেহারায় আনন্দ আর উত্তেজনা দেখে এরা তিনজনই ধরে নিয়েছিল, ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দিচ্ছে ও, সাধারণ সতর্কতাবোধ হারিয়ে ফেলেছে।

'এটা যে ফাঁদ তাতে কোন সন্দেহ নেই,' বলল মোবারক। 'আমাদেরকে ধরার কোন আশা দেখতে না পেয়ে মেয়েটাকে দিয়ে এই মেসেজ পাঠিয়েছে, আমরা যাতে জাহাজ ঘুরিয়ে নিয়ে ওদের দিকে এগোই।'

'আমি তা মনে করি না,' বলল রানা। 'রিচিকে আমি চিনি। ইমপেরিয়ালকে ধাক্কা দিতে চাওয়া, একমাত্র তার মাথাতেই এই ধরনের বুদ্ধি আসতে পারে। এখন ওই জাহাজ ধ্বংস না করে কোন উপায় নেই।'

'ঠিক আছে, যখন আসে তখন দেখা যাবে,' বলল জহির। 'ইতিমধ্যে যেমন যাচ্ছি আমরা...'

'আমিও তো তাই বলছি,' বলল রানা। 'তোমরা থেমো না, কিন্তু আমাকে হোয়াইট রোজে যেতে হবে।'

'বোকার মত কথা বলছ তুমি, রানা।' রেগে গেল মোবারক। 'তুমি গেলে আমরাও যাব। তুমি একার চেষ্টায় একটা জাহাজ দখল করতে চাও নাকি?'

'আমার যুক্তিটা আগে শোনো, তারপর তর্ক কোরো,' বলল রানা, আগের চেয়ে শান্ত দেখাল ওকে। 'হ্যাঁ, আমি একাই জাহাজটাকে ধ্বংস করতে চাই। যদি পারি, এই জাহাজের বিপদ কেটে যাবে। আর যদি না পারি, ফাইট দেবার জন্যে তোমরা সবাই তো এখানে থাকছই। থামো, আরও আছে। হোয়াইট রোজ যদি সত্যি আমাদেরকে ধরতে পারবে না বলে মনে করে থাকে, এটা যদি একটা ফাঁদই হয়, তাহলে সেই ফাঁদে একমাত্র আমি পড়ছি। এরচেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কি হতে পারে?'

কিন্তু রানার কোন যুক্তিই মেনে নিতে রাজি হলো না ওরা। শেষ পর্যন্ত রেগেমেগে ওদেরকে বলল রানা, 'তোমরা নিজেদের ক্ষমতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ। ভুলে যাচ্ছ, আমার আন্ডারে কাজ করার জন্যে এসেছ তোমরা। সাথে করে আমি শুধু আমার জানটা নিয়ে যাচ্ছি, কাজেই ভাল হচ্ছে কি মন্দ হচ্ছে সেটা তোমাদের মুখ থেকে আমি শুনতে চাই না।'

এরপর ওরা আর তর্ক করেনি। বরং সাহায্য করেছে। নামিয়ে দিয়েছে ওকে একটা বোটে করে। রেডিও সেট দিয়ে দিয়েছে সাথে।

এখন উত্তাল সাগর পেরিয়ে হোয়াইট রোজের দিকে যাবার সময় ভয় ভয় করছে রানার। ও একা হোয়াইট রোজ দখল করবে, সেটা সম্ভব নয়। হোয়াইট রোজে সি.আই.এ-র লোক আছে, তারা সঙ সেজে দাঁড়িয়ে থাকবে না। অবশ্য সে-ধরনের কোন প্ল্যান নেই-ও রানার। ও যাচ্ছে একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে। এষাকে উদ্ধার করতে হবে।

যুক্তি দিয়ে নয়, অন্তরের অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পারছে রানা, এটা ফাঁদ নয়।

মনের একটা অংশ যুক্তি মেনে চলে, সেই অংশটা লে. জেনারেল আলি কারামের কথা বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু মনের আরেকটা অংশ আছে, সেটা অনেক সময় যুক্তি মানে না, অনুভূতি আর বোধের নির্দেশ শোনে, সেই অংশটা মুহূর্তের জন্যেও বিশ্বাস করেনি যে এষা তার সাথে বেঈমানী করেছে বা করতে পারে। মনের ওদিক থেকে বারবার একটা খবরই পেয়ে এসেছে সে, এষার ভালবাসার মধ্যে কোন গলদ নেই, ভান নেই, খাদ নেই, ছলনা নেই—কখনও ছিল না।

মাথা থেকে এসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সাগরের দিকে মন দিল রানা। পনেরো মিনিটের মধ্যে হোয়াইট রোজকে দেখতে পাবার কথা। কিন্তু কোথায় সে? বৃষ্টির মধ্যে কোথাও কিছু চোখে পড়ল না।

রাতের অন্ধকারে একটা জাহাজকে খুঁজে বের করা সহজ কথা নয়। মনে যখন ভয় ধরতে শুরু করেছে, জাহাজটা ওকে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে নাকি, এই সময় দেখতে পেল ও। একেবারে নাক বরাবর এগিয়ে আসছে ওর দিকে। কোর্স না বদল করলে মুখোমুখি সংঘর্ষ হবে, তাড়াতাড়ি বোটের নাক একটু ঘুরিয়ে নিল ও।

কোমরে রশি বেঁধে তৈরি হয়ে আছে ও। বোটটাকে আরও একটু ঘুরিয়ে নিল। কাছে এসে পড়েছে হোয়াইট রোজ। পাঁচশো গজ দূরে রয়েছে জাহাজ, এই সময় বোট ঘুরিয়ে নিল ও। জাহাজ যেদিকে যাচ্ছে, ওর বোটও সেদিকে ছুটছে এখন। পিছন থেকে দ্রুত এগিয়ে আসছে হোয়াইট রোজ, মাঝখানের দূরত্ব কমছে ক্রমেই।

তারপর একেবারে পাশে চলে এল জাহাজ। বোটের স্পীড একেবারে কমিয়ে দিল রানা। হোয়াইট রোজের মই নাগালের মধ্যে চলে এল। বোটের কিনারায় পা রাখল ও, তারপর লাফ দিল।

মইয়ের ওপর পড়ল রানা, হাত দিয়ে ধরে ফেলে ঝুলে রইল জাহাজের গায়ের সাথে। প্রথম কাজ সিঁড়ির সাথে বোটটা বেঁধে ফেলা, তারপর ম্যাগনেটিক মাইনটা খোলের গায়ে আটকে দেয়া। কোমরের দড়িটা জায়গামত বেঁধে বেল্ট থেকে মাইনটা বের করল ও। হাত বাড়িয়ে হোয়াইট রোজের গায়ে ঠেকাবার আগেই ছুটে গেল মাইন, কিন্তু পানিতে পড়ার আগে নিজে থেকেই সেঁটে বসল জাহাজের গায়ে।

হাঁপ ছাড়ল রানা। ইউরেনিয়ামের নিরাপত্তা নিশ্চিত হলো।

অয়েলস্কিন খুলে ফেলে দিল রানা, মই বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল ধীরে ধীরে। বোটের আওয়াজ এই দুর্যোগের মধ্যে শুনতে পাবার কথা নয়, হয়তো অন্য কোন কারণে সন্দেহ হয়েছে লোকটার—রেইলের ওপর দিয়ে তাকিয়েছে, ঠিক এই সময় রানাও মাথা তুলল।

মুহূর্তের জন্যে লোকটার চোখে পলক পড়ল না। তারপর বিস্ময় ফুটে উঠতে শুরু করল চেহারায়। রেইল টপকে উঠতে চেষ্টা করছে রানা, একটা হাত বাড়িয়ে দিল তার দিকে, যেন সাহায্য চাইছে। অভ্যাসের বসে হাত বাড়িয়ে রানাকে ধরল লোকটা, টেনে তুলে ফেলল রেলিঙের ওপর। হাঁটু ভাঁজ করা অবস্থায় ডেকে নামল রানা, সিধে হবার সময় লোকটার পা ধরে ওপর দিকে ধাক্কা দিল জোরে। রেইল টপকে সাগরে গিয়ে পড়ল সে। তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকারটা চাপা পড়ে গেল সাগরের একটানা গর্জনে।

রেইলের দিকে পিছন ফিরে চারদিকে তাকাল রানা।

ইমপেরিয়ালের চেয়ে অনেক ছোট জাহাজ হোয়াইট রোজ। অ্যামিডশিপে একটা মাত্র সুপারস্ট্রাকচার, দুই ডেক উঁচু। কোন ক্রেন নেই। ফরওয়ার্ড হোল্ডের ওপর বড়সড় একটা হ্যাচ দেখা গেল, কিন্তু পিছনে হোল্ড নেই। ক্রুদের থাকার জায়গা আর এঞ্জিনরূম জাহাজের পিছন দিকে ডেকের নিচে হবে বলে অনুমান করল রানা।

হাতঘড়ি দেখল ও। পাঁচটা পঁচিশ। সময় হয়ে এসেছে, এষা কিছু করতে পারবে তো?

ডেক ধরে এগোল রানা। জাহাজের ল্যাম্প থেকে কিছুটা আলো আসছে বটে, কিন্তু ওর চেহারা চিনতে হলে খুব কাছ থেকে দেখতে হবে ওকে। খাপ থেকে বের করে ছুরিটা বেল্টে গুঁজে রাখল ও। বাধ্য না হলে গুলি করতে চায় না, যত কম আওয়াজ করা যায় ততই ভাল। চুপিচুপি এষাকে নিয়ে কেটে পড়তে পারলে আর কিছু চায় না ও।

সুপারস্ট্রাকচারের সামনে পড়তে যাবে, এই সময় একটা দরজা খুলে গেল, ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ভিজে ডেকে পড়ল হলদেটে ম্লান আলো। সাঁৎ করে একটা কোণে সরে এসে গা ঢাকা দিল রানা। দু'জন লোকের গলা পাওয়া গেল। কথাগুলো ধরতে পারল না ও। দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ। জাহাজের পিছন দিকে চলে গেল লোকগুলো।

পোর্ট সাইডে চলে এল রানা, তারপর এগোল স্টার্নের দিকে। খানিকদূর এসে একটা বাল্কহেডের আড়াল থেকে উঁকি দিল ও। লোকগুলো আফটারডেক পেরিয়ে এসে আর একজনের সাথে কথা বলছে। রানার মাথায় একটা ঝোঁক চাপল, ব্রাশ ফায়ার করে তিনজনকেই উড়িয়ে দেবে নাকি! এরা তিনজন শত্রুদের পাঁচ ভাগের একভাগ তো হবেই, সুতরাং বাকি থাকবে আর চার ভাগ। কিন্তু না, লোকগুলো এমনিতেই মারা যাবে, উটকো ঝামেলার মধ্যে গিয়ে লাভ কি। প্রথম কাজ এষাকে উদ্ধার করা। কিন্তু কোথায় সে?

স্টারবোর্ড ডেক ধরে ফিরে এসে ভেতরে ঢুকে গেল লোক দু'জন। আড়াল থেকে বেরিয়ে অপর লোকটার দিকে এগোল রানা। এ বোধহয় এখানে পাহারায় রয়েছে। পাহারাদার থাকলে অসুবিধে আছে ওর। 'কে?' জানতে চাইল লোকটা। বিড়বিড় করে বলল রানা, 'আমি।' লোকটার দু'হাতের মধ্যে চলে এল ও, তারপর লাফ দিয়ে এগিয়ে তার কণ্ঠনালীটা কেটে দিল।

লাশটা রেইলের ওপর দিয়ে সাগরে ফেলে দিল রানা। দু'জন গেল। কিন্তু ওর উপস্থিতির কথা এখনও কেউ জানে না। আবার রিস্টওয়াচ দেখল ও। সাড়ে পাঁচটা। না, ডেকে ঘুর ঘুর করার আর কোন মানে হয় না। ভেতরে ঢুকতে হবে।

একটা দরজা খুলে তাকাল রানা। একটা গ্যাংওয়ে, একটা কম্প্যানিয়নওয়ে। দুটোই ফাঁকা, সম্ভবত ব্রিজের দিকে উঠে গেছে। মই বেয়ে উঠতে শুরু করল ও।

ব্রিজ থেকে চড়া গলা ভেসে আসছে। কম্প্যানিয়নওয়েয়ের মাথা থেকে উঁকি দিয়ে তাকাল রানা। তিনজন লোককে দেখতে পেল ও। এরা বোধহয় ক্যাপ্টেন, ফার্স্ট অফিসার আর সেকেন্ড সাব-লেফটেন্যান্ট। ভয়েস পাইপে চিৎকার করছে ফার্স্ট

অফিসার। সাব-মেশিনগানটা ওদের দিকে তাক করল রানা, ক্যাপ্টেন হাত বাড়িয়ে একটা লিভার টেনে দিল। গোটা জাহাজে অ্যালার্ম বাজতে শুরু করল। ট্রিগার টেনে ধরল রানা।

সাব-মেশিনগানের আওয়াজ অনেকটাই চাপা পড়ে গেল অ্যালার্মের একটানা শব্দে। ওখানে দাঁড়িয়েই মারা গেল তিনজন লোক। লাশগুলো পড়ল নাকি দাঁড়িয়েই রইল, দেখার জন্যে ওখানে থাকল না রানা। মই বেয়ে তর তর করে নেমে এল ডেকে।

মইয়ের গোড়া থেকে দু'দিকের দুটো গ্যাংওয়ে চলে গেছে। একটা আগেই ব্যবহার করেছে রানা, অপরটা সুপারস্ট্রাকচারের সাথে এগিয়ে শেষ মাথার দিকে চলে গেছে। অ্যালার্মের আওয়াজ পেয়ে দরজা খুলে যাচ্ছে, দুটো গ্যাংওয়েতেই বেরিয়ে আসছে লোকজন। কারও কাছে কোন অস্ত্র দেখল না রানা। মানুষের সাথে নয়। আগুনের সাথে যুদ্ধ করার ডাক দেয়া হয়েছে, অস্ত্র থাকার প্রশ্নই ওঠে না। দেখা যাক শালাদের ধোঁকা দেয়া যায় কিনা, কাজ হলে গুলি চালাবার দরকার নেই। লোকজন যেদিকে বেশি, সেদিকেই এগোল ও। ভিড় ঠেলে এগোবার সময় আমেরিকান উচ্চারণে বলল, 'পথ ছাড়ো, পথ ছাড়ো, যেতে দাও।' তাকিয়ে থাকল সবাই। কেউ জানে না কে ও, কোথায় যাচ্ছে, কি করতে চায়। কিন্তু জানে, জাহাজে আগুন লেগেছে, আর এই অচেনা লোকটাই সি.আই.এ. কর্মকর্তা গোছের কেউ বলে মনে হচ্ছে। দু'একজন কথা বলতে চেষ্টা করল রানার সাথে। কিছু শোনার সময় নেই এমন ভাব দেখিয়ে এগিয়ে চলল ও। এই সময় চড়া গলায় নির্দেশ এল একপাশ থেকে, লোকগুলো আরেক দিকে ছুটল। গ্যাংওয়ের শেষ মাথায় এসে লাফ দিয়ে নিচে নামল রানা।

লোয়ার ডেকের পরিস্থিতি অন্য রকম। সবাই ছুটছে একই দিকে, জাহাজের পিছন দিকে। একজন অফিসারের সাথে তিনজন লোককে দেখা গেল, বাল্কহেডের গা থেকে ভেঙে নামাচ্ছে আগুন নেভাবার সরঞ্জাম। আর একটু সামনে, গ্যাংওয়ে যেখানে বেশ চওড়া হয়ে গেছে, কাকে যেন পড়ে থাকতে দেখল রানা। মুহূর্তে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক।

এষা!

বাল্কহেডে পিঠ ঠেকিয়ে ডেকের ওপর শুয়ে আছে এষা। পা দুটো ছড়ানো, ট্রাউজার ছিঁড়ে গেছে। একটা পায়ের প্রায় হাঁটু পর্যন্ত জায়গায় জায়গায় চামড়া নেই। এষার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে জ্যাক রিচি। 'বল, শালী, কি বলেছিস তুই রানাকে?'

ছুটল রানা। একজন লোক পথ রোধ করে দাঁড়াতে চাইল। থামল না রানা, কনুইয়ের প্রচণ্ড এক গুঁতো দিয়ে সামনে থেকে সরিয়ে দিল তাকে। তারপর লাফ দিল রিচির ওপর।

রাগে অন্ধ হয়ে গেলেও রানা বুঝল, এই ছোট্ট পরিসরে মেশিনগান চালাতে পারবে না ও, বিশেষ করে রিচির পাশেই যেখানে এষা রয়েছে।

রিচির কাঁধ ধরে নিজের দিকে তাকে ফেরাল রানা। ওকে দেখতে পেল রিচি। 'তুমি!' ধাঁই করে তার পেটে একটা ঘুসি মারল রানা। হুস করে বাতাস বেরিয়ে

এল রিচির গলা দিয়ে, পেট ধরে কুঁজো হয়ে গেল সে। মাথাটা নেমে আসছে, এই সময় আবার মারল রানা। এবার ভাঁজ করা হাঁটুটা বিদ্যুৎবেগে তুলল ওপর দিকে। থুতনি আর চোয়ালের হাড় ভেঙে গেল রিচির। ছিটকে সরে যাচ্ছে রিচি, সমস্ত শক্তি এক করে সাইড কিক চালাল রানা। গলার পাশে পড়ল সেটা, মড়াৎ করে ভেঙে গেল ঘাড়। বাল্কহেডের ওপর ছিটকে পড়ল সে, সেখান থেকে ডেকে।

ইতোমধ্যে একপায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে এষা। টলছে সে। রিচি ডেকে পড়ার আগেই কাঁধ থেকে মেশিনগান নামিয়ে এক পশলা গুলি ছুঁড়ল রানা, অফিসার আর তার তিনজন সহকারী মাথার ওপর হাত তুলে পিছন ফিরে ছুটল। ঘুরে দাঁড়াল রানা। এগিয়ে এসে এষার সামনে নিচু হলো, তারপর এক ঝটকায় কাঁধের ওপর তুলে নিল তাকে। এক সেকেন্ড চিন্তা করল ও। আগুন লেগেছে জাহাজের পিছন দিকে, সন্দেহ নেই। লোকজন সব ওদিকেই ছুটে গেছে। তার মানে সামনের দিকেই লোকের চোখে পড়ার সম্ভাবনা কম।

গ্যাংওয়ে ধরে ছুটল রানা। মই বেয়ে উঠতে শুরু করল। কাঁধের ওপর মড়ার মত পড়ে আছে এষা। বোধহয় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। মেইন ডেক লেভেলে উঠে এসে একটা দরজা দেখল ও, বেরিয়ে এল বাইরে।

ডেকের ওপর লোকজনের ছুটোছুটি। ওকে ধাক্কা দিয়ে ছুটে গেল একজন লোক, জাহাজের পিছন দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। আরেকজন গেল উল্টো দিকে। ব্যাটারা অন্ধ হয়ে গেছে, ভাবল ও। খানিক দূরে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে একজন, তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে দু'জন। লোকটা বোধহয় আগুনে পুড়ে আহত হয়েছে।

সামনের দিকে একটা মই দেখে ছুটল রানা, এই মই বেয়েই জাহাজে উঠেছে ও। মেশিনগানটা কাঁধে গলিয়ে নিল ও, তারপর এক কাঁধ থেকে আরেক কাঁধে নিয়ে এল এষাকে। রেইল টপকে জাহাজের বাইরে দাঁড়াল মইয়ের ওপর।

ডেকের দিকে ফিরে নামতে শুরু করল রানা, বুঝল, শত্রুদের চোখে ধরা পড়ে গেছে ও। হৈ-হাঙ্গামার সময় অচেনা লোককে দেখা এক কথা, আর কাঁধে মেয়ে নিয়ে জাহাজ থেকে কাউকে নেমে যেতে দেখা আরেক কথা। মই বেয়ে বোটের দিকে অর্ধেক পথও নামেনি ও, ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল ওরা। রানার মাথার পাশে, খোলের গায়ে লেগে পিছলে গেল একটা বুলেট। মুখ তুলে ওপর দিকে তাকাল ও। রেইলের ওপর দিয়ে নিচের দিকে ঝুঁকে রয়েছে তিনজন লোক, দু'জনের হাতে পিস্তল। বাঁ হাতে মই ধরে রেখে সাব-মেশিনগানের ট্রিগারে আঙুল রাখল রানা।

গুলি করল বটে, কিন্তু তিন মাথার ধারেকাছেও গেল না বুলেট। তবে লোকগুলো পিছিয়ে গেল। এই সময় কাত হতে শুরু করল জাহাজ। তাল সামলাবার জন্যে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে হাত থেকে পড়ে গেল সাব-মেশিনগান। ডান হাত দিয়ে মই ধরল রানা, কিন্তু মইয়ের ওপর থেকে পিছলে গেল একটা পা। ঠিক সেই সঙ্কটময় মুহূর্তেই কাঁধের ওপর থেকে নেমে যেতে শুরু করল এষা।

'আমাকে ধরে থাকো!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। কিন্তু চিৎকারটা এষার কানে পৌঁছল বলে মনে হলো না। আগের মতই কাঁধ থেকে নেমে যাচ্ছে সে। সেই

সাথে মই থেকে বাইরের দিকে কাত হয়ে পড়ল রানা। মইয়ের পিচ্ছিল লোহার ধাপ একটু একটু করে বেরিয়ে যাচ্ছে মুঠো থেকে।

'না!' আর্তনাদ বেরিয়ে এল রানার গলা থেকে।

কাঁধ থেকে নেমে গেল এষা. উত্তাল সাগরে পড়ে নিমেষে হারিয়ে গেল সে।

নিচে তাকাল রানা, বোট দেখে লাফ দিল। পতনের ধাক্কায় শরীরের সব ক'টা হাড়ে যেন ঠোকাঠুকি হয়ে গেল।

কালো সাগরের চারদিকে তাকাল রানা। বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে একটা চাপা ফোঁপানি। নাম ধরে ডাকল রানা। বোটের এদিক থেকে ওদিকে পাগলের মত ছুটে গেল। বারবার এষার নাম ধরে ডেকেই চলেছে। প্রতি সেকেন্ড কাটছে, সেই সাথে বাড়ছে হতাশা, সাগরের প্রতি একটা প্রচণ্ড বৈরী মনোভাব—বিদ্রোহ না অভিমান, ঠিক বোঝা কঠিন।

এত ডাকাডাকি, তবু সাড়া নেই। হঠাৎ একেবারে শান্ত হয়ে গেল রানা। বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকল। ঠিক তখনই কানে এল চিৎকারটা।

বাতাস আর বৃষ্টির শব্দকে ছাপিয়ে উঠল এষার গলা। শব্দ লক্ষ্য করে ঘাড় ফেরাল রানা। পানির ওপর ভেসে উঠেই আবার ডুবে গেল একটা মাথা জাহাজের খোল আর বোটের মাঝখানে, কিন্তু ওর নাগালের বাইরে।

পানির ওপর আবার মাথা তুলে এষা চিৎকার করতে চাইল, কিন্তু গলা দিয়ে পানি বেরোল শুধু। জাহাজের সাথে বাঁধা রয়েছে বোট, রশির বেশিরভাগই কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে বোটের ডেকে। ছুরি দিয়ে রশিটা কাটল রানা, একটা প্রান্ত ছুঁড়ে দিল এষাকে লক্ষ্য করে।

হাত বাড়াল এষা, কিন্তু ঠিক সেই সময় একটা ঢেউ এসে ঢেকে দিল ওর মাথা।

হোয়াইট রোজের রেইল থেকে আবার গুলি চালাচ্ছে ওরা। পিস্তল বের করে দুটো গুলি করল রানা।

আবার হারিয়ে গেল এষা। এক দুই করে গুনছে রানা। পনেরো সেকেন্ড পর মাথা তুলল এষা, হাত বাড়িয়ে আছে রশিটা ধরবে বলে। ইতোমধ্যে সেটা টেনে নিয়েছে রানা, আবার ছুঁড়ে দিল। এবার মাথার ওপর গিয়ে পড়ল রশি। ধরে ফেলল এষা।

বোটে তুলে নিচু পাটাতনে শুইয়ে দিল রানা এষাকে। ওপর থেকে গর্জে উঠল একটা মেশিনগান। গিয়্যার দিয়ে বোট ছেড়ে দিল রানা, তারপর সরে এসে শুয়ে পড়ল এষার ওপর। জাহাজের কাছ থেকে সরে আসছে বোট, কিন্তু হুইলে কেউ না থাকায় মাতালের মত ছুটল সেটা যেদিক খুশি।

গুলির আওয়াজ থামল। পিছন দিকে তাকাল রানা। অন্ধকারে হারিয়ে গেছে হোয়াইট রোজ। ধীরে ধীরে এষাকে চিৎ করল ও। ভয় লাগছে, যদি মারা যায়? চোখ বন্ধ করে আছে এষা। ঘুমাচ্ছে, নাকি জ্ঞান হারিয়েছে বোঝা গেল না।

বোটের হুইলে ফিরে এল রানা। রেডিওর সুইচ অন করে অরিয়নের নাম ধরে ইমপেরিয়ালকে ডাকল।

ইমপেরিয়াল সাড়া দিল। রানা বলল, 'হোয়াইট রোজে আগুন লেগেছে। ফিরতি পথ ধরে খানিকটা এগিয়ে এসে আমাকে তোলো। এষার জন্যে সিক বে রেডি রাখো—মারাত্মক পুড়ে গেছে ও।'

রেডিও বন্ধ করে আবার এষার সামনে ফিরে এল রানা। পায়ের পোড়া ক্ষতটা পরীক্ষা করতে গিয়ে গম্ভীর হয়ে উঠল চেহারা। বেশ কয়েকটা দাগ থেকে যাবে।

তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল রানা। চোখ মেলে তাকাল এষা। 'খুব কষ্ট হচ্ছে, এষা?'

'সত্যি তুমি?' ক্লান্ত, দুর্বল গলায় জানতে চাইল এষা।

'হ্যাঁ, আমি···মাসুদ।'

এষার ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল। 'তাহলে চিন্তা কোরো না, আমি বাঁচব।'

প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো। ফাটল মাইন। কয়েক সেকেন্ড পর শোনা গেল আরেক বিস্ফোরণ। হোয়াইট রোজের ফুয়েল ট্যাংকে পৌঁচেছে আগুন। আগুনের চওড়া একটা শিখা আকাশের একটা দিক আলোকিত করে রাখল কিছুক্ষণ। মাত্র কয়েক মিনিট। আগুনের গর্জন শোনা গেল। তারপর আওয়াজ আর আগুন থেমে গেল দুটোই, সেই সাথে হারিয়ে গেল হোয়াইট রোজ।

মেঘ কেটে গিয়ে পরিষ্কার হয়ে এল আকাশ। বৃষ্টি নেই।

এষার দিকে তাকাল রানা। ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করল এষা। ঠোঁটের কোণে হাসিটুকু লেগেই আছে। বিড়বিড় করে বলল, 'হিলারী··· রিচির এক লোক লুকিয়ে বসে আছে ইমপেরিয়ালের কোথাও।'

মুখ নামিয়ে একটা চুমো খেলো রানা ওর ঠোঁটে।

'কিচ্ছু ভেব না। ধরা পড়বে ও।'

সেদিন একাই অফিসে বসে আছে এফ.এ. মুলার। তার কোম্পানীর নামে ছয় মিলিয়ন ডলারের একটা চেক এল। চেকে সই রয়েছে ভিনসেন্ট গগলের। চেকের সাথে বুভাইল শিপিং কোম্পানীর একটা ছোট্ট স্টেটমেন্ট। তাতে লেখা—'হারিয়ে যাওয়া কার্গোর ক্ষতিপূরণ।'

পরদিন আরেক ঘটনা।

মিশরীয় আর্মির একজন অফিসার চুক্তিমত প্রথম বছরের টাকা অগ্রিম করতে এল। যাবার সময় অদ্ভুত একটা কথা বলল সে।

'আর আপনার ওই হারিয়ে যাওয়া কার্গোর ব্যাপারে,' বলল মিলিটারি অফিসার, 'আপনি যদি কোন রকম কৌতূহল না দেখান, আমরা খুব খুশি হব।'

চালাক-চতুর লোক মুলার, ব্যাপারটা এতক্ষণে পরিষ্কার হয়ে উঠতে শুরু করেছে তার কাছে। জানতে চাইল, 'কিন্তু ইউরাটম জিজ্ঞেস করলে কি বলব আমি?'

'সত্যি কথাই বলবেন,' বলল অফিসার। 'কার্গো হারিয়ে গেছে। বলবেন, আপনি যখন জানতে চেষ্টা করলেন আসলে ব্যাপারটা কি, দেখলেন, বুভাইল শিপিং

তাদের ব্যবসা গুটিয়ে দিয়েছে।'

'দিয়েছে কি?'

'দিয়েছে।'

ঠিক সেই কথাই ইউরাটমকে বলল মুলার। একদিন একজন ইনভেস্টিগেটর দেখা করল তার সাথে। মিলিটারি অফিসার যা বলতে বলেছিল, তাই বলল সে। সবশেষে মুলার জানতে চাইল, 'ব্যাপারটা নিয়ে কি খুব হৈ চৈ হবে?'

'মনে হয় না,' বলল ইউরাটম ইনভেস্টিগেটর। 'তাতে আমাদের ওপর আস্থা কমে যাবে লোকের। অন্তত আরও তথ্য না পেলে এই খবর আমরা প্রকাশ করতে চাইব না।'

কোন তথ্যই আর পায়নি ইউরাটম।

কোন প্রশ্নও ওঠেনি।

* * *